নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

মানুষ তার নিজের জীবনের ছক মনের মতো করে সাজাবার চেষ্টা করে। কিন্তু অদৃশ্য অদৃষ্টের বিচিত্র খেয়ালে সে ছক ওলট-পালট হয়ে যায়। বিকাশের সাজানো ছকও এই ভাবে উলটে গিয়েছিল। মনীষাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন যখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তখন সুবর্ণা দেখা দিল আলোকপর্ণার মতো। কিন্তু সেখানেও তো ঘোর অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলেছে নীচতা ও পঙ্কিলতা। এই পটভূমিকাতেই লেখক গড়ে তুলেছেন 'আলোকপর্ণা' উপন্যাসের কাহিনী।

ডাইনে বাঁয়ে ইঁটের পাঁজা আর পুরনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, এক জায়গায় তিনটি শুধু থাম, আর কিছুই নেই। চারধারে বটের ঝুরি নেমেছে। তারই মাঝখানে একটি লালপাড় ময়লা শাড়ি শুকুচ্ছে—এই চিহ্নটি শুধু মানুষ-বাসের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

বিকাশ চলেছে একটা রিকশায় নিয়োগীপাড়ার দিকে। যে বাড়ির দিকে সে চলেছিল রিকশায় তার বিস্তারিত না হোক একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেল রিকশাওয়ালার মুখে। আমি তো এখানকার ছেলে বাবু, জানবো না কেন? বাপ্-ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি এক-কালে বনেদীয়ানা বলতে তো নিয়োগীপাড়াই বোঝাতো। পালেরা কুণ্ডুবাবুরা তো হালের বড়লোক। ব্যবসা করে টাকা হলো ওদের। আগে ওই পাড়া থেকেই বেরুত ত্রিশ-চল্লিশখানা দুর্গা প্রতিমা। দেখার জন্যে চারধার ওজাড় করে লোক আসতো। এখন একখানা পুজো হয় তাও আবার চাঁদা তুলে। এখন একটা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ থাকে ওখানে আর ওঁর নাতনী।

শশাঙ্কবাবুর কাছে যাচ্ছিল বিকাশ। তাই নিয়োগীপাড়ার এত খোঁজ খবর নেওয়া।

বিকাশ ডাকলে: কাকা বাড়ি আছেন?

শশাঙ্ক তাকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। সামনের চেয়ারটায় বসে বিকাশের চোখ পড়লো টেবিলের ওপর একটা খবরের কাগজ, কতগুলো হ্যাণ্ডবিল—কৌতূহলী হয়ে উঠলো বিকাশ: দৈব মাদুলীর বিজ্ঞাপনটা, জটিল অসুখ সারে ওটা নিলে।

আশ্চর্য এ বাড়িটা, ভাবতেই পারা যায় না, একটা লোক পাগল আর এরাই কি সুস্থ। ভাবনায় ছেদ পড়ে। নিজেকে সামলে নিল বিকাশ। শশাঙ্ক আবার এসে পড়েছেন বাইরের কাজ সেরে। যে পাগল লোকটিকে দেখেছে বিকাশ সে শশাঙ্কর মেজদা। শশাঙ্ক তাকে এসে নাটকের দর্শক হতে দিতে চান না, বলেন: চলো—চলো ওপরে চলো। ও-সবে কান দিতে নেই। ওসব ভাহা পাগলের কাণ্ড।...

তোমার চা।

বিকাশ তাকাল। আধঘোমটা টানা মাঝবয়েসী এক মহিলা। তাঁর সঙ্গে একটি

কিশোরীর হাতে খাবার থালা ও চা। ইনিই কাকীমা। শশাঙ্ককাকার স্ত্রী। কাকার মেজ মেয়ে সুনী।

মেয়েটি দেখতে ভালো। প্রথম বয়েসের লাবণ্য নদীর জলের ওপর এক মুঠো আলোর মতো জেগে আছে। তবু মুখের রেখায় একটা শান্ত বিষণ্ণতা—এই সব পুরনো বাড়িতে —যেখানে একটা সমৃদ্ধ অতীত ছিল—অথচ এখন নেই সেখানে মেয়েদের চেহারায় হয়তো এমনি ক্লান্ত করুণ ছাপই পড়ে। ওর ভালো নাম সুবর্ণা। মেয়েটির সেবা, যত্ন ধীরে ধীরে আকর্ষণ করতে লাগলো বিকাশকে।

এখানেই তার সহপাঠী প্রভাকরকে সে খুঁজে বের করলে। প্রভাকর ডাক্তার। বিকাশ তাকে ঠাট্টা করে বললে, বন্ধুত্ব আর ডাক্তারী একসঙ্গে চলে না। প্রভাকর বললে, তোর ব্রাইটনেস নেই। তুই যেন কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস।

প্রভাকর আরও বলে, বিয়ে কর। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিকাশের মনে পড়ে যায় মনীষার কথা। মনীষা আফিসে চাকরি করে। তার টাকার খুব দরকার। বাবা রিটায়ার করেছেন, দুটি ভাই স্কুল কলেজে পড়ে। তাই বিকাশ চলে গেল। কিন্তু সে পড়ে রইলো কলকাতায়। চাকরি তার চাই—ছাড়লে তো চলবে না। বাস্তব অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সে মনের ভালবাসার কোন মূল্যই দেয় না। মনীষাকে ছেড়ে আসতে তার খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ছেড়ে যাকে আসতেই হবে তার জন্যে পিছু ফেরা কেন।

সুনু—সুবর্ণা—সোনালী এ বাড়ির একটি আশ্চর্য মেয়ে। ওকে তুলনা করতে ইচ্ছে করে সূর্যমুখীর সঙ্গে। কিন্তু সে যেমন ক্লান্ত আর তেমনি বিষণ্ণ।

বিকাশের জীবনে কেউই এলো না—মনীষাকে কলকাতা গ্রাস করলো। দেশবন্ধু পার্কের আকাশে লাল চিতার রং। মনীষার মৃত্যুর ছায়া থেকে পাপড়ি মেলতে লাগলো আলোকপর্ণা। শশাঙ্ককাকাও সাংঘাতিক লোক—সে হয়তো জোর করেই মিথ্যা কথা বলে প্রমাণ করতে চাইবে আতিথ্যের সুযোগে বিকাশ তার মেয়ের ওপর অন্যায় হাত বাড়িয়েছে।

কিন্তু মনীষার মৃত্যুর ভেতর দিয়ে হয়তো মেঘ কেটে যাবে। নতুন সূর্য উঠবে আর তারই আলোকে দল মেলবে সুবর্ণা—আলোকপর্ণা।

লেখক মধ্যবিত্ত সংসারের এক তরুণের মানসিক দ্বন্দ্বের, আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশা-গ্লানির এক বিচিত্র টানা-পোড়েনে বোনা জীবন-যন্ত্রণার অনুপম চিত্র তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে।

শুভক্ষণ একটি ছোট গল্পের সংকলন। এতে নানাধরনের বিভিন্ন আঙ্গিকের বিভিন্ন রসের ও স্বাদের গল্প আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের বৈশিষ্ট্য প্রতিটি গল্প নতুন

ভাবধারার—, তার বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ অভিনব। ভাবের এমন প্রাচুর্য চিন্তার এমন স্বচ্ছতা তাঁর গল্পের একটি দুর্লভ সম্পদ। 'রিবনবাঁধা ভালুক' যে স্বাদের 'কেয়া' তার সম্পূর্ণ ভিন্ন রসের গল্প। তবে সবগুলিই লেখকের সার্থক সৃষ্টি।

উদ্বোধন, খুনী, তিলঙ্গমা, শুভক্ষণ গল্পগুলিতে যে অপূর্ব জীবনবোধ ফুটে উঠেছে তা চিরদিন লেখককে অমর করে রাখবে।

তিতির, একটি চিঠি তাঁর অন্যবিধ ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করেছে।

'একটি চিঠি'র ভেতর প্রেমের প্রগাঢ় রস অনুভূত।

রেকর্ড গল্পটি অতুলনীয়। অনেকে মনে করেন, গল্পটিকে যে কোন বিদেশী ভাল গল্পের এক পর্যায়ে ফেলা যায়। তিতির এবং মহুলাও তাঁর অনন্য সৃষ্টি।

আশা দেবী
অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

না. র—৮ম

আলোকপর্ণা

কবি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র রায়

বন্ধুবরেষু

এক

রাস্তাটা ক্রমেই অদ্ভুত হয়ে উঠতে লাগল।

এতক্ষণ নতুন-পুরোনো মেশানো বাড়ি-ঘর ছিল, সবুজ পানায় ছাওয়া—কখনো বা তার মধ্যে বৃষকাষ্ঠ-পোঁতা পুকুর ছিল, রেডিয়োর দোকানে গানের আওয়াজ ছিল, ধুলো-পড়া কাচের আড়ালে ময়রার দোকানে জয়নগরের মোয়া ছিল, কোথাও বা পাইকারী বাজারের লাউ-মুলো-ফুলকপি-বেগুন দুধারে স্তূপাকার ছিল। পথটা পীচের ছিল, সাইকেল-রিক্‌শ, লরী, মোটর আনাগোনা করছিল, বেলা দশটার রোদে জীবন আর মানুষ ঝকমক করছিল। কোথায় যেন একটা রাজনৈতিক সভার কথা কারা ঘোষণা করে যাচ্ছিল।

তাই, নীচের পথ ছেড়ে, ডানদিকের খোয়া আর মাটি মেশানো রাস্তায় বাঁক না নেওয়া পর্যন্ত, নিয়োগী-বাড়ি সম্পর্কে আলাদা করে কিছু মনে হয়নি; তখন এপাশে ওপাশে, কোনো মজা পুকুরের ধারে—যে কোনো একটা নতুন কিংবা পুরোনো বাড়িই অনায়াসে নিয়োগী-বাড়ি হতে পারত। সে বাড়ির যে-কোনো একটি ছেলে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে আড্ডা দিতে পারত, যে-কোনো একটি মেয়ে হাতে-বোনা স্কার্ফ গায়ে জড়িয়ে—একটি ব্যাগ মুঠোর মধ্যে চেপে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে পারত, যে-কোনো একজন বয়স্ক মানুষ পাইকারী বাজারে এক ডজন ফুলকপি দরাদরি করতে পারতেন। কিন্তু সাইকেল-রিক্‌শটা এই রাস্তায় নামবার পরে, দুর্বিনীত খোয়া আর উঁচু-নীচু মাটিতে গোটাকয়েক ঝাঁকুনি খাওয়ার পরে—এখন অন্য রকম মনে হতে লাগল বিকাশের।

মনে হতে লাগল একটু-একটু করে।

প্রথমেই দু পাশ থেকে গাছগুলো যেন অনেকখানি নত হয়ে এল, তাদের মলিন পাতা-গুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল এখানে অনেক দিন বৃষ্টি হয়নি; একটা ছোট বাঁশের ঝাড়ে হাওয়া লেগে সর্‌সর্‌ করে আওয়াজ হতে লাগল; দেখা গেল পুরোনো একটা অশ্বত্থের নীচে জড়াজড়ি করে রয়েছে রং-জ্বলে-যাওয়া মাটি-বেরিয়ে-আসা গোটা তিনেক শীতলা মূর্তি আর তাদের সামনে কিচির-মিচির রবে গোটা কয়েক ছাতারের জটলা। পিছনে বাজার-গরু-গাড়ি-মানুষ-রেডিয়োর আওয়াজ হঠাৎ যেন বাঁশবনের আওয়াজে আর ছাতারের ডাকে একশো মাইল পিছিয়ে গেল।

তারও পরে—

ডাইনে বাঁয়ে ইঁটের পাঁজা আর পুরোনো বাড়ির ধ্বংসশেষ। এক জায়গায় তিনটে থাম শুধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, আর কিছুই নেই; একটা মন্দিরগোছের কিছু ছিল এখানে—বটগাছের নাগপাশে প্রায় অদৃশ্য; ওখানে একটা পোড়ো বাড়ির মতো কী দাঁড়িয়ে—লাল পাড়ের একটা ময়লা শাড়ি শুকোচ্ছে বলে বোঝা যায় ও বাড়িতে মানুষ আছে।

অস্বস্তিতে একবার নড়ে উঠল বিকাশ। টক্কর বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল রিক্‌শটা, বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো আমরা ?'

রিক্‌শওলা বললে, 'রাস্তা ভুল হবে কেন বাবু ? এই তো নিয়োগীপাড়া শুরু হল।'

'এইটে নিয়োগীপাড়া ?' সন্দেহ মিটতে চাইল না : 'কিন্তু পাড়া বলে তো মনে হচ্ছে না। চারদিকটা তো পোড়োবাড়ি দেখছি।'

'পোড়োবাড়ি আছে, আবার মানুষজনও থাকে।'

'এর ভেতরে ?'

'যেখানে যেটুকু আস্তো আছে, তারই ভেতরে মুখ গুঁজে থাকে বাবু। বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে যাবে কোথায়, বলুন ?'

'হুঁ।'

'দু-তিন ঘর কলকাতায় গিয়ে বাড়ি করেছে, তাদের অবস্থা ভালো। দেশে আর তারা আসে না। ক'ঘর মরে শেষ হয়ে গেছে, তাদের ভিটেয় আর বাতি জ্বলে না। বাকী সব আর যাবে কোথায়, এরই ভেতরে পড়ে আছে কোনো রকমে। ওই দু-চার মণ ধান জমি-টমি থেকে পায়, এক-আধটু চাকরি-বাকরি করে—এই যা।'

সাধারণ রিক্‌শওয়ালার চাইতে লোকটি কিছু বেশি আলোকিত দেখা গেল, একটু আশ্চর্য হল বিকাশ।

'তুমি তো অনেক খবর জানো দেখছি।'

'আমি তো এখানকারই ছেলে বাবু, জানব না কেন ? বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি এককালে বনেদীয়ানা বলতে নিয়োগীপাড়াই তো বোঝাত। পালেরা, কুণ্ডুবাবুরা তো হালের বড়লোক, ব্যবসা করে টাকা হল ওদের। আগে ওই পাড়া থেকেই নাকি বেরোতো ত্রিশ-চল্লিশখানা দুগ্‌গা প্রতিমা—মিছিল করে নদীতে নিয়ে যেত—দেখবার জন্যে দশ বিশ মাইল দূরের থেকে মানুষ আসত দঙ্গল বেঁধে। এখন একখানা পুজো হয় কোনোমতে—সব শরিকে মিলে চাঁদা দেয়। তাও হয়তো আর—'

একবারের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল রিক্‌শওয়ালা, মস্ত একটা ঝাঁকুনি লাগল, কথাটা শেষ হল না।

হ্যাঁ, নিয়োগীপাড়ায় মানুষজন আছে এখনো, কথাটা মানতে হল বিকাশকে। এ-দিকে আধখানা ধসে-পড়া তেমনি একটা জীর্ণ একতলা বাড়ি। তার সামনের একটু ফাঁকা জায়গায়—একটা ইজি-চেয়ার পেতে কে যেন খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজের আড়ালে তাঁর মুখ দেখা যায় না—কিন্তু ধুতির নীচে হলদে হলদে দুখানি শীর্ণ পা—মণি-বন্ধ পর্যন্ত খয়েরী রঙের পুলওভার আর গায়ের বালাপোশ থেকে বোঝা যায়—মানুষটি বুড়ো। ছিটের ফ্রক পরা আর লাল র‍্যাপার জড়ানো একটি ছোট মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে

রিক্‌শটার দিকে চেয়ে আছে—ওই বুড়ো মানুষটির নাতনিই হবে খুব সম্ভব।

ডান দিকে আবার বাঁশঝাড় সর্‌সর্‌ করছে হাওয়ায়। একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে বিকাশের গায়ে পড়ল। রিক্‌শওলা বললে, 'আপনি তো যাবেন শশাঙ্কবাবুর বাড়ি?'

'তাই তো বলেছি তোমাকে।'

'কেউ হন নাকি আপনার?'

'না—সে রকম কিছু নয়।'

'আলাপ-সালাপ আছে তো?'

'না, এর আগে আমি কখনো ওঁদের দেখিনি।'

'ও—' একটু চুপ করে থেকে রিক্‌শওয়ালা বললে, 'ওঁদের ওখানে থাকবেন নাকি এখন?'

'ঠিক জানি না। থাকতে হতে পারে দু-চারদিন।' নিজের অজ্ঞাতেই বিকাশ রিক্‌শওয়ালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল: 'এখানে চাকরি নিয়ে এসেছি। আলাপ না থাকলেও চেনা-জানা বলতে ওঁরাই। প্রথমটা দু-একদিন থেকে তারপরে হয়তো একটা বাসা-টাসা ঠিক করে নিতে হবে।'

রিক্‌শওলা এতক্ষণ জবাব দিচ্ছিল সামনে চোখ রেখেই। হঠাৎ ফিরে তাকালো।

'ও বাড়িতে দু-চারদিনই থাকা ভালো, বাবু। তার বেশি থাকবেন না।'

লোকটার চোখ, গলার স্বর, বলবার ভঙ্গি—সব কি রকম মনে হল বিকাশের।

'এ কথা বলছ কেন?'

রিক্‌শওলা তার জবাব দিল না। ডান দিকের একটা ফালি পথে এবার রিক্‌শটা ঘুরিয়ে নিলে সে। তার দুধারে সুপুরি গাছের সারি, এক ধারের গাছগুলো আধশুকনো একটা পুরোনো পুকুরে ছায়া ফেলেছে। সেই পুকুরের পাড়ে আর একটা বিশাল বাড়ি আধখানা ভেঙে দাঁড়িয়ে, তার সামনের অংশটা হোয়াইটওয়াশ করা—সব মিলে যেন বিকট একটা মুখ-ভ্যাংচানির মতো দেখাচ্ছিল। রিক্‌শওলা বললে, 'ওইটেই শশাঙ্ক নিয়োগীর বাড়ি বাবু।'

শুধু সামনেটাই চুনকাম করা হয়েছে তা নয়, সিঁড়িটাও বোধ হয় নতুনভাবে করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। তার কিছু অংশে এখনো দগদগে লাল সিমেন্টের রং, কোথাও কোথাও চাপ্‌ড়া ভেঙে পড়েছে। রিক্‌শর আওয়াজ কানে যেতেই সেই সিঁড়ির মুখে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়ালো।

'শশাঙ্ক কাকা আছেন?'

'বাবা আছে—' একসঙ্গেই জবাব এল। তারপরেই হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল তারা।

ট্রাঙ্ক আর বিছানাটা রিকশওলাই তুলে দিচ্ছিল বারান্দায়। কেমন একটা অনিশ্চিত অস্বস্তি নিয়ে বিকাশ দাঁড়িয়ে রইল—কথাটা মনের ভেতরে গুন্‌গুন্ করছে: 'ও-বাড়িতে দু-চারদিনই থাকা ভালো, বাবু।' নোনা-লাগা ইট আর পুরোনো মাটির গন্ধ আসছে, সামনে একটা নতুন খড়ের পালা শীতের রোদে জ্বলছে সোনার মতো।

চটির ফটাফট আওয়াজ পাওয়া গেল, বিকাশ সচেতন হয়ে উঠল। হাফ-শার্টের ওপরে সোয়েটার আর লুঙ্গিপরা মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন বাইরে। বোধ হয় দাড়ি কামাচ্ছিলেন, একটা কানের তলায় খানিকটা সাবানের ফেনা দেখা যাচ্ছে এখনো।

'তুমি বিকাশ? আরে এসো এসো, কালই তোমার চিঠি পেয়েছি।'

'শশাঙ্ক কাকা?' এগিয়ে গিয়ে বিকাশ পায়ের ধুলো নিলে।

'বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো—' শশাঙ্ক কাকা আশীর্বাদ করলেন: 'তা চিনে আসতে কষ্ট হয়নি? একবার ভেবেছিলুম আমি নিজেই স্টেশনে যাই, তা সকাল থেকে এত কাজ—'

'তাতে কী হয়েছে কাকা, আমি তো আর পর নই।' বিকাশ ভদ্রতার চেষ্টা করল: 'তাছাড়া নিয়োগীপাড়া তো নাম করা—আসতে আর অসুবিধে কিসের।'

'নিয়োগীপাড়ার এখন কেবল নামই আছে হে—' শশাঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: 'বাকী যা দেখছ শ্মশান—সব শ্মশান। অথচ একদিন—যাক সে-সব পরে হবে—' শশাঙ্ক কাকা গলা তুলে ডাক ছাড়লেন: 'নিতাই—নিতাই—ওরে নিতাই—'

সিঁড়ির ওপর আবার একটি ছোট মেয়ের আবির্ভাব হল।

'নিতাই তো নেই বাবা, সে সকালে গেছে ধান আনতে।'

'তাই তো, মনেই ছিল না। ওরে—ও রিক্‌শওলা—কে রে, গণেশ নাকি?'

রিক্‌শওলা হাসল: 'আজ্ঞে।'

'তুই এসেছিস, ভালোই হল। একটু কষ্ট কর্ বাবা—এই টুনিটার সঙ্গে যা, বাবুর বাক্স-বিছানাটা ওপরে তুলে দিয়ে আয়। পয়সা দেব এখন।'

গণেশ বাক্স তুলতে গেল। শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কেন, এসো, ভেতরে এসো।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান দিকে ছোট ঘর একটা। বাইরে থেকে যতই বিবর্ণ দেখাক, ভেতরটা মোটামুটি ছিমছাম। একটা টেবিল, খানকয়েক পুরোনো কাঠের চেয়ার। পেছনে দেওয়াল-আলমারিতে একরাশ খাতাপত্র দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কিসের যেন স্তূপাকার হ্যাণ্ডবিল—ধুলো জমে আছে তার ওপরে। দেওয়ালের গায়ে মহিষমর্দিনীর ছবিওলা ক্যালেণ্ডার, তারকেশ্বর আর বিবেকানন্দের বাঁধানো ছবি—বিবেকানন্দ একটু

হেলে আছেন একধারে। ঘরের আর এক কোনায় অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটা টিনের ড্রাম ওপর-নীচ করে সাজানো, বড়ো একটা দাঁড়িপাল্লা, মরচেপড়া গোটাকয়েক বাটখারা। বোঝা গেল, এইটেই শশাঙ্ক কাকার বসবার ঘর এবং যে-কোনো একটা অফিস।

শশাঙ্ক বললেন, 'একটু বোসো এখানে, আমি দেখি ওদিকে কী হল।'

কী দেখতে গেলেন কে জানে। বিকাশ একটা চেয়ারে চুপ করে বসে রইল। এই ঘরটা ছিমছাম, দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ নোনা ফুটে বেরুলেও মোটের ওপর ধবধবে —তবু কোথায় জীর্ণতার গন্ধ, পুরোনো ইট, ধসা-বালি, মরে-যাওয়া মাটির চাপা নিশ্বাস। এ-ঘরে নয়, বাইরে কোথায় একটা দেওয়াল-ঘড়ি টিকটিক করছে, তার শব্দটা ক্লান্ত, অদ্ভুত ক্লান্ত। আরো চোখে পড়ল, তারকেশ্বরের ছবির একটা কোনা স্যাঁতা লেগে খেয়ে এসেছে, বিবেকানন্দের ছবির কাচে চিড়-ধরা।

বিকাশ টেবিলের ওপর চোখ নামিয়ে আনল। একটা খবরের কাগজ—কালকের। সেটাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তার তলা থেকে একটা হ্যাণ্ডবিল উঁকি মারল।

পুরোনো হ্যাণ্ডবিল, কাগজের রঙ হলদে হয়ে এসেছে। এইগুলোই দেওয়াল-আলমারির ভেতরে রাখা আছে মনে হয়। অলসভাবে চোখ বোলাতে গিয়েও তৎক্ষণাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠল বিকাশ।

'দৈব মাদুলী! দৈব মাদুলী!! দৈব মাদুলী!!! হিমালয় পর্বতের সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রদত্ত। এই মাদুলী ধারণ করলে বাত সারে, হাঁপানি সারে, যাবতীয় জটিল বৈদ্যের অসাধ্য রোগ সমূলে নির্মূল হয়ে যায়। শুধু লোক-হিতের জন্যে মাত্র এক টাকা পাঁচ আনায় বিতরণ করা হচ্ছে। স্পেশ্যাল শক্তিসম্পন্ন দু-টাকা দশ আনা। ডাকব্যয়—'

তলায় বিনীতা সুধামুখী দেবী। নিয়োগীপাড়া। পোঃ ও জিলা—

কে সুধামুখী দেবী? কাকিমা? শশাঙ্ক কাকার স্ত্রী, কিংবা তাঁর মা? আর কেউ? দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের এইসব সন্ন্যাসীরা প্রায়ই-মাদুলী-তাবিজ-ওষুধ বিতরণের জন্যে লোকালয়ে নেমে আসেন, কিন্তু নিয়োগীপাড়ার সন্ধান তাঁরা পান কী করে?

প্রশ্নটার জবাব মিলল না। দরজায় রিকশওলা গণেশ দেখা দিল।

'বাবু, আমার ভাড়াটা—'

বারো আনা ঠিক হয়েছিল। একটা টাকা এগিয়ে দিয়ে বিকাশ বললে, 'রেখে দাও।'

চটির আওয়াজ তুলে শশাঙ্ক এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি শিউরে উঠলেন।

'কিরে, এক টাকা? ডাকাতি পেলি নাকি?'

'আজ্ঞে স্টেশন থেকে আসতে তো বারো আনাই রেট। আর চার আনা বাবু বক্শিশ দিলেন।'

'বারো আনা? ছ-আনায় আসে। মাল তোলবার জন্যে দু আনা। আট আনা

ফেরৎ দে।'

'আপনি শুধিয়ে দেখবেন বাবু, বারো আনার কমে কেউ রাজী হবে না। আপনি তো কখনো রিক্শয় আসেন না—'

বাধা দিয়ে শশাঙ্ক বললেন, 'কোন্ দুঃখে রিক্শয় আসতে যাব সাইকেল থাকতে? কিন্তু তোরা কী হলি বল্ দিকি গণেশ? বিদেশী লোক পেলেই গলা কাটতে হবে? একটা চক্ষুলজ্জাও নেই?'

বিকাশ বললেন, 'ওরা ওই রকমই নেয়, কাকা। স্টেশনে কেউ বারো আনা এক টাকার কমে আসতে চাইল না। ওর দোষ নেই।'

'শুনলেন তো?' মৃদু হেসে গণেশ বললে, 'আচ্ছা বাবু আসি।'

'এই করেই এ-সব ছোটলোকের লোভ বাড়িয়ে দাও তোমরা।' শশাঙ্ক গজগজ করতে লাগলেন: 'যা চায়, চাক না! বাড়িতে এনে ছ' গণ্ডা পয়সা ফেলে দেবে—ব্যস, মিটে গেল। আমাদের কাছেই ওরা ঠিক থাকে।'

বিকাশ একটু হাসল।

'এ কলকাতা নয়, বাবাজী—পাড়াগাঁ। এখানকার লোককে বিশ্বাস করলেই ঠকেছ। কেউ একটা সত্যি কথা বলে না এখানে, সবাই আছে কেবল পরকে ফাঁকি দেবার তালে।'

বিকাশ বললে, 'কথাটা উলটো রকম শোনাচ্ছে কাকা। ও অপবাদ তো কলকাতারই। বরং পাড়াগাঁয়ের লোক ঢের ভালো—এইরকমই সবাই বলে।'

'ভুল, একদম ভুল। দিনকাল যা হয়েছে না—পাড়াগাঁ এখন কলকাতার ওপরেও এক কাঠি। কলকাতার তবু চক্ষুলজ্জা আছে, এখানে মানুষ একেবারে ছিঁচকে হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে ঘেন্না ধরে যায়—জানো? ভাবি, এ-সব বিক্রী-পাটা করে দিয়ে ওই কলকাতা-টলকাতাই চলে যাই—একটা দোকান-ফোকান যা হয় খুলি। এ-সব চোর-ছ্যাচোড়ের মধ্যে আর বাস করতে ইচ্ছে হয় না।'

'বলেন কি!'

'একটা খাঁটি মানুষ কোথাও তুমি পাবে না—একটাও না—' শশাঙ্ক বলে চললেন, 'আচ্ছা এখন তো আছো এখানে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে সব। যাক—সে পরে হবে। এখন চলো ভেতরে—হাত-মুখ ধোবে, চা-টা খাবে।'

'আজ্ঞে চা আমি খেয়েই এসেছি। এত বেলায় ও-সমস্ত আর—'

'আরে চা খেয়ে তো এসেইছ—বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত কি আর বসে থাকবে চায়ের জন্তে? তবে কলকাতার মানুষ তোমরা, দিনে সাতবার চা না হলে কি আর তোমাদের চলে? এখানে তোমার লজ্জার কিছু নেই হে—নিজের বাড়ি বলেই মনে

কোরো। তোমার বাবা আমার বড়োভাইয়ের চেয়েও আপন ছিলেন—কী যে ভালো-বাসতেন আমাকে! এসো—এসো—'

বিকাশ পা বাড়ালো শশাঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে। বাইরে একটু রং ফেরানো হয়েছে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে জীর্ণতা কোথাও গোপন নেই আর। আস্তর খসে পড়া দেওয়াল থেকে দাঁত বের করে আছে পুরোনো ইটের সার। মাথার ওপরে নুয়ে এসেছে পুরোনো ছাদ, তাতে শ্যাওলার দাগ, জলের রং। চারদিকে ছায়া-ছায়া আড়ষ্টতা, কোনোদিন আলো-না-ঢোকার একটা শীতল স্যাঁতসেঁতে ভাবটা এই শীতের দিনে গা শিউরে-আনা একটা আব-হাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছে। বাইরে যে ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা হাওয়ায় আলগাভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল, এখানে যেন তা চাপ দিতে চাইছে বুকের ওপর।

ডানদিক দিয়ে একটা সরু সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। তার তলার দিকটাতে এই দিনের বেলাতেও সন্ধ্যার অন্ধকার।

সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে শশাঙ্ক একবার থেমে দাঁড়ালেন। হয়তো বিকাশের চিন্তার দিকটা আন্দাজ করে নিলেন, হয়তো স্বাভাবিকভাবেই কৈফিয়ৎ দিলেন একটা।

'পুরোনো বাড়ি, বুঝেছ বিকাশ, কর্তারা বড়ো করেই করেছিলেন। তাঁদের তো কোনো অভাব ছিল না—ঘরে বেঁধেই রেখেছিলেন লক্ষ্মীকে। তাঁরা গেছেন—লক্ষ্মী-ঠাকরুণও ছেড়েছেন। এত বড়ো বাড়ি সামলে রাখব সে ক্ষমতা আর আমাদের নেই। এদিকটায় ঠেকো দিই তো ওদিকটা ভেঙে পড়ে। কী করা বলো, এইভাবেই থাকতে হয় কোনোরকমে।'

'আজ্ঞে হাঁ, সে তো বটেই। এত বড়ো বাড়ি মেনটেন্ করা—'

'প্রাণান্ত—প্রাণান্ত! তারপর চুন-বালি-সিমেন্টের দাম? যে রাজমিস্ত্রী আগে এক টাকা রোজে কাজ করত, এখন ছ'টাকার নীচে সে কথাই কয় না। তাই তো ভাবি, সমস্ত বিক্রী করে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলে এ-সব ইটের পাঁজা কিনবেই বা কে?'

বলতে বলতে কয়েকটা ধাপ উঠে গিয়েছিলেন শশাঙ্ক, বিকাশও পা বাড়িয়েছিল সিঁড়ির দিকে। ঠিক সেই সময়, ঠিক বিকাশের কানের কাছে একটা অদ্ভুত খ্যাঁসখেঁসে গলা বেজে উঠল: 'এই!'

চমকে বিকাশ ঘুরে দাঁড়াল; একবারের জন্যে কেঁপে উঠল বুকটা। সিঁড়ির তলায় এই দিনের বেলাতেও যেখানে সন্ধ্যার মতো অন্ধকার থমকে আছে, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে না থাকলে যার ভেতরে নজর চলে না, সেখান থেকে একখানা মুখ বেরিয়ে এসেছে। তার মাথায় খানিকটা রুক্ষ-বিশৃঙ্খল চুল, মুখে কাঁচা-পাকা এলোমেলো দাড়ি, দুটো ছোট ছোট চোখ তার জোনাকির মতো মিটমিট করছে।

লোকটা আবার বললে, 'অ্যাই!'

সিঁড়ির ধাপের ওপর বিকাশ থমকে গেল। মনে হল সে ভূত দেখছে।

অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'কিছু বলছেন আমাকে ?'

'হাঁ, তোকেই—তোকেই। কেন এসেছিস এ বাড়িতে ?'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'বুঝলি—' জোনাকির মতো চোখ দুটো দপ-দপ করে উঠল: 'নিয়োগীবাড়িতে আগে কালীপুজোর নরবলি দেওয়া হত। তোকেও বলি দেবার জন্যে এনেছে। বাঁচতে চাস তো—'

এ যে একেবারে বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা! কিন্তু এই দাড়ি-গোঁফওলা মুখখানা কপাল-কুণ্ডলার নয়, শশাঙ্ক কাকা কাপালিক নন, নিয়োগীবাড়ি সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ীও নয়। তবু উনিশ শো সাতষট্টি সালের এই শীতের দুপুরে—কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে ঠাট্টা করার চাইতেও—সিঁড়ির তলায় ওই অন্ধকার, ওই কদাকার মুখখানা, ওই বলবার অস্বাভাবিক ভঙ্গি, সব মিলে বিকাশের শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা বরফের স্রোত বয়ে গেল, সিঁড়ির ওপর পা দুটো তার জমে যেতে চাইল।

শশাঙ্ক কাকা খানিকটা উঠে গিয়েছিলেন, পেছনের এই নাটকটা তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু অদ্ভুত লোকটার শেষ কথাগুলো তাঁর কানে গিয়েছিল। প্রায় বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে গোটা দুয়েক ধাপ নেমে এলেন তিনি, গমগমে গলায় ডাকলেন: 'মেজদা—আবার!'

যেন ম্যাজিক ঘটল। চক্ষের পলকে মুখটা মিলিয়ে গেল সিঁড়ির তলায়।

'আবার তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে দেখছি—' শশাঙ্ক কাকার দাঁত কশ্‌-কশ্‌ করে উঠল: 'ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছো।'

বিকাশ যেখানে ছিল, সেখানেই একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকে সামলে নিয়ে, কাছে এসে শশাঙ্ক কাকা সস্নেহে হাসলেন: 'চলো—চলো, ওপরে চলো। ও-সবে কান দিতে নেই, ভাহা পাগলের কাণ্ড!'

তা হলে আপাতত এই বাড়িতেই থাকা যাক দু-একদিন। কাল অফিসে গিয়ে জয়েন করা, তারপর খুঁজে-পেতে দেখা কোথাও একটা ঘরটর ভাড়া নেওয়া যায় কি না। কিংবা কে জানে, যেখানে বাস চলে, ট্র্যানজিস্টার রেডিয়ো নিয়ে লোকের চলা-ফেরা দেখা যায়, বাজারের রাস্তায় পর-পর কয়েকটা হেয়ার-কাটিং সেলুনও চোখে পড়ে, পালেরা কুণ্ডুরা ব্যবসা করে বড়োলোক হয়ে যায়, সেখানে চলনসই এক-আধটা মেসের সন্ধান পাওয়াও

যেতে পারে হয়তো।

শশাঙ্ক কাকা বলেছেন, 'তুমি ঘরের ছেলে, থেকেই যাও না এখানে।'

রিক্‌শওলার কথাটা কানে না বাজলে, কিংবা সিঁড়ির তলা থেকে ভূতুড়ে মেজদা একটা রোমাঞ্চকর গল্পের মতো হঠাৎ তার অদ্ভুত মুখটা না বাড়ালে, হয়তো এক-আধ মাস এখানে থেকে যাওয়ার নিশ্চিন্ত শিথিলতা বিকাশেরও আসত। চিরদিন তার বাড়িতে থাকাই অভ্যাস। বাসা করে থাকার মধ্যে যদিও বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু ঘর ভাড়া করা, একটা রান্নার লোক রাখা, বাজার করা, হাঁড়ি-কড়াই-তেল-মশলার ভাবনা ভাবা—এগুলো মনে হলেই অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে ওঠে। মেস সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়, কিন্তু এই আধা-শহর আধা-গ্রামে তার চেহারাটা কি রকম দাঁড়াবে, এক ঘরে ক'টি তক্তপোশ এবং কে কে তাতে থাকবেন (তাঁদের কারুর যদি সমস্ত রাত নাক ডাকে!), কী খেতে দেবে এবং তার ছ্যাঁচড়ার গন্ধে প্রাণ চমকে উঠবে কিনা কিংবা তরকারীতে এমন লঙ্কা পড়বে যে ঠোঁটে ছুঁইয়েই লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে কিনা—এ সবও ভাববার দরকার আছে!

তার চেয়ে মন্দ কি একটা পরিবারের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে!

কিন্তু তাও সম্ভব নয়!

রিক্‌শওলার কথায় গুরুত্ব না দিলেও চলে, পাড়াগাঁয়ে নানা রকম দলাদলি থাকেই। তা ছাড়া শশাঙ্ক কাকা বলেছেন এসব জায়গার সবাই ঠক, কাউকে বিশ্বাস নেই। অতএব রিক্‌শওলাকে স্বচ্ছন্দে অবিশ্বাস করা যায়। মেজদা অবশ্য সিঁড়ির তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে প্রাণ চমকে দিয়েছিলেন, কিন্তু শশাঙ্ক কাকা বলেছেন—'ওর মাথা খারাপ—সে এক হিস্ট্রী বাবাজী, পরে বলব।' সে একটা ক্রমশ প্রকাশ্য গল্প, তার জন্যে ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবু—তবু এ বাড়িতে থাকা যায় না।

প্রথমত থাকতে গেলেই কিছু খরচ দিতে হয়। সে টাকা শশাঙ্ক কাকা নেবেন কিনা সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত কোনো অচেনা বাড়িতে ঢুকে দুদিনে তাদের আপন করে নেওয়া—ঠিক এই স্বভাবটা বিকাশের নয়, তার পক্ষে এখানে ওভাবে সহজ হওয়া শক্ত। আর তৃতীয়ত—

চিন্তাটা থামল। শশাঙ্ক কাকার গলা ভেসে এল নীচ থেকে।

'কই রে, ওপরে চা দিয়ে এসেছিস বিকাশকে?'

'এই নিয়ে যাচ্ছি, বাবা।'

'এত দেরি হল এক পেয়ালা চা করতে?'

মিষ্টি মেয়েলি গলায় জবাবটা এবার শোনা গেল না। বিকাশ অনুমান করবার চেষ্টা করল। হয়তো মেয়েটি চুপি-চুপি জানালো, ঘরে চা ছিল না কিংবা দোকান থেকে চিনি

আনতে হল।

'আচ্ছা—আচ্ছা—' শশাঙ্ক কাকা একটা কিছু বুঝে নিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সেই কানভাঙা পেয়ালাগুলোয় আবার দিস নে, একটা ভালো কাপ-টাপ বের করে দিস। সে-সব দু-একটা আছে, না গয়ায় পৌঁছেছে?'

এবারেও জবাব পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব, তারা এখনো গয়ায় যায়নি, এখনো যত্ন করেই তোলা আছে, নইলে শশাঙ্ক কাকা নিশ্চয় চেঁচিয়ে উঠতেন।

এসব বিকাশের শোনা উচিত নয়, নিতান্ত সাংসারিক আলাপ। তবু না শুনে উপায় ছিল না। যে কোনার ঘরটিতে তার থাকবার ব্যবস্থা, তার সামনের বারান্দাটিতে দাঁড়িয়েই অন্তঃপুরের এসব নেপথ্য-সংলাপ তার কানে আসছিল।

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'তোরা চা-টা দে, আমি একটু ঘুরে আসছি ছোট কাকার কাছ থেকে।'

আবার একটি মেয়েলি কণ্ঠ কিছু বলল। চাপা, সতর্ক স্বর—একটুখানি আওয়াজ পাওয়া গেল, কিন্তু কথা বোঝা গেল না। না, সেই মেয়েটির রিনরিনে গলা নয়, অন্য কেউ। খুব সম্ভব কাকিমা।

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'না না, দেরি হবে কেন? বাড়িতে অতিথি—আমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি আসছি।'

একটা চটির আওয়াজ বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে।

চা একটু পরেই আসবে, একটা ভদ্র রকমের পেয়ালাতেই আসবে খুব সম্ভব। কিন্তু বিকাশের চিন্তা এগিয়ে চলল অন্য দিকে। কিন্তু কোনো একটা চকচকে—হয়তো বা ফুলকাটা চায়ের পেয়ালা—এই বাড়িতে ঠিক মানাবে? নীচের তলায় শশাঙ্ক কাকার বসবার ঘরটিতে রং বদলানো হয়েছে, দোতলার এই অংশটিতেও বসবাস করবার জন্যে জোড়াতাড়া দেবার চেষ্টা। কিন্তু বিকাশ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তারই নীচে একটা চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসস্তূপ। খানিকটা দাঁড়িয়ে আছে—বাকি অংশ চুন-সুরকি-ইটের পাহাড় হয়ে রয়েছে, তার ওপর আগাছার জঙ্গল। ওটা সাফ করবারও কারো গরজ নেই। চণ্ডীমণ্ডপের ওদিকে আর এক সার ঘর, তার একতলাটা চোখে পড়ে না; দোতলার যে-অংশ মুখোমুখি দেখা যায়, তার আস্তরখসা দেওয়াল, বন্ধ দরজা-জানলায় ভাঙা খড়খড়ি, বারান্দা জুড়ে আধহাত উঁচু হয়ে আছে পায়রার আবর্জনা, ছাতের আধখানা জুড়ে বিরাট এক বটগাছের আবির্ভাব। অন্য কোনো শরিকের অংশ খুব সম্ভব—কিন্তু তারা কেউ আর এ-বাড়িতে থাকে না।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভেতরে সব ভাঙন-লাগা, সব ধসে পড়ার মুখে। নিয়োগীদের যেদিন গেছে, সেদিন আর ফিরবে না। চল্লিশখানা প্রতিমার শোভাযাত্রা

বেরুনোর ইতিহাস চিরকালের মতোই শেষ হয়ে গেছে।

বারান্দা থেকে সরে বিকাশ নিজের ঘরটিতে ফিরে এল। আপাতত এইটিই তার থাকবার জায়গা। বোধ হয় আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছিলেন শশাঙ্ক কাকা। ছোট ঘরের একধারে একটি তক্তোপোশ বেডকভার বিছানো, একটা পুরোনো টেবিল, একটা চেয়ার। দেওয়ালে একটি রঙিন ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত। কুলুঙ্গিতে একজোড়া কাচের ফুল-দানি, কোনো সময় হয়তো ফুল এনে সাজিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এত আয়োজনেও দেওয়ালটা কালো, ছাতে ঝুল, এখানে-ওখানে নোনার রং।

ঐশ্বর্যের ভেতরে দুটি জানলা। তাদের সামনে দাঁড়ালে জংলা বাগান—কয়েকটা নারকেল গাছের ফলন্ত সম্ভার। সবুজ। বাঁদিকে ভাঙা ঘাটলা আর পানা নিয়ে একটা পুকুর—এ-বাড়ির খিড়কির কাজ চলে বোধ হয়।

বাগানের কয়েকটা আম-জামের গাছে একপাল বানর কয়েকটা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে লাফালাফি করছিল, একজোড়া হলদে পাখি ওড়া-উড়ি করছিল, একটা নারকেল গাছে গোটাকয়েক ব্যতিব্যস্ত কাঠবেড়ালের ওঠানামা চলছিল, টুনটুনির ডাক শোনা যাচ্ছিল। তারই মধ্যে কিছুক্ষণ চোখ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বিকাশ। ছেলেবেলায় গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে যাওয়া—দুপুরবেলা বাগানে বাগানে আম-জামরুল-গোলাপজামের খোঁজে—

'তোমার চা—'

বিকাশ ফিরে তাকালো। আধঘোমটাটানা মাঝবয়েসী এক মহিলা। তাঁর সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে। মেয়েটির হাতে খাবারের থালা, জলের গ্লাস, মহিলার হাতে চায়ের পেয়ালা।

টেবিলে খাবার নামিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এসো বাবা—চা-টা খেয়ে নাও! একটু দেরি হয়ে গেল, তোমার কষ্ট হল খুব।'

বলে দিতে হল না, ইনিই কাকিমা—শশাঙ্ক কাকার স্ত্রী। বিকাশ এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিলে।

'বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো, সুখী হও—' কাকিমা আশীর্বাদ করলেন। তারপর আলতোভাবে একটা ধমক দিলেন সঙ্গের মেয়েটিকে।

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন, প্রণাম কর্ দাদাকে।'

মেয়েটি সঙ্কুচিতভাবে নীচু হয়ে বিকাশের পায়ে হাত ছোঁয়ালো। পাখির পালকের মতো নরম আলতো স্পর্শ লাগল। একটা কিছু আশীর্বাদ করবার কথা ভাবল বিকাশ, কিন্তু কেমন বুড়োটে শোনাবে মনে হল তার।

কাকিমা বললেন, 'খেয়ে নাও বাবা, চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'কিন্তু এসব কিছু দরকার ছিল না কাকিমা। আমি পথেই তো—'

'পথে সে কখন খেয়েছ—এত বেলা হয়ে গেল, খিদে পায় না? তাছাড়া রান্নাবান্না হতেও তো দেরি হবে একটু। এসো—লজ্জা কোরো না।'

চায়ের দরকার ছিল না, খাবারেরও না। কিন্তু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

থালায় লুচি—হালুয়া—আলুভাজা। চায়ের পেয়ালা-পিরিচ নতুন। অতিথির সম্মানে বেরিয়ে এসেছে।

চেয়ারে বসে পড়ল বিকাশ।

'খাবার এখন থাক কাকিমা, চা-ই বরং—'

'তা কি হয়? প্রথম এলে কাকার বাড়িতে।'

'তাহলে তুলে নিতে বলুন কিছুটা।'

'তুমি যা পারো খাও না। ফেলা যাবে না।'

অর্থাৎ যা পড়ে থাকবে তা খাওয়ার লোকের অভাব নেই। আন-হাইজিনিক। কিন্তু এই বাড়িতে কাকিমাকে সে-কথাটা বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভালো।

বিকাশ খাবারে মন দিলে।

মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়েছিল মায়ের আড়ালে। কাকিমা বললেন, 'তুই যা সুনু। তরকারীটা চাপিয়ে এসেছি, দেখিস ধরে না যায়।'

শাড়ি, কয়েক গাছা চুড়ির আওয়াজ আর হাল্কা পায়ের শব্দ বেরিয়ে গেল বাইরে।

কাকিমা বললেন, 'আমার মেজো মেয়ে। বড়োটির বিয়ে দিয়েছি দু' বছর হল। সুনী এবারে স্কুল-ফাইন্যাল পড়ছে। তোমার কাকাকে বলেছিলুম এরও একটা পাত্র-টাত্র ছাখো, কিন্তু ওঁর আপত্তি। বললেন, তাড়া কিসের—পাস করে কলেজে-টলেজে পড়ুক, তখন দেখা যাবে।'

'সে তো ভালোই। এত অল্প বয়েসে কেউ আজকাল আর মেয়েদের বিয়ে দেয় না কাকিমা।'

'অল্প বয়েস কী বলছ—ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পড়তে চলল যে।'

মাথা নামিয়ে বিকাশ একটু হাসল। ষোলো ছাড়িয়ে যে মেয়ে সতেরোর দিকে এগিয়েছে, কলকাতায় সে এখনো ফ্রকের সীমা ছাড়ায় না; এমনকি এখানেও—বাজারের রাস্তায় যেখানে বাস-মোটর-লরী চলে, রেডিয়ো বাজে, দু-তিনটে হেয়ার-কাটিং সেলুন দেখা যায়, সেখানেও বোধ হয় এটা বিয়ের বয়স নয়। কিন্তু নিয়োগীপাড়ায় আসতে হয় পুরোনো গাছের ছায়া-নুয়ে-পড়া একটা গর্ত-ওঠা রাস্তা দিয়ে, দু' ধারের সারি-সারি ভাঙা বাড়ি পার হয়ে বালাপোষ গায়ে যে-বুড়ো মানুষটি দুপুরের রোদে বসে আছেন—তাঁকে পাশে রেখে। নিয়োগীপাড়ায় পুরোনো দিনগুলো এখনো একটুকরো দ্বীপের মধ্যে জেগে

রয়েছে, জীর্ণ চুন-বালি, ভাঙা ইট আর ভাপ্‌সা একটা অতীতের গন্ধের মধ্যে, সতেরো বছর এখানে অনেক বয়েস।

কাকিমা এ-বাড়িতে কী বয়েসে এসেছিলেন? তেরো, চোদ্দ? কিংবা আরো কম?

'ও কি, সবই সরিয়ে রাখছ যে!' কাকিমার ক্ষুণ্ণ প্রতিবাদ শোনা গেল।

'অনেক খেয়েছি কাকিমা, আর পারব না।'

'তুমি লজ্জা করছ বাবা।'

'সত্যি বলছি, আর পারব না।'

'কলকাতায় তোমরা যে কী খেয়ে বেঁচে থাকো তাই ভাবি।'

বিকাশ হাসল। উত্তর দিল না।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। দু চুমুকেই শেষ করল বিকাশ।

কাকিমা বললেন, 'তোমরা সেই গড়পারের বাড়িতেই তো আছো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বিকাশ একটু আশ্চর্য হল: 'আপনি গিয়েছিলেন নাকি?'

'হাঁ, তা কুড়ি-বাইশ বছর হল।' কাকিমা হাসলেন: 'তখন বোধ হয় তোমার বছর চারেক বয়েস ছিল। তোমার দাদা স্কুলে পড়ত। আমরা গিয়েছিলুম গঙ্গাসাগরের মেলায় —যাওয়া-আসার পথে তিন-চারদিন তোমাদের বাড়িতে ছিলুম। তোমার মনে থাকবার কথা নয়।'

'না। চার বছরের কথা কারো মনে থাকে না।' বিকাশও হাসল।

'তোমার দাদা কী করছে?'

'বিলেতে।'

'পড়তে গেছে?'

'গিয়েছিল। সে সাত-আট বছর আগে। এখন আর পড়ে না, পাস করে ওখানেই চাকরি করছে।'

'সে কি! দেশে আসে না?'

'এসেছিল। সে বছর দুই হল। ছুটি পায় না তো।'

'এ ঠিক নয়। সবাইকে ফেলে, অত দূরে! তোমার মার কষ্ট হয় না?'

'হলে আর কী করবেন? উপায় তো নেই।'

'তবু ভালো, তুমি বিলেত-টিলেতে যাওনি।'

বিকাশ চুপ করে রইল। দাদার প্রসঙ্গটা অপ্রীতিকর। একথা কাকিমাকে বলা যায় না যে দাদা শুধু বিলেতেই যায়নি, সে ওখানেই সংসার পেতেছে, সে এখন ব্রিটিশ সিটিজেন। বলা যায় না দাদার মতো ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেকে ওভাবে হারিয়েই বাবার সেকেণ্ড আর থার্ড অ্যাটাকটা অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। আরো বলা যায় না যে

বাবার মৃত্যুর পরে পায়ের তলা থেকে যেন মাটি ধসে গেল সংসারটার—তার আর এম-কম পরীক্ষা দেওয়া হল না, যেমন-তেমন করে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে হল, গড়পারের বাড়ির নীচের তলাটা ভাড়া দিতে হল।

'তোমার বাবার তো এত পশার ছিল, ওকালতি করলে না কেন?'

'সকলের সব কাজ হয় না, কাকিমা।'

'তা বটে।' কাকিমা কিছু একটা বুঝে নিয়ে চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, 'তা হলে তুমি একটু জিরিয়ে নাও এখন—রাতে নিশ্চয় ভালো ঘুম হয়নি। রান্নার একটু দেরি আছে এখনো।'

'থাক কাকিমা। এখুনি তো একরাশ খেলুম।'

'কোথায় খেলে?' খাবারের থালাটা তুলে নিয়ে কাকিমা বললেন, 'এমন লজ্জা করলে তো চলবে না—দেখো তোমার কাকা এসে রাগারাগি করবেন।'

'রাগারাগির দরকার নেই। আমি প্রচুর খেতে পারি। পরে দেখবেন।'

'দেখব এখন।' মৃদু হেসে কাকিমা বেরিয়ে গেলেন।

রিক্‌শটা বাড়ির সামনে থামবার সময় দু-একটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে দেখা গিয়েছিল। তারপর এতক্ষণ আর তাদের সন্ধান মেলেনি। খুব সম্ভব যাতে অতিথির সামনে কোনো অসভ্যতা না করে, সেইজন্যে শশাঙ্ক কাকার সামনে তারা লুকিয়েছিল কোথাও। এতক্ষণে দরজার বাইরে আবার দুটি মুখ উঁকি মারল।

শশাঙ্ক কাকারই ছেলেমেয়ে—সন্দেহ নেই। ফর্সা রং, টানাটানা চোখ, মিষ্টি চেহারা। শশাঙ্ক কাকা এককালে রূপবান ছিলেন, কাকিমার রোগা শরীর আর জ্বলে-যাওয়া রং দেখেও বোঝা যায়, দুজনের বিয়ের সময় কোষ্ঠীর সঙ্গে রূপেরও জোড় মেলানো হয়েছিল। ঠাণ্ডায় ফাটা-ফাটা গাল আর নাকের নীচে শুকনো সিউকাসের দাগ সত্ত্বেও বাচ্চাগুলো দেখতে ভালো।

বিকাশ ডাকল: 'শোনো—এসো এদিকে—'

একটা হাসির শব্দ উঠল, মেয়েটি ছুটে পালালো। শুধু ছোট ছেলেটাই বড়ো বড়ো চোখ মেলে চেয়ে রইল বীরপুরুষের মতো।

'তোমার নাম কী?'

'বুলো।'

'বুলো?'

'না—বুলো।' বেশ গম্ভীরভাবে জবাব এল।

'বুলো নয়, বুলো? মানে বুড়ো?'

'হুঁ।'

'আর ভালো নাম নেই? শুধুই বুলো।'

'ভালো নাম আছে।' বেশ চেষ্টা করেই বলতে হল নামটা: 'মিগান্ত তুমার নিওগী।'

'মিগান্ত তুমার?'

'না—মিগান্ততুমার।'

একবার মাথা চুলকে রহস্য ভেদ করতে হল বিকাশকে: 'অ—মৃগাঙ্ককুমার?'

সদালাপটা আর বেশী দূর এগোলো না। দরজায় দেখা দিল স্বস্থ।

মিগান্তকুমার আবার গম্ভীর স্বরে বললে, 'মেজদি।'

বিকাশ হেসে উঠল: 'ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার মেজদির সঙ্গে আর পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই—ওটা আগেই হয়ে গেছে।'

খিল-খিল করে হেসে ফেলল স্বস্থ।

'বুড়োর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়ে গেছে দেখছি।'

'হাঁ—ভাইবোনদের মধ্যে ওরই একটু সাহস আছে মনে হল। ওর দিদি তো ডাক শুনেই ছুটে পালালো।'

স্বস্থ বুড়োর মাথায় একবার আঙুল বুলিয়ে দিলে। উজ্জ্বল মুখে বললে, 'ও খুব কথা বলতে পারে। ওইজন্যেই তো ওর নাম বুড়ো। ও আরো কী বলেছে, জানেন? বলব বুড়ো? বলি? ও বলেছে, বাবার হুঁকোতে করে ও তামাক খাবে।'

'ধ্যেৎ—যা—' বিরক্ত হয়ে বুড়ো ছুটে পালালো। আবার খিলখিল করে হেসে উঠল স্বস্থ।

'তোমার সব চেয়ে ছোট ভাই, না?'

'হাঁ। আমরা তিন বোন, এক ভাই।' স্বস্থ ঘরে পা দিল। একটু আগেই এই মেয়েটি তার মার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘরে এসেছিল, বিকাশের মুখের দিকে চোখ তুলেও সে ভালো করে তাকায়নি। কিন্তু এই বাচ্চাটা এসে সব সহজ করে দিয়েছে—সংকোচের আড়াল সরিয়ে নিয়েছে।

বিকাশ স্বস্থর মুখের দিকে চেয়ে দেখল। মেয়েটি দেখতে ভালো। প্রথম বয়সের লাবণ্য নদীর জলের ওপর এক মুঠো আলোর মতো জেগে আছে। তবু মুখের রেখায় একটা শান্ত বিষণ্ণতা—এই সব পুরোনো বাড়িতে—যেখানে একটা সমৃদ্ধ অতীত ছিল—অথচ এখন নেই—সেখানে মেয়েদের চেহারায় হয়তো এই রকম ক্লান্ত করুণতারই ছায়া পড়ে।

স্বস্থ চোখ নামিয়ে নিল। তারপর বললে, 'শুধুন?'

বিকাশ বললে, 'আমার একটা নাম আছে কিন্তু। তার সঙ্গে একটা 'দা' যোগ করে নিলেই চলে যায়।'

স্বমু আবার মুখ তুলল : 'আচ্ছা।'

'আচ্ছা নয়, নামটা বলো।'

'বিকাশদা।' স্বমু ফিক করে হেসে ফেলল।

'যাক, পাস করে গেলে। এবার বলো কী খবর এনেছ।'

'মা জিজ্ঞেস করল আপনি গরম জলে স্নান করবেন তো ?'

'না না—আমার ওসব অভ্যেস নেই।' বিকাশ ত্রস্ত হয়ে উঠল : 'তোমরা কোথায় স্নান করো ?'

'কেন, পুকুরে। কিন্তু সে তো আপনি পারবেন না।'

'খুব অসাধ্য ব্যাপার নাকি ? কিছু ভেবো না—আমি সাঁতার জানি।'

'সে কথা নয়। কলকাতা থেকে এসেছেন, শীতের দিন—আপনার ঠাণ্ডা লাগবে।'

'লাগবে না। আর তা ছাড়া আমাকে নিয়ে এত সমারোহ করলে আমি এখানে টিঁকতেও পারব না—বিকেলেই ছুটে পালাতে হবে এখান থেকে। বুঝেছ ?'

স্বমু কথা খুঁজে পেল না, চুপ করে রইল।

বিকাশ বলল, 'তোমার ভালো নাম কী ? সোনালি, না স্বনীতা ?'

স্বমুর চোখ ছুটোতে কৌতুক দেখা দিল : 'ওসব কিছু নয়, স্বর্ণা।'

'আমি প্রায় কাছাকাছি এসেছিলুম। সোনালী স্বর্ণা থেকে খুব তফাতে নয়। আমি তোমাকে সোনালি বলে ডাকব।'

মেয়েটির গাল রাঙা হল একটু।

'আপনার যে নামে খুশি ডাকবেন।'

'তুমি রাগ করবে না ?'

'না।'

বিকাশ একটু চেয়ে থাকল স্বমুর দিকে। নদীর জলে এক মুঠো আলো ; তবু সেই আলোর ওপরে একটা ছায়া আছে। এই পুরোনো বাড়ির ছায়া—ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ছায়া, একটা অন্ধকার সিঁড়ির ছায়া। স্বমু আবার চোখ নামিয়ে নিল। বিকাশ বললে, 'খুব যদি ব্যস্ত না থাকো, লক্ষ্মী মেয়েটির মতো একটু সাহায্য করো দিকি আমাকে।'

'কী করব বলুন।'

'আমার বেডিং আর ট্রাঙ্কের সঙ্গে ছোট একটা কাঠের বাক্স ছিল, সেটা কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না।'

'দেখছি—দাঁড়ান।' স্বমু তক্তপোশের তলায় নীচু হল, তারপর বাক্সটা টেনে বের করে আনল : 'এইটে ?'

বিকাশ খুশী হয়ে বললে, 'ঠিক। আমি ভেবেছিলুম, ট্রেনেই ফেলে এসেছি বোধ

হয়। পেলে কী করে? ম্যাজিক জানো নাকি?'

'ম্যাজিক জানতে হবে কেন?' সুমু হাসল: 'ট্রাঙ্কের পেছনে সরানো ছিল, তাই আপনি দেখতে পাননি।'

পাতলা বাক্সটা খুলে ফেলল বিকাশ। আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুমু: 'বেহালা? আপনি বাজান বুঝি?'

'নইলে কি পরের বাজানোর জন্যে বয়ে বেড়াব?' বিকাশ হাসল।

অপ্রতিভ হয়ে সুমু বললে, 'না—তাই বলছিলুম।'

'তুমি কী বাজাও?'

'কিছু না।' সুমুর মৃদু নিঃশ্বাস পড়ল একটা।

'বেহালা শিখবে?'

সেই সময় আবির্ভাব হল বুড়োর। গম্ভীর স্বরে বললে, 'মেজদি, মা তোমায় ডাকছে।'

তিন

এসব ক্ষেত্রে যা হয়, শশাঙ্ক কাকার আতিথেয়তা আর কাকিমার উদ্যমে দুপুরের খাওয়া এমনিতেই বেশি হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন বিকেলে সুমু অর্থাৎ সুবর্ণা অর্থাৎ বিকাশের সোনালি এক থালা লুচি-তরকারী নিয়ে এল, তখন বিদ্রোহ ছাড়া উপায় রইল না।

'মাপ করতে হবে, অসম্ভব।'

জমি থেকে ধান এসেছে, তাই মাপাবার জন্যে শশাঙ্ক কাকা চশমা পরে একখানা খাতা হাতে নেমে যাচ্ছিলেন। বিকাশের প্রতিবাদ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন, চশমাটাকে ঠেলে তুলে দিলেন কপালের ওপর।

'তার মানে? বিকেলে জলখাবার খাও না?'

'খাই, কিন্তু দুপুরে যা খাওয়া হয়েছে—'

তারপরে চিরাচরিত বাক্যালাপ। কলকাতার ছেলেরা কিছুই খেতে পারে না দেখে শশাঙ্ক বিক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত, কাকিমা কিঞ্চিৎ ব্যথিত এবং বিকাশের প্রাণপণে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা। ঠোঁটে একটুকরো কৌতুকের হাসি নিয়ে সুমুর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা—অদূরে দুটি বালক-বালিকার কৌতূহলী সন্দর্শন।

লুচির থালাকে কোনমতে প্রতিরোধ করে বিকাশ উঠে পড়ল। শেষ পর্যন্ত বললে, 'খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না কাকা, রাত্রেই হবে এখন। আমি বরং একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসি আপাতত।'

নিষ্কৃতির এইটিই উপায়। তা ছাড়া দুপুর, দিনের আলো, গাছপালার ছায়া, বাগানের পাখিরা এরা চোখ কান জুড়িয়ে দিচ্ছিল বটে, কিন্তু বেলাশেষের ছায়া নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে কেমন বিমর্ষতা নেমে আসছিল একটা, নীচের চণ্ডীমণ্ডপটা তার ইটের পাঁজা আর ঝোপ-জঙ্গল নিয়ে আরো ক্লান্ত হয়ে উঠছিল, ওদিকের পোড়ো মহলটায় এক ঝাঁক পায়রার সঙ্গে রাশি রাশি চামচিকে উড়ে ভুতুড়ে আবহাওয়া তৈরি করছিল, পুরোনো ঠাণ্ডা দেওয়ালগুলোতে শীত শিউরে উঠছিল, বাগানটা অরণ্যের মতো জটিল হয়ে যাচ্ছিল, বাতাস ছিল না, আর বহুদিনের শ্রান্ত মাটি থেকে একটা সোঁদা গন্ধ—বেলাশেষের গন্ধ, যেন স্নায়ুর ওপরে চাপ দিচ্ছিল। পাড়াগাঁয়ের পুরোনো বাড়ি পড়ন্ত বেলায় এত বিমর্ষ, এত ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, এর আগে তা সে কখনো জানত না।

দোতলার সিঁড়ি এর মধ্যেই আবছা অন্ধকার। নীচের ধাপটায় পা দিয়ে বিকাশ একবার থমকে দাঁড়ালো। সিঁড়ির তলাটায় এখন প্রায় নিকষ-কালো রাত্রি—তা থেকে অসংখ্য মশার ক্রুদ্ধ গর্জন উঠছে। ওখানে সেই অদ্ভুত মেজদা এখনো বসে আছে নাকি? আশ্চর্য, তারপর থেকে লোকটাকে সে আর দেখতে পায়নি, কোনো সাড়াশব্দ পর্যন্ত না—যেন মুছে গেছে সে। ওই সিঁড়ির নীচেই সে থাকে, কিংবা—এ-সব বনেদী পুরোনো বাড়ির কথা কিছুই বলা যায় না, হয়তো ওর আড়ালে পাতালকুঠ্‌রির মতো কিছু একটা আছে কোথাও, তার একটা রহস্যময় 'হিস্ট্রি' (শশাঙ্ক কাকার ভাষায়) নিয়ে সেইখানেই লুকিয়ে রয়েছে সে।

মরুক গে। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে বিকাশ বেরিয়ে এল।

বাইরে শশাঙ্ক কাকা ধান মাপাচ্ছিলেন। এখানে এখনো রোদের আভা। সেই আভায় চিকচিক করছিল দুটো ধানের স্তূপ—একটা থেকে মাপা হচ্ছে, আর একটায় সাজানো হচ্ছে। বিরাট একটা দাঁড়িপাল্লায় ধান তুলে মাপছিল কৃষাণ জাতের দুজন লোক, একজন সমানে বলে যাচ্ছিল : 'সাত—সাত—সাত—আট' আর চশমা চোখে শশাঙ্ক খরদৃষ্টিতে তা লক্ষ্য করছিলেন।

বিকাশকে দেখে শশাঙ্ক কাকার মনোযোগ ব্যাহত হল একটু।

'বেরুচ্ছ তা হলে?'

'আজ্ঞে।'

'বেশি দূরে-টুরে যাবে নাকি?'

'না—এই বাজারের রাস্তায় ঘুরে আসব একটু। ব্যাঙ্কটাও দেখে আসব।'

'তোমার ব্যাঙ্ক কালীবাড়ির উল্টোদিকে—মানে বাজারের রাস্তায় পা দিয়ে একটু ডান দিকে ঘুরলেই। রাত কোরো না বাবাজী।'

'আজ্ঞে না, রাত হবে না।'

'কত হল, এই কত হল? দশ?' শশাঙ্ক কাকা একবার ধানের দিকে মন দিয়েই আবার বিকাশের দিকে তাকালেন: 'ভালো কথা, একটা টর্চ নিয়ে যাও। এদিকে আবার ইলেকট্রিক নেই, তার মেটে রাস্তা—'

'আজ্ঞে টর্চ আমার কাছে আছে, অসুবিধে হবে না।'

বিকাশ বেরিয়ে এল রাস্তাটায়। সেই পুকুরটার ওপরে নুয়ে-পড়া নারকেল গাছগুলোর ছায়া—জলে একটা মাছের শব্দ। আশপাশ থেকে ঝিঁঝির ডাক। সেখান থেকে বাজারে যাওয়ার টানা পথ—দু'ধারে নিয়োগীপাড়া, কোথাও ধ্বংস, কোথাও অবশেষ, কোথাও ওরই মধ্যে এক-আধটা নতুন বাড়ির আকস্মিকতা। আর সব মিলে জীর্ণতা-জীর্ণতা—ক্লান্তি-ক্লান্তি—নুয়ে-পড়া গাছের ডালগুলো ধুলোয় মলিন, সোঁদা গন্ধ—মাথার ওপর বাদুড়ের ডানার শব্দ, শ্রান্ত কাকের ডাক আর প্রায় শরীর ছুঁয়ে দু-একটা চামচিকের উড়ে-যাওয়া।

হয়তো এই কারণেই রিক্শওলা বলেছিল, 'ওখানে বেশি দিন না থাকাই ভালো বাবু।' দিনের বেলা এমন কিছু মনে হয় না, কিন্তু বিকেল এলে, ছায়া পড়লে, এইসব পুরোনো জায়গা, পুরোনো মাটি অচেনা হয়ে যায়—ভয় করে, মনের ওপর ভার পড়তে থাকে।

অন্ধকার নামলে, দুটো-একটা আলো জ্বলে উঠলে, তখন এটা থাকবে না। তখন একটি রাত্রি-নির্বিশেষ, যে-কোনো পাড়াগাঁয়ের পথ, জোনাকি, শেয়াল, কুকুরের ডাক। কিন্তু দিন আর রাতের মাঝখানে, এইসব ভাঙা বাড়ি আর পুরোনো গাছপালা আর সোঁদা গন্ধ যেন ঠিক সত্যি আর মিথ্যের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়—ভয় করে, অস্বস্তি লাগে, বুকের ওপরে একটা চাপ নেমে আসে। হয়তো এইজন্যেই সেকালে কোনো শহর জীর্ণ হয়ে গেলে লোকে তা থেকে সরে এসে অন্য জায়গায় শহর গড়ত—এই অস্বস্তি, এই ভার সইতে পারত না তারা।

বিকাশ পা চালিয়ে আধ-মাইলটাক এই পথটা পেরিয়ে এল। এর মধ্যে শীতের সন্ধ্যাটা যেন হঠাৎ ঘনিয়ে এল, দপ দপ করে উঠল গোটাকয়েক ইলেকট্রিকের আলো।

বাজার। পীচের বড়ো রাস্তাটা। দোকান। লোকজন। গাড়ি-রিক্শর যাওয়া-আসা। রেডিয়োর শব্দ। সামনের হেয়ার-কাটিং সেলুনে কাঁচি চলার আওয়াজ। নতুন মাটি, প্রতপ্ত জীবন।

এক ভদ্রলোক পাশের পানের দোকান থেকে সিগারেট কিনছিলেন। বুকখোলা গরম কোটের তলায় হাতে-বোনা মোটা স্লিপওভার, গলায় মাফলার জড়ানো। মনে হল ডাক্তার। সঙ্গে একটা সাইকেল, তাতে কালো ব্যাগ ঝুলছে।

বিকাশ বললে, 'এখানকার কালীবাড়িটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন?'

'কালীবাড়ি?' ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন : 'এই দিকে মিনিট তিনেক এগিয়ে—' বলতে বলতে তিনি থামলেন : 'আপনাকে যেন চেনা-চেনা ঠেকছে।'

তৎক্ষণাৎ বিকাশের মনে হল, এ লোকটিও তার অচেনা নয়।

'আমিও আপনাকে—আগে কোথায়—'

ভদ্রলোকের স্মৃতিই দ্রুত কাজ করল : 'হেয়ার স্কুলের বিকাশ না?'

'আপনি—তুমি—'

'দূর গর্দভ!' এইবার লোকটি সশব্দে একটা চড় বসিয়ে দিলে বিকাশের পিঠে : 'স্কুল-টিমের ওপনিং ব্যাটসম্যান হয়ে উইকেট-কীপারকে ভুলে গেলি?'

'প্রভাকর!'

'সার্টেনলি। দ্যাট সেম ওল্ড রোগ।'—খুশিতে আর বিস্ময়ে ভরে উঠল প্রভাকরের মুখ : 'তা এতকাল পরে তুই এখানে উড়ে পড়লি কী করে? এই বিশ্ব-সংসারে এত সব ভালো জায়গা থাকতে? আর কালীবাড়িই বা খুঁজছিস কেন? কলকাতা থেকে ভক্তির টানে লোক ছুটে আসে—এখানকার কালীর যে এত মাহাত্ম্য আছে সে তো আমি জানতুম না।'

বিকাশ চুপ করে প্রভাকরের দিকে চেয়ে রইল।

'কি রে, কথা বলছিস না কেন?'

'কী বলব? স্পেক্যুলেশন তুই-ই শুরু করেছিস, শেষ করে নে, তারপরে যা বলবার বলব।'

প্রভাকর হেসে উঠল। বললে, 'না—ঠাট্টা নয়। ইট'স এ সারপ্রাইজ। কী করে এলি এখানে?'

'ও কথাটা তো তোকেও জিজ্ঞেস করতে পারি।'

'আরে, সরকারী চাকরি। আমি এখানকার হেলথ্ সেণ্টারের ডাক্তার।'

'আর এখানে আমাদের ব্যাঙ্কের একটা ব্র্যাঞ্চ রয়েছে। আমি এসেছি তারই অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট হয়ে।'

'বোঝা গেল।' প্রভাকর একটা সিগারেট বার করে দিলে : 'নে।'

'থ্যাঙ্কস—খাই না।'

'এখনো সেই ভীষ্মদেব?' প্রভাকরের চোখে স্মৃতির প্রসন্নতা ফুটে উঠল : 'ক্লাস এইট থেকে চেষ্টা করছি, কলেজেও তোকে রিক্রুট করতে পারিনি। দেখছি এখনো অবিচল হয়ে আছিস। পান খাবি?'

'ওটাও অভ্যেস নেই।'

প্রভাকর বললে, 'উজবুক!'

'প্রায় দশ বছর পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, আর এই ভাষায় তার অভ্যর্থনা!' পান-ওলা সকৌতুকে তাকাচ্ছিল, বিকাশ তাকে বললে, 'একটা মিঠে পানই দাও তা হলে। জরদা-টরদা মিশিয়ো না—মাথা ঘুরে পড়ে যাব।'

'না—না, জরদা মেশাব কেন?'

'সবরকম মিষ্টি মশলা—' প্রভাকর পানওলাকে মনে করিয়ে দিলে। তারপর জিজ্ঞেস করল: 'সত্যি—এমন করে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি। আছিস কেমন?'

'দেখতেই পাচ্ছিস।'

বন্ধুত্ব আর ডাক্তারী—দুটো দৃষ্টি একসঙ্গে মিশিয়ে কিছুক্ষণ বিকাশকে লক্ষ্য করল প্রভাকর। বললে, 'তোর মুখ-চোখের ব্রাইটনেসটা আর সে-রকম নেই, যেন একটু বুড়োটে হয়ে যাচ্ছিস।'

'স্ট্রাগল ফর—'

'রেখে দে স্ট্রাগল!' থাবা দিয়ে কথাটা প্রায় কেড়ে নিলে প্রভাকর: 'বয়েস কত হল? ছাব্বিশ? সাতাশ? এর মধ্যেই একেবারে পঞ্চাশ বছরের বুড়োর বুলি ধরলি যে! ক্রিকেট খেলিস এখনো?'

'না।'

'আমি কিন্তু এখনো খেলি। চান্স পেলেই।'

'খুব ভালো।'

'পান বাবু—'

বিকাশ পান নিয়ে মুখে পুরল। নানা মশলায় সেটা প্রায় সিঙাড়ার মতো বিরাট।

প্রভাকর বললে, 'কালীবাড়ি খুঁজছিলি কেন? ধর্মে মতি হয়েছে বুঝি?'

অতিকায় পানটাকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল।

'না, তা নয়। শুনেছি আমাদের ব্যাঙ্কটা ওখানেই। দেখতে বেরিয়েছিলুম।'

'বুঝেছি, আমি চিনি সে-ব্যাঙ্ক।' প্রভাকর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল: 'তা সে এমন চমৎকার কিছু নয় যে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। নয় কালই দেখবি। ভালো কথা, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে তুই আজই এখানে পৌঁছেছিস এসে।'

'হুঁ, নির্ভুল অনুমান।'

'উঠেছিস কোথায়?'

'নিয়োগীপাড়া।'

'নিয়োগীপাড়া? কোন্ বাড়ি?' প্রভাকর একটু কৌতূহলী হল।

'আমি শশাঙ্ক নিয়োগীর ওখানে উঠেছি।'

'শশাঙ্ক নিয়োগী? অ।'

বিকাশ ঠিক বুঝতে পারল না, হয়তো এমনিই মনে হল, শশাঙ্কর নামে যেন একটা ছায়া পড়ল প্রভাকরের কপালে।

'চিনিস নিশ্চয় ?'

'কেন চিনব না ? শশাঙ্কবাবু বিখ্যাত লোক। তাছাড়া আমি ডাক্তার—সোশ্যাল-ম্যান, সবাইকেই চিনতে হয় আমাদের। তোর আত্মীয় হন নাকি ?'

'খুঁজলে মা-র মাসীবাড়ির পিসশ্বশুর বংশ-টংশের সঙ্গে একটা কিছু বেরুতে পারে বোধ হয়। তা নয়। ওঁরা আমার বাবার মক্কেল। শুনেছি, সেই সূত্রেই খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, ওঁরা আমাদের ওখানে আসা-যাওয়াও করতেন। তবে সেও আমার ছেলেবেলায়, মনে পড়ে না।'

'অ।' যেন একটু অন্যমনস্ক হল প্রভাকর : 'ওখানেই থাকবি ?'

'না—সেটা ঠিক হবে না। ওঁরা অবশ্য তাই বলছেন, কিন্তু আমি ভাবছি দু-চারদিন পরে যেখানে হোক একটা ব্যবস্থা করে নেব।'

প্রভাকর তার শেষ কথাগুলো ভালো করে শুনল কিনা বোঝা গেল না। উদাস ভঙ্গিতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল একটু, পানওলাকে পয়সা মিটিয়ে দিলে, তারপর বললে, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ-ভাবে বকবক করে কী হবে, চল্, আমার বাসায়। এতদিন পরে দেখা হল, গল্প করা যাবে প্রাণ খুলে।'

'তোর বাসায় ?'

'কাছেই। মিনিট দশ-বারোর রাস্তা হেঁটে গেলে। কলকাতার বাবুর যদি কষ্ট হয়, একটা রিক্শ ডেকে নিচ্ছি—আমার সাইকেল তো আছেই।'

'রিক্শ দরকার নেই, আমি হাঁটতেই বেরিয়েছি।'

'চল্ তবে। আয়—আয়, কোনো ভাবনা নেই, ব্যাচেলর্স ডেন নয়, ঘরে গিন্নী আছেন। আমাকে স্টোভ ধরিয়ে তোর জন্যে চা করতে হবে না। ভালো কথা, তোর বউ-টউ—'

'এখনো এসে পৌছোননি।

'এখানে ?'

'না—স্বপ্নে।'

প্রভাকর আবার বললে, 'উল্লুক !'

বাজার পেরিয়ে একটু ডান দিকে এগিয়ে ছোট মাঠ একটা। সেইখানেই হেলথ সেন্টার, প্রভাকরের কোয়ার্টার।

এ-ধরনের কোয়ার্টার যেমন হয়। বাড়তির ভেতরে সামনে ছোট একটা বাগান।

বারান্দার ইলেকট্রিকের আলোয়, তাতে কতগুলো নানা রঙের মরশুমী ফুল ঝিকমিক করছিল, কয়েকটা ম্যাক-প্রিন্স ফুটেছিল চাপবাঁধা রক্তের মতো, আর মস্ত একটা হেনার ঝাড় গন্ধে একেবারে উতরোল হয়ে গিয়েছিল। এ নিয়োগীপাড়া নয়, বাজারের রাস্তাও নয়—শহরের ভিড় থেকে পালিয়ে এসে নিঃশ্বাস ফেলবার মতো—হাত-পা মেলে বসবার মতো জায়গা।

সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজে চাকর বেরিয়ে এল। সাইকেলটা তাকে ধরিয়ে দিয়ে প্রভাকর বললে, 'তোর মাকে একটু আসতে বল্—আর আমাদের চা দে।'

বারান্দায় তুলোর কুশন পাতা কয়েকটা বেতের চেয়ার। প্রভাকর বললে,'ঘরের ভেতর বসবি, না বারান্দায়?'

'তোর বারান্দাটাই আমার ভালো লাগছে। চমৎকার।'

'শীত করবে না?'

'শীতের দিনে ঘরে বসলেও শীত করবে। এখানে একটা বাড়তি পাওনা আছে—হাসনুহানার গন্ধ।'

'কবি!' প্রভাকর হাসল: 'আচ্ছা, বোস্ দু মিনিট, আমি এই জামা-কাপড়গুলো ছেড়েই আসছি।'

বিকাশ একা বসে রইল। হেনার সঙ্গে গোলাপেরও গন্ধ মিশেছে—বাতাস নেই, নেশার মতো জমে আছে এখানে। সামনের মাঠটায় আলো-অন্ধকার জড়ানো ঘাস ভিজে উঠছে শিশিরে। মাঠের ওপারে বড়ো রাস্তাটা, রিক্শ চলেছে তা দিয়ে, মোটর যাচ্ছে। এদিকে হাসপাতালের গোটা-তিনেক কাচের জানলায় ঝলমল করছে শাদা আলো। বিকাশের নিয়োগীপাড়ার কথা মনে পড়তে লাগল। সেখানে এখন জমাট ছায়া—শিউরে শিউরে উঠছে পুরোনো ক্লান্ত মাটি, অন্ধকারে বাড়িগুলোর ধ্বংসস্তুপ ভুতুড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইতস্তত। একটু পরে আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে—এই চিন্তাটা তার ভালো লাগল না।

দু' মিনিট নয়—আর একটু দেরি হল প্রভাকরের আসতে। এবার সঙ্গে এল তার বউ। যথারীতি চা এবং প্লেটে কিছু খাবার।

প্রভাকর বললে, 'আমার মিসেস। অমলা।'

লম্বা ধাঁচের শ্যামবর্ণা মেয়েটি। মুখে শান্ত উজ্জ্বলতা। দেখলেই বোঝা যায়, বিয়ে করে সুখী হয়েছে প্রভাকর। নমস্কার পর্ব মিটিয়ে বিকাশ বললে, 'চা-টা থাক, কিন্তু খাবার চলবে না। দুপুরের খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে।'

ডাক্তার প্রভাকর জোর করল না। প্লেট নিয়ে ফিরে যেতে যেতে অমলা বললে,

'আজ ফাঁকি দিলেন, কিন্তু কাল দুপুরে খেতে হবে এখানে।'

'দুপুরে তো সম্ভব নয়। কাল দশটায় অফিস।'

'বেশ, তাহলে কাল রাত্রে।'

প্রভাকর বললে, 'আমি কিছু বলছি না, এগুলো মিসেসের ডিপার্টমেন্ট।'

প্রতিশ্রুতি আদায় করে অমলা ভেতরে চলে গেল। চায়ে চুমুক দিতে লাগল দুজনে। একটু পরে খেয়াল হল প্রভাকরের।

'বিকাশ, তুই তো কবিতা লিখতিস।'

'আর লিখি না। দলে পড়ে চেষ্টা করেছিলুম, দেখলুম ও হবার নয় আমার।'

'তা ঠিক, কবি-টবি হওয়া খুব ঝামেলা।' ডাক্তার প্রভাকর নিজের ধরনে মোটা রসিকতা করল একটা: 'একটু নিউরোসিস না থাকলে ও লাইনে শাইন করা যায় না। তুই তো যেন কার কাছে বেহালাও শিখতিস।'

'ওটা পৈতৃক। বাবা বাজাতেন, ঠাকুরদা নামকরা সেতারী ছিলেন। ওটা ছাড়িনি।'

'ভেরি ওয়েল। বেহালা শোনাস একদিন।'

'আচ্ছা, সে হবে—'বিকাশ হাসল। প্রভাকর ভদ্রতা করছে। ব্যস্ত ডাক্তারের বেহালা শোনার সময় হয়তো কোনোদিনই হবে না। কিন্তু হঠাৎ—অনেকক্ষণ পরে বিকাশের সুন্দর কথা মনে পড়ে গেল। এই হেনার গন্ধের নেশায়, নিয়োগীপাড়া থেকে দূরে বসে—সে ভাবতে লাগল মেয়েটি তার কাছে বেহালা শিখতে চেয়েছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রভাকর বললে, 'কী ভাবছিস?'

'কিছু না।'

'বিয়ে করিসনি কেন?'

'সময় পাইনি।'

'বিয়ের সময় কোনোদিনই পাওয়া যায় না—ঝাঁ করে, চোখ কান বুজে একদিন ঝুলে পড়তে হয়।'

'তুইও তাই করেছিলি?'

'আমি, মানে—' প্রভাকর একটু দ্বিধা করল: 'মানে—অমলাকে আগেই পছন্দ করে ফেলেছিলুম। একটু লাভ্-টাভ্ বলতে পারিস আর কি। তুই যদি বিয়ে করতে চাস্—বল্—পাত্রী দেখি।'

'তুই-ই লাভ্ করতে পারিস, আমার কি সে যোগ্যতা নেই?'

তৎক্ষণাৎ দারুণ উৎসাহিত হল প্রভাকর।

'ও—তা হলে আছেন কেউ? তাই বল্! কে তিনি?' অন্যের প্রেমকাহিনী শোনবার আকুলতায় প্রভাকরের মুখে একটা তেল-তেলে কৌতূহল দেখা দিল: 'একটু

শুনি ব্যাপারটা।'

'একদিনে সব শুনলে চলে? হবে আস্তে আস্তে।'

'দেখতে কেমন? সুন্দরী তো?'

আবার সেই তৈলাক্ত কৌতূহল। বিকাশ একটু হাসল।

'বললুম তো, হবে আস্তে আস্তে।'

'গর্দভ!' নিরাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলল প্রভাকর।

হেনার গন্ধটা সুহৃকে ছাড়িয়ে তার বৃত্তটাকে আরো দূরে নিয়ে যাচ্ছিল। কলকাতায় বেলা দশটার রোদ। সার্কুলার রোডের বাস-স্টপের সামনে ব্যাগ কাঁধে মনীষা, অফিসে বেরিয়েছে।

'কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে তোমার?'

'কী করি, বলো। চাকরিতে এক ধাপ প্রোমোশন।'

মনীষা চুপ। জোর করে বলতে পারছে না—'তুমি যেয়ো না, তুমি গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

মনীষার চাকরিতে বাইরে ট্রান্‌সফারের সুযোগ থাকলে তাকেও যেতে হত। বাবা রিটায়ার করেছেন, ছুটো ভাই স্কুল-কলেজে পড়ে, চাকরি মনীষার খুব দরকার, প্রোমোশন আরো দরকার।

'দু একটা চিঠি লিখবে তো?'

বৃত্তটা মিলিয়ে গেল। প্রভাকর কথা বলছে।

'এই, কাল বিছানা-পত্তর নিয়ে আমার এখানে চলে আয় না। এ বাড়িতে একটা ঘর তো পড়েই থাকে, তোর কোনো অসুবিধে হবে না।'

'ধন্যবাদ, দরকার হলে আসব। কিন্তু—'বিকাশ এবার তার সংশয়ের মধ্যে ফিরে এল: 'ব্যাপার কী বল্ তো? আমার সন্দেহ হচ্ছে, এখানকার লোকে শশাঙ্ক কাকাকে বোধ হয় খুব পছন্দ করে না!'

'পছন্দ করবে কী!' সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে প্রভাকর বললে, 'ওঁকে লোকে ভয় পায়।'

'ভয় পায়—? কেন?'

'মানে—এস্‌কিউজ মি—তোর সেন্টিমেণ্টে হয়তো ঘা লাগবে—'

'না—লাগবে না। শশাঙ্ক কাকা এত ভীতিকর কেন?'

প্রভাকর একটু রহস্যময় ভাবে হাসল: 'আমার পদবীটা মনে আছে? নিয়োগী।'

'তা থেকে কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মানে, নিয়োগীপাড়ায় যে-সব ভাঙা-চুরো বাড়ি দেখেছিস তাদের কোনোটায় আমার

পিতৃপুরুষও থাকতেন। হয়তো এখনো খোঁজ করলে দু-একটা আমবাগানের শেয়ার-টেয়ার পেতে পারি। কিন্তু বাবা দেশ ছেড়েছিলেন ওই শশাঙ্ক নিয়োগীদের উৎপাতেই। কী যে ডেন্‌জারাস, ভাবতে পারবি না। মামলা-মোকর্দমা থেকে ইলেক্‌শনের প্যাঁচ—সবটায় সিদ্ধহস্ত। অন্যান্য শরিকদের ঠকিয়ে তাদের কত জমি-জমা যে পেটে পুরেছেন ঠিক নেই। সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং—'প্রভাকর থামল: 'ও বাড়িতে একটা পাগল আছে, দেখে থাকবি বোধ হয়।'

বিকাশের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল: 'মেজদা!'

'হুঁ, মেজদা। লোকে বলে, তাকে গাঁজার সঙ্গে ধুতরো বীজ খাইয়ে—'

'প্রভাকর!'

প্রভাকর বললে, 'ড্রপ ইট। হয়তো সবই শোনা কথা। তবু যা রটে তার সবটাই মিথ্যে হয় না। আমিও টের পেয়েছি। আসবার পরে এমনভাবে আমার পেছনে লেগে-ছিলেন যে চাকরি যায়-যায়। অনেক কষ্টে সামলেছি। জানিস, লোকটা এমন ক্রুট যে এখনও স্ত্রীকে মারে। একবার সিঁড়ি থেকে লাথি মেরে—'

চমকে উঠে বিকাশ বললে, 'থাক—থাক।'

প্রভাকর তিক্তস্বরে বললে, 'হ্যাঁ, এ সব আলোচনা না করাই ভালো। টু আগ্‌লি। সেইজন্যই বলছিলুম, ও বাড়িটা কার্সড্‌—ওখানে তুই থাকিসনি। তারপরে গত বছর সেই সুইসাইডটা—'

চমকটা আরো প্রচণ্ড হয়ে লাগল বিকাশের: 'কার সুইসাইড?'

বলতে বলতে নিজেই বোধ হয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল প্রভাকর। তেমনি বিস্বাদ ভঙ্গিতে বললে, 'থাক আজ, নিজেই সব শুনতে পাবি এর পরে। তবে চটাস নে লোক-টাকে। ভালো করতে না পারে বসিয়ে দিতে ঠিক পারবে।'

'আমার সঙ্গে শত্রুতা হবে কেন?'

'যারা শত্রুতা তৈরি করতে জানে তাদের কেন-র দরকার হয় না রে, আকাশ থেকে টেনে নামাতে পারে। ছেড়ে দে। চা খাবি আর একটু?'

ঠোঁটে দাঁত চেপে ধরে বিকাশ বললে, 'না।'

বাইরে হেনার গন্ধটা বিষাক্ত হয়ে উঠছিল। নিয়োগীবাড়ির ঠাণ্ডা ছায়াগুলো ক্রমশ নিষ্ঠুর আর বীভৎস রূপ ধরছে। কিন্তু এর মধ্যে ওই মেয়েটিকে—সুমুকে—যার নাম দিয়েছে সে সোনালি—তাকে কোথাও মিলিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না, কোথাও না!

চার

'ভদ্রলোক স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন।'

'মেজদাকে দেখেছিস তো? গাঁজার সঙ্গে ওঁকে ধুতরোর বীচি খাইয়ে—'

'ও বাড়িতে সেই সুইসাইডটা হয়ে যাওয়ার পর—'

'আমার পদবী মনে আছে? নিয়োগী। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ও পাড়াতেই জন্মেছিলেন। কিন্তু তারপর—'

'আমার এই কোয়ার্টারে একটা ঘর তো খালিই আছে, বিকাশ। এখানে এসে থাক্ না।'

রাত। অনেক রাত এখন। ঘুম আসছে, আসছে না। ঘরের এক কোণে একটা মিটমিটে লণ্ঠন। বিকাশ বলেছিল, 'আলোর দরকার নেই,' কাকিমা বলেছেন, 'না বাবা, অচেনা জায়গা—যদি দরকার পড়ে?' শান্ত, মিষ্টি আর ক্লান্ত চেহারা। এই ভদ্রমহিলার গায়ে হাত তোলেন শশাঙ্ক কাকা? বিশ্বাস হতে চায় না।

পল্‌তে-কমানো লণ্ঠনটার চারপাশে একটা ঝাপসা আলোর বৃত্ত। বাকিটা হাল্‌কা অন্ধকার। তাতে সারা ঘরে অনেকগুলো নিরবয়ব ছায়ার ভিড়। ঘরের ভ্যাপ্‌সা চাপা চুন-বালির পুরোনো গন্ধকে ছাপিয়ে মশারির ন্যাপ্‌থালীনের গন্ধ। কলকাতায় মশারি দরকার হয় না তাদের পাড়ায়। কতদিন আগে কেন কেনা হয়েছিল কে জানে—মা ওটাকে ট্রাঙ্ক থেকে বের করে দিয়েছেন।

মশারির বাইরে মশার গুঞ্জন। জীবনানন্দের কবিতার লাইন মনে আসে এলোমেলো হয়ে: 'চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা—মশা তার অন্ধকার সংঘারামে—সংঘারামে—' তারপর হারিয়ে যাচ্ছে। বিকাশের মেমারি খারাপ।

বাইরে ঝিঁঝিঁরা। বাগানে শীতের হাওয়ায় পাতার শব্দ। বাড়িতে ঢুকেই যে অদেখা দেওয়াল-ঘড়িটার আওয়াজ পেয়েছিল বিকাশ, সেটা বাজছে। চাপা—শ্রান্ত-গভীর আওয়াজ: ঠং—ঠং—ঠং—

বারোটা আওয়াজ। রাত বারোটা। হয়তো বেশি, হয়তো কম। এসব পাড়াগাঁয়ের ঘড়ি কি ঠিক সময় দেয়? বিকাশের হাত-ঘড়িটা আছে বালিশের তলায়। বের করে টর্চ নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ঠিক কটা বেজেছে। কিন্তু কী হবে!

শোওয়ার পরেই ঘুম এসেছিল, তখন বোধ হয় সাড়ে দশটার মতো হবে। কালকের ক্লান্ত ট্রেন জার্নি ছিল, চোখে ঘুমও ছিল। কিন্তু সব মাটি হয়ে গেল সেই চিৎকারটায়। বাড়ি কাঁপিয়ে রব উঠেছিল: 'কালী—কালী—মহাকালী, কালিকে কালরাত্রিকে!'

ওটা বলির মন্ত্র—বিকাশ জানে। তারপরেই শশাঙ্ক কাকার কড়া গলার ধমক উঠেছিল: 'কী হচ্ছে এত রাত্রে? থামো বলছি।' শব্দটা যেমন আচমকা উঠেছিল তেমনি থেমে গেল। বোধ হয়, সেই মেজদা। অন্ধকার সিঁড়ির তলায় হয়তো কোনো চোরা কুঠরিতে মুখ লুকিয়ে থাকে—সেইখানেই আবার ডুব মারল।

শশাঙ্ক কাকার ইতিহাস ভালো না। এই বাড়ির আবহাওয়ায় বিকার। রিক্‌শওলা থেকে নিয়োগীবাড়ির ছেলে ডাক্তার প্রভাকর সবাই এখান থেকে সরে আসতে বলছে। কিছুদিন আগেও এই বাড়িতে একটা আত্মহত্যা ঘটেছিল। কে করেছিল?

প্রভাকর সবটা বলেনি। আলোচনাটা প্রায় মাঝপথে, কিংবা শুরু করেই থামিয়ে দিয়েছিল। 'কী হবে আর ওসব দিয়ে? যেতে দে। এ-সব বনেদী বাড়িতে বহু-দিনের অনেক পাপ জমে থাকে রে! সাস্‌পেন্‌স্ স্টোরি, হরর স্টোরি, ক্রাইম স্টোরি—অনেক কিছু লেখা যায় সেগুলো নিয়ে। শুনে মন খারাপ করে কী করবি? ইউ মাইট ওয়েল ইউজ ইয়োর ইম্যাজিনেশন!'

এর পরেই স্কুল-জীবনে সরে গিয়েছিল গল্পটা। হিন্দু স্কুলের সঙ্গে একটা ক্রিকেট ম্যাচের স্মৃতি। ওরা জিতেছিল সে ম্যাচে।

কিন্তু ইম্যাজিনেশন। এই ঘুম আসা না-আসা। মিটমিটে লণ্ঠনের চারপাশে মুমূর্ষু আলোকবৃত্ত। ঘরে কতগুলো নিরবয়ব ছায়া। শশাঙ্ক কাকার চরিত্রের কয়েকটা আদ্রা। কল্পনা অনেকদূর যেতে পারে। মেজদা বলেছিল, 'নরবলি দেবে'—ওটা পাগল গেঁজেলের প্রলাপ। কিন্তু একটা সুইসাইড! কে করেছিল, কেন করেছিল? কোথায় করে-ছিল?

পুকুরে ডুবে? বিষ খেয়ে? গলায় দড়ি দিয়ে? গলায় দড়ি দেওয়াই তো পাড়া-গাঁয়ের রেওয়াজ। আজকাল আবার অনেক 'কীট-নাশক' আমদানি হয়েছে—গাঁয়ের মানুষের খানিক সুবিধেও হয়েছে তাতে।

কোন্ ঘরে আত্মহত্যা করেছিল? এই ঘরে? অসম্ভব নয়—এটা তো বাড়ির একটেরেয়—আত্মহত্যার পক্ষে ভারী নিরিবিলি জায়গা। গলায় দড়ি দিয়ে? কে জানে—ছাদের কড়িকাঠে টর্চ ফেললে হয়তো দেখা যাবে একটা কেটে-নেওয়া দড়ির ফাঁস হয়তো এখনো রয়ে গেছে কালো একটা আংটার সঙ্গে।

একবারের জন্য আধো-ঘুম আধো-জাগাটা ভয়ের তীক্ষ্ণ চমকে সম্পূর্ণ বিস্ফুরিত হল, নড়ে উঠল বিকাশ, মশারির ঝাপসা আবরণের বাইরে ঘরের নিরবয়ব ছায়াগুলো সজীব হল, লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটা, পিটপিট করল অশরীরী চোখের মতো, হৃৎপিণ্ডে যেন ঠাণ্ডা একটা হাতের ছোঁয়া লাগল। চোখ দুটোকে ঠেলে ধরে সে ছাতের সঙ্গে একটা ঝুলন্ত মানুষের শরীর দেখবার আশা করেই—পরমুহূর্তে লজ্জিত হল।

ইডিয়ট! নিজেকে সম্ভাষণ করে বিকাশ বললে, ইডিয়ট! পাড়াগাঁ রাত—অচেনা ঘর—গালগল্প—সব মিলিয়ে চমৎকার সিন্‌থিনিস একটা! কলকাতার পুরোনো ভাড়াটে বাড়িতে এমন কত মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা, পাগলামি। কোনো চিহ্ন থাকে তার? একটা হোয়াইট ওয়াশের পলেস্তারা পড়ে, কোথায় মিলিয়ে যায় সে-সব। যে ঘরে খুন হয়েছিল, বছর ঘুরতে না ঘুরতে হয়তো সে ঘরেই ফুলশয্যার খাট বিছিয়ে দেওয়া হয়। প্রকাণ্ড বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কোথাও জুয়ার আড্ডা চলে, কেউ মদ খেয়ে বৌকে মারে, কেউ অফিসের চাকরি আর স্ত্রী-সন্তানের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ নিয়ে একটানার দিন বোনে, কেউ বা অনেক রাত পর্যন্ত রেডিয়ো খুলে শোনে রবিশঙ্করের সেতার—কিংবা কার্নাটকী সঙ্গীত—কিংবা কুমার গন্ধর্বের গান—কিংবা শেষ বাসরের রবীন্দ্রসঙ্গীত।

পাড়াগাঁয়ে এলেই তার রাত, তার নির্জনতা, তার পাতার শব্দ, তার ঝিঁঝি—তার শেয়ালের ডাক (দূরে কাছে শেয়ালের সাড়া উঠেছে এখন) আর সেই সঙ্গে পুরোনো বাড়ির পুরোনো ইট-সুরকি-বালি সব যেন একসঙ্গে মিলে খানিকটা বদ্ধ কালো জলের মতো স্থির হয়ে দাঁড়ায়—সব স্মৃতিগুলো তার মধ্যে জমাট বাঁধে। কলকাতায় যদি এসব গল্প প্রভাকর তাকে শোনাত আর এ বাড়িটা কলকাতায় থাকত, তাহলে এরা এমন করে ঘুরে বেড়াত তার মাথার মধ্যে? প্রভাকরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো ট্রামে কিংবা বাসে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সব মুছে যেত—কিংবা মনে থাকলেও তার ভার থাকত না।

বিকাশ পাশ ফিরল। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বাড়ছে। মশারির ওপর দিয়ে একটা হাত একবারের জন্যে দেওয়ালে গিয়ে ঠেকেছিল, মনে হল যেন বরফের ছোঁয়া লাগল। কানে এল, ওদিকের পোড়ো মহলে পায়রাগুলো হঠাৎ পাখা সাপটে উঠেছে, কী কারণে ছটফটিয়ে উঠেছে তারা। কে জানে, ওদের সুখের সংসারে কী অস্বস্তির কারণ ঘটেছে, ওরাও তার মতো প্রহর জানছে আজকে।

দুত্তোর, এ কী হচ্ছে? আজ কি আর ঘুম আসবে না? অনিদ্রার আসামী তো সে কখনো নয়। আসলে অচেনা জায়গা—নতুন আবহাওয়া! ঘুম আসছে না সেই জন্যই।

চুলোয় যাক এ-সব এলোপাথাড়ি ভাবনা। কালকে ব্যাঙ্কে গিয়ে বসতে হবে। নতুন অফিস—মানিয়ে নিতে হবে সবার সঙ্গে। আজ রাত্রে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। তার ঘুমনো দরকার!

কী হলে ঘুম আসে? ভেড়া গুনলে?

এক—দুই—তিন—চার—

ভেড়া গোনা হল না। চোখটা খুলে যাচ্ছে এবার। আবছা অন্ধকারে—কী একটা চকচক করছে ওখানে—আলোর বিষণ্ণ বৃত্তটা ছুঁয়েছে ওটাকে।

কী হতে পারে ওটা? জলের গ্রাস? না—তার সেই বেহালাটা। সন্ধ্যের আগে কেস থেকে বের করেছিল একবার।

'তুমি বেহালা শিখবে?'

'শেখাবেন আপনি?'

একটি কিশোরীর মুখ। এই জীর্ণ, অবসন্ন, ভয় আর রহস্যের ছায়া জড়ানো বাড়িতে কেমন অচেনা বলে মনে হয়। সুষু। সুবর্ণা—সোনালি।

তুলনা করতে ইচ্ছে করে সূর্যমুখীর সঙ্গে। এ বাড়িতে ওকে মানায় না। শশাঙ্ক কাকার জানা-না-জানা শোনা-না-শোনা অন্ধকার চরিত্রটার ওপর একটা আলোর মতো জেগে থাকে।

হয়তো অল্প বয়সে কাকিমার চেহারাটা ওরই মতো ছিল। তারপরে এই বাড়ি তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছে। ওকেও নেবে। এ বাড়ি না হোক, এ রকম অন্য কোন বাড়ি—এমনি ক্লান্ত, পুরোনো ঠাণ্ডা, অন্ধকার।

শুধু ওকে কেন?

আর একজনের মুখে ওর মতো সকালের আলোয় রাঙা বিকেলে, কলকাতার সন্ধ্যায় জলে উঠতে চেয়েছে। তারপর শ্রান্ত পা ফেলে ফিরে গেছে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার কাছে—মোহনলাল স্ট্রীটে—জনতা-জীবিকা-ক্লান্তির দোল-খাওয়া নিরানন্দ একটা একতলা বাড়িতে।

মনীষা।

'মনীষা, আমাদের এইভাবেই চলবে?'

'বাবা রিটায়ার করেছেন। একশো পঁচিশ টাকা পান। ছোট ভাই দুটো স্কুলে-কলেজে পড়ছে। ওদের একটু দাঁড় না করিয়ে আমি কি ভাবে ফেলে যাই?'

একটু চুপ করে থাকা। কোনো জবাব নেই। সামনের গঙ্গায় একটা জাহাজের ক্রেন ভৌতিক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

'আমাদের সময় কখনো আসবে না?'

'কে জানে! হয়তো আসতে আসতেই ফুরিয়ে যাবে।'

স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে উল্কার মতো মোটরের পর মোটর যায়। গঙ্গায় ভাঁটার জল তীর-বেগে নামে। রাস্তার ধারের ফালি বাগানের কৃপণতায় আলো-আঁধারিতে কয়েকটা ক্যানা দোলে। দুটি পাঞ্জাবী ছেলেমেয়ে হাসিতে গল্পে পাশ দিয়ে উড়ে যায় যেন। শুধু এই দুজনের ভেতরে সব থেমে থাকে, কোনো কিছুর কোনো অর্থ মেলে না—সব ভাবনা গিয়ে মোহনলাল স্ট্রীটের সেই একতলায় মুখ থুবড়ে পড়ে।

সান্ত্বনা মনীষাই দেয়।

'তুমি মন খারাপ কোরো না। কোনো একটা উপায় হবেই।'

হয়তো হবে। পাঁচ বছর, সাত বছর পরে। অন্তত একটা ভাইয়ের দাঁড়াতে কতদিন লাগবে? আজকাল কি পাস করে বেরোলেই চাকরি পাওয়া যায়?

কিংবা—কে জানে, একটা লটারীর টিকেট কিনে আর ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে—হয়তো মনীষা সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দিতে পারবে।

কোনো মেয়ে মনীষা, কোনো মেয়ের নাম সুমু। সূর্যমুখীর মতো আলোর জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু কোথাও নিয়োগীবাড়ি, কোথাও বা শ্যামবাজার। এক ইতিহাস। একটাই।

কিন্তু কী আশ্চর্য—ঘুম কি আসবে না? কাল দশটায় জয়েন করতে হবে। ব্যাঙ্কের কাজ। মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে নিতে হবে সমস্ত। আজ তার ভালো করে ঘুমোনো দরকার।

না—ভেড়াই গুনতে হল।

এক—দুই—তিন—চার—বাইরে কী অসংখ্য মশা! যেন একটা ট্রেন চলছে ঘরের ভেতর। পাঁচ—ছয়—সাত—। মেরি হ্যাড এ লিট্‌ল ল্যাম—নার্সারি রাইম। আবার গুনতে হচ্ছে ভেড়াগুলো গোড়া থেকেই—এক—দুই—তিন—কী ভয়ংকর মশার ডাক—এখন তাছাড়া আর বাইরে কোনো শব্দই নেই। ব্যা-ব্যা-ব্ল্যাক্‌শিপ হ্যাভ ইয়ু এনি উল? নাঃ—সমস্ত অন্ধকারটাই মশা হয়ে গেছে এখন। কিন্তু মশার ডাকের মধ্যেও একটা মিউজিক আছে নাকি? লণ্ঠনের মুমূর্ষু আলোর বৃত্তটার ঠিক বাইরে বেহালাটা দেখা যায়—যায় না। মশাগুলো যেন কনসার্ট বাজাচ্ছে—বেহালা—ক্ল্যারিয়োনেট্—চেলো—বেহালাটা—বেহালাটা—বেহালাটা—

তারপর আর নেই। রাত একটা বাজবার আওয়াজটা ঘুমের দীঘিতে আপাতত শেষ বুদ্বুদ।

এই জায়গাটা আগে ঠিক ব্যবসায় ছিল না। লোকের জমিজমা ছিল, চাষবাস ছিল, একটা মোটের ওপর সম্পন্ন গ্রামজীবন ছিল। তখন ছিল নিয়োগীদের যুগ। তারা জমিদারী করত, মামলা করত, গ্রাম্য রাজনীতি করত আর বিজয়ার দিনে চল্লিশখানা প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা বের করত।

সময় ঘুরতে লাগল তার পর। মেটে রাস্তার জায়গায় এল পীচের পথ, গোরুর গাড়ি আর পালকীর পালা শেষ করে দিয়ে মোটর গাড়ি এল, বাস এল। যে কুণ্ডুরা ধান-চালের আড়তদার ছিল তারা তৈরি করল রাইস মিল, যে-পালেরা ঠাকুর গড়ত তাদের কেউ কেউ নামল ব্যবসায়। নিয়োগীরা ডুবতে লাগল, পাল-কুণ্ডুরা উঠতে লাগল। গ্রামের

ব্যবসা এগিয়ে চলল শহরে, শহর ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল কলকাতার দিকে। অর্থনৈতিক কাঠামোটাই বদলে গেল ধীরে ধীরে।

ধান-চালের জমাট ব্যবসা এখন। তরীতরকারীর মস্ত পাইকারী বাজার। পাল-কুণ্ডুদের লরী আছে, জীপ আছে, প্রাইভেট গাড়ি আছে। এখন মাল্‌টি-পারপাস স্কুলের তেতলা বাড়ি, হেলথ সেণ্টার, পাল-কুণ্ডুরা একটা কলেজের কথাও ভাবছেন।

অতএব ব্যাঙ্ককে আসতে হল অবধারিতভাবে।

ব্রাঞ্চটা নতুন, বছর চারেক মাত্র হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে বিজ্‌নেসের অবস্থা ভালো। এই সময় একজন বিচক্ষণ লোক দরকার। বিকাশকে বাছাই করা হয়েছে। কিঞ্চিৎ পদোন্নতির আশায় বিকাশ রাজী হয়েছে আসতে, তার সঙ্গে ভেবেছে—মন্দ কী, দিনকতক বাংলা দেশটাকে একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখাই যাক না—কলকাতা তো মধ্যে মধ্যে নার্ভগুলোকে ছিঁড়ে খেতে চায়।

জায়গাটার নাম শুনে মা বলেছিলেন, 'ও—ওখানে? ওখানে তো সেই শশাঙ্ক ঠাকুরপোর বাড়ি, তোর বাবার মক্কেল ছিলেন—আপনজনের মতো আসা-যাওয়া ছিল। ওঁরা খুব নামী লোক ওখানকার। ভালোই হল, তোর ওখানে কোনো অসুবিধে হবে না—ওঁরাই তোকে সব ঠিক করে দেবেন।'

অতএব। অতএব নিয়োগীবাড়ি।

শশাঙ্ক কাকা বলেছিলেন, 'ব্যাঙ্ক-ফ্যাঙ্ক আমার ভালো লাগে না। কিছু মনে কোরো না বাবাজী—তোমরা ভালো ছেলে, কিন্তু ও-সব চোরের কারবার।'

খেয়ে উঠে বেরুবার আগে মুখে এক গ্লাস জল তুলেছিল বিকাশ। তার বিষম লাগল।

'বলেন কি!'

একটা ইতিহাস শুনিয়ে দিলেন শশাঙ্ক কাকা। সেই যুদ্ধের সময়। ব্যাঙের ছাতার মতো ব্যাঙ্ক গজাচ্ছিল মাটি ফুঁড়ে—কারো নাম 'সোনার ভারত', কেউ বা 'সর্বমঙ্গলা'। তারা বলতে লাগল: 'আসুন, বাঙালীর জাগরণে সাহায্য করুন, আমাদের ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়ে নির্ভয় হোন—মোটা হারে সুদের টাকা ভোগ করতে থাকুন।' তারপরে বহু মানুষের সর্বস্ব ডুবিয়ে সর্বমঙ্গলা অন্তর্ধান করলেন। সোনার ভারত ভারত-মহাসাগরে ডুব মারল। শশাঙ্ক কাকার কোন্ বন্ধু, তখন সারা জীবনের বিশ হাজার টাকা সম্বল খুইয়ে—

বিকাশ বাধা দিয়ে বলেছিল, 'এখন আর সেদিন নেই। এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—'

শশাঙ্ক কাকা তাকে শেষ করতে দেননি: 'হাঁ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক—এ-সবের একটা মানে বোঝা যায়। কিন্তু এ-সব দিশি জিনিসকে বিশ্বাস আছে? দিলে একদিন

গণেশ উল্‌টে। তখন বুক থাবড়াও বসে বসে।'

'আপনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন না?'

'থাকলে তো?' হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন শশাঙ্ক কাকা: 'এই দু-চারটে ধান-পান নাড়াচাড়া করে কোনোমতে সংসারটা চালাই আর কি! আর যদি কখনো পাঁচ-দশটা টাকা এসেই গেল, তা হলে পোস্টাপিশের পাসবই। ওর আর একটা সুবিধে আছে—বুঝেছ না? ওখানে কিছুতেই সই মেলানো যায় না—তুলতে প্রাণান্ত! একবার জমা দিয়েছ কি রইল যক্ষের ধন—আর সহজে নড়াতে পারছ না!'

শশাঙ্ক কাকা আর একবার খুশী হয়ে হেসে উঠেছিলেন।

আলোচনাটা হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলতে পারত, কিন্তু বিকাশের আর সময় ছিল না। ব্যাঙ্কের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

বেরুতেই একটা রিক্‌শ পাওয়া গেল, সে-ই পৌঁছে দিল ব্যাঙ্কে।

ছোট দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় 'শ্রীহরি স্টোর্স' নামে মনোহারী দোকান, তার পাশে 'সত্যভামা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। ওপরে দুটো ঘরের সাইজে একটি ঘর—সেখানে ব্যাঙ্ক জনকয়েক কর্মচারী, বেয়ারারা, বন্দুক কাঁধে দারোয়ান। পরিচয়-পর্ব মিটতে কয়েক মিনিট লাগল। যে ছেলেটি চার্জ বুঝিয়ে দিলে, সে বিকাশের চাইতে বয়সে একটু বড়োই হবে; কিন্তু সমানে 'দাদা—দাদা' বলে আপ্যায়ন করতে লাগল, চা আনাল সত্যভামা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে।

'এখনই তো খেয়ে এলুম মশাই—আবার চা কেন?'

'আপনি প্রথম দিন এলেন দাদা—একটু চা-ও খাবেন না?'

ছেলেটির নাম প্রেমানন্দ। এইদিকেই কোথাও বাড়ি। কলকাতার আর একটা বড়ো ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে।

'দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন কেন? বেশ তো ঘরের খেয়ে চাকরি করছিলেন।'

'ভালো লাগে না দাদা পাড়াগাঁয়ে রট্ করতে। লাইফ বলতে তো কিছু নেই।'

বিকাশ একবার চেয়ে দেখল প্রেমানন্দর দিকে। এই জায়গার পক্ষে চেহারাটা একটু বেশি স্মার্ট। ধারালো চোখ, চোখা নাক, তরতর করে কথা বলে যায়।

প্রেমানন্দ আবার বললে, 'এখানে যে সিনেমা হাউসটা আছে, দশ বছর আগেকার হিন্দী ফিল্ম ছাড়া আর কিছু আনে না তারা। আর হল্! একবার যদি ঢুকেছেন, তা হলে আর দ্বিতীয়বার ঢুকতে চাইবেন না। যেমন নোংরা, আর চেয়ারে তেমনি ডেঙ্গারাশ ছারপোকা!'

বিকাশ চুপ করে রইল। সন্দেহ নেই, এর পক্ষে এখানে রট্ করা সম্ভব নয়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প শিস দিচ্ছিল প্রেমানন্দ। হঠাৎ ফস করে জিজ্ঞেস

ধরে বসল, 'লাইটহাউসে এখন কী ছবি হচ্ছে বলুন তো? একটা জেম্‌স্ বণ্ড—না?'

'ঠিক বলতে পারছি না। অনেকদিন সিনেমা দেখিনি।'

'কী যে বলেন দাদা!' প্রেমানন্দ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না: 'কলকাতায় থাকেন—অথচ—'

উত্তরে বিকাশ একটু হাসল।

'তা কলকাতায় এত ভ্যারাইটি আছে যে ও-সব খেয়াল না করলেও চলে। তাই না দাদা?'

খাতা-পত্রের মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হল বিকাশ। ভ্যারাইটি? কলকাতায়? ঠিক মনে পড়ে না। ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা। একটা স্রোত, একটানা। অবসাদ নিয়ে জেগে ওঠা, ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। ভ্যারাইটি? সিনেমা—থিয়েটার—গান—খেলা—কারো কারো বার—কারো কারো সঙ্গিনী—, কারো কারো পণ্য। তারপর? সমস্ত যোগফলটা কী?

শুধু শুধু কখনো কখনো এক-একটা ঝড়ের ডাক। মিছিলের মুখ। দাবি-দাওয়া। কখনো টিয়ার গ্যাস, কখনো গুলির আওয়াজ। সমুদ্রের সাড়া। আমরা বেঁচে আছি, আমরা বেঁচে থাকব, আমরাই বাঁচি। 'লাগাতার হরতাল—আম হরতাল—' 'ময়দানের ঐতিহাসিক সমাবেশে দলে দলে যোগ দিন।' 'ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা আওয়াজ তুলুন—'

তবু ঝড়ও কখন থেমে যায়। কে যেন একটা বিরাট পা ফেলে আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কোথাও। আলোগুলো আলেয়া হয়। হতাশা। আবার সাড়া ওঠে: 'আমরা বেঁচে আছি, আমরা বেঁচে থাকব, আমরাই চিরকাল বাঁচি—'

ভ্যারাইটি? এইটুকু মনে পড়ে।

তবু এর ভেতরেও মনীষাকে ভরসা দেওয়া যায় না। বলা যায় না—তুমি হারাতে পারো না, তুমি অপেক্ষা করতে করতে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারো না। তোমার জন্যে সব আছে। ঘর, ভালোবাসা, নিশ্চয়তা—ভবিষ্যৎ—

অন্যমনস্কতা কেটে গেল।

'দাদা, কী ভাবছেন?'

'অ্যাঁ?'

প্রেমানন্দ আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে চেয়ে আছে মুখের দিকে। এ তার নতুন জায়গার অচেনা ব্যাঙ্ক। মনীষা—কলকাতা—সব অনেক দূরে।

'কী ভাবছিলেন দাদা?'

'কিছু না—কিছু না।'

'কলকাতার জন্যে মন খারাপ লাগছে—না?'

বিকাশ আবার হাসল : 'খারাপ যদি লাগবেই, তবে ছেড়ে আসব কেন ? আপনি গ্রামে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, আর আমি কলকাতার ছেলে—এখানে দু'দিন স্বাদ বদলাতে এসেছি।'

প্রেমানন্দর চোখ দুটো কৌতুকে মিটমিট করতে লাগল।

'তা বদলান—দুদিন বদলেই নিন। তারপরেই পালাবার রাস্তা খুঁজবেন প্রাণপণে, এ আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে। এখানকার লোকগুলোকে তো চেনেন না! কতগুলো স্রেফ হাঙর, কতগুলো কাঁকড়া বিছে, কতগুলো—'

সেগুলোর পরিচয় দেবার আগেই থেমে গেল প্রেমানন্দ। সিঁড়ি কাঁপিয়ে এক ভারী চেহারার ভদ্রলোক উঠে আসছেন ওপরে। পায়ে মোটা মোটা জুতো, গায়ে দামী শাল।

গলা নামিয়ে প্রেমানন্দ বললে, 'কানাই পাল। টাকার কুমীর মশাই। আর আপনার শশাঙ্ক কাকার সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়!'

বলেই সম্বর্ধনার রব তুলল : 'আসুন আসুন কানাইদা, আলাপ করিয়ে দিই! ইনি হচ্ছেন আমাদের—'

পাঁচ

কানাই পালের মতো পেট্রনকে কাউণ্টারে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না, প্রেমানন্দই এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ভেতরে নিয়ে এল।

'আসুন আসুন পাল মশাই। ইনিই বিকাশ রায়চৌধুরী—আমার জায়গায় চার্জ নিলেন।'

কানাই পাল বললেন, 'একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি।'

জড়ো করা হাত দুটো কপাল থেকে নামিয়ে বিকাশ বলল, 'যতটা ছেলেমানুষ ভাবছেন তা নয়। সাতাশ পেরিয়েছি।'

'সাতাশ!' হা-হা করে প্রচণ্ড এবং পরিতৃপ্তভাবে হাসলেন কানাই পাল, চেয়ারটা মড়মড় করে উঠল। তারপর প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার বয়েস কত বলুন দেখি?'

ষাটের নীচে নিশ্চয় নয়। তবু এত বড়ো পেট্রনকে খুশী করতে হয় বোকা সেজে। বিকাশ বললে, 'পঁয়তাল্লিশ—না?'

আবার সেই প্রবল হাসি এবং সেই সঙ্গে চেয়ারটার আর্তনাদ।

'পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছি কুড়ি বছর আগে—হা-হা—'

এই মেজাজটাই চলল কিছুক্ষণ ধরে। বিকাশ আরো বোকা সাজল, অত্যন্ত সরল-

ভাবে জানালো যে তিনি ষাট ছাড়িয়েছেন একথা ভাবাই যায় না। প্রেমানন্দ বললে, কেন হবে না—পালমশাই অল্প বয়সে কুস্তি-টুস্তিও নাকি লড়তেন। কানাই পাল নিজের সম্পর্কে একটু বিনীত হয়ে বললেন, ওসব কিছু না, আসলে পাড়াগাঁয়ের জল-হাওয়াই মানুষকে তাজা রাখে। তা হলে এখানকার অর্ধেক লোকেরই এরকম বাদুড়চোষা রোগা চেহারা কেন—এ কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলে বিকাশ। কানাই পাল বললেন, কলকাতায় ধোঁয়া-ধুলো, খাবারে ভেজাল—এ সবেই লোকে কুড়িতে বুড়িয়ে যায়।

এসব খোশ গল্প হয়ে গেলে, প্রেমানন্দ পান এনে খাওয়ালে, নিজের অ্যাকাউন্টে কী একটা দেখবার ছিল সেটা দেখে কানাই পাল উঠলেন। তাকালেন ঘড়ির দিকে।

'এস.ডি.ও. এসেছেন ডাক-বাংলোয়। একবার দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে।'

কাজের লোক। বেশি সময় নষ্ট করতে পারেন না।

যাওয়ার আগে প্রেমানন্দকে বললেন, 'ভারী ভুল করছ হে ছোকরা। কলকাতায় গিয়ে কী যে মোক্ষ লাভ হবে তুমিই জানো। বেশ তো ছিলে এখানে।'

প্রেমানন্দ হাত কচলাতে লাগল: 'আজ্ঞে মাইনেটা একটু বেশি, উন্নতির আশা আছে—'

কানাই পাল একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'ওই মাইনেটাই দেখলে? নিজের তো কিছু জমি-জমা আছে, চাকরি না করতে চাও সেদিকেও তো একটু নজর দিলে পারতে। এখন আর চাকরির সেদিন নেই হে, লক্ষ্মী ওদেরই ঘরে। কিন্তু তোমাদের আর এসব বলে কী হবে, বাবু হয়ে গেছ—চাকরি না করলে কি আর প্রেষ্টিজ থাকে?'

প্রেমানন্দ হেঁ হেঁ করতে লাগল।

কানাই পাল আবার ঘড়ি দেখলেন।

'চলি। এগারোটার মধ্যেই এস.ডি.ও.র সঙ্গে দেখা করবার কথা।' বেরিয়ে যেতে যেতে একবার দরজা থেকে ফিরে তাকালেন: 'সময় পেলে, সন্ধ্যের পর-টর এক-আধদিন আমার ওখানে পায়ের ধুলো দেবেন বিকাশবাবু। গল্প-সল্প করা যাবে।'

'আজ্ঞে যাব বইকি—নিশ্চয় যাব।' কৃতার্থ বিকাশ করজোড়ে জানালো: 'সে তো আমারই সৌভাগ্য।'

ভারী জুতোর আওয়াজ নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। একটু পরে বাইরে মোটরের শব্দ হল।

প্রেমানন্দ তার চতুর ভঙ্গিতে মিটমিট করে হাসল।

'কেমন দেখলেন দাদা?'

'ভালোই।'

'হাঁ, হাতে রাখলে ভালোই। খুব ইনফ্লুয়েনশাল লোক। অঢেল টাকা।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। নইলে আর এস.ডি.ও. কেন বসে থাকবেন ওঁর জন্তে?'

'চটাবেন না, আখেরে কাজ দেবে।'

'আখের?' বিকাশ আশ্চর্য হল: 'আখেরের কী আছে? আর চটাবই বা কেন, আমি তো আর ওঁর বিজনেস-রাইভ্যাল নই। তা ছাড়া ওঁদের সেবার জন্তেই তো আমাদের চাকরি।'

'হাঁ ওইটেই মনে রাখবেন।' প্রেমানন্দ আবার মিটমিট করে হাসল: 'তবে আপনাকে আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি দাদা। আপনি যে শশাঙ্কবাবুর ওখানে এসে উঠেছেন সেটা ওঁকে জানতে দিইনি। খেপে যেতেন শুনলে। ও বাড়িতে যে আপনি বেশিদিন থাকছেন না, সে ভালোই।'

বিকাশ বিরক্তি বোধ করল: 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মশাই। করি তো ব্যাঙ্কের চাকরি—সেজন্তে সকলকে তোয়াজ করে বেড়াতে হবে?'

'অন্তত ওঁকে হাতে রাখবেন। নইলে হয়তো খাঁ করে একটা চিঠিই ছেড়ে দেবেন হেড অফিসে। আপনার ব্যবহার খারাপ, পাবলিকের সঙ্গে ডীল করতে পারেন না—এই সব। কী দরকার দাদা খামোকা ঝামেলা বাড়িয়ে?'

বিকাশ গম্ভীর হয়ে বললে, 'হুঁ।'

'আর মাঝে মাঝে যাবেন সন্ধ্যেবেলায়।'

'গিয়ে মোসায়েবী করতে হবে?'

প্রেমানন্দ এবার একটু বিষণ্ণ হল: 'আপনি কলকাতার মেজাজ নিয়ে সবটা দেখছেন দাদা—এসব জায়গাকে ঠিক চিনতে পারছেন না। মোসায়েবীর দরকার নেই, গিয়ে বসবেন—উনি আধুনিক যুবকদের উপদেশ দিতে ভালোবাসেন—তাই শুনবেন কান পেতে, আর এক-আধটু হাসবেন। বাস—এতেই যথেষ্ট।'

'লাভ?'

'উনি খুশী থাকবেন। চা-টা খাওয়াবেন। কখনো কখনো দু-একটা পুকুরের মাছও খাওয়াতে পারেন।'

বিকাশের গাটা একবার গুলিয়ে উঠল। এখানে আসবার পর থেকে প্রত্যেকটা জিনিস তার বিস্বাদ হয়ে উঠছে ক্রমশ। নিয়োগীপাড়া, শশাঙ্ককাকা, প্রভাকরের কথাগুলো, কানাই পাল, প্রেমানন্দর এই সব অযাচিত উপদেশ। কলকাতা ক্লান্ত করে, কলকাতার ভিড়ে সমস্ত মন বিমর্ষ হয়ে যায়—একটা আকাশ, একটুকরো সবুজের জন্তে চোখের দৃষ্টি কাতর হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে, কলকাতা থেকে একশো মাইল দূরে যেখানে সবুজ

অবারিত, আকাশের শেষ নেই—এখানে বাতাসে বাতাসেও বিষ ভেসে বেড়ায়। সবুজের নীচে সাপেরা কিলবিল করে। বিকাশ অন্যমনস্ক হল। গ্রামের এই সব অভিজ্ঞতার জন্যে এত দূরে না এলেও তার ক্ষতি ছিল না, ছেলেবেলায় পড়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলো আর একবার পড়লেই চলে যেত।

সামনের খোলা খাতাটা একরাশ অঙ্কের হিসেব, লাল কালির কটা সই, চেকিং পেনসিলের 'টিক' মার্ক—এগুলোর দিকে চোখ মেলে রেখেও বিকাশ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না—এই বিস্বাদ ভাবনাটাই তাকে মাকড়শার জালের মতো ঘিরে ধরছিল। ঘড়িতে এগারোটার আওয়াজ উঠতে তার ঘোর কাটল।

প্রেমানন্দ একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। বিকাশ তাকালো তার দিকে।

'শশাঙ্ক কাকার সঙ্গে ওঁর শত্রুতা কেন বলুন তো?'

'পলিটিকস—লোক্যাল পলিটিকস। তা ছাড়া গত ইলেকশানে দাঁড়িয়েছিলেন। হেরে গেছেন। ওঁর ধারণা আপনার কাকাই সেজন্যে দায়ী।'

'কোন্ দল থেকে দাঁড়িয়েছিলেন?'

'ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট। উনি সব দলের ওপর চটা। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, পি-এস-পি, জনসংঘ—কাউকে দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। ওঁর বিশ্বাস দেশের ভালো তারাই করতে পারে, যারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। রাজনীতি থাকলেই দল, আর দল থাকলেই দলাদলি—দেশ চুলোয় যাক, তাতে কারুর কিছু যায় আসে না।'

'উনি তা হলে সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে শুধু দেশের কাজ করতে চান?'

'চেয়েছিলেন। যে দল জিতবে, তারা ডাকলে মিনিস্ট্রিতে যোগ দিলেও দিতে পারেন, এসবও ভেবেছিলেন। টাকাও খরচ করেছিলেন বেশ কিছু। কিন্তু—'

কথাটা তুলে নিয়ে বিকাশ বললে, 'কাকা?'

'হুঁ। গোড়াতে তিনিই ওঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তারপর কানাইবাবুর সন্দেহ হল, ইলেকশানের খরচা বাবদ যত টাকা তিনি শশাঙ্কবাবুকে দিচ্ছেন তার বেশিটা আত্মসাৎ করছেন শশাঙ্কবাবু নিজেই। ব্যবসায়ী মানুষ—লোকচরিত্র তো বোঝেন। লেগে গেল খিটিমিটি। শশাঙ্কবাবু ওঁকে ছেড়ে চলে গেলেন অন্য দলে, বলতে লাগলেন উনি ব্ল্যাক-মার্কেটীয়ার, হোর্ডার, বাড়ির গোরুর নামে পর্যন্ত বেনামী জমি রেখেছেন, নিজের কাকাকে ঠকিয়েছেন—'

'বুঝেছি।'

'দারুণভাবে হেরে গেলেন। অবশ্য উনি নিজে ছাড়া আর কেউ-ই বিশ্বাস করত না যে উনি জিততে পারবেন। কিন্তু সেই যে শত্রুতা শুরু হল, এ ওঁর নাম শুনতে পারেন না। কানাইবাবুর অবশ্য অনেক টাকা, কিন্তু প্যাঁচালো বুদ্ধিতে শশাঙ্কবাবু ওঁকে এ-হাটে

কিনে ও-হাটে বেচতে পারেন। তাঁরও তো জমিদার-বংশে জন্ম।'

বিকাশ আবার একটু চুপ করে রইল।

'তা হলে ওঁর ওখানে মোসায়েবী করতে গেলে তো কাকাকে চটাতে হবে!'

'ওইটে একটু ট্যাক্‌ট্‌ফুলী ম্যানেজ করতে হবে আপনাকে। গিয়ে ফাঁক পেলেই কাকার নিন্দে করে আসবেন, আর কাকাকে বলবেন—' আবার চতুর হাসিতে প্রেমানন্দর চোখ মিটমিট করতে লাগল: 'তাঁর হয়ে আপনি—কী বলে ইয়ে—একটু এসপিয়নেজ করছেন।'

বিকাশ প্রেমানন্দর মুখের দিকে তাকালো।

'এ আপনারই জায়গা, মশাই। সন্দেহ হচ্ছে আমি ঠিক পেরে উঠব না।'

প্রেমানন্দ পিঠ চাপড়াবার ভঙ্গিতে হাতটা তুলেই নামিয়ে নিলে, বোধ হয় ভাবল—দাদা ডাকবার পরে ওটা একটু বেশি মাত্রার জ্যাঠামো হয়ে যাবে। অভয় দিয়ে বললে, 'কিছু ভাববেন না দাদা, দুদিনে আপনি সব শিখে নেবেন। আমরা পাবলিকম্যান মশাই, সব দিক মানিয়ে তো চলতে হয় আমাদের। কলকাতায় আপনি নিজেকে নিয়ে চুপ করে পড়ে থাকুন, কেউ আপনাকে ঘাঁটাতে আসবে না। কিন্তু এই সব জায়গায়—নানারকম ভিলেজ পলিটিকসের ভেতরে—'

শেষ করল না, থেমে গেল।

বিকাশ ক্লান্তভাবে বললে, 'আচ্ছা, পরে ভাবা যাবে এসব। আসুন, কাজগুলো শেষ করে ফেলি।'

খাতাপত্র, অঙ্ক, হিসেব-নিকেশ, লাল কালির সই, টিক মার্কা। এটা-ওটা জিজ্ঞাসা। কাজ চলতে লাগল। তিনটে নাগাদ নিজের দায়িত্ব নামিয়ে উঠে পড়ল প্রেমানন্দ।

'আর দেখা হবে না দাদা। সন্ধ্যের গাড়িতে কলকাতায় চলে যাব। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক।'

'ধন্যবাদ।'

বিকাশ বেরুল প্রায় পাঁচটায়। না—এই রকম একটা আধা শহরে একটা ব্র্যাঞ্চ খুলে দিয়ে হেড অফিস খুব ভুল করেনি। এই ধান-চাল, তরি-তরকারীর জায়গায় মানুষের এত টাকা আছে কলকাতায় বসে তা কল্পনাও করা যেত না। বাংলাদেশের কৃষক কিংবা ক্ষেত-মজুর তিন দিন এক মুঠো চাল যোগাড় করতে পারে কিনা, তাদের ঘরে কেরোসিন তেল পৌঁছোয় কিনা, অথবা কখনো কখনো 'টীক টু' অথবা 'ফলিডল' জাতীয় কীটনাশক খেয়ে তাদের জ্বালা জুড়োতে হয় কিনা—এই ব্যাঙ্কটিতে বসে সে সব তথ্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে মনে হল। কানাই পালই ঠিক বলেছিলেন। চাষীর ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকুন আর নাই থাকুন—ধান-চালের যাঁরা কারবারী তাঁরা তাঁর প্যাঁচাটিকে পর্যন্ত সোনার শেকল

পরিয়ে রেখেছেন—সহজে পালাবার রাস্তা নেই।

বাংলাদেশ সম্পর্কে কলকাতার খবরের কাগজে পড়া ধারণা তার বদলাতে হবে।

পথে তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন প্রিয়গোপালবাবু। ব্যাঙ্কের একজন কেরানী। ইনিও এখানকারই লোক।

প্রিয়গোপালের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। কানাইবাবু বলেছিলেন এখানকার লোক চারদিকের বিশুদ্ধ আলো-বাতাস (এবং খাদ্যও নিশ্চয়) খেয়েই ষাট বছর পেরিয়েও যুবক থাকতে পারে। প্রিয়গোপাল এর মূর্তিমান প্রতিবাদ। চল্লিশেই কুঁজো হয়ে গেছেন, চশমার কাঁচ এত মোটা যে চোখ প্রায় দেখা যায় না—হয়তো দৃষ্টি হারিয়ে সময়ের আগেই রিটায়ার করবেন। ভাঙা গাল, সেই কারণেই নাকটাকে অদ্ভুত রকমের দীর্ঘ দেখায়; হাত-পায়ের হাড়গুলো মোটাই ছিল, এখন শুধু তার ওপর চামড়ার একটা আবরণ জড়ানো। এই শীতের দিনে বৃষ্টি নেই, রোদও নরম, তবু একটা ছাতা হাতে নিয়ে ভদ্রলোক টুকটুক করে হাঁটছিলেন বিকাশের পাশে পাশে।

প্রিয়গোপাল একটু ভীতুভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল স্যার ?'

'ভালোই তো।' একটু আগেকার চিন্তার জের টেনে বিকাশ বললে, 'এসব তল্লাটে লোকের তো বেশ পয়সা আছে দেখছি!'

'ওই ওপর তলায়। একটু অবস্থাপন্ন কৃষক, জোতদার—এদের। তলাটা ফোঁপরা—স্রেফ ফোঁপরা, স্যার। একেবারে চোরা বালির ওপর দাঁড়িয়ে।'

বিকাশ আশ্চর্য হল। এই ভীতু মানুষটির গলায় এতখানি স্পষ্ট তীক্ষ্ণতা সে আশা করেনি।

প্রিয়গোপাল আবার বললেন, 'চাষীর কষ্ট বরাবরই ছিল, স্যার। আগে তবু দু-এক বিঘে জমি অনেকের থাকত; ধান উঠলে একটু সুখের মুখ দেখত। ঘরে দু-একটা পেতল-কাঁসা থাকত, দু-চার ভরি চাঁদি থাকত। অর্থাৎ আকাল এলেও সেগুলোর ভরসা ছিল। এখন গিয়ে দেখুন—একদম ফাঁকা। গ্রামের সাধারণ চাষীদের কারো কারো মিনিমাম ইকনমিক একটা ফাউণ্ডেশন ছিল। সেটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। তাই অজন্মার একটা ধাক্কা এলেও আর দাঁড়াতে পারে না—সঙ্গে সঙ্গে কলাগাছের মতো শুয়ে পড়ে। চারিয়ে-থাকা টাকা কয়েকজনের মুঠোয় এসে জমেছে। আর নইলে—, প্রিয়গোপালের মুখে একটা বিরস হাসি দেখা দিল : 'এ সব জায়গাতেও ব্যাঙ্ক জমে উঠবে কেন বলুন ?'

এবার যেন ধোঁয়াটে চশমার আড়ালে চোখ দুটো দেখা দিল। কুঁজো লোকটার মেরুদণ্ড যেন অনেকখানি সোজা হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ স্বরে ছুরির ধার। এই লোকটি এতক্ষণ শুধু ঘাড় বাঁকিয়ে কাউন্টারে বসে ছিলেন, বিশ্বাস করা যায় না সে কথা।

'প্রিয়গোপালবাবু, আপনি এ সব নিয়ে ভাবেন নাকি ?'

'ভাবতে চাই না স্যার। আমি ব্যাচেলার মানুষ। থাকবার মধ্যে ঘরে বুড়ো মা আছেন, সম্বলের মধ্যে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাঙ্কে যা মাইনে পাই, চলে যায়। কিন্তু কথাটা কী জানেন—এই দেশে তো জন্মেছি। কিছু কিছু ভাবতে হয়, চোখ থাকলে চোখে না পড়েও পারে না। তা ছাড়া অল্প বয়সে সরকারী ক্রপ-সার্ভেতেও ঢুকেছিলাম। আমাকে তো স্যার পোলিটিক্যাল মীটিঙে দেশের কথা শুনতে হয়নি, নিজের চোখেই অনেক দেখেছি কিনা!'

বিকাশ চুপ করে রইল।

প্রিয়গোপাল তেমনি বিরস ধারালো গলায় বললেন, 'আমি স্যার আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এই শশাঙ্ক নিয়োগী, এই অখিল কুণ্ডু, এই কানাই পাল, এঁরাও যখন দেশের জন্যে চোখের জল ফেলতে থাকেন, তখন একটু খটকা লাগে—এই যা।'

বিকাশ জবাব দিল না।

এবার একটু খটকা লাগল প্রিয়গোপালের। স্বরটা নেমে এল এবার। কাউণ্টারের ভীরু কেরানী ফিরে এলেন নিজের জায়গাটিতে।

'আপনি রাগ করলেন আমার ওপর। না স্যার ?'

'রাগ করব কেন ?'

'এ সব শুনতে আপনার ভালো লাগল না।'

'আপনি নিজে যা বুঝেছেন তাই বলেছেন। আমি কেন রাগ করব ?'

প্রিয়গোপাল সলজ্জভাবে বললেন, 'কিন্তু আপনার কাকার সম্পর্কে ফস করে একটা কমেণ্ট করে বসেছি, তাতে হয়তো আপনার—'

বিকাশ হেসে উঠল।

'এখানে পা দেবার পর থেকে কাকা সম্পর্কে এত ভালো ভালো খবর পাচ্ছি যে আমি আর ও নিয়ে খুব বিচলিত নই। ও-সব যেতে দিন। আচ্ছা প্রিয়গোপালবাবু, থাকবার মতো একটা মেস-টেস এখানে কোথাও আছে ?'

'মেস ?' প্রিয়গোপাল ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এসব জায়গায় আর মেস কোথায় ? তবে স্কুলের তিন-চারজন মাস্টার মশাই একটা বাসা নিয়ে আছেন, তাঁদের সঙ্গে—'

বিকাশ হাসল : 'না, তাঁরা আমাকে রাখবেন না। তা ছাড়া পড়ুয়া মানুষ, ওঁরা আছেন ওঁদের কাজ নিয়ে। আমার আবার মধ্যে মধ্যে বেহালা বাজানোর বদ-অভ্যেস আছে, ওঁদের ধ্যানভঙ্গ হবে।'

'বেহালা বাজান নাকি আপনি ?' প্রিয়গোপালের অদৃশ্যপ্রায় চোখ উজ্জ্বল হল : 'আমার কিন্তু একটু তবলার অভ্যেস ছিল।'

'ভালো।' প্রসন্নভাবে বিকাশ বললে, 'সঙ্গতের জন্যে ডাকব আপনাকে। কিন্তু সে পরের কথা। আপাতত একটা ছোট বাসা দেখে দিন না আমাকে। একটা ঘর, একটা রান্নার জায়গা হলেই চলবে।'

'সে তো বেশ কথা। বৌমাকে নিয়ে আসুন।'

'তিনি নেই।'

'বিয়ে করেননি স্যার?'

'এখনো সুযোগ পাইনি।'

'তা হলে তো বাসা করে কষ্ট হবে। আর এদিকের লোকজন সব যা রাঁধে—'

'আমার অসুবিধে হবে না। দেখে দিতে পারবেন একটা বাসা?'

'নিশ্চয় স্যার, চেষ্টা করব। তবে কানাইবাবু দু-একটা নতুন বাড়ি-টাড়ি করছেন, তাঁকে একবার বললে বোধ হয়—'

'অত বড় লোকটাকে এসব তুচ্ছ অনুরোধে বিরক্ত করতে চাই না।'

কিছু একটা বুঝলেন প্রিয়গোপাল, মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'একটা কথা বলব স্যার?'

'নিশ্চয় বলবেন।'

'কোনো অপরাধ যদি না নেন—একটু বাঁ-দিকে ঘুরেই আমার বাড়ি, যদি একটু বসে এক পেয়ালা চা খেয়ে যান—'

'আজ থাক প্রিয়গোপালবাবু, আর একদিন হবে।' বিকাশ ভদ্রলোকের একটু ক্ষুন্ন মুখের দিকে কোমল দৃষ্টিতে তাকালো: 'কিন্তু নেমন্তন্ন ছাড়ব না। অফিস থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে হানা দেব, তখন কিন্তু বিরক্ত হতে পারবেন না।'

'একবার পরীক্ষা করেই দেখবেন, স্যার।'

'তাই হবে।'

প্রিয়গোপাল হাতের ছাতাটা ঠুকঠুক করে বাঁ পাশে মোড় ঘুরলেন। বিকাশ এগিয়ে চলল নিয়োগীপাড়ার দিকে—যেখানে খোয়া-ওঠা প্রায় মেটে রাস্তাটার ওপর এর মধ্যেই অন্ধকার কালো হচ্ছে, যেখানে পুরোনো গাছগুলোর ডালপালা নুয়ে পড়েছে পথের ওপর, যেখানে ভাঙা বাড়ির অবশেষ আর জীর্ণতা, যেখানে অনেক কালের ক্লান্ত মাটি থেকে এখন সোঁদা গন্ধের উচ্ছ্বাস, যেখানে এখন ছায়ার সঙ্গে বাদুড় আর চামচিকের ডানা মিশে যাচ্ছে, যেখানে শীত আর স্মৃতিরা কতগুলো প্রেতের মতো শরীরে সঞ্চারিত হয়ে যায়!

আজ রাত্রে প্রভাকর ডাক্তারের কাছে খাওয়ার নিমন্ত্রণ রয়েছে, সকালে এই কথাটা শশাঙ্ক কাকাকে বলতে একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। অন্তত প্রভাকরের ভাষ্য থেকে মনে

হয়েছিল—তার ওপরে কাকা যখন বিরূপ, তখন এ নিয়ে অন্তত দু-একটা বিরস মন্তব্য তিনি করবেন।

কী একটা মামলার সাক্ষী দেবার জন্যে পনেরো মাইল দূরের শহরে যাচ্ছিলেন কাকা, বেরুচ্ছিলেন বাস ধরতে। হয়তো তাড়াতাড়ির জন্যেই বেশি মাথা ঘামালেন না।

'ছেলেবেলার বন্ধু যখন, যাবে বইকি, নিশ্চয় যাবে। তার আর কথা কি হে বাবাজী!'

বলেই তিনি হাঁক ছাড়লেন: 'কই রে মুনী, আমার চাদরটা গেল কোথায়?'

অতএব প্রসঙ্গটার এইখানেই ইতি।

বিকাশ যখন বাড়ি ফিরল, তখনো শশাঙ্ক কাকা আসেননি শহর থেকে। মুনুর ছোট বোনটি বিনু বা বিনি, যার সঙ্গে আজ সকালে আলাপ হয়ে গেছে, সে ঘরে লণ্ঠনটা পৌঁছে দিলে। বললে, 'ছোটদি চা আনছে।'

'আচ্ছা।'

'মিগান্ত তুমার নিয়োগী' ওরফে বুড়োর এইটি ছোটদি। সুতরাং তার মেজদি এর ছোটদি।

জামা-কাপড় ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে বিকাশ একটু বসে রইল শ্রান্তভাবে। এখন ছ'টা। বাইরে শীতের সন্ধ্যা এরই মধ্যে ঘন আর ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে, কিন্তু প্রভাকরের কাছে এত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় না। সাড়ে সাতটার পরে বেরুলেই চলবে।

লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের ওপর বেহালাটা চিকচিক করছে। সেটা তুলে আনল সে।

দিনটা বিভ্রান্তিকর। মন আর চিন্তা এলোমেলো হয়ে আছে। আজ একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল মনীষাকে। কিন্তু হয়ে উঠল না। লিখতে হবে রাত্রে। এই বাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে—চারদিকে শীতের রাত নিথর হয়ে গেলে—সেই তখন মনীষাকে চিঠি লেখবার মতো মন তৈরি হবে তার।

আর মনীষার ভাবনাই একটা সুর গুনগুনিয়ে তুলল। বেহালার তারগুলো ঠিক করে নিয়ে ছড় টানল সে। চলে এল রবীন্দ্রনাথের গান: 'আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে, গোধূলি-লগন রে—'

তখন আলো-অন্ধকার দরজার ফ্রেমে দেখা দিল মুনু। সোনালি—সুবর্ণা। বেহালার সুরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিকাশ চোখ তুলে তাকাতে তার মনে হল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি।

ছয়

সুমু—সোনালি—সুবর্ণা। দরজার ফ্রেমে অবনীন্দ্রনাথের ছবি। একবার চেয়ে দেখল বিকাশ, ছায়ায় আলোয় মেয়েটিকে তার চকিতের জন্যে অবাস্তব মনে হল, মমতা-মেশানো ভালো লাগার একটা ঢেউ তুলল আবিষ্ট চেতনার ভেতরে, তারপর বেহালার ছড় চলতে লাগল: 'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে—'

সুমু আস্তে আস্তে ঘরে এল। জলখাবারটা রাখল টেবিলের ওপর। তারপর নিঃশব্দে একদিকে সরে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

বিকাশ তাকে দেখছিল, তবু দেখতে পাচ্ছিল না। ঘনিয়ে-আসা শীতের সন্ধ্যার ভেতরে কোমল আর স্নিগ্ধ আবির্ভাবের মতো এই মেয়েটি মিশে যাচ্ছিল তার সুরের সঙ্গে। বাইরে হাওয়া দিচ্ছিল, বাগানটায় পাতার শব্দ উঠছিল, ঘরে মশারা ভিড় করছিল, পোড়ো মহলে পায়রারা পাখা ঝাপটাচ্ছিল, চারদিকের জীর্ণতার সঙ্গে সোঁদা গন্ধ পাক খাচ্ছিল। কিন্তু বিকাশের মনে সুর ছিল, এই মেয়েটি ছবি হয়ে সেই সুরকে নিবিড় করছিল: 'বুঝি দেরী নাই, আসে বুঝি আসে—আলোকের আভা লেগেছে আকাশে—'। আর অনেক দূরের কলকাতায় মনীষা বলে আর একজন—

'কালী—কালী কালী—'

সারা বাড়ি কাঁপিয়ে হুঙ্কার উঠল কয়েকটা। থমকে থেমে গেল বেহালা। সুর, ছবি, মগ্নতা—সব একসঙ্গে খান খান হয়ে গেল।

সুমুই কথা বললে একটু পরে।

'মেজো জ্যাঠা। ওঁর মাথা খারাপ। থেকে থেকে ও-রকম চেঁচিয়ে ওঠেন। থামলেন কেন আপনি? বাজান।'

বেহালাটা সরিয়ে রেখে বিকাশ বললে, 'না, থাক এখন।'

একটা নিশ্বাস ফেলল সুমু: 'এত সুন্দর বাজাচ্ছিলেন আপনি, নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মেজো জ্যাঠার ওপর আপনি রাগ করবেন না। উনি চ্যাঁচানো ছাড়া আর কোনো ক্ষতি করেন না। সে যাক। আপনার খাবারটা নিয়ে এসেছি, খেয়ে নিন বরং।'

টেবিলের কাছে উঠে গিয়ে বিকাশ অন্যমনস্কভাবে খেতে শুরু করল। একটা ছায়া পড়ছে ভাবনায়। গাঁজার সঙ্গে ধুতরোর বিচি খাইয়ে কাকে যেন পাগল করে দেওয়া হয়েছে—প্রভাকর বলছিল। এই মেজদাকে? খাইয়েছিলেন কি শশাঙ্ক কাকা?

খাবারের থালায় আঙুল শক্ত হয়ে গেল বিকাশের।

সুমু বললে, 'খাচ্ছেন না?'

মনের অস্বস্তিটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বিকাশ সহজ হতে চাইল: 'খাচ্ছি বইকি।

আচ্ছা সুনু, তোমার মেজো জ্যাঠা কি বরাবরই পাগল?'

সুনু বললে, 'আমরা তো ওঁকে ওই রকমই দেখছি ছেলেবেলা থেকে। তবে আগে ও-রকম ছিলেন না। লেখাপড়ায় নাম ছিল, এম.এ. পড়তে পড়তে স্বদেশী করে জেলে যান। তারপর দেশে এসে জমিজমা দেখতেন, বই-টই পড়তেন। ওঁর বাড়িতে এখনো যে-সব বই ধুলোয় পড়ে উইয়ে কেটে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সে-সব দেখলে আপনি চমকে যাবেন।'

বিকাশ আশ্চর্য হল।

'ওঁর বাড়ি মানে? উনি কি এ বাড়িতে থাকেন না?'

'থাকেন। কোথায় আর যাবেন? কে খেতে দেবে বলুন?' লণ্ঠনের আলোয় সুনুর চোখ মমতায় ভরে উঠল: 'এখানে এসে—যেখানে-সেখানে, কোনায়-আড়ালে চুপ করে বসে থাকেন। যখন খিদে পায়—ওই রকম চেঁচিয়ে ওঠেন, যা কিছু খেতে দিলে চুপ করে যান।'

'ওঁর কেউ নেই?'

'আত্মীয় কুটুম তো নিয়োগীপাড়ার সবাই। কিন্তু আমরাই আপন শরিক বলে এখানেই যাওয়া-আসা করেন। বলতে গেলে তো একই বাড়ি।'

'ওঁর বাড়ি কোন্‌টা?'

'সামনেই তো দেখতে পাচ্ছেন। ওই যে ভাঙাচুরো—পায়রার বাসা।'

'ওই পোড়ো মহল?'

'ওইটেই তো। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপটা এজমালী, ওঁদের আর আমাদের। পুজোটুজো তো আর হয় না, তাই চণ্ডীমণ্ডপটাও ভেঙে পড়ছে।'

সামনের ভাঙন-লাগা বীভৎস বাড়িটা আর মেজদার ওই অদ্ভুত বীভৎস চেহারা—দুটো মিলে এখন সম্পূর্ণতার বৃত্ত তৈরি হচ্ছে একটা। বিকাশ চুপ করে রইল একটু। এখনো পায়রার ঝাপটা কানে আসছে ওখান থেকে। কে বলে, বাড়িতে অলক্ষ্মী লাগলে পায়রারা উড়ে পালায়? ঠিক উল্‌টো।

বিকাশ আবার জিজ্ঞেস করল: 'তার মানে নিজের বলতে—মানে, মা-বাপ ভাই-বোন—কেউ নেই?'

'মেজ জ্যাঠা তো বিয়ে করেননি। আর দাদু-দিদিমার উনিই এক ছেলে। তাঁরা মারা গেছেন অনেকদিন।'

'বুঝেছি।' বিকাশ আবার একটু চুপ করল: 'অত কালী-কালী করেন কেন? কালী সাধনা-টাধনা করতেন নাকি?'

'না—না, সেসব কিছু নয়। খালি বই-টই পড়তেন বসে বসে। কিন্তু এত বিদ্বান

মানুষ, তবু কোত্থেকে কী সব বিশ্রী নেশা-টেশা ধরেছিলেন। লোকে বলে তাতেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

বিকাশের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল : 'গাঁজা খেতেন—না?'

একটু অবাক হল সুমু। সরল দৃষ্টিতে কয়েক পলক চেয়ে রইল বিকাশের দিকে।

'আপনি কী করে জানলেন?'

প্রভাকরের কথাটা সামলে নিলে বিকাশ। বললে, 'না—আন্দাজ করছি। ঠিক জানি না তবে শুনেছি, ওতেই নাকি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায় লোকের।'

সুমু বললে, 'ঠিকই বলেছেন। বাবা বলেন রাতদিনই বই পড়তেন আর গাঁজা খেতেন। তাতেই শেষে ওঁর ওই রকম হয়ে গেল।'

শুধু গাঁজা? তার সঙ্গে ধুতুরোর বীজ মিশিয়ে দিত না কেউ?

'এখন আর বই পড়েন না?'

সুমুর চোখ আবার মমতায় চকচক করে উঠল : 'সে দেখলে আপনার দুঃখ হবে। কখনো কখনো বইগুলো ছড়িয়ে নিয়ে বসে থাকেন, পড়েন কি পড়েন না কে জানে, কী যেন বিড়বিড় করে বলেন, তারপর হয়তো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেন চারদিকে।'

'ছিঁড়েও ফেলেন?'

'কখনো কখনো তা-ও করেন কিন্তু কী অদ্ভুত জানেন, বইগুলোর ওপরে আবার মায়াও আছে খুব। এই তো ছুঁড়ে ছিটিয়ে ফেললেন, কিন্তু আপনাকে হাত দিতে দেবেন না। গুছিয়ে তুলে রাখতে গেলেও চটে যান। ওই করেই তো বইগুলো নষ্ট হচ্ছে। উইয়ে কাটছে, স্যাঁতা লাগছে, ইঁদুরে শেষ করে দিচ্ছে। একবার স্কুলের হেডমাস্টার মশাই এসে জ্যাঠাকে বলেছিলেন, এসব দামী দামী বই শুধু শুধুই তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দিন না ক'খানা আমাদের স্কুলের লাইব্রেরীতে। তাই শুনে জ্যাঠা একটা কাঠ তুলে তাঁকে এমন তাড়া—'এমন একটা বিষণ্ণ ব্যাপারের বিবরণ দিতে গিয়েও আর সামলাতে পারল না সুমু, হেসে ফেলল খিলখিল করে : 'আর হেডমাস্টার মশাই যে কিভাবে দৌড়ে পালালেন সে যদি একবার দেখতেন আপনি!'

সুমুর দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকালো বিকাশ। অবনীন্দ্রনাথের ছবি, বেহালায় পূরবীর সুর, মনীষার ছায়া-সঞ্চার—সব মিলিয়ে এবার তার মনে হল, এই মেয়েটি কৈশোর আর যৌবনের ঠিক উষালগ্নটিতে দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে গভীর হয়ে আসছে, কিন্তু এক ঝলক আলো পড়লে, কি একটুখানি বাতাস উঠলেই একেবারে ছল-ছল করে দুলে ওঠে। সুমুর ওপরে সোনালির রঙ লেগেছে, কিন্তু সুবর্ণা এখনো জাগেনি।

'সত্যি—জ্যাঠার জন্যে ভারী কষ্ট হয় আমার। জানেন—'সুমু একটু থামল : 'জ্যাঠা আমাকে খুব ভালোবাসেন। গরমের সময় বাগানে পাকা আম পড়লে আমার জন্যে

কুড়িয়ে আনেন ছেলেমানুষের মতো! আর মধ্যে মধ্যে হয়তো রেগেমেগে খুব চ্যাঁচামেচি করছেন, মা গিয়ে একটুখানি সামনে দাঁড়ালেই একেবারে চুপ। জানেন—মা না থাকলে মেজ জ্যাঠা কবে মরেই যেতেন। বাবা তো দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। বলেন, একটা অপদার্থ গেঁজেল—' বলতে বলতে স্বনু থেমে গেল। বুঝতে পারল, কথাটা এতদূর টেনে আনাটা ঠিক হয়নি।

'এই যা, একদম ভুলে গেছি। আপনার চা-টাই আনা হয়নি—' স্বনু দরজার দিকে পা বাড়ালো: 'চা খেয়ে আবার বেহালা বাজাবেন কিন্তু।'

'আজ নয়।' বিকাশ হাসল: 'কাল সন্ধ্যায় বেহালা শোনবার নিমন্ত্রণ রইল তোমার। এখন একটু বেরুব। যেতে হবে আমার বন্ধু প্রভাকর ডাক্তারের বাসায়।'

'ও—ওখানেই বুঝি আপনার নেমন্তন্ন?'

'ঠিক ধরেছ। তুমি চেন প্রভাকরকে?'

'চিনি বইকি। আমাদের কিরকম দাদা হন যেন। আগে তো মাঝে মাঝেই আসতেন। তারপর বাবার সঙ্গে কী নিয়ে খুব ঝগড়া হয়ে—' স্বনু আবার সাংসারিক অভিজ্ঞতায় ফিরে এল: 'এই রে, তখন থেকে খালি বকেই যাচ্ছি, আপনার চা আর আনাই হচ্ছে না।'

স্বনু আর দাঁড়ালো না, বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে।

বিকাশ মেজদার কথা ভাবতে লাগল। শশাঙ্ক বলেছেন, 'ওর একটা হিস্টরি আছে।' কী সেই হিস্টরি? যেটুকু শোনা গেল, শুধু সেইটুকুই? অথবা প্রভাকর যেমন বলছিল—

'আমি বাজনা বাজাতে পারি।'

বিকাশ ফিরে তাকালো। একটি মাটির বেহালা হাতে নিয়ে বুড়ো। 'মিগাস্তভুমায় নিয়োগী।'

মিগাস্ত উজ্জ্বলমুখে বললে, 'আমি বাজাই?'

খুশি হয়ে বিকাশ বললে, 'নিশ্চয়—নিশ্চয়।'

অতএব ক্যাঁ-ক্যাঁ করে বাজনা বাজতে লাগল।

বারান্দাটা ছেয়ে সেই হেনার গন্ধ। ইলেকট্রিকের আলোয় বাগানে ক'টা ঝকঝকে গোলাপ। সামনের মাঠে শিশিরে ভেজা ঘাস। খানিক দূরে বড়ো রাস্তাটা দিয়ে লরী আর বাসের আনাগোনা। নারকেল গাছের মাথায় চাঁদের টুকরো।

ন'টার ভেতরে খাওয়া শেষ। প্রভাকর বললে, 'এখুনি যাবি? একটু বসে যা।'

'অনেকটা রাস্তা যে। তার ওপর অচেনা জায়গা!'

প্রভাকর বললে, 'এই হল কলকাতায় থাকার সাইকোলজি। দমদম কিংবা বেলুড় ছাড়ালেই মনে হয় সুন্দরবনে পৌঁছে গেছি। বোস—বোস।'

আধঘণ্টা আরো বসতে হল বারান্দায়। এসে বসল প্রভাকরের স্ত্রীও। অল্প বয়সের গল্প, কলেজের গল্প, খেলার গল্প। এক আধটা কৌতুকের স্মৃতি।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে না। শশাঙ্ক নিয়োগী সম্পর্কে। এখানে পৌঁছোনোর পরে—এই দেড়দিনের মধ্যেই লোকটি যেন নানাদিক থেকে কোনো রহস্য উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠেছেন; অথচ মুন্নুর দিকে তাকালে কিংবা কাকিমার মুখের দিকে চাইলে অথবা সন্ধ্যাবেলায় ছোট মেয়ে ছুটির গুন গুন করে পড়ার আওয়াজ নইলে দিগন্তকুমারের বেহালা শুনলে—সব সুন্দর, সহজ স্বাভাবিক মনে হয়। শুধু এই একটি লোক পুরোনো জীর্ণ বাড়িটার ওপর যেন ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—স্পষ্টভাবে তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু বলে না, তাই তাঁকে নিয়ে যে-কোনো কল্পনা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যে-কোনো রকম বিভীষিকা তৈরী করা চলে।

একবার একজন খুন-হওয়া মানুষ পড়ে ছিল কলকাতার হৃষীকেশ পার্কের পাশে, গাছের তলায়। সকালে এসেই পুলিস লাশটাকে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, শুধু শরীরের রেখা দেখা যাচ্ছিল তার, চাপ-চাপ কালো রক্ত জমে ছিল, আশপাশে জড়ো হয়েছিল অসংখ্য মাছি। আরো দশজন কৌতূহলী পথচারীর সঙ্গে বিকাশও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খুনটা চোখে দেখলে কতখানি খারাপ লাগত কে জানে, তার চেয়েও ঢের বেশি বীভৎস লেগেছিল রক্তটা, কাপড়ের তলায় নিস্পন্দ শরীরের রেখাগুলো, আর কার যেন কথা: 'গলাটা একেবারে মুরগীর মতো জবাই করেছে'—এগুলোর সব মিলে রাত্রির পার্ক, একটা পৈশাচিক খুন, গলায় ছুরি বসানোর সময় মানুষটার আতঙ্কিত চোখের দৃষ্টি —ছটফট-করা শরীরটাকে মাটিতে ফেলে রক্ত-মাখা ছুরি হাতে যারা উঠে দাঁড়ালো—সেই তারা—কল্পনা করতে গিয়েও বিকাশের রক্ত হিম হয়ে এসেছিল। শশাঙ্ক কাকাও এই রকম একটা কল্পনার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন—সেই রিক্শওয়ালা—প্রভাকর নিজে—ব্যাঙ্কের প্রেমানন্দ।

হঠাৎ প্রভাকর যেন তাকে জাগিয়ে দিলে।

'কিরে, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?'

'না-না, ঘুমোব কেন?' অপ্রস্তুত হয়ে বিকাশ একটু হাসল: 'তবে যা খাইয়েছেন তোর স্ত্রী, তাতে ঘুমিয়ে পড়া কিছু অন্যায় নয়।'

অমলা আপত্তি করে বললে, 'ঝুট বাত। আপনি কিছুই খাননি।'

'ওটা আপনাদের চিরকালের নালিশ। আকণ্ঠ খেলেও খুশি করা যায় না।'

প্রভাকর বললে, 'বাজে বকিস্‌নি। তোর কলকাত্তাই খাওয়া তো আমি নিজেও

দেখেছি। কিন্তু সত্যি, খুব টায়ার্ড ? তা হলে থেকে যা বরং এখানেই।'

'না—ঠিক হবে না সেটা। ওঁরা দরজা খুলে জেগে থাকবেন।'

'তা হলে লোক পাঠিয়ে খবর দিই।'

'দরকার নেই, তোকে আর ঝঞ্ঝাট করতে হবে না এখন। আমি বরং উঠি।'

প্রভাকর বললে, 'তবে একটু দাঁড়া। আমিও জামা-কাপড় পরে নিই, এগিয়ে দিয়ে আসি তোকে।'

'তুই আবার কষ্ট করবি কেন এত রাত্রে ? রাস্তাও তো—'

'থাম—থাম, ওস্তাদী করতে হবে না। একটু দাঁড়া, আমি আসছি।'

বড়ো রাস্তায় পড়ে একটা রিক্শা নিতে যাচ্ছিল প্রভাকর। বিকাশ বললে, 'যা খেয়েছি, একটু হাঁটলেই কিন্তু আমার ভালো লাগবে। অবশ্য তোর যদি অসুবিধে হয়—'

'আমার ?' প্রভাকর হাসল : 'মফঃস্বলের ডাক্তার, জানিস তো ? এই সামনেই যা দু-একটা পাকা রাস্তা দেখছিস, ভেতরে একেবারে আদিম বাংলা দেশ! বর্ষাকালে সাইকেলও চলে না—কখনো ক্ষেতের আল বেয়ে, কখনো কাদা ভেঙে পাঁচ-সাত মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়। অসুবিধে আমার নয়, আমি কলকাতার বাবুর কথা ভাবছিলুম।'

'সে ভাবনা তোকে না ভাবলেও চলবে।'

'আচ্ছা—তবে পা-ই চালা।'

শীতের রাত—সাড়ে ন'টা পেরোনো। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, বাড়ির জানলাগুলোতে আলো-নেবার পালা। গাছপালা, পথ, ঘাট, ঘরবাড়ি, পুকুর—সব কিছুর ওপর হাল্কা কুয়াশা নামতে শুরু হয়েছে। কুকুরগুলোর পর্যন্ত ডাকাডাকির উৎসাহ নেই, ময়রার নেবা উনুনের আশেপাশে একটুখানি গরম আশ্রয় খুঁজে ফিরছে তারা।

চলতে চলতে বিকাশ বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ডাক্তার ?'

'নিশ্চয়। কেন করবি না ?'

'শশাঙ্ক কাকা এখানে খুব আনপপুলার—না ?'

'ঠিক তা নয়। ওঁরও দলের লোক আছে। তাঁদের কাছে উনি অত্যন্ত জনপ্রিয়।'

'অনেকেই তো ওঁকে দেখতে পারে না। সে কি লোক্যাল পলিটিক্সের জন্যে ?'

'খানিকটা।' প্রভাকর সিগারেট ধরালো : 'যদিও ওঁর বিরুদ্ধে মানুষগুলো কেউই দেবতা নয়, কানাই পাল তো নয়ই, বাট হি ইজ ডেফিনিট্‌লি মিস্টার ব্যাড্‌ম্যান।'

'কী করেন ?'

'কী করেন না ?' প্রভাকর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল : 'ওঁর সব চাইতে জরুরি কাজ কী—জানিস তো ? যেখানে যার যত লিটিগিশেন আছে, তার মধ্যে নাক গলানো। অর্থাৎ কোথাও মামলার গন্ধ পেলে আর কথা নেই, গিয়ে সোজা লাফিয়ে পড়বেন তার

ভেতরে। তারপর যে-কোনো একটা পক্ষ নেবেন, তার হয়ে তদ্বির করবেন, পরামর্শ দেবেন, দরকার হলে তার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী দেবেন—শেষে লোকটা হারুক বা জিতুক—নিজে দু-পয়সা গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়বেন।'

'তবু লোকে ওঁকে বিশ্বাস করে?'

'করে। কারণ উকিল না হলেও আইনের ফাঁকগুলো ওঁর খুব ভালো করে জানা। কোথায় কী প্যাঁচ কষতে হবে, অনেক ঝানু উকিলকেও উনি তা শিখিয়ে দিতে পারেন।' প্রভাকর হঠাৎ হেসে উঠল: 'ভালো কথা, সন্ন্যাসী-প্রদত্ত দৈব-মাদুলী একটা পাসনি এখনো?'

হ্যাণ্ডবিলগুলোর কথা মনে পড়ে গেল বিকাশের।

'সেটাও ওঁর ব্যবসা নাকি?'

'নিশ্চয়। ভালো মানুষ স্ত্রীর বেনামীতে। তবে ওটা আর বেশিদিন চলল না। আর শশাঙ্কবাবুও দেখলেন, ওঁর মতো অ্যাম্বিশাস লোকের পক্ষে এ-সব খুচরো ব্যবসা খুব কাজের নয়। তবু একেবারে ছাড়েননি। রুই-কাতলার জন্যে টোপ ফেললেও চুনো-পুঁটিতেও ওঁর অরুচি নেই।'

বিকাশের ঠোঁটের আগায় কয়েকটা জিজ্ঞাসা বার বার এগিয়ে আসছে। সেই বিশ্রী সুইসাইডটা। স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে থাকেন ভদ্রলোক। গাঁজার সঙ্গে ধুতরোর বীজ মিশিয়ে—

কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না প্রভাকর। আভাস দিয়েই থেমে গেছে। যেন এগোতে চায় না আর।

'যাক গে, থাক এ-সব। তবে সুযোগ পেলেই ও বাড়ি ছেড়ে দিস।'

'খুঁজছি তো।'

'বললুম আমার এখানে চলে আয়, সে তোর পছন্দ হল না।'

'তুই তো আছিসই। সময় হলে যাব বইকি!'

'কলকাত্তাই ভদ্রতা!' একটু বিরক্তভাবেই যেন সিগারেটটা ছুড়ে ফেলল প্রভাকর।

নিয়োগীপাড়ার রাস্তার মুখে এসে পড়েছিল দুজনে। বিকাশ থেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, এবার তুই ফিরে যা।'

'আরে আসল রাস্তাটা তো পড়ে রইল সামনে। এদিকে তো ইলেকট্রিকও নেই।'

'সেজন্যে ভাবতে হবে না। সঙ্গে টর্চ আছে। কিন্তু তুই এবারে যা দেখি। না হলে তোকে পৌঁছে দেবার জন্যে আবার আমায় উলটো দিকে হাঁটতে হবে।'

'সেই লথ্নোই কালচার? আপ্ জাইয়ে? তারপর সারারাত শাট্ল ককের মতো এ রাস্তা ও রাস্তা!' প্রভাকর হেসে উঠল: 'ঠিক আছে, আমি চললুম। টা—টা।'

'টা—টা।'

প্রভাকর ফিরে গেল। পুরোনো গাছের ছায়ায় ছায়ায়, গর্ত ওঠা রাস্তায় টর্চ ফেলতে ফেলতে চলল প্রভাকর, মাথার ওপর শুনতে লাগল পাতার শব্দ, বাদুড়ের ডানার আওয়াজ, পোড়ো বাড়িগুলোর ইটের ফাঁকে ফাঁকে তীব্র ঝিঁঝির ডাক।

অন্যমনস্কভাবে পুকুরের পাশ দিয়ে শশাঙ্ক কাকার বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিকাশ। চমকে উঠল হৃৎপিণ্ড।

যেন জঙ্গলের মধ্য থেকে দেখা দিল লোকটা। চোখ দুটো আগুনের টুকরোর মতো জ্বলছে। মাথায় জট-বাঁধা চুল, মুখে বিশৃঙ্খল দাড়ি-গোঁফের বন্যতা।

পথ আগলে ধরে অদ্ভুত ভরাট আর মোটা গলায় লোকটা বললে, 'এই—দাঁড়া।'

বিকাশ চেয়ে দেখল: সেই মেজদা!

সাত

প্রিয়গোপাল বললেন, 'চোখমুখ একটু শুকনো দেখাচ্ছে যেন স্যার।'

'রাত্রে বড্ড মশায় কামড়েছে।' বিকাশ হাই তুলল: 'মশারি ফেলবার কথা মনেই ছিল না।'

'বলেন কি স্যার! সারা রাত বিনা মশারিতেই ঘুমিয়েছেন নাকি?'

'অভ্যেস তো নেই।' বিকাশ একটু অপ্রতিভ হল: 'গিয়ে শুয়ে পড়েছি। ভেবেছি ফেলব-ফেলব, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি। শেষে মাঝ রাতে আর পারা গেল না। মশারি ফেললুম বটে, কিন্তু কতগুলো রয়েই গেল ভেতরে।'

'এরকম আর করবেন না স্যার—' প্রিয়গোপাল সস্নেহে সতর্ক করে দিলেন: 'এদিকে এখন আর ম্যালেরিয়া নেই বটে, কিন্তু এগুলো ডেঙ্গুর মশা। ভারী যাচ্ছেতাই রোগ ডেঙ্গু।'

'জানি। ডেঙ্গুর অভিজ্ঞতা আমার আছে।'

সামনে থেকে খাতাপত্রগুলো সরিয়ে নিতে নিতে প্রিয়গোপাল বললেন, 'ওই জন্যেই বলি স্যার—বিয়ে-টিয়ে করে ফেলুন, বৌমাকে নিয়ে আসুন এখানে। আমি ভালো একটা বাসা দেখে দেব আপনাকে।'

'সে তো দেবেন।' বিকাশ হাসল: 'কিন্তু তার আগে যে ঘর দেখে দেবেন বলে-ছিলেন, তার কী হল?'

'দেখছি দু-একটা। কিন্তু পছন্দমতো কিছু পাইনি।'

'পছন্দের জন্যে ভাববেন না। কাজচালানো গোছের একটা হলেই চলে যাবে আমার।'

'সেও কি হয় স্যার ?' প্রিয়গোপাল হাসলেন : 'আপনি হচ্ছেন আমাদের হেড—যা-তা একটা ঘর দেখে দিলে কি আমাদেরই মান থাকে ? ভালো একটা ঘরের খবর আমি পেয়েছি, দু-তিন দিনের মধ্যেই আপনাকে জানাতে পারব।'

কাগজপত্র নিয়ে প্রিয়গোপাল নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন।

বিকাশ চুপ করে বসে রইল। কলকাতার বাইরে বাংলা দেশকে দেখতে এসেছিল। এই চার-পাঁচটা দিনেই মনে হচ্ছে, কী দেখব—কী আর দেখবার আছে ? মাঠ-ঘাট, পুকুর-গাছপালা। পাইকারী বাজারে তরী-তরকারীর স্তূপ। ছুটো চালের কল। কালী-বাড়ি, সিনেমা হাউস। নিয়োগীপাড়ার পথের দুধারে এককালের বনেদী বাড়িগুলোর ধ্বংসাবশেষ। আর কিছু নেই। কিছুই না।

একটানা দিন—একই রকম রাত্রি। নিয়োগী বাড়ির পুরোনো গন্ধ, মেজদার পোড়ো মহলে পায়রার আস্তানা, পাশের জংলামতন বাগানটায় বানরের আনাগোনা। ব্যতিব্যস্ত শশাঙ্ক কাকা। ধান-টানের কী সব হিসেব-পত্র করেন, কখনো সকালে—কখনো বিকেলে একদল চাষীর সঙ্গে কী নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চালান—কখনো সদরে যান, কখনো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান। রাত্রে খেতে বসবার সময় ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর দেখাই হয় না।

'কোনো কষ্ট হচ্ছে না বাবাজী ?'

'আজ্ঞে না—না, কষ্ট কিসের ?'

'আর এ তো তোমার নিজেরই বাড়ি। কষ্ট হলেই বা করছ কী ?'

ঠিক একইভাবে কাকিমার সজাগ দৃষ্টি জেগে থাকে।

'আর একটুকরো মাছ নাও বাবা, আর চারটি ভাত দিই।'

'মাপ করবেন. খেতে পারব না।'

'এরকম খেলে শরীর ভালো থাকবে কী করে ?'

'আমার শরীর খুব ভালোই কাকিমা। কখনো অসুখ করে না।'

সব এক নিয়মে, একটানা চলে। মুনু আসে তার জলখাবার নিয়ে। মিগাঙ্কুমার অর্থাৎ বুড়ো এসে গম্ভীর মুখে ঘরের মধ্যে দাঁড়ায়। জানায়, তার একটা হাতি আছে।

'তাই বুঝি ?'

'হু।'

'ডাকে ?'

'হু। ম্যাও-ম্যাও করে ডাকে।'

ওর ছোট্ট দিদিটি ঘর ভরে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

'জানেন, বুড়ো ভীষণ বোকা। ও একটা বেড়ালকে হাতি বলে। বেড়ালের ল্যাজটা

নাকি হাতির শুঁড়। হি-হি-হি—'

এই বাড়ি—এই জীবন। যে-কোনো গৃহস্থবাড়ির সঙ্গে, তার ছোটখাটো সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সঙ্গে এক হয়ে আছে, কোনো বিশেষত্ব নেই, কোনো আলাদা রূপ নেই। মিথ্যেই কতগুলো ছায়া তৈরী করেছিল প্রথম দিনের সেই রিকশওলা, ডাক্তার প্রভাকর। হয়তো শশাঙ্ক কাকা গ্রামের টিপিক্যাল মিস্টার ব্যাড্‌ম্যান, মামলাবাজ, লোককে ঠকান, গ্রাম্য রাজনীতিতে বিশারদ, কিন্তু বিকাশের তাতে কী আসে যায়। সে তো কোনোদিন ভিলেজ-পলিটিক্‌স্ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে না।

এ বাড়িতে অপমৃত্যু আছে, পাপ আছে। কোথায় নেই? কলকাতার একটা ফ্ল্যাটে কেউ রাতে ধর্মগ্রন্থ পড়েন, তার পাশের ফ্ল্যাটে জুয়ার আড্ডা চলে। এক-বাড়ির একতলায় বেআইনী নারীমাংসের ব্যবসা, আর একতলায় সীমন্তিনীর শান্ত সংসার। এক ঘরে যখন কেউ রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তন্ময় হয়ে যায়, তখন আর এক ঘরে হত্যাকাণ্ড ঘটে। শশাঙ্ক কাকার বাড়ির একটা ঝাপসা ইতিহাস নিয়ে—

'নমস্কার মশাই।'

বিকাশ মাথা তুলল। মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক। চোখে চশমা, মুখে গোঁফ। গায়ে গরম কোট, গলায় ভাঁজ করা গরদের চাদর।

'আমার নাম কুমুদ সেনগুপ্ত। এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার।'

'বসুন—বসুন।'

মুখোমুখি চেয়ারটায় বসলেন ভদ্রলোক। একটা ফোলিও ব্যাগ খুলে, কী যেন খুঁজতে লাগলেন। একবারের জন্যে সুনুর কথাটা মনে পড়ে গেল বিকাশের। ইনিই কী সুনুর মেজ জ্যাঠার কাছে লাইব্রেরির জন্যে ইতিহাসের বই চাইতে গিয়েছিলেন? তারপর তাড়া খেয়ে—

একটা ছেলেমানুষি কৌতুক অনুভব করল বিকাশ। এইরকম একটি সম্মানিত আর গম্ভীর মানুষ পাগলের তাড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে, দৃশ্যটা কল্পনা করা যায়?

ব্যাগ হাতড়ে ব্যাঙ্কের পাস বই বের করলেন হেডমাস্টার।

'এটা একটু আপ-টু-ডেট করে দিতে হবে। ইমিডিয়েট। কাল পাব?'

'দেখছি। প্রদীপবাবু?'

অল্পবয়েসী প্রদীপ মুস্তফি উঠে এল।

'পাশ-বইটা ঠিক করে দেবেন। কালকের মধ্যেই। হবে না?'

'হবে স্যার।' পাশ বই নিয়ে প্রদীপ চলে গেল।

কুমুদবাবু বললেন, 'আপনিই তো নতুন এসেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনচারেক হল।'

'এর আগে প্রেমানন্দ ছিল। আমার ছাত্র সে।'

'আমিও আপনার ছাত্র হতে পারতুম।'

'নিশ্চয়। প্রেমানন্দের চেয়েও তো বয়েসে ছোট আপনি। কোন্ সালের গ্র্যাজুয়েট ?

পাসের বছরটা জানালো বিকাশ।

'ওঃ—এই সেদিন ?'—হেডমাস্টার বললেন, 'একদম বাচ্চা।'

'আজ্ঞে সাতাশ বছর হল।'

'ও আবার বয়েস নাকি ? ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষ। আছেন কোথায় ?'

বিকাশ শশাঙ্ক কাকার নাম করল। এবং—এবং সেই অবধারিত ছায়া দেখা দিল কুমুদ সেনগুপ্তের কপালে।

'আত্মীয় ?'

'না—সেরকম কিছু নয়। চেনা বলে ক'দিনের জন্যে উঠেছি—' যেন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল বিকাশ: 'একটা বাসা খুঁজছি।'

একটু চুপ করে থেকে হেডমাস্টার বললেন, 'প্রদ্যোৎবাবুকে দেখেছেন ?'

প্রদ্যোৎবাবু ? বিকাশ আশ্চর্য হল: 'না, তাঁকে তো—। কে তিনি ?'

আরো আশ্চর্য হলেন হেডমাস্টার: 'শশাঙ্কবাবুর সেই দাদা ? যাঁর মাথা খারাপ ?'

তাহলে মেজদা। অদ্ভুত লাগল প্রথমটায়। ওই মানুষটারও প্রদ্যোতের মতো একটা কুলীন জাতের নাম থাকতে পারে এ যেন বিশ্বাসই হয় না। বিকাশ বললে, 'হ্যাঁ তাকে দেখেছি। নামটা জানতুম না।'

'ভাবতে পারবেন না, লোকটা কী স্কলার ছিল। লাখে একটা মানুষ পাবেন না—যার এমন পড়াশুনো। কিন্তু ওরা শেষ করে দিলে লোকটাকে। দোজ হাউণ্ডস্।'

আবার সেই দুর্বোধ রহস্যের আভাস। বিকাশ অস্বস্তি বোধ করল।

'আজ্ঞে, আমি শুনেছিলুম, গাঁজা খেয়ে—'

'ইয়েস ইয়েস, গাঁজা। সে দোষ ছিল। বাট্ ইট'স্ অনলি এ প্লি। তারপর জালে ফেলে—' হেডমাস্টার যেন এখানকার সকলের মতো—একই নিয়মে, একই জায়গায় এসে থেমে গেলেন: 'যাক, ছেড়ে দিন ওসব কথা।'

বিকাশ চুপ করে রইল। হেডমাস্টারের কপালে ছায়া। প্রদ্যোৎবাবুর কথাই ভাবছেন খুব সম্ভব।

একটু পরে হেডমাস্টার আবার বললেন, 'স্পোর্টস-টোর্টস আসে আপনার ?'

বিকাশ হাসল: 'অভ্যেস ছিল একসময়।'

'হুঁ—চেহারায় অ্যাথ্‌লীটের ছাপ আছে।'

'সেটা জানি না। কিন্তু এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'স্কুলের স্পোর্টস্ রয়েছে পরশু। আসবেন আজ হয়ে?'

তবু বৈচিত্র্য। একটানা একঘেয়ে জীবনের ভেতরে একটা প্রসন্ন উজ্জ্বল দিন। ছাত্রজীবনের স্মৃতি। দু-একটা কাপ-মেডেল পাওয়ার উদ্ভাসিত মুহূর্তগুলো।

বিকাশ বললে, 'নিশ্চয়, আসব বইকি।'

'আচ্ছা, গিয়েই আমি কার্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার নামটা এখনো—'

'বিকাশ। বিকাশ মজুমদার। কিন্তু আমাকে তুমিই বলতে পারেন। আমি প্রেমানন্দবাবুর চাইতেও বয়েসে ছোট।'

স্কুল-মাস্টারের প্রসন্ন হাসিতে কুমুদ সেনগুপ্তের মুখ ভরে উঠল: 'আচ্ছা, সে হবে। অল্পবয়সীদের তুমি বলা এমনিই অভ্যাস হয়ে গেছে যে আপনি বলতেই বরং বাধো বাধো ঠেকে। তা হলে রবিবার সকালে তুমি আসছ স্কুলের মাঠে। চেনো তো?'

'চিনি। স্টেশনের রাস্তায়।'

'ঠিক।' হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন: 'তোমাকে দেখে ভারী ভালো লাগল। উঠি আজ।'

হেডমাস্টার চলে যাওয়ার পর আবার মেজদার ভাবনায় মনটা ফিরে গেল বিকাশের। তা হলে শশাঙ্ক নিয়োগী শুধু মামলাবাজ চতুর বলে নয়—তাঁর সম্পর্কে যা কিছু নিন্দা, যা কিছু আতঙ্ক—সব ওই একটি মানুষকে ঘিরে—সে প্রদ্যোৎ নিয়োগী। কতগুলো নোংরা চক্রান্ত, বিশ্রী লোভ—ওই নিয়োগী বাড়ির অন্ধকার কোণায় কোণায় লুকিয়ে আছে—ওখানকার সমস্ত বাতাসটাকে আবিল করে তুলেছে।

কিন্তু তাই যদি, তা হলে অত পবিত্র কেন সুমুর মুখ? কেন সেই মুখে স্বর্গের আলো জলে? সেই বুড়ো—তার ছোট দিদিটি—তাদের ওপরে কেন এতটুকুও আভাস পড়েনি তার?

মেজদা!

বিকাশের মনে পড়ে গেল, সেই রাত্রিটা—যেদিন সে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিল প্রভাকরের ওখান থেকে। ঝিঁঝির ডাক, কুয়াশায় জড়ানো গাছগুলো, নির্জন পথটা পুকুরের পাশ দিয়ে, নারকেল গাছের পাতায় হাওয়ার শব্দ। হঠাৎ—মেজদা!

'এই দাঁড়া।'

রক্ত চমকে উঠেছিল একবারের জন্যে। জটা-বাঁধা চুল আর গোঁফদাড়ির ভেতরে মেজদার চোখ দুটো জলছিল।

কিছু বলতে চেয়েছিল বিকাশ, কথা ফোটেনি। ভয়ে জিভ জড়িয়ে গিয়েছিল তার।

মেজদাই কথা শুরু করেছিল। ঝুঁকে পড়েছিল তার মুখের ওপর।

'বাড়িতে হঠাৎ বেহালার সুর শুনতে পাচ্ছিলুম। তুই বাজাচ্ছিলি, তাই না?'

তখনো কথা বলতে পারল না বিকাশ। মাথা নাড়ল কেবল।

'বেহালা বাজাসনি কখনো। খুব খারাপ।'

'কেন খারাপ?' এতক্ষণে স্বর ফুটল বিকাশের।

'বেহালা ভালো করে বাজাতে গেলে মানুষ খুন করতে হয়।'

'সে কি!'

'পাগানিনি কে জানিস? পাগানিনি?'

জড়ানো গলায় বিকাশ বললে, 'শুনেছি নামটা।'

'খুব দুর্দান্ত বাজিয়ে ছিল। বিশ্ববিখ্যাত। যখন বাজাত, তখন কী হত জানিস? তার বেহালা থেকে ঠিকরে বেরুত জ্যান্ত মানুষের কান্নার স্বর, তার দীর্ঘশ্বাস, তার বুকফাটা হাহাকার। যারা শুনত, ভয়ে হিম হয়ে যেত তাদের বুক, মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকত—নড়তে পারত না, একটা নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারত না, ভূতে পাওয়ার মতো বসে থাকত সবাই—মেয়েরা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যেত। কেন এরকম হত, জানিস তুই—জানিস?'

তেমনি অস্পষ্ট গলায় বিকাশ বললে, 'না।'

'ওই লোকটার বেহালার তার কী দিয়ে তৈরী ছিল—জানিস, দুটো মেয়ের বুকের শিরা ছিঁড়ে। সেই মেয়ে দুটো ওকে ভালবাসত। লোকটা তাদের একে একে খুন করল। তারপর তাদের শিরাগুলো উপড়ে নিয়ে জুড়ে দিলে বেহালায়। তারপর থেকে ও আর বেহালা বাজায় না—বাজায় পিশাচে। সেই বাজনায় আছড়ে পড়ে দুটো মেয়ের কান্না, তাদের যন্ত্রণা, তাদের দীর্ঘনিশ্বাস। পারবি ও-রকম করে বাজাতে? তা হলে তোকেও খুন করতে হবে। পারবি, কাউকে ভালোবাসিস? তাকে খুন করে—'

শুনতে শুনতে বিকাশের হৃৎপিণ্ড জমে গিয়েছিল। চেঁচিয়ে বলেছিল, 'থামুন।'

'তোর কিচ্ছু হবে না—তুই একটা ইডিয়ট!'

তারপরেই আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল লোকটা।

আরো কিছুক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল বিকাশ। পাগলের কথা—হয়তো সম্পূর্ণ বানানো। হয়তো এমন একটা কাহিনী থাকতে পারে, বড়ো বড়ো শিল্পীদের নিয়ে এ-রকম অলৌকিক গল্প তো অনেক গড়ে ওঠে, যেমন মহামানবদের নিয়ে তৈরী হয় আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত।

কিন্তু একটা জিনিস বোঝা গিয়েছিল। লোকটা সাধারণ নয়। পড়াশোনা করত। তারপর গাঁজার চর্চা। সব মিলে একটা বিকৃত জগৎ তৈরী করে নিয়েছে নিজের ভেতর।

বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথার মধ্যে অদ্ভুত গল্পটা ঘুরছিল। ঘরে আলোর সেই একটুখানি আভাস। বেহালার তারগুলো জ্বলছিল। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—নিতান্তই ধাতব। তার পাগানিনি হয়ে দরকার নেই।

'আমার গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে, গোধূলি লগন রে—'

'স্যার—'

বেয়ারা। আবার কতগুলো কাগজপত্র। চেক করে সই দিতে হবে।

বিকাশ ক্লান্তভাবে লাল পেনসিলটা তুলে নিলে।

•

রাত্রে খেতে বসে শশাঙ্ক কাকা কথাটা তুললেন।

'এসব কী শুনছি হে?'

প্রশ্নের ভঙ্গিতে বিকাশ একটু বিব্রত বোধ করল: 'আমাকে কিছু বলছেন?'

'হাঁ—হাঁ, তোমাকে। তুমি নাকি বাসা খুঁজছ?'

বিকাশ সংকুচিত হল: 'কে বললে আপনাকে?'

'আরে এখানে কোন্ খবরটা চাপা থাকে আমার কাছে?'

ঠিক কথা। শশাঙ্ক নিয়োগী সম্পর্কে জনশ্রুতি যদি সত্যি হয়, তা হলে কিছুই তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়।

'আজ্ঞে, আমি ভাবছিলুম—'

ভাতের গ্রাস গালে পুরে শশাঙ্ক মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন বিকাশের দিকে।

'কী ভাবছিলে?'

তীক্ষ্ণ, সন্ধানী চোখের দৃষ্টি। বিকাশ মাথা নামিয়ে নিলে।

'ভাবছিলুম, আপনাদের আর বিব্রত করা—'

'বিব্রত মানে?' শশাঙ্ক ভরামুখে বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা ছেলে হে! নিজের বাড়িতেও এ-রকম বিব্রত বোধ করো নাকি? আত্মীয়তা সোজাসুজি হয়তো নেই, কিন্তু তোমার বাবা—সেই শিবতুল্য লোক, তিনি যে উপকার আমাদের করেছেন সে আত্মীয়ের বাড়া। এ-সব পাগলামি মোটেই করবে না, এ বাড়ি ছেড়ে যেতে দেব না তোমায়।'

অনুরোধ? আত্মীয়তার দাবি? ভালোবাসা? না হুকুমের মতোই শোনালো? বিকাশ ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আচ্ছা।'

শশাঙ্ক কাকা বলে চললেন, 'একা মানুষ, বাসাটাসা করবার ঝামেলা পোয়াতে যাবে কেন আবার? তা ছাড়া এ যা জায়গা! বলেছি না তোমাকে? চোট্টা—সব চোট্টা! লোক রেখে দ্যাখো—চুরি করে কিছু আর রাখবে না। যদি বিয়ে-থা করতে, বৌমা সঙ্গে আসতেন, তা হলেও বা কথা ছিল।'

প্রিয়গোপালও তাই বলেছিলেন। স্ত্রী সঙ্গে থাকলে তবু বাসা করার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল তার পক্ষে। কলকাতার বাইরে বোধ হয় স্ত্রীর আঁচলের আশ্রয় ছাড়া মানুষের গতি-মুক্তি নেই!

কিন্তু মনীষা? সে আসবে? তাকে নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায় ছিনিয়ে আনা যাবে তার বিপন্ন সংসারের ক্ষুধিত মুখের কাছ থেকে? বলা যাবে, 'পৃথিবীতে সকলের ভাবনাই যদি ভাবতে হয়, আমাদের ভাবনা আমরা কখন ভাবব? মানুষের সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, তার মুখ চেয়েও কি আমরা এটুকু স্বার্থপর হতে পারি না?'

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'তুমি যে ভারী ভাবনায় পড়ে গেলে হে! তখন থেকে দেখছি, সমানে হাত গুটিয়ে বসে আছো। খাও—খাও। বাসা করার জন্যে এখনি এত ব্যস্ত হয়ো না—দরকার হলে পরে দেখা যাবে।'

'আজ্ঞে, আচ্ছা।'

ঘরে শুতে এসেও একটা সংশয় তার যাচ্ছে না। সে তো বেকার নয়। চাকরি করে, মোটামুটি একটা রোজগার তার আছে। এ বাড়ীতে থাকতে গেলে তাকে কিছু খরচ দিতে হবে। অন্তত দেওয়া উচিত। কিন্তু কত দেওয়া যায়? আর দিলে কি নেবেন শশাঙ্ককাকা? প্রস্তাব শুনলে অপমানিত বোধ করবেন না তো? আর টাকা নগদ না দিয়ে অন্যভাবে কি কিছু?

'বিকাশদা!'

বিকাশ চমকে উঠল। ঘরে সুমু।

'আজও মশারিটা না টাঙিয়ে শুয়ে পড়েছেন? তারপর কালকের মতো ঘুমিয়ে পড়বেন আর সারাটা রাত মশায় ছিঁড়ে খাবে—এই তো?'

'না, আজ আর ভুল হবে না। এখনি উঠে মশারি ফেলব।'

'আপনাকে বিশ্বাস নেই। মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দেখবার জন্যে—' অভি-ভাবকের ভঙ্গিতে সুমু এগিয়ে এল: 'আমি ফেলে দিয়ে যাচ্ছি।'

বিকাশ হেসে বলল: 'বাঁচালে। সত্যিই আলসেমি ধরে যাচ্ছিল।'

'সে আমি জানি—' গম্ভীরভাবে জবাব দিলে সুমু। তারপর মশারিটা ভালো করে ঝেড়ে নিয়ে গুঁজে দিতে শুরু করল। বিকাশ চোখ বুজে রইল। একটি কিশোরী শরীরের উপস্থিতি, তার শাড়ির ছোঁয়া, তার চুলের গন্ধ, চুড়ির শব্দ তাকে ঘিরে ঘিরে মিষ্টি একটা আমেজ সৃষ্টি করতে লাগল।

'বিকাশদা।' মুখের খুব কাছে চাপা মিষ্টি গলার ডাক। বিকাশ চোখ মেলল। ঘরের আবছা আলোয় সুমুর মাথাটা নুয়ে পড়েছে তার কাছে। চোখ দুটি জ্বলছে তারার মতো। যেন চকিতে একাকার হয়ে গেছে মনীষার সঙ্গে। বিকাশের রক্তে দোলা লাগল একটা।

সুস্থ বললে, 'বিকাশদা, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আমার খুব কষ্ট হবে তা হলে।'

আবছা গলায়—নেশায় আবিষ্ট হয়ে বিকাশ বললে, 'না, যাব না।'

শাড়ির ছোঁয়া, চুলের গন্ধ, শাড়ির শব্দ মশারির বাইরে চলে গেল। তেমনি চোখ বুজে বিকাশ শুনল সুস্থুর সুরেলা গলা : 'দরজাটা ভেজিয়ে দিলুম, উঠে বন্ধ করে দেবেন কিন্তু।'

আট

তবু এরই ভেতরে রবিবারের দিনটা অন্য স্বাদ আনল।

অনেক বছর পরে স্পোর্টস অফিশিয়াল হয়ে যেন খেলাধুলোর সেই সব স্মৃতির মধ্যে ফিরে এল বিকাশ। এখানে এসে মনীষাকে একটা চিঠি দিয়েছিল, কাল পর্যন্ত তার জবাব পাওয়া যায়নি—আজ সকালেও সেজন্যে মনটা বিষণ্ণ হয়ে ছিল। আরো সুস্থুকে দেখলেই তার ক্রমাগত মনে পড়ে যাচ্ছিল মনীষার কথা। এই দুটি মেয়ের ভেতরে কোথাও এত-টুকু মিল নেই। না বয়সে, না পরিবেশে, না ভাবনায়। তবুও যেন কোন্‌খানে একটা অদৃশ্য যোগ আছে দুজনের ভিতরে। একটা অন্ধকার চাকার সঙ্গে এদের দুজনকেই বেঁধে দিয়েছে কেউ ; নিরুপায়ভাবে ঘুরে চলেছে, বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

মনীষা ক্লান্ত। জীবনের দাবীর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে আরো নির্জীব, আরো নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে—কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটো যেন ছায়ার মধ্যে তলিয়ে যায়। সুস্থু কেবল ফুটে উঠতে শুরু করেছে, তবু কেমন যেন মনে হয়, তার পাপড়িতেও কোথায় বিবর্ণতার আভাস।

নিয়োগী বাড়ি নয়, মেজদা নয়, পাগানিনি না কার সম্পর্কে সেই ভুতুড়ে গল্পটাও নয়। মানুষ ভালোয়-মন্দে-মাঝারিতে ছককাটা—শশাঙ্ক নিয়োগী যদি গ্রাম্য ধূর্ততার সাক্ষাৎ অবতার হয়েই থাকেন, তাতেই বা তার কী আসে যায়। শশাঙ্ক কাকাকে যদি কখনো জেলে যেতে হয়, যদি শত্রুপক্ষ কখনো ফাঁক পেয়ে লাঠিপেটা করে তাঁকে—বিকাশ বিচলিত হবে না ; আর প্রতিশোধ নেবার জন্যে যদি শশাঙ্ক কাকা পাল্টা কারুর গোয়ালের খড়ের চালায় আগুন ধরিয়ে দেন তাহলে যাদের বোঝবার তারাই বুঝবে—সে নয়।

কলকাতায় শব্দের ঢেউ। ট্রাম-বাস-মোটরগাড়ি—মাথার ওপর জেটপ্লেনের যাওয়া-আসা, আরও অনেক, অনেক এক সঙ্গে মিলে মনে হয়—অসংখ্য দাঁতে দাঁতে ঘষার মতো আওয়াজ উঠছে। উঠুক। কলকাতা তো অরণ্যের মন্ত্র জপে—'কিল অর্ বী কিল্‌ড'। মধ্যে মধ্যে মিছিলের ঝড়ে আর এক শপথ নেয় জীবন। চলুক সংগ্রাম, হয়ে যাক বোঝা-

পড়া। কিন্তু গ্রামেই হোক, অন্য কোনো শহরেই হোক কিংবা কলকাতাতেই হোক—এই সব বিদ্বেষে, ঝড়ে, হিংস্রতায় কতগুলো ফুলের মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যু নামে মনীষাকে ঘিরে, তার ছায়া পড়ে সুবর্ণাদের ওপর। এই ক্ষতিটার দিকে চোখ পড়ে না—ঝড়ের ভেতরে এরা সব কোথায় হারিয়ে যায়। বিকাশও লক্ষ্য করত না। মনীষার জন্যে যেটুকু তার বেদনা—সেটা ছিল একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু আজ সুনুর দিকে তাকিয়ে মনে হল, আকাশের আলোগুলোকে নিবিয়ে দিলে সূর্যমুখীরাই ঝরে যেতে থাকে। মনীষা-সোনালি—আরো-আরো অনেকে।

এই রকম একটা আচ্ছন্ন বিমর্ষ মন নিয়ে স্কুলের স্পোর্টসে এসেছিল বিকাশ। কিন্তু চমৎকার কাটল বেলাটা। আকাশ শীতের রোদে জ্বলজ্বলে, এক কোণায় সোনালি পাড়-দেওয়া এক টুকরো মেঘ আছে কিংবা নেই, বেলা উঠলেও ঘাসের আড়ালে শিশিরের ছোঁয়া। মাঠের পাশে এক সার কুল গাছের গায়ে স্বর্ণলতার জাল-বোনা। রোদের আকাশে পায়রার লুটোপুটি।

ইভেন্টগুলো শুরু হতেই সব ভুলে গেল বিকাশ। উত্তেজনা, কৌতূহল। থানার ও-সি তাঁর রিভলভারে ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ার করে স্টার্ট দিচ্ছেন। ছেলেদের কোলাহল—জয়ধ্বনি। 'সাবাস—শিবে সাবাস!'

'আবদুল, আরো-আরো জোরে—'

মাঝখানে একটু ব্রেক। চা খাবার। তারপর আবার শুরু। সারা হল ডিজগাইজ দিয়ে। একটি লম্বা ছেলে বেমালুম কাবুলীওলা সেজে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে গেল।

স্কুলের প্রেসিডেন্ট কানাই পাল সভাপতি। তিনিই পুরস্কার-বিতরণ করলেন।

পয়সাওলা গ্রামের ব্যবসায়ী—বিকাশ এই পর্যন্ত ভেবে রেখেছিল কানাইবাবু সম্পর্কে। কিন্তু দেখল, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কানাইবাবু বেশ গুছিয়ে বক্তৃতা করতে পারেন।

খুব বেশি কিছু যে বললেন তা নয়। কিন্তু মুন্সিয়ানা ছিল।

'দেশে আমরা ভালো ছেলে নিশ্চয়ই চাই। তারা ডাক্তার হোক, ইনজিনীয়ার হোক, বৈজ্ঞানিক হোক, শিল্পপতি হোক, অধ্যাপক হোক, আই-এ-এস হোক। কিন্তু তারও আগে চাই স্বাস্থ্য। শরীরের বনেদ শক্ত না থাকলে কোনো প্রতিভাই ফুটতে পায় না। একজন ঘাড়কুঁজো ভালো ছাত্রের চাইতে লেখাপড়ায় মাঝারি একজন স্পোর্টসম্যান বা অ্যাথলীট জাতির গৌরব বাড়াতে পারে। তাই স্বামীজী বলেছিলেন—'

অর্থাৎ কানাইবাবু সব দিক থেকেই বেশ বিচক্ষণ লোক। গ্রামের ব্যবসায়ী হলেও নিছক ধান-চালের হিসেবই রাখেন না। বিবেকানন্দের উক্তিটা নির্ভুলভাবেই দিলেন মনে হল।

হেডমাস্টারমশাই ইংরিজিতে ধন্যবাদ জানালেন সকলকে—বিজয়ী ছাত্রদের অভি-

নন্দন জানালেন। যারা এবারে সফল হল না তাদের অনুপ্রাণিত হতে বললেন, তারপরে অনুষ্ঠান শেষ হল।

বিকাশকে হেডমাস্টার বললেন, 'খুব খুশি হয়েছি—ডাকলে মাঝে মাঝে আসতে হবে।'

'আসব।'

ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে বিকাশ থেমে দাঁড়ালো। এখনই বাড়ি ফেরা? নিয়োগী বাড়ি নয়, বেলাশেষের ছায়ায় ওই বিমর্ষ পথটার কথা ভাবতেই মন কুঁকড়ে এল তার। প্রভাকরের ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া যায়? কিন্তু ব্যস্ত ডাক্তারকে এখন বাসায় পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। আর নইলে প্রিয়গোপালবাবুর বাড়িতে—

পাশে একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেল।

'এই যে বিকাশবাবু।'

ফিরে তাকালো। গাড়িতে কানাই পাল। নিজেই চালাচ্ছেন—স্কুলের অনুষ্ঠান সেরে বেরিয়ে এলেন।

'কোথায় চললেন? বাড়ির দিকে?'

'তাই ভাবছি।'

'খুব জরুরি তাড়া আছে কিছু?'

'আজ্ঞে না—সে-রকম কোনো—'

'আসুন তা হলে—' কানাইবাবু গাড়ির দরজা খুলে ধরলেন: 'আসুন।'

'আমি বরং হেঁটেই—'

কানাইবাবু হাসলেন।

'চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। আমাদের এখানে তো আপনি নতুন—জায়গাটার আশপাশ কিছুই দেখলেন না। একটু দেখিয়ে আনি।'

কিরকম মনে হল যেন এখন। কানাইবাবু উঁচু দরের জীব, ব্যতিব্যস্ত, এস. ডি. ও. এলে তাঁকে আগে ডেকে পাঠান, মন্ত্রীরা এদিকে এলে তাঁর অতিথি হন। তিনি যে বিকাশের মতো সামান্য একজন ব্যাঙ্কের কর্মচারীকে লিফ্‌ট দেবেন—বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইবেন—ঠিক বিশ্বাস হতে চাইল না।

কানাইবাবু বললেন, 'আসুন—আসুন।'

অগত্যা। অস্বস্তি বোধ করেও উঠে পড়তে হল গাড়িতে। তার ব্যাঙ্কের যিনি সব চাইতে বড়ো পেট্রন, তাঁর আদেশ উপেক্ষা করা যায় না। সকলকে খুশী রাখাই তাদের কাজ।

পাশে সভাপতির মালাছড়া রাখা ছিল, কানাইবাবু সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পেছনের

সীটে। গোলাপের কয়েকটা শুকনো পাপড়ি উড়ে পড়ল এদিকে-ওদিকে।

গাড়ি স্পীড নিল। সাইকেল-রিকশা, বাস, গোরুর গাড়ি, মানুষ, দোকানপাট পেছনে ফেলে প্রভাকরের হাসপাতাল পাশে রেখে ছাড়িয়ে এল লোকালয়ের ভীড়। গাছপালার মাথায় আর জলার জলে ঝিকমিক করতে লাগল বেলাশেষের রঙ।

বিকাশ লক্ষ্য করল, গাড়ি চালাতে চালাতে কানাইবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। তাকে যে তুলে নিয়েছেন সে-কথা যেন ভুলেই গেছেন আপাতত।

একটা মোষের গাড়ি রাস্তার মাঝখান দিয়ে ঝিমুতে-ঝিমুতে চলছিল; সেটার উদ্দেশে হর্ন বাজিয়ে যেন জেগে উঠলেন কানাইবাবু।

'জানেন, এই গাড়িটা মধ্যে মধ্যে ছুটি দেয় আমাকে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' বিকাশ সায় দিলে বোকার মতো।

'কাজ-কাজ-কাজ। সবটাই একার ওপর। মধ্যে মধ্যে বিরক্তি ধরে যায়।' বিকাশকে উপলক্ষ করে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চললেন কানাই পাল: 'তখন বেরিয়ে পড়ি গাড়িটা নিয়ে। যতদূর ইচ্ছে হয়, ছুটে যাই। মাথাটা ঠাণ্ডা হয় একটু—কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।'

'আজ্ঞে রেস্ট তো দরকার।'

'রেস্ট ?' কানাই পাল হাসলেন: 'না—রেস্ট আমার নেই। আপনি হয়তো জানেন না—আমি বড়লোকের ছেলে নই। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন কুমোর, হাঁড়ি-কলসী গড়তেন—মূর্তি-টুর্তিও তৈরী করতেন। বাবা এক-আধটু ব্যবসা শুরু করেছিলেন, সেও এমন কিছু নয়। আমি দাঁড়িয়েছি নিজের পায়ে। রেস্টের কথা যদি ভাবতুম, তা হলে অনেক আগেই থেমে যেতে হত।'

'কিন্তু এখন তো—'

'অনেক টাকা হয়েছে, তাই বলছেন ?' কানাই পাল হাসলেন: 'অনেক কিনা জানি না, তবে গরিব নই। অথচ জানেন—এ-ভাবে টাকা করবার কথা আমি ভাবিইনি। লেখা-পড়া শিখে আমিও ডাক্তার-প্রোফেসর কিংবা ইনজিনীয়ার গোছের কিছু হতে চেয়েছিলুম। পড়াশুনোয় বোকা ছিলুম না মশাই, ম্যাট্রিকে আমি ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলুম।'

'আজ্ঞে, প্রতিভা না থাকলে আর—'

'প্রতিভা—প্রতিভা।' কানাইবাবু যেন শব্দটাকে একবার নাড়াচাড়া করে নিলেন: 'কিছু না মশাই, ও-সব কিছু না। জেদ, শুধু জেদ। যেন খুন চেপে গেল হঠাৎ।'

বিকাশ আশ্চর্য হল: 'খুন চেপে গেল ?'

'কলকাতায় কলেজে পড়তুম মশাই। সহপাঠী ছিল কোন্ এক জমিদার-বাড়ির

ছেলে। গাড়ি চেপে আসত। এক পাড়াতেই থাকতুম। একদিন দারুণ বৃষ্টি—ভিড়ে ট্রামে-বাসেও উঠতে পারছি না। পাশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। বললুম, তুলে নে। উত্তর এল : তোর ওই ভিজে কাপড়-জামা দিয়ে গাড়ির সীটটা নোংরা করি আর কি'। গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মশাই। হঠাৎ আগুন ধরে গেল মাথার মধ্যে। অনার্স নিয়ে বি-এস্-সি পড়ছিলুম, দিলুম ছেড়ে।'

গাড়ির স্পীড নব্ব্ুই কিলোমিটারে পৌঁছুল। হু-হু করছে হাওয়া। আসন্ন সন্ধ্যার পথ-ঘাট ছুটে যাচ্ছে দু পাশ দিয়ে। কানাইবাবুর কথাগুলো ভেঙে ভেঙে কানে আসতে লাগল বিকাশের।

'লাগলুম ব্যবসার কাজে। বাবা ক-দিন চেঁচিয়ে থেমে গেলেন, বুঝলেন—আমি খুব কাঁচা কাজ করছি না। উঠতে লাগলুম। সবটাই খুব অনেস্টলি করেছি বলব না—সাধু হলে বিবেক নিশ্চয় পরিষ্কার থাকে, কিন্তু উন্নতির রাস্তাটা অত তর-তর করে তৈরী হয় না। এখন —'

কানাইবাবু থামলেন। এখনকার কাহিনী আর না বললেও চলে—সে তো চোখের সামনেই রয়েছে। একটু চুপ করে থেকে কানাইবাবু বললেন, 'সেই জমিদার-নন্দনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল মশাই—বছর চারেক আগে। জমিদারী গেছে। কলকাতায় খান-কয়েক ভাড়াটে বাড়ি, তাও চার শরিকে ভাগাভাগি। বড়লোকের দুলাল মশাই, ভালো খেয়ে-দেয়ে-ঘুমিয়ে মোটা হওয়ার অভ্যেস—তাই কাজকর্মে আর এগোতে পারেনি। ওই বাড়িভাড়ার টাকা নাড়াচাড়া করেই কষ্টেস্রষ্টে চলে। তাও আর বেশিদিন চলবে না—গলায় কালোয়ারদের দেনার ফাঁস। একটা ত্রিশ বছরের পুরোনো ঝরঝরে অস্টিন দেখলুম—আধ ঘণ্টা মেহনৎ করলে স্টার্ট নেয়। আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াবার খুব চেষ্টা করেছিল, রাজী হইনি।'

শুকনো হাসি হাসলেন একটু। স্টীয়ারিংয়ের ওপর বাজনার ভঙ্গিতে আঙুলগুলো খেলা করল একবার। বললেন, 'এখন এখানে আর কলকাতায় মিলিয়ে আমার তিনটে কার, চারটে লরী, দুটো জীপ। আরো বাড়াতে পারি। কিন্তু কী হবে!'

প্রতিশোধ? বিকাশ ভাবল। তবে নিজেরও এ-রকম একটা অহংকারী বন্ধু থাকলে মন্দ হত না বোধ হয়। কে জানে—সেও তা হলে জেদ করে আজকে কানাইবাবুর মতো বড়লোক হয়ে উঠত কিনা।

গাড়িটা থামল। এদিকে পথে আলো নেই—রাস্তার ওপর অন্ধকার নামছে, ঝোপ-ঝাড়ের গায়ে ধোঁয়াটে শীত জড়ানো। কানাইবাবু প্রসঙ্গ বদলালেন। ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওটা দেখছেন?'

একটা অন্ধকার মন্দিরের মতো দেখা যায় খানিক দূরে। কয়েকটা তার চুড়ো। গা

বেয়ে গাছ উঠেছে এখন—হাওয়ায় দুলছে ডাল-পাতা।

কানাইবাবু বললেন, 'খুব পুরোনো মন্দির মশাই। সেই যে নবরত্ন না কী বলে, তাই। ইটে অনেক কারুকাজ ছিল। বিগ্রহ-ফিগ্রহ আর নেই, কালাপাহাড় নাকি ভেঙে দিয়ে গেছে। একবার দিনের আলোয় এসে দেখবেন, আপনার এ সবে ইন্টারেস্ট থাকলে ভালোও লাগতে পারে। তবে এখন আর যাওয়া যাবে না—ভয়ঙ্কর কাঁটার জঙ্গল।'

'আচ্ছা, বেলাবেলিই আসব কোনোদিন।'

'আমিই নিয়ে আসব আপনাকে। একটা বড় দীঘিও আছে ওধারে, আর পীরের দরগা। দরগাটা আমার বেশ লাগে মশাই। পুরোনো বটগাছ—ছায়া ছায়া, ভারী নির্জন। আমার যখন খুব ক্লান্তি লাগে, তখন একা পালিয়ে এসে দরগাটার কাছে বসে থাকি। অনেকক্ষণ ধরে।'

আবার স্টার্ট দিলেন গাড়িতে।

'কিছু না মশাই, কিছু না। টাকা নয়, পয়সা নয়, মোটরগাড়ি নয়। কখনো কখনো ইচ্ছে করে—যেমন ঠাকুর্দাকে দেখতুম—এক মনে মূর্তি গড়ছেন—যেন ধ্যান করছেন সেই দিকে তাকিয়ে, ইচ্ছে করে সেইভাবে—সব ফেলে দিয়ে আমিও মূর্তি গড়ি বসে বসে। অনেক সুখ আছে তাতে। আসলে তো কুমোরের ছেলে মশাই, রক্তটা যাবে কোথায়?'

কানাইবাবু প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছেন। সব কাজ ফেলে—এই গাড়িটাকে নিজের মনে ছুটিয়ে দিয়ে আজ তাঁর মুক্তি। কিছুটা স্বপ্ন দেখা, বাঁধা হিসেবের বাইরে নিজেকে অন্য-ভাবে খানিকটা দেখা। হয়তো ক্লান্তি বোধ করছেন, হয়তো খানিক স্বপ্নবিলাস। বিকাশকে সঙ্গে তুলে নিয়েছেন শুধু উপলক্ষ হিসেবে। কেবল নিজের কথাগুলো বলবার জন্যেই।

গাড়িটা এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় পীচের রাস্তা ছেড়ে একটা মেঠো রাস্তায় বাঁক নিলে। কানাইবাবু বললেন, 'কোথায় যাচ্ছি জানেন?'

'না।'

'আমার আর একটা ছোট আস্তানা আছে এখানে। বাগানবাড়ি কিংবা খামারবাড়ি যা খুশি বলতে পারেন। সেইখানে গিয়ে আপনাকে চা খাওয়াব।'

'কিন্তু—' বিকাশ বিব্রত বোধ করল: 'আমার তো এখন চা খাওয়ার দরকার নেই।'

কানাইবাবু বললেন, 'আপনার দরকার নেই, আমার আছে। চলুন।'

গাছপালা আছে, পুকুর আছে, ফুলের বাগান রয়েছে। মাঝখানে বাংলো-ধরনের একতলা বাড়ি। গেটের মুখে গাড়ির আলো পড়তেই দুজন লোক ছুটে এল ব্যতিব্যস্ত

হয়ে—দরজা খুলে ধরল। খানিকটা কাঁকর মাড়িয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল বাংলোর সামনে।

কানাইবাবু বললেন, 'আলো জেলে দে—বদর।'

চঞ্চলতা দেখা দিল কিছুক্ষণের মধ্যে। দুজনে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। বাতাসে ফুল আর শিশিরের গন্ধ। ঠাণ্ডা আকাশে ঝকঝকে তারার ভিড়।

কানাইবাবু বললেন, 'এ আমার আর একটা পালাবার জায়গা।' যেন বুক ভরে বাতাস টেনে নিলেন অনেকখানি।

বিকাশ আস্তে-আস্তে বললে, 'তা হলে আমাকে সঙ্গে করে আনলেন কেন? আপনি একা থাকতে চাইছিলেন।'

'সব সময়ে নয়।' আবছা অন্ধকারে একটা গোলাপ-ঝাড়ের ওপর ঝুয়ে পড়লেন কানাইবাবু, একটা ফুটন্ত ব্ল্যাক প্রিন্সকে তুলে দেখলেন একবার: 'কখনো কখনো অন্তরঙ্গ কেউ কাছে থাকলে ভালো লাগে।'

অন্তরঙ্গ? বিকাশ ভুরু কোঁচকালো। এই ভদ্রলোকের অন্তরঙ্গ সে কোন্ সুবাদে? প্রথম দেখা সেই কদিন আগে ব্যাঙ্কে, তারপর এই খেলার মাঠে। এর মধ্যে কানাই পালের মতো বড়লোক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার হৃদয়-বিনিময় হল কী করে? তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না কানাইবাবু, আর এই লোকটিরই বা কতটুকু খবর রাখে সে?

অথবা কিছুই না—মেজাজী লাখোপতি লোক, ইচ্ছে হলে রাস্তা থেকে যে-কাউকে তুলে নিয়ে সখাভাবে বিভোর হতে পারেন, আবার পরক্ষণেই কুকুর লেলিয়ে দিতে পারেন পেছনে। গাড়িতে না উঠলেই ভালো হত তখন। কিন্তু উপায় ছিল না—পাবলিককে সার্ভিস দেওয়াই তার কাজ—প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে দামী পেট্রনকে কোনোমতেই চটানো যায় না।

সামনেই বড়ো বসবার ঘরে গোল ডুমওয়ালা একটা মস্ত কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল কানাইবাবুর মালী। এদিকে ইলেকট্রিক নেই। কানাইবাবু বললেন, 'ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে আর কী লাভ, চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক একটু।'

কেরোসিনের আলোতেও ঝলমল করছে ঘরটা। বেশ বড়ো একটা টেবিলকে ঘিরে গোটাকয়েক গদী আঁটা চেয়ার—একদিকে কাউচ রয়েছে একটা। তার এক কোণায় ছোট একটি রেডিয়োসেট। বুক-সেলফে কিছু বই—ক'টা মাসিকপত্র। মাথার ওপরে টানা পাখার ব্যবস্থা। দু-একখানা ছবিও আছে দেওয়ালে।

'বসুন—বসুন—', কানাইবাবু অভ্যর্থনা জানালেন।

একটা চেয়ারে দ্বিধাগ্রস্তের মতো বসে পড়ল বিকাশ। কানাইবাবু এগিয়ে গেলেন কাউচের দিকে।

'বুড়ো মানুষ—একটু হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করি, কী বলেন? অপরাধ

নেবেন না।'

'ছি-ছি, কী যে বলেন।'

মালী সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কানাইবাবু হাসলেন একটু।

'বিকাশবাবু, আপনার চলে?'

'আজ্ঞে বুঝতে পারছি না।'

'আমি একটা ড্রিংক নেব।' কানাইবাবুর চোখে কৌতুক দেখা দিল: 'না—সফ্‌ট নয়। আপনার অভ্যেস আছে?'

'আজ্ঞে না, মাপ করবেন।'

'কখনো খাননি?'

'না।'

'কলকাতার ছেলে বলে তো মনে হয় না—যেন সত্য যুগ থেকে আছড়ে পড়েছেন আপনি। আজকাল তো এ-সব চায়ের চাইতেও ইজি হয়ে গেছে।'

বিকাশ হাসল: 'অনেকে তো চা-ও খায় না।'

'তা বটে—তা বটে।' কানাইবাবু মাথা নাড়লেন: 'কিন্তু চায়ের কথা আপনি যখন বললেন, ওটা খান তো?'

'তা খাই।'

'আমি ঠিক জুৎ পাই না—ইন্‌সম্‌নিয়া ধরে। বরং মাঝে মাঝে এক-আধ পেয়ালা কফি মন্দ লাগে না।' কানাইবাবু মালীর দিকে তাকালেন: 'এই বাবুর জন্যে চা। আর আমার জন্যে নতুন বোতলটা বের করবি।'

মালী চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপ। বাইরে ঝিঁঝির ডাক। বিকাশ টেবিলটার ওপরে আঙুল বোলাতে লাগল, কানাইবাবু চেয়ে রইলেন দেওয়ালের দিকে। তারপর:

'আপনার কী মনে হচ্ছে জানি না। আমি এখন প্রায়ই ভাবি—ভুল করেছি।'

'কিসের ভুল?'

'এই ব্যবসা—এ-সব টাকা-কড়ি—কোন লাভ হল না এগুলো দিয়ে।'

'কী হলে খুশি হতেন আপনি? প্রফেসর—ডাক্তার—এই সব?'

'না, মীনিংলেস। ওতেও অ্যাম্বিশন আসে। ডাক্তার টাকার জন্যে ক্ষেপে ওঠে, প্রফেসার নোট-বই ছেপে রাতারাতি গাড়ি-বাড়ির স্বপ্ন দেখে। আমি ঠাকুর্দার কথা ভাবছি।'

'যিনি মূর্তি গড়তেন?'

'হ্যাঁ, মূর্তি গড়তেন।' কানাই পালের গলা ভারী হয়ে এল: 'আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। তখন এদিকে এত বড় গঞ্জ তৈরী হয়নি, এ-সব বিজলী বাতি-টাতিই

বা কোথায়! আমার মনে পড়ে—লণ্ঠনের আলো জেলে ঠাকুর্দা সরস্বতীর মুখে রঙ বুলিয়ে চলেছেন। চোখ দুটো একেবারে তন্ময়। যেন আনন্দে ডুবে আছেন নিজের ভেতরে। আমি এক কোণায় চুপ-চাপ বসে দেখতুম মূর্তি গড়া, তার চেয়েও বেশি দেখতুম ঠাকুর্দাকে। এখন আমার ইচ্ছে করে, ফাঁক পেলে একতাল মাটি নিয়ে বসে যাই।'

বিকাশ হাসল: 'পারবেন?'

'পারব না কেন মশাই—রক্তের মধ্যে রয়েছে যে। কিন্তু তা শুধু মূর্তিই হবে, আর কিছু তাতে আসবে না। সে ধ্যান, সে তন্ময়তা আমি কোথায় পাব? কিন্তু পেলে ভালো হত। বেঁচে যেতুম।'

একটা নিঃশ্বাস ফেললেন কানাইবাবু। মালীর হাতের ট্রেতে হুইস্কি এল, সোডা এল, গেলাস এল, কিছু স্ন্যাক্স এল। এখানেও আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই—বিকাশ দেখল।

হুইস্কি-সোডা মিশিয়ে নিজেই বড়ো একটা ড্রিংক বানিয়ে নিলেন কানাইবাবু।

'এই পর্যন্তই। এর বেশি আমার এগোয় না, তা-ও রোজ নয়।' যেন একটু কৈফিয়তের ভঙ্গী আনলেন স্বরে: 'মাতাল হওয়ার বিলাসিতা পোষায় না মশাই, হাতে অনেক কাজ।'

বিকাশ মৃদু হাসল।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে কানাইবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনার কাকার এত রাগ আমার ওপরে কেন, তা জানেন তো? আমি কুমোরের ছেলে বলে, ছোটলোকের পয়সা হয়েছে বলে।'

দারুণভাবে চমকে উঠল বিকাশ। সে যে শশাঙ্ক নিয়োগীদের বাড়িতেই এসে উঠেছে এবং শশাঙ্ক যে তার কাকা, এ খবরটা তাহলে কানাই পালের আর অজানা নেই! কিংবা এ-রকম আশা করাই বিড়ম্বনা। এইটুকু জায়গাতে এ-সংবাদটা চাপা থাকবে এমন ভাবাটাই পাগলামি!

ম্লান হয়ে বিকাশ বললে, 'ছি-ছি, এ-সব কী বলছেন আপনি? তা ছাড়া আমি একেবারে বাইরে থেকে এসেছি, কিছুই জানি না—এ সমস্ত বলে আমাকে অপরাধী করা—'

বাধা দিয়ে মৃদু হাসিতে কানাইবাবু বললেন, 'জানি মশাই, সব আমি জানি। অপরাধী আপনাকে কেউ করছে না। তাছাড়া আমি তো সত্যিই গরীব কুমোরের ছেলে—বামুন-কায়েত-বদ্যির ঘরে তো জন্মাইনি।'

বিকাশ উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'আজকালকার দিনেও এ-ধরনের জাতের কথা যাঁরা তুলতে পারেন, তাঁদের মন যে কত নোংরা তা ভাবাই যায় না।'

'থামুন—থামুন!' কানাইবাবু আবার স্মিত মুখে গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন : 'কলকাতা শহরে না হয় আপনারা উদারতার শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছেছেন, কিন্তু বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে চিনতে আপনাদের এখনো দেরী আছে। আমরা তো কখনো দাবি করছি না—যে ব্রহ্মার পবিত্র মুখ থেকে পৈতে গলায় দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ টুপ করে লাফিয়ে পড়েছেন। উঁচু জাত আমরা নই। কিন্তু মুশকিলটা কোথায় দাঁড়িয়েছে জানেন? আপনার কাকা এই সোজা স্ট্যাটিসটিকস্‌টা বুঝতে পারেন না যে বাঙালী হিন্দুর দশ পার্সেন্টও এই উঁচু জাত কিনা সন্দেহ—বাকী আমরা সবাই মিলে একটা করে ফুঁ দিলেই এঁরা সব উড়ে গিয়ে বে-অব্‌ বেঙ্গলে পড়বেন! হা-হা-হা—'

কিন্তু বিকাশ শক্ত হয়ে গেল চেয়ারের ভেতরে। প্রায় নিরর্থক একটা নোংরা প্রসঙ্গ এসে বিশ্রীভাবে ঘুলিয়ে দিলে সমস্ত আবহাওয়াটা। মালী সামনে চা-বিস্কুট এনে দিয়েছিল, তার দিকে সে চাইতে পর্যন্ত পারল না—উত্তেজনায় তার গলার শিরাগুলো কাঁপতে থাকল কেবল।

হাসি থামিয়ে কানাইবাবু বললেন, 'কী হল মশাই, নার্ভাস হয়ে পড়লেন নাকি?'

বিকাশ কথা খুঁজে পেল এতক্ষণে। চাপা, প্রায় হিংস্র গলায় বললে, 'আপনি দয়া করে থামুন—এসব আলোচনা আমার একেবারেই ভালো লাগছে না।'

'ভুল বুঝবেন না—এর সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।' কানাইবাবু তাঁর বয়সের গাম্ভীর্যে ফিরে এলেন : 'আসল ব্যাপার হল, আপনারা যারা শহরে থাকেন, কিংবা কলকাতায় যাঁরা বড়ো হয়েছেন, তাঁরা বাংলা দেশকে এখনো ঠিক চেনেন না। কলকাতায় একটা টানা প্রবল স্রোত বয়ে চলেছে, নতুন-পুরোনো সব একাকার, আপনাদের চোখের সামনে নতুন জীবন ঝকঝক করতে করতে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু ভেতরে চলে আসুন, দেখবেন, হাজার বছরের শেকড় এখনো কত শক্ত। এত তো মশাই রাম-রহিম কপচালেন, গেল কম্যুনালিজম?'

'যাবে।'

'কোন্ মন্ত্রে?' কানাইবাবু হাসলেন : 'আপনাকে জবাব দিতে হবে না, আপনাদের কালের উত্তর আমি জানি : সোস্তালিজম এলে। কিন্তু ওটা স্বপ্ন। ভারতবর্ষের মাটিতে কোনোদিন ও বস্তু ফলবে না।'

তর্ক করবার জন্যে বিকাশের জিভ উদ্যত হয়ে উঠল, পরক্ষণেই বুঝল পণ্ডশ্রম। জেলের মাথায় ব্যবসা করতে নেমে যিনি ধুলোমুঠিকে সোনামুঠি করতে পেরেছেন, সোস্তালিজম্‌ সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস বিজ্ঞতার মধ্যেই বাসা বেঁধে আছে। তর্কে তিনি টলবার নন।

কানাইবাবু নিঃশব্দে কয়েকটা চুমুক দিলেন গ্লাসে। মালী এর মধ্যে বিকাশের জন্যে চা আর বিস্কুট নিয়ে এসেছিল, বিস্কুট রেখে বিকাশ চা-টা টেনে নিলে।

রুপোর সিগারেট কেস খুলে বিকাশের দিকে এগিয়ে দিলেন কানাইবাবু।

'চলে?'

'আজ্ঞে না।'

কানাইবাবু সিগারেট ধরালেন। বললেন, 'যে কথাটা আপনাকে বলতে চাইছিলুম। সারা ভারতবর্ষে কাস্টের এখনো একচেটে আধিপত্য। সাউথের ব্রাহ্মণদের কথা ছেড়েই দিন। নর্থ ইণ্ডিয়াতেই বা কী হয়? কোন্ হরিজন উঁচু জাতের কুয়োর জল ছুঁয়েছে, অতএব তাকে পিটিয়ে মারতে হল। আপনাদের এই প্রোগ্রেসিভ বাংলাদেশেই মশাই—অনেক সোস্যালিস্ট-মার্কা ক্যাণ্ডিডেটকে ইলেকশনে জিততে হয় কমিউনিটির নাম ভাঙিয়ে, নইলে কম্যুনাল ফীলিংকে সুড়সুড়ি দিয়ে। মুসলিম এরিয়ায় দিতে হয় মুসলিম ক্যাণ্ডিডেট, নন-বেঙ্গলি এরিয়ায় অবাঙালী—তারা যোগ্য হোক আর নাই হোক। খুব বড়ো বড়ো কথা যে বলেন মশাই—এই হল জন-জাগরণের চেহারা?'

তর্ক করব না—এই মন্ত্র জপ করতে করতে বিকাশ বললে, 'সময় লাগে।'

'হাজার বছরেও পেরে উঠবেন না—'কানাইবাবু হাসলেন: 'মথুরায় গিয়েছিলুম মশাই বছর দেড়েক আগে। এক ছোকরা প্রোফেসারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—সে নাকি কোথায় ফিজিকস্ পড়ায়—মনে রাখবেন, একেবারে সায়েন্সের লোক। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, বাংলাদেশে আমরা গো-হত্যা নিবারণের জন্যে কী করছি। বললুম, বাঙালীর কাছে ওটা প্রোব্লেমই নয়। চটে আগুন হয়ে গেল। বাঙালী সম্পর্কে কী বললে সে আপনার না শোনাই ভালো—তবে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিলে।'

'ও-রকম দু-একজন থাকেই।'

'দু-একজন?' কানাইবাবু আবার ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন: 'ফুলস্ প্যারাডাইজে বাস করছেন। বারো আনা লোকই ভেতরে ভেতরে এই, কেউ খোলাখুলি বলে, কেউ বলে না। পারবেন না—কিছুই করতে পারবেন না। তবে এক কল্কি-অবতার এলে কী হয় কিছুই বলা যায় না।'

'সেই কল্কি-অবতারই আসবেন। টোট্যাল চেন্‌জের ভেতর দিয়ে।'

একটু চুপ করে থেকে কানাইবাবু চশমার ভেতর দিয়ে বিকাশকে লক্ষ্য করলেন কিছুটা।

'আপনি কমিউনিস্ট?'

'আজ্ঞে না।'

'কী তা হলে? আর-এস-পি? এস-এস-পি? আরো কী সব দল রয়েছে যেন, তাদের কোনোটার সাপোর্টার নাকি?'

বিকাশ হাসল: 'না, আমি কিছুই নই। অধিকাংশ মানুষ যা ভাবে, তাই ভাবি।'

'ভুল বললেন। অধিকাংশ মানুষ পেটের ধান্দা ছাড়া আর কিছুই ভাবে না, স্বার্থের দলাদলি ছাড়া তাদের আর কোনো দলই নেই, এক ইলেকশন-টনে তাদের যেটুকু আপনারা তাতিয়ে তোলেন, বাংলা দেশটাকে ভালো করে দেখলেই বুঝবেন—কাস্টিজম্ আর কম্যুনালিজম্। বাকী সব ইজম্ তাদের কাঁচা রঙ। নিরীহ ষাঁড়কে লাল কাপড় দেখিয়ে খ্যাপানো যায়—আপনারাও লাল বুলি ছড়িয়ে মধ্যে মধ্যে খেপিয়ে দেন তাদের।'

কানাইবাবুর কথার মধ্যে কিছু সত্য থাকতে পারে, কিন্তু সে-সত্য একপেশে তা নিজের স্বার্থ আর গোঁড়ামির দিকে বাঁকানো। হাতের বড়ো গ্লাসটির আধখানা শেষ হয়েছে তাঁর, সোনালি ড্রিংকের ওপর মনোরম শাদা ফেনার ছটা এর মধ্যে হয়তো কিছু প্রভাব ছড়িয়ে থাকবে। বিকাশ চুপ করে রইল। শীতের হাওয়ার একটা ঝলক একটুখানি গোলাপের গন্ধ বয়ে এল ঘরের ভেতর, জানলার বাইরে আইভি লতার নিশ্বাস শোনা গেল।

কানাইবাবু কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেট টানলেন। তারপর বললেন, 'আপনি খুব বিরক্ত হচ্ছেন, না?'

'আজ্ঞে না।'

'ভালো করে আপনার সঙ্গে চেনা পর্যন্ত হয়নি। অথচ রাস্তা থেকে আমি আপনাকে প্রায় জোর করে টেনে এনেছি এখানে, একটা মদের গেলাস সামনে নিয়ে পাগলের মতো বলে চলেছি।'

'পাগলের মতো কেন? আপনি যা ভাবেন, তাই বলছিলেন।'

একটু অন্যমনস্ক হলেন কানাইবাবু—যেন বিকাশের কথাটা ভালো করে শুনতে পেলেন না তিনি। বললেন, 'এ-সব আপনাকে বলবারই কোনো দরকার হত না, যদি শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক না থাকত।'

'আপনি ভুল বুঝছেন। সম্পর্ক নেই, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে মাত্র।'

'তা হোক। কিন্তু আমার ওপর শশাঙ্কবাবুর রাগটা এত বেশি কেন, জানেন?'

উত্তরটা আগেই কানাইবাবু দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাষায় সেটার পুনরাবৃত্তি করা গেল না। বিকাশ কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'আপনি নিজের জোরে ভাগ্যকে জয় করেছেন বলে।'

'সেটা একটা কারণ।' কানাইবাবুর মুখে বিষাদ হাসিটা দেখা দিল: 'গরিব কুমোরের ছেলের এত বাড়-বাড়ন্ত উচিত হয়নি। তার চেয়েও বড়ো কারণ—আমার এক ভাইপো কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে পড়তে উঁচু জাতের একটি ক্লাস-মেট মেয়েকে বিয়ে করেছে। ছেলেটি খাসা মশাই—ডাক্তারিতে গোল্ড-মেডালিস্ট—চেহারাও ভালো। মেয়েটা ঠকেনি। আমি অবশ্য এ নিয়ে এখানে একটু ঘটা করেছিলুম—তাতে উঁচু জাতের

অনেকেই চটে গেলেন, সব চেয়ে বেশি চটলেন আপনার কাকা। টাকা না হয় নেই, কিন্তু জাতটা তো ছিল। সেই জাতেই যদি কলঙ্ক পড়ে, তাহলে কোনো ধর্মপ্রাণ সেটা সইতে পারেন ?'

'এগুলো স্রেফ কুসংস্কার এখন।'

'কলকাতায় বসে বলতে পারেন, কিন্তু এ-সব জায়গায়—' কানাইবাবু গ্লাসটা শেষ করলেন : 'সেই থেকে উনি শুরু করলেন শত্রুতা। ইলেকশনে দাঁড়ালুম। নিজের জোরে টাকা করেছি মশাই—সবাই আমাকে পছন্দ করবেন এমন আশাই দুরাশা। সেই সঙ্গে উনি জুড়ে দিলেন অকথ্য সব মিথ্যে কুৎসা। হেরে গেলুম—কিন্তু রাগ হল না—শশাঙ্কবাবু পেছনে না লাগলে যে জিততে পারতুম, তাই বা জোর করে বলি কী করে। ইলেকশনে হার-জিৎ তো আছেই। শেষে শশাঙ্কবাবু এমন একটা কাণ্ড করলেন—'

কানাইবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

'না মশাই, ও-সব শুনে আপনার আর দরকার নেই।'

বিকাশ চমকে উঠল। ঠিক এক ব্যাপার। সেই রিক্শাওলা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি মানুষ এসে যেন একটা জায়গাতে থমকে যায়। কী একটা বিশ্রী ইতিহাসের অন্ধকার পর্দাটা সরাতে গিয়েই ঠিক আগের মুহূর্তে সরিয়ে নেয় হাতটাকে। হঠাৎ বলে বসে—থাক এই পর্যন্তই থাক।

বিকাশের গলায় একটা শিরা কাঁপতে লাগল, খানিকটা রক্ত আছড়ে পড়ল মাথার ভেতরে। প্রায় হিংস্রভাবে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল সে।

'বলুন না, কী বলছিলেন আপনি।'

কানাইবাবু একটা হাই তুললেন।

'যেতে দিন, কী হবে শুনে। আমি তো শত্রুপক্ষ মশাই। ভাববেন, মিথ্যেই আপনার কাকার নামে বদনাম গাইছি।'

বিকাশ তীব্রভাবে বললে, 'না—বলুন আপনি।'

'উঁহু মশাই, আজ নয়।' আবার হাই তুললেন কানাইবাবু : 'আপনার সামনেই এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি শেষ করলুম, আপনার মনে হবে এ-সব মাতালের গল্প। তাছাড়া ও-সব নোংরা আলোচনাও আমার ভালো লাগে না। কিন্তু এমনিতে তো আমি আপনার বাপের বয়সী। একটা অনুরোধ রাখবেন ?'

হতাশ হয়ে বিকাশ বললে, 'বলুন।'

'পারেন তো ও বাড়িটা ছাড়ুন। ওখানে বেশিদিন থাকবেন না।'

সেই কথা—সেই ইঙ্গিত—সেই রিকশওলা—প্রভাকর ডাক্তার—প্রিয়গোপাল! বিকাশের হঠাৎ বিশ্রী গলায় একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল।

কানাইবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'অনেক রাত পর্যন্ত আপনাকে আটকে রেখে আবোল-তাবোল বকলুম, অপরাধ নেবেন না। কিন্তু কখনো কখনো এইভাবে কথা কইতে ইচ্ছে করে। আপনি এগুলোকে মাতালের প্রলাপ মনে করে স্বচ্ছন্দে ভুলে যেতে পারেন—' একটু হাসলেন, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'কিন্তু আর বকুনি নয়, এবার আপনাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিই চলুন।'

* * *

গাড়িটা নিয়োগী-পাড়ার রাস্তা পর্যন্ত এসে থামল। পুকুরের ধার দিয়ে আর মোটর চলার পথ নেই। কানাইবাবু বললেন, 'এই ভালো মশাই, বাড়ি পর্যন্ত না যাওয়াই নিরাপদ। আপনার কাকা আমাকে দেখলে বোধ হয় খুশি হবেন না।'

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে, পথের গর্তে ছুটো একটা টাল খেয়ে, কানাইবাবু চলে গেলেন। পেছন থেকে মিনিটখানেট গাড়িটাকে এগিয়ে যেতে দেখল বিকাশ, তারপর ধীরে ধীরে পুকুরের পাশ দিয়ে পা বাড়ালো।

অন্ধকার বাগান আর ঝোপ-ঝাড়ে ঝিঁঝির ডাক। হঠাৎ মনে হল, সেদিনের মতো মেজদা আবার বেরিয়ে আসবে না তো একটা ভূতুড়ে গল্প নিয়ে? কিন্তু মেজদা এল না। কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল কেবল।

বাইরের সেই বৈঠকখানায় খাতাপত্র খুলে কী সব দেখছিলেন শশাঙ্ক কাকা। বিকাশের পায়ের শব্দে চোখ তুলে চাইলেন। মনে মনে একটুখানি কুঁকড়ে গেল বিকাশ।

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'ছেলেদের খেলার মাঠে গিয়েছিলে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এতক্ষণ আটকে রেখেছিল কে? হেডমাস্টার মশাই, না? লোকটার সব ভালো কিন্তু কাউকে একবার পেলে—'

বিকাশের গলা শুকিয়ে এল। কানাইবাবুর সঙ্গে—তাঁর গাড়িতে চড়ে—সেই বাগান-বাড়িতে যাওয়ার কথাটা বলা উচিত কিনা? কিন্তু এখন থাক—সময় বুঝে পরে বলা যাবে না হয়।

'আজ্ঞে না, হেডমাস্টার মশাই নন। একটু এদিক-ওদিক—'

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'যদি বিরক্তি লাগে, সিনেমাতেও যেতে পারো মধ্যে মধ্যে। কিন্তু যা বিশ্রী হল্! আর দেখায় তো বাজে সব হিন্দি ছবি।'

বলেই আবার খাতাপত্রে মাথা নামালেন।

বিকাশ চলে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠল দোতলায়। নীচে রান্নাঘর থেকে কাকিমার ফোড়নের গন্ধ। সিঁড়ির মাথায় প্রথম ঘরটার ভেজানো দরজায় ভেতর দিয়ে বারান্দায় এক ফালি আলো। গুনগুন করে পড়ার আওয়াজ—মুন্নুই হবে। ছোট বোন বিনি

তার মাঝখানে গলা তুলল : 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে-বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

পরপর দুটো বন্ধ ঘর পেরিয়ে বিকাশ চলে এল বারান্দার শেষে। তার ঘরের দরজা খোলা—ভেতরে লণ্ঠনের কমানো পলতেয় মিটি মিটি আলো। উল্টো দিকে মেজদার পোড়ো মহল অন্ধকার নিথর। নীচের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে এক ঝাঁক জোনাকি।

ঘরে ঢুকে বাইরের জামা-কাপড় ছেড়ে, একটা চাদর জড়িয়ে কিছুক্ষণ চেয়ারের ওপর ঝিম মেরে বসে রইল বিকাশ। এখন আর কোনো কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না তার, কিছুতেই সে উৎসাহ পাচ্ছে না। সারা দুপুর মাঠে ছোটাছুটি—কানাইবাবুর পাল্লায় ঘণ্টা দুই সময়, রাজনীতি আর সমাজতত্ত্বের সেই সব ব্যাখ্যা—সব এখন তার অর্থহীন বলে মনে হচ্ছিল। কোথায় একটা চাপা যন্ত্রণা ছিল এতক্ষণ, এবারে সেটা চিন-চিন করতে লাগল বুকের ভেতরে। মনে হতে লাগল—আসেনি, মনীষার চিঠিটা আজও আসেনি।

ওই তো স্বাস্থ্য—সংসারের চাপে রক্তহীন চেহারা, অফিসের ক্লান্তি। ভাই-বোন-মা-বাপের গ্রাস জোটানোর পরিশ্রম। অসুখ করতে কতক্ষণ? চব্বিশ বছরেই শরীরে-মনে দেউলে হয়ে আসছে মনীষা। অথচ কিছুই করবার নেই। পুরুষের দুটি নির্ভয় বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মনীষাকে উদ্ধার করে আনবার শক্তি তার নেই—বাইরের বাঁধন ছেঁড়া যায়, কিন্তু যে শৃঙ্খল রক্তের ভেতরে—যা নিয়তি, তার হাত থেকে, ওই মেয়েটিকে সে ত্রাণ করবে কি করে?

অথবা—এমন হতে পারে, ডাকের গোলমালে চিঠিটা পৌঁছায়নি। কাল আর একখানা চিঠি লিখতে হবে।

টেবিলে মা-র পোস্টকার্ডখানা। পরশু এসেছে। লিখেছেন, 'ওঁরা তোমার আদর-যত্ন করিতেছেন জানিয়া খুব সুখী হইয়াছি। এখানকার জন্য ভাবিও না। বিনু সব দেখাশুনা করিতেছে।'

বিনু ছোট ভাই। এম. এ. ক্লাসের ছাত্র।

কিন্তু মনীষা!

'প্রাইভেটে একটা এম. এ. দিলে কেমন হয়?'

'কী লাভ?'

'কোয়ালিফিকেশন তো বাড়বে। গ্রেডটা একটু ভালো পেতে পারি।'

ওই পর্যন্তই। এম. এ. পরীক্ষা আর এগোয়নি মনীষার। সময় কখন পড়বার? বিকাশকে লুকিয়ে সে দুটো-একটা ট্যুশন করে বলেও সন্দেহ হয়।

ভালো গ্রেড মনীষার আর জুটবে না। তাকে ওইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে—অনেকদিন, আরো অনেকদিন পর্যন্ত। ভাই কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কে জানে,

তার মধ্যে একটু একটু করে আরো হারিয়ে যাবে, আরো ফুরিয়ে যাবে মনীষা।

সুমু ঘরে এল।

'চা খাবেন বিকাশদা ? মা জিজ্ঞেস করল।'

'না—দরকার নেই।'

বাইরে বেরিয়ে গেল সুমু। রেলিঙের কাছে গিয়ে, নীচের রান্নাঘরের উদ্দেশে ঘোষণা করল : 'না মা, খাবেন না।' কিশোরী গলায় তীক্ষ্ণ মিষ্টি স্বর একটা ঢেউ তুলল বাড়িময়।

সুমু ফিরে এল আবার।

'বিকাশদা!'

'হুঁ।'

'একটা কথা বলব—রাগ করবেন না ?'

'আগে কথাটা শুনেই নিই। রাগ করব কিনা বোঝা যাবে তারপরে।'

সুমু একটু চুপ করে রইল সংকুচিতভাবে। বললে, 'আমার দু-একটা ইংরিজি লেখা একটু দেখে দেবেন ?'

'ইংরিজি লেখা ?'

'ক্লাসে পড়ার।'

বিকাশ হাসল : 'আমি দেখে দিলে কি সুবিধে হবে ? আমার ইংরিজি বিদ্যে তোমার চাইতে বেশি নয়।'

'যান—চালাকি করবেন না।'

'ঠিক আছে। দেব দেখে। কিন্তু ক্লাসে যদি বকুনি খাও সে দায়িত্ব আমার নয়—তা বলে দিচ্ছি।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসল সুমু। বিকাশ বললে, 'তবে বেহালা যদি শিখতে চাও তাহলে চলনসই গোছের একটা পাঠ দিয়ে দিতে পারি।'

সুমু বললে, 'আর বেহালা শিখিয়েছেন আপনি! আপনাকে তো বাড়িতেই পাওয়া যায় না।'

'আর আমি যখন বাড়িতে থাকি, তখন তুমি এক-একবার দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যাও। অত চঞ্চল ছাত্রীর কি আর গানবাজনা শেখা হয় ?'

সুমুর চোখ নামল, ছায়া পড়ল মুখে।

'কী করব—রান্না-বান্নার কাজে মা-র কাছে কাছে থাকতে হয় যে সব সময়। একটু এদিক-ওদিক হলে বাবা তো আর মাকে আস্তো—'

'সুমু!' বিকাশ চমকে উঠল।

আর শিউরে উঠল সুমুও। চোখের তারায় চকচক করে উঠল ভয়।

'দোহাই বিকাশদা—কাউকে বলবেন না, কাউকে না।' কাঁপতে লাগল গলা, ফিস-ফিস করে বলল, 'রাগ হলে তো বাবার আর মাথার ঠিক থাকে না।'

বিকাশ শক্ত হয়ে বসে রইল চেয়ারে। প্রভাকরও বলেছিল, কিন্তু তখন বিশ্বাস হয়নি। শশাঙ্ক কাকার আর সব রহস্য, তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে নানা জনের নানা ইঙ্গিত—এ-সব বাদ দিয়েও মনে হল, যে লোকটা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, তার বাড়ি ছেড়ে এখুনি, অবিলম্বে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

'ছি—ছি—ভদ্রলোক হয়ে—'

আতঙ্কে আরো নিভে গেল সুমুর গলা: 'বলবেন না বিকাশদা, বলবেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ। ঘরের মধ্যে পুরোনো চুন-বালির গন্ধ যেন জমাট হয়ে ঘিরে আসতে চাইল, বিকাশের মনে হল, নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে তার।

সুমুর চোখে বোধ হয় জল এসে গিয়েছিল। চিকচিক করে উঠল তারা দুটো। আস্তে আস্তে বললে, 'আমি এখান থেকে পাস করলে আমাকে কলকাতার কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করে দেবেন বিকাশদা?'

'কেন, তোমাদের এখানেই তো কলেজ হচ্ছে বলে শুনেছি।'

'না—পড়ব না এখানে। আমার কী মনে হয় বিকাশদা, জানেন? এ বাড়িতে থাকলে আমি ঠিক মরে যাব ছোট মাসীর মতো।'

'সুমু!'

'ছোট মাসী যেমন করে গলায় দড়ি দিয়েছিল, ঠিক তেমনি করে—'

চেয়ারের ভেতরে আবার নড়ে উঠল বিকাশ।

সুমু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল খুব সম্ভব। এই সময় কাকিমার গলা শোনা গেল। সুমুকে ডাকছিলেন। আর দাঁড়ালো না মেয়েটা,—প্রায় ছুটেই চলে গেল ঘর থেকে।

নয়

খুশি হয়ে বেরিয়ে এল প্রভাকরের স্ত্রী অমলা।

'আসুন, আসুন।'

'ডাক্তার কোথায়?'

'এতক্ষণ তো ছিলেন। হাসপাতালে কী একটা এমার্জেন্সী কেস এসেছে, এক্ষুনি দেখতে গেলেন সেটা। আপনি বসুন, চা খান, উনি এসে পড়বেন একটু পরেই।'

আজকে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েই সোজা প্রভাকরের কাছে চলে এসেছে বিকাশ। সকালেই একটা চিঠি এসেছে মনীষার। অল্প কথায় লেখা। 'মাঝখানে জরে পড়ে-

ছিলুম—তুমি চলে যাওয়ার পরেই। শরীর এখনো দুর্বল। তাই চিঠি দিতে দেরী হয়ে গেল। আমার জন্মে ভেবো না—তুমি ভালো থেকো।'

যে-কোনো মানুষের মেজাজ খারাপ করবার পক্ষে এই একটি চিঠিই যথেষ্ট। মনীষার ওই স্বাস্থ্যের ওপর আরো দুর্বল হলে জিনিসটা যে কি রকম দাঁড়ায়, সেটা ভাবতেও মন বিষাদ হয়ে যায়। খেটে মরছে সংসারের জন্মে—ফুরিয়ে যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু করে। চোখের সামনে এই বীভৎস অপচয়টা সহ্য করতে হচ্ছে বিকাশকে, তার কিছুই করবার উপায় নেই—শক্তি নেই মনীষাকে আশ্রয় দেবার। নিজের এই নিরুপায় ক্লীবতা আজ সারাটা দিন ধরে তাকে চাবুক মারছিল।

কিছু একটা করতেই হবে। সামনের শনিবারে অন্তত তার একদিনের জন্মেও একবার কলকাতা যাওয়ার দরকার।

কিন্তু সেটা ছাপিয়েও আর একটা বিশ্রী জেদ তাকে কাল রাত থেকে পেয়ে বসেছে। সবাই মিলে শশাঙ্ক নিয়োগীকে নিয়ে একটা অন্ধকার গল্প তৈরী করছে, আর থেমে যাচ্ছে ঠিক একটা জায়গাতে এসেই। এমন কি কানাই পালের মতো বস্তুবাদী ব্যক্তি—যিনি মানুষ আর জীবন সম্পর্কে কোনো মোহই রাখেন না—সোজা ভাষায় যিনি স্পষ্ট কথা বলেন, তিনিও কাল সন্ধ্যায় ঠিক ওই একটি কেন্দ্রে এসে থমকে দাঁড়ালেন। যেন গোয়েন্দা গল্পের শেষ পাতাটার জন্মে কৌতূহল যখন চূড়ান্ত, তখন তার লেখক ক্রমাগত কথার পরে কথা বুনে যাচ্ছেন—আসল কথাটাই আর বলা হয়ে উঠছে না। তার ওপর কাল রাত্রে স্বপ্ন—

বিকাশকে বসিয়ে ভেতরে বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা করতে চলে গেছে অমলা, হতাশ-ভাবে বিকাশ নিশ্বাস ফেলল একটা। সামনে টেবিলে কতগুলো মেডিক্যাল জার্নাল পড়ে ছিল। পুরোনো হয়ে গেছে, তবু দু-একটার মোড়কই খোলা হয়নি এখনো—ব্যস্ত ডাক্তার সময় পায়নি, অথবা ভেবেছে পড়বার কিছু নেই। তারই একটার মোড়ক খুলে বিকাশ সম্পূর্ণ অকারণে ডায়েটিক্স্-এর ওপর একটা প্রায়-দুর্বোধ্য টেক্নিক্যাল প্রবন্ধ অকারণে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

অমলা ফিরে এসে মুখোমুখি বসল।

'সেই যে চলে গেলেন, আর আপনার দেখা নেই।'

পত্রিকাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিকাশ বলল, 'খবর কিন্তু আপনাদেরই নেবার কথা। আমি বিদেশী।'

অমলা হাসল: 'আমার দশাও কিন্তু আপনার মতোই। উনি এখানে এসেছেন বছর দুই হল, আমি এসেছি মোটে সাত-আট মাস আগে। আর এর আগে—সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি বাংলা দেশ দেখিইনি।'

'ছিলেন কোথায় ?'

'মোরাদাবাদে। বাবা ওখানকার ডাক্তার। ঠাকুর্দার আমল থেকেই আমরা ওখানে সেট্‌ল করেছি। আপনার শুনলে হয়তো হাসি পাবে, বাংলায় ভালো করে চিঠি-পত্রও আমি লিখতে পারি না—হিন্দি মিডিয়ামেই আমার লেখাপড়া।'

'তাতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে, আপনি তো রাষ্ট্রভাষায় শিক্ষিতা।'

অমলা বললে, 'ঠাট্টা করবেন না। মধ্যে মধ্যে ভারী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। শাশুড়ীর সামনে রান্নার বদলে রসুই বলে ফেললুম—শাশুড়ী বললেন, রসুই-মসুই বোলো না মা—আমি বিধবা মানুষ, শুনলেই কেমন রসুনের কথা মনে পড়ে যায়।'

দুজনেই হেসে ফেলল।

'আর আপনার বন্ধু তো আছেনই সব সময়। আমি কিছু বললেই বলবেন, জী হাঁ। প্রথম প্রথম এঁদের বাড়িতে আসবার পরে প্রায়ই ওটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেত কিনা।'

'জী হাঁ। বুঝেছি।'

অমলার হাসিটা এবার খিলখিল করে ভেঙে পড়ল: 'আপনিও? সবাই দেখছি এক দলের।'

মনের ভেতর যে ভারটা জমে আছে, একটু একটু হাল্কা হয়ে আসছিল। বেশি পরিচয় হয়নি, তবু বোঝা যায়, বেশ মেয়েটি। প্রভাকর সুখী। কিন্তু কথাটা মনে হতেই ছায়া নেমে এল একটা। তাকেও এইভাবে মনীষা সুখী করতে পারত। অথচ—

অমলা বললে, 'কী হল, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে?'

'একটা কথা ভাবছি। এখানে আপনার তো খুব একা লাগে?'

'একেবারে লাগে না কী করে বলি। উনি তো ব্যস্ত মানুষ। প্রতিবেশিনী বলতে কম্পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রী আছেন, কিন্তু চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁরও নিশ্বাস ফেলবার জো নেই। তবু তিনিই এসে মধ্যে মধ্যে দুঃখের গল্প করে যান। তা ছাড়া হঠাৎ এক-আধদিন কেউ কেউ আসেন। নইলে একা।'

'সময় কাটে কী করে?'

'রেডিয়োটা খুলে রাখি। সংস্কৃত শিক্ষা থেকে বাজার দর পর্যন্ত সব শুনি। লাইব্রেরী থেকে বাংলা বই আনিয়ে পড়ি, একটু কষ্ট হয়—উনি বলেন তা হোক, মাতৃভাষা শেখো।'

'তা ভালো।'

বিকাশ নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করতে লাগল। তার ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল এখন। প্রভাকরের স্ত্রী অমলা রেডিয়ো থেকে মাতৃভাষা শিখছে এই খবরটা মজার, কিন্তু এই মুহূর্তে এটা নিয়ে আলোচনা না করলেও তার চলে। আসবার পরেই যে ভালো-লাগাটুকু দেখা দিয়েছিল, ক্রমেই সেটা বিকেলের আলোর সঙ্গে নিবে আসছে। একটু

পরেই তাকে ফিরে যেতে হবে নিয়োগীবাড়িতে। সেই পুরোনো ধুলোর পথটা ধরে—জীর্ণ কতগুলো গাছের শীতার্ত ছায়ায় ছায়ায়, তারপর সেই শীতল অন্ধকার বাড়িটা তার অদ্ভুত জঠরের মধ্যে তাকে টেনে নেবে। তার আগে—

একটা বাচ্চা চাকর চা আর কিছু মিষ্টি নিয়ে এল। অমলা বললে, 'খান।'

'আপনি ?'

'আমাদের তো হয়ে গেছে সেই কখন।'

'চা-টাও একাই খাব ?'

'আমি দিনে দু-বারের বেশি চা খাই না। ইনসম্‌নিয়া হয়।'

'ডাক্তারের স্ত্রীই বটে!' বিকাশ খেতে আরম্ভ করল। খাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মনের অস্বস্তিটা যে-কোনো একদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার।

অমলা বললে, 'সময় কাটাবার কথা বলছিলেন না ? আর একটা ভালো কাজ আমি করি।'

'সামনের এই বাগান ?'

না—ওটা করে এখানকার লোকজন। আমি রেডিয়ো খুলে দিয়ে উল বুনি।'

'উল বোনেন ?'

'এর চাইতে চমৎকার কাজ আর কী আছে মেয়েদের সময় কাটানোর ? ওঁর জন্যে, শ্বশুরের জন্যে, ননদ-দেওরদের জন্যে বুনে যাই একটার পর একটা। ওঁর চেনাশুনো দু-একজনকে বুনে দিই। আপনাকে করে দেব একটা। স্লিপওভার। কাটা হাত না ফুল সাইজ ? ওঁর মাপেই আপনার হয়ে যাবে আশা করি।'

'যা দেবেন, তাতেই চরিতার্থ। কিন্তু বোনবার তো একটা লিমিট আছে।' বিকাশ সহজ হতে চাইল : 'পৃথিবীসুদ্ধ সকলের শীত-নিবারণের দায়িত্ব নিশ্চয় নেননি। যখন তালিকা শেষ হয়ে যায়, তখন কী করেন ?'

'যেটা বুনছিলুম, সেটা খুলে ফেলি। আবার গোড়া থেকে শুরু করা যায়।'

হাসতে গিয়েও বিকাশ হাসতে পারল না। সামনের মাঠে এখন রাত্রির ছায়া পড়েছে। নিয়োগীবাড়ির পথটা এতক্ষণে বোধ হয় অন্ধকারে মুখ ঢাকছে। সব আবার ভারী হয়ে এল।

'একটা কথা বলব ?'

'বলুন না।'

'নিয়োগীরা তো আপনাদের আত্মীয়। ওঁরা কেউ আসেন না এখানে ?'

অমলা একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আগে খবর-টবর নিতেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি আসবার পর থেকে ওদের সঙ্গে আপনার বন্ধুর কোনো সম্পর্ক নেই।

শুনেছি শশাঙ্কবাবু—'

সমস্ত স্নায়ু মুহূর্তে উদগ্র হল বিকাশের।

'কী করেছিলেন শশাঙ্কবাবু ?'

সামনের টিপয়টার ওপর কয়েকবার আঙুল বুলিয়ে নিলে অমলা। বললে, 'ওঁর নামে ওপরে অনেক লেখালেখি করেছিলেন। মানে যাতে এখান থেকে ওঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়।'

'হুঁ, প্রভাকরও একটা আভাস দিয়েছিল ওই রকম। কিন্তু কেন ? কী উদ্দেশ্য এই শত্রুতার ?'

'জানেন তো—ওঁদের চাকরি নন্‌-প্র্যাক্‌টিসিং। সেজন্য ওঁরা আলাদা অ্যালাউয়েনস পান। উনিও এ ব্যাপারে খুব প্রিন্সিপল মেনে চলেন। লেকিন—' অমলা একবার জিভ কাটল : 'কিন্তু কেউ হঠাৎ যদি বিপদে পড়ে ডাকে, উনি বিনা ফীয়ে যদি তাকে দেখতে যান, সেটাও কি অন্যায় ? ডাক্তারের তো একটা ডিউটি আছে, কী বলেন ?'

'সে তো নিশ্চয়।'

'অথচ শশাঙ্কবাবু রিপোর্ট করলেন—উনি নাকি প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করে টাকা নেন, তার সাক্ষী পর্যন্ত তাঁর মজুত আছে। কী ডাহা মিথ্যে কথা বলুন তো ?'

বিকাশের চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

'কিন্তু এ-রকম শত্রুতা কেন ?'

'একটা সুইসাইড হয়েছিল শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে।'

আবার সেই অন্ধকার অধ্যায়টা এগিয়ে আসছে। বিকাশ চেয়ারে আরো ঘন হয়ে বসল। প্রভাকর নেই, সে থাকলে হয়তো এইখানেই থামিয়ে দিত—বলত 'থাক—' কী হবে ও-সব নোংরা আলোচনায়।' কিন্তু অমলা হয়ত অত সতর্ক নয়। কিন্তু সতর্ক হোক আর নাই হোক, সমস্ত ব্যাপারটা না জেনে এখান থেকে আজ ওঠা চলবে না, কোনোমতেই না।

'কে সুইসাইড করেছিলেন ?'

'শশাঙ্কবাবুর ছোট শালী। ওঁর ওখানেই থাকতেন। খুব সুন্দরী বলে শুনেছি। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।'

সুন্তুর কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধ ঘরটার সামনে দিয়ে যেতে তার ভয় করে।

'কেন আত্মহত্যা করলেন ?'

'একটা গে লমেলে কী ব্যাপার ছিল। ওঁদেরই আর একজন আত্মীয়ের ছেলে—সে সরকারী কাজের ব্যাপারে এখানে এলে উঠত ওঁর বাসায়। মেয়েটির সঙ্গে তার—' অমলা একটু থামল : 'বোধ হয় বিয়ের কথা উঠেছিল—মানে ওরা দু-জনে এ-ওকে খুব

লাইক করত। শশাঙ্কবাবু বাধা দেন শেষ পর্যন্ত। ছেলেটিকে বের করে দেন বাড়ি থেকে। আর তাতেই—'

'কিন্তু শশাঙ্কবাবুর শালী তো যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে। তাতে তাঁর বাধা দেবার কী আছে? আর মেয়েটি নিশ্চয় নাবালিকা ছিল না।'

'না, বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হয়েছিল শুনেছি।'

'তা হলে চলে গেল না কেন মেয়েটি? আর তারও তো মা-বাবা আছে। শশাঙ্ক-বাবু ঠেকিয়ে রাখলেন কী করে?'

অমলার স্বর বিষণ্ণ হল।

'আপনি জানেন না?'

'না।'

'শশাঙ্কবাবুর শ্বশুরের কোনো ছেলে নেই। দুটিই মেয়ে। আর ওঁর শ্বশুর-শাশুড়ীও মারা গেছেন। তার ফলে উনিই শালীর অভিভাবক, কাছে এনে রেখেছিলেন। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা এগিয়ে আসতেই বোধ হয় ভাবলেন—এর পরে তো সম্পত্তি দু ভাগ হয়ে যাবে, ছোট মেয়েটিও নিশ্চয় তার পাওনা ছাড়বে না। কাজেই ছেলেটাকে দিলেন তাড়িয়ে। এর পরে মেয়েটি আর কী করতে পারে বলুন?'

'চলে যেতে পারত ছেলেটির সঙ্গে। গিয়ে বিয়ে করতে পারত।'

অমলা ক্লান্ত গলায় বললে, 'আপনি কি মেয়েদের জানেন না? তাদের অনেকেই আছে, যারা জীবনের কাছে জোর খাটাতে চায় না, খাটাতে জানেও না—যখন দুঃখ পায়, কারো কাছে নালিশ না করে নিঃশব্দে সরে যায়। এই মেয়েটিও হয়তো সেইরকম ছিল। শুনেছি চেহারাটি ছিল লক্ষ্মীর মতো, স্বভাবেও তাই।'

একটা স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। সামনের লনে অন্ধকার, তার সঙ্গে ফুলের গন্ধ। ঝিঁঝি ডাকছে। কখন বারান্দায় আলো জ্বলেছে, বাইরে আলো জ্বলেছে—বিকাশ টেরও পায়নি। অমলার একটা নিশ্বাস পড়ল।

বিকাশের মনে পড়ল মনীষাকে। হাঁ, অনেক মেয়েই জোর খাটাতে জানে না। সেও তো এমনি করে—নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে জীবনের কাছ থেকে। বিকাশ জানে মনীষারও আর সময় হবে না। কবে ভাইগুলো দাঁড়াবে—সংসার দেখবে সচ্ছলতার মুখ, বোনদের জন্যে আর ভাবতে হবে না—তখন—হয়তো আরো পাঁচ-সাত-দশ বছর পরে মনীষার মা-বাবা বলবেন, 'এইবার সময় হয়েছে, এইবার তুমি বিয়ে করতে পারো।' তখন কঙ্কালসার শরীরে, ক্লান্ত মুখে মনীষা বিকাশকে বলবে—'কী করবে আমাকে নিয়ে, শরীরে মনে তো আমি সম্পূর্ণ দেউলে হয়ে গেছি। আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারব না, কিছুই দিতে পারব না তোমাকে—শুধু একটা ভার হয়ে তোমার প্রত্যেকটা দিনকে অসহ্য

করে তুলব। এখন আমি শূন্য, আমি শ্রান্ত—আমাকে জিরোতে দাও, একটা বোঝা এইমাত্র আমি নামিয়েছি, আর একটা তুলে দিয়ো না আমার ওপরে।'

না—সব মেয়ে পারে না। জোর নেই সকলের ওপরে। কেউ-কেউ গলায় দেবার জন্যে একটা দড়ি খোঁজে, কেউ বা এমনি করে তিলে তিলে আত্মহত্যার উপাসনা করে।

অমলা আস্তে আস্তে বললেন, 'ওঁর স্ত্রীকে দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'আমিও একদিন দেখেছিলুম কালীবাড়িতে। আলাপ করলুম। সম্পর্কে তো আমাদেরও কাকীমা হন। এত ভালোমানুষ যে কী বলব। এককালে সুন্দরীই ছিলেন—অথচ স্বামী আর ওঁর কিছু রাখেননি। ওঁর চোখ লক্ষ্য করেছেন? সব সময়ে যেন ভয় পাচ্ছেন, সব সময়ে যেন চমকে চমকে উঠছেন।'

মেয়েদের দৃষ্টি আলাদা। শান্ত ভালোমানুষ কাকীমাকে বিকাশ দেখেছে বইকি—কিন্তু তাঁর চোখের দিকে চেয়ে দেখেনি। কিন্তু সুনুর চোখ মনে পড়ল। সেই স্বর্ণা—সেই সোনালী—মশারিটা ফেলে এসে ফিসফিস করে বলেছিল, 'আপনি এখান থেকে চলে যাবেন না বিকাশদা, দোহাই আপনার, চলে যাবেন না এ বাড়ি থেকে।'

ওর চোখেও ভয়। ওকেও হয়তো একদিন এমনি করে সরে যেতে হবে। বিকাশের বেহালাটার দিকে তাকিয়ে একবার আলো ফুটেছিল ওর মুখে। কিন্তু ওর আলো দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাবে—যেমন করে ঘন ছায়ার আড়ালে ঝরে যায় সূর্যমুখীর পাপড়ি।

বিকাশ নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল একবার।

'অদ্ভুত লোক এই শশাঙ্ককাকা।'

'খুব হিসেবী লোক। প্রত্যেকটি পা মেপে মেপে ফেলেন।' অমলার স্বর তেতো হয়ে উঠল।

একটু চুপ করে থেকে বিকাশ বললে, 'সুইসাইড করল মেয়েটি—আর একটি ছেলে জড়িয়ে ছিল তার সঙ্গে। কিন্তু এর মধ্যে প্রভাকর এল কী করে? তার সঙ্গে শত্রুতা হবে কেন?

'খুব সোজা কারণ।' অমলার গলা থেকে সেই তিক্ততা ঝরে পড়তে লাগল: 'মাঝরাতে এসে ওঁকে ডেকে নিয়ে যান শশাঙ্কবাবু। সুইসাইডের ব্যাপার, পুলিস কেস হবে, তা ছাড়া কেলেঙ্কারী তো একটা আছেই। নানা বাজে কথাও রটতে পারে। তাই ওঁকে বলেছিলেন—কলেরা-টলেরা যা হোক একটা সার্টিফিকেট দিতে, তারপরেই রাতারাতি নিয়ে পুড়িয়ে দেবেন।'

'বুঝেছি।'

'উনি রাজী হননি। তা ছাড়া একটা চিঠিও বোধ হয় ছিল মেয়েটির শাড়ির সঙ্গে

সেপ্‌টিপিনে আটকানো, ওঁরা দেখবার আগেই সেটা এঁর চোখে পড়ে। তাতে বোধ হয় এমন কিছু কথা ছিল—যা শশাঙ্কবাবুর সম্মানের দিক থেকে খুব ভালো নয়। উনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। পুলিস এসে চিঠিটা দেখতে পায়নি—আগেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। যাই হোক, সুইসাইড চাপা রইল না—' ধর-পাকড় করে অবশ্য শশাঙ্কবাবু অটোপ্‌সি বন্ধ করলেন। আর সেই থেকে লাগলেন ওঁর পেছনে, কী করে তাড়াবেন।'

বিকাশ চুপ করে রইল।

'বেশি কিছু করতে পারেননি—এঁদের ডাইরেকটার তো এঁকে জানেন। তবু এ-ভাবে উৎপাত করলে কার ভালো লাগে, বলুন ? আমি বলেছিলুম, ট্রান্সফার নাও—নইলে ছেড়ে দাও না এই চাকরি। কীই বা মাইনে, এর চাইতে প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস করলেও অনেক বেশি রোজগার। কিন্তু ওঁরও জেদ চেপে গেল। বললেন, কী ভেবেছেন শশাঙ্কবাবু—আমিও তো নিয়োগীবংশেরই ছেলে, আমিও দেখে নেব। তাছাড়া তখন কানাইবাবু—এখানকার খুব বড়ো বিজনেসম্যান—ভিলেজ পলিটিকসে শশাঙ্কবাবুর রাই-ভ্যাল—তিনিও ওঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন।'

একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হয়ে আসছে, বিকাশ ভাবল। তবু এখনো বাকী আছে, অনেকখানি ফাঁকা আছে, কোথাও।

কী ছিল সেই চিঠিটায়—যা পুলিসের হাতে পড়বার আগেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল ? কে ছিল সেই ছেলেটি—যে সেই নিঃশব্দ লক্ষ্মী মেয়েটির মৃত্যুর কারণ ?

কিন্তু অমলাও তার মতো বিদেশী। রেডিয়ো শুনে, উল বুনে আর উল খুলে তার সময় কাটে। সব তার জানবার কথা নয়। তবু অনেকখানি ভার হালকা হয়ে এল। হঠাৎ উঠে পড়ল বিকাশ।

'আচ্ছা, চলি আজ।'

এতক্ষণে অমলারও যেন খেয়াল হল।

'তাই তো, আপনার বন্ধুর সঙ্গে যে দেখা হল না। নিশ্চয় কাজে আটকে গেছেন, নইলে হাসপাতালেই গল্প জমিয়ে বসেছেন কারুর সঙ্গে। একটু বসুন না—ওঁকে ডেকে পাঠাই।'

'থাক না। কাজের মানুষকে ডিস্‌টার্ব করতে নেই।'

'কাজ তো আছেই হরবখত—' অমলা আবার জিভ কাটল : 'কিন্তু কাজের চাইতেও অকাজ বেশি। ও-সব লোককে জোর করে টেনে আনতে হয়। দাঁড়ান, আমি বাচ্চা চাকরটাকে পাঠিয়ে দিই হাসপাতালে, খবর দিক ওঁকে।'

'আজ থাক। আপনি ব্যস্ত হবেন না। প্রভাকরের সঙ্গে ভদ্রতার সম্পর্ক নয় আমার' —বিকাশ পা বাড়ালো : 'আসব আবার।'

'আসেন কোথায় ?'

'এবার থেকে নিয়মিত হানা দেব। চা আর খাবার খেয়ে খেয়ে জেরবার করে তুলব আপনাকে।'

'কেউ জেরবার করলে তো বেঁচে যাই।' অমলার নিঃশ্বাস পড়ল : 'এমন একা-একা থাকি যে কী বলব। তা ছাড়া মিশতেও পারি না সকলের সঙ্গে। কিন্তু আসবেন তো দু-একদিনের মধ্যে ?

বিকাশ একটু হেসে বললে, 'জী হাঁ। এখন নমস্তে।'

'নমস্তে—' বলেই খিলখিল করে হেসে ফেলল অমলা : 'আমার উইকনেস আপনার কাছে এক্সপোজ করাই ভুল হয়েছে। আজ থেকে আর একজনকে দলে পেলেন উনি।'

চলতে চলতে—এই আপাত-লঘুতার কৌতুকটিকে ছাপিয়ে, আবার একটা বিষণ্ণ মন্থরতা নামতে লাগল মনের ভেতর। উত্তরের হাওয়ায় সমস্ত শরীর শির-শির করছে, মনের ভেতরেও কেমন একটা শিহরণ জাগছিল তার। আর সে মনীষার চিঠি পেয়েছে —সেই শ্রান্ত অসুস্থ মেয়েটিই আজকে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে—এইটেই স্বাভাবিক ছিল। তবু চলতে চলতে বিকাশ সুনুর কথাই ভাবতে লাগল।

তার মা। তার মাসী। সে।

এক অন্ধকারের ভেতরে। দুজনে তলিয়ে গেছে, আর একজন এখনো আশা রাখে —তার ক্ষীণ বৃন্তটিকে তুলে ধরতে চায় আলোর দিকে। কিন্তু সেও বাঁচবে না। তারও নিয়তি যেন নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

'বিকাশদা—এ বাড়ি থেকে আপনি যাবেন না—'

ব্যাঙ্ক থেকে বেরুবার সময় ভেবেছিল, কালই সে চলে যাবে যেখানে হোক, না হয় সেই মাস্টারমশাইদের মেসে গিয়েই আস্তানা নেবে। কিন্তু এখন—

এখন তার মনে হল, যাওয়া চলে ? এমন স্বার্থপরের মতো যাওয়া চলে ?

সুনু—সুবর্ণা—সোনালি। কিছুই কি করা যায় না তার জন্যে ? কিছুই না ?

দশ

কলকাতা কখন ঘুমোয়, কখন জাগে—কলকাতার ছেলে হয়েও সেটা আবিষ্কার করতে পারেনি বিকাশ। তাদের গরপাড়ের বাড়ির পেছনের বস্তিটায় ঘুমের ঘোরে রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত মানুষের সাড়া মেলে, আবার আলো ফোটবার কত আগে যে বেরিয়ে পড়ে দুইপারের দল, রাস্তায় জলের আওয়াজ ওঠে—প্রথম ট্রাম রওনা হয়—বিকাশ তার কোন

খবর রাখে না। ঘরের টাইমপীসটায় সাতটা বাজে—রোদ এসে পড়ে মুখের ওপর, চা আসে, ঘুম ভাঙে। কলকাতা কখনো সম্পূর্ণ ঘুমোয় না বলেই—তার জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে পড়ার মাঝখানটিতে কোনো সীমা নেই।

কিন্তু এখানে—বিশেষ করে এই শীতে—দশটা বাজতে না বাজতেই একটা কালো পর্দা যেন নেমে আসে। কুকুর ডাকে—মধ্যে মধ্যে শেয়ালের সাড়া ওঠে—ঝিঁঝিরা একটানা ঝাঁ ঝাঁ করতে করতে আচমকা থমকে গিয়ে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করে দেয়। হাওয়ায় কখনো কখনো গাছের পাতা নড়ে। আর ঘুম—পাথরের মতো একটা নিথর ঘুম সব একাকার করে দেয়।

এখানে সেই ঘুম ভাঙায় পাখিরা। নানা সুরে, নানা গলায়। পাশের বাগানটায় কয়েক হাজার পাখির কলোনী আছে খুব সম্ভব, অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এলেই তাদের ব্যতিব্যস্ত আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এদিকের এই জানলাটার কাছাকাছি একটা জামরুল গাছের ডাল এগিয়ে এসেছে—সেখানে টুনটুনিদের বাসা আছে বলে মনে হয়—ওই নিতান্ত ছোট ছোট পাখিগুলিই তাদের মিলিত চিপিট-চিপিট আওয়াজে যেন সমস্বরে বিকাশকে ডাকতে থাকে :

'উঠে পড়ো হে, আর্লি টু বেড অ্যাণ্ড—'

প্রথম দিনকয়েক বিরক্তি লেগেছিল, এখন উঠেই পড়ে। খুলে দেয় জানলা। বাইরে থেকে ঠাণ্ডার ঝলক আসে। বন্ধ ঘরের গুমোট, পুরোনো চুন-বালির গন্ধ—মশার ঝাঁক বেরিয়ে যেতে থাকে বাইরে। বিকাশও বেরিয়ে আসে। একটু দাঁড়ায় বারান্দায়—অন্যমনস্ক হয়ে তাকায় পোড়ো মহলটার দিকে, পায়রাদের বকবকানি শোনে—তারপর তালা দেওয়া ঘরটা পাশে রেখে, সুনুদের ঘরটা ছাড়িয়ে, অন্ধকার সিঁড়িটা বেয়ে নেমে যায় কুয়োতলার দিকে।

কাকিমা জেগে উঠেছেন আরো আগে—রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া। বাইরের ঘর থেকে হুঁকোর আওয়াজ ওঠে—শশাঙ্ক কাকা তাঁর কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে আসতে আসতে সুনুর পড়ার আওয়াজ কানে যায় : 'গ্রামং নিকষা নদী। প্রত্যঙ্মুখিঙ্—'

এক-আধদিন এই সময়ে তার বেহালাটা বাজাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী যে হয়েছে—সমস্ত মনটাই কেমন বেসুরো হয়ে গেছে তার। বেহালাটাকে আবার কেসে পুরে চালান করেছে খাটের তলায়। আর পাঁচ-সাতদিন ধরে খালি ভাবছে এই বাড়িটা থেকে তার চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না—কোনোমতে বলা যাচ্ছে না শশাঙ্ক কাকাকে। এই শনিবারে একবার কলকাতা থেকে ঘুরে আসবে ভেবেছিল, কিন্তু তাও হয়ে উঠল না। মনীষার সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হত, কিন্তু তাতেই বা কী

হবে ? মনীষা বলবে, 'এই তো বেশ আছি, ভাবছ কেন আমার জন্তে ?'

কলকাতা মানেই ক্লান্তি। আর সেই ক্লান্তিটা মনীষাকে ঘিরে। একটা বিষণ্ণ বিকেলে হয়তো মুখোমুখি বসবে দুজনে। চশমার আড়ালে আরো ম্লান, আরো আচ্ছন্ন দেখাবে মনীষার চোখ।

'আমার জন্মে ভেবো না তুমি।'

'তবে কে ভাববে ? তুমি যে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছ মনীষা।'

'হারাব কেন ? অপেক্ষা করব তোমার জন্তে।'

'কতদিন ?'

এ কথার আর জবাব পাওয়া যাবে না।

একা ফিরতে ফিরতে মনে হবে, কলকাতা দিনের পর দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। তার ঘর-বাড়ি, তার পথ-ঘাট, তার আকাশ—সব। এখানে সব কিছু মনীষার মতো একটা বিশ্রামহীন কাজের মধ্য দিয়ে ফুরিয়ে যেতে চলেছে—কারো ছুটি নেই, কারো মুক্তি নেই।

তা হলে আর কী দোষ করল নিয়োগীবাড়ি ?

বাসা বদল ? একটা করা দরকার। কিন্তু স্নুমুর কথা মনে হয়। 'বিকাশদা, আপনি চলে যাবেন না এখান থেকে—বিকাশদা—'

এই সকাল, এই পাখির ডাক, এর মধ্যেও মনটার মুক্তি মেলে না। প্রিয়গোপালবাবু অবশ্য তার জন্তে উৎসাহ ভরে বাসা খুঁজছেন একটা। বলেছেন—'একটা প্রায় পেয়েছি স্থার, ব্যাঙ্ক থেকে বেশ কাছেই হবে। দু-চারদিন পরে দেখাব আপনাকে।'

'আচ্ছা।'

সকালটা ভার হয়ে থাকে। কোনো কাজ নেই। কিছুই করবার থাকে না। বেহালাটার কথা ভাবতেই ভালো লাগে না তখন। পাখিরা তো উপদেশ দিয়ে যায় : 'আর্লি টু বেড অ্যাণ্ড আর্লি টু রাইজ'—কিন্তু ভোরে উঠেই বা কী লাভ ? কলকাতায় বরং খবরের কাগজ পৌঁছে যায়, কিন্তু এখানে কাগজ আসতে প্রায় দশটা—সেটা পড়তে হয় অফিসে গিয়ে।

চুপ করে বসে থাকা। জানলা দিয়ে আলো ফোটা। বারান্দায় 'মিগাঙ্কভুমার নিয়োগী'র কলরব—কখনো এক টুকরো কান্না ('[illegible])—ছোড়দি আমাকে মারল।' তলা থেকে শশাঙ্কর এক-আধটা দাঁড়ি-কাটানো ধমক। আরো পরে স্নুমুর হাতে চা।

এক-আধদিন স্নুমু অল্প-সল্প পড়া বুঝতে আসে। মেয়েটা একেবারে বোকা নয়। একটু যত্ন করে কেউ পড়ালে হয়তো ফার্স্ট ডিভিসনেই পাস করবে। তখন মনে হয়, অন্তত এই মেয়েটার জন্তেও এই বাড়িতে তার থাকা চলে। ওর মা মনীষার মতো হারিয়ে গেছেন—ওর মাসীকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে—ওর যে দিদির বিয়ে হয়েছে

সে-ও কোথাও মৃত্যুর সাধনা করছে কিনা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এই মেয়েটি তার উজ্জ্বল চোখ নিয়ে অন্ধকারের সূর্যমুখীর মতো ঝরে পড়বে—এই কথাটা ভাবতে গেলেই বুকের ভেতরে কোথায় একটা যন্ত্রণা বেজে ওঠে।

কিন্তু কী সে করতে পারে? শশাঙ্ক কাকা তো সম্পর্কের দিক থেকে তার কেউ নন। তাঁর ছেলে-মেয়ের ভাবনা ভাববার জন্যে তিনি নিজেই আছেন—সেখানে বিকাশের কোনো পরামর্শ তাঁর নিশ্চয়ই দরকার হবে না।

অস্বস্তি। বিরক্তিকর। অকারণে রাগ হতে থাকে নিজের ওপর। সেই রিকশ-ওলাকে দিয়েই শুরু। তারপর এক-একজন। প্রভাকর। কানাই পাল। অমলা। দুত্তোর!

কিচ্ছু না—কারো জন্যে তার ভাববার দরকার নেই। যেচে নিজের ওপর কতগুলো ঝঞ্ঝাট টেনে আনা। আজই আবার তাড়া দিতে হবে প্রিয়গোপালবাবুকে।

হাত-ঘড়িটায় সাড়ে ছ'টা। চা আসতে কিছু দেরী হবে আরো। বসে বসে এইসব ভুতুড়ে ভাবনার কোনো মানেই হয় না। বিকাশ নিজেকে বললে, ওয়েক আপ। একটু ঘুরে এসো বরং বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

চাদরটা গায়ে চড়িয়ে নেমে এল দোতলা থেকে।

বাইরের ঘরে শশাঙ্ক কাকা। যথা নিয়মে বসে আছেন কাগজপত্র নিয়ে। দেওয়ালে ছেলে-পড়া ছবি। কোণায় দাঁড়ি-পাল্লা—ক'টা পুরোনো ড্রাম। খোলা আলমারির ভেতরে ধুলোয় বিবর্ণ সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মাদুলির হ্যাণ্ডবিলগুলো। একটা অদৃশ্য ঘড়ি টক-টক করছে।

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'বিকাশ নাকি?'

'আজ্ঞে।'

'কোথায় বেরুচ্ছ এই সকালে? চা-টাও তো হয়নি বোধ হয়।'

'বাইরে একটু বেড়িয়ে আসব।'

'অ—মর্নিং ওয়াক?' শশাঙ্ক হাসলেন: 'সে ভালো। কিন্তু দেরী কোরো না।'

'আজ্ঞে না।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলল পুকুরটার ধার দিয়ে। নারকেল গাছগুলো থেকে এখনও টপটপ করে শিশির পড়ছে। চটির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে ভিজে ধুলো।

এমন সময় সামনেই দেখা গেল মেজদাকে।

এই শীতেও গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি ছাড়া কিছুই নেই। হাত দেড়েক লম্বা একটা গাব-ভেরেণ্ডার ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করছে। অন্তত গোটা-দশেক আলাদা দাঁতন তৈরী করা যেত তা থেকে।

ঠিক স্বাভাবিক ভাবে দাঁতন করছে, তা নয়। প্রবল বেগে ভেরেণ্ডার ডালটা মুখের এক পাশ থেকে আর এক পাশে ছোটাছুটি করছে। পাগলের মাড়ি না হলে এতক্ষণে রক্তারক্তি হয়ে যেত—মুগ্ধভাবে লোকটার দিকে তাকিয়ে মনে হল বিকাশের। দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নারকেল গাছে ঠেসান দিয়ে, ওপরে কতগুলো কাক যে জটলা করছে তাই দেখছে একমনে। দন্ত-ধাবনটা বোধ হয় খুব জরুরি নয়—একটা কিছু করা দরকার, তাই করে যাচ্ছে।

পাশ কাটিয়ে গেলে কিছুমাত্র ক্ষতি হত না—মেজদার মন ছিল কাকেদের দিকে। কিন্তু রাত নয়—দিনের আলো। সিঁড়ির তলার অন্ধকার থেকে একটা ভৌতিক আবির্ভাব নয়—অন্ধকার বাগানের ভেতর হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়িয়ে পাগানিনি না কার সেই উৎকট গল্পটাও নয়—এ আর এক মানুষ—যার জন্যে কুমুদ সেনগুপ্তের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কাকিমার মমতায় যে বেঁচে আছে—যে-লোকটা নিজেই লাইব্রেরির বইগুলোকে এখনো যখের ধনের মতো আঁকড়ে বসে রয়েছে—যার পাগল হওয়ার পেছনে—

মেজোজ্যাঠার জন্যে সুদূর বেদনাটা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ লোকটা সম্পর্কে বিকাশ নিবিড় সমবেদনা বোধ করল একটা।

'মেজদা!'

ডেকেই খেয়াল হল, শশাঙ্ক কাকার দাদাকে তারও কাকা কিংবা জ্যাঠা একটা কিছু বলা উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর সংশোধন করা চলে না। তা ছাড়া খুব সম্ভব এ নিয়ে মেজদাও কিছু মনে করবে না।

দাঁতন বন্ধ করে মেজদা ঘোলা-ঘোলা চোখে বিকাশের দিকে চাইল।

'তোকে তো চিনি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—চেনেন।'

'তুই তো বেহালা বাজাস!'

'চর্চা করি।'

'ভারী খারাপ বাজনা।' মেজদার স্বর গভীর হয়ে উঠল: 'ওর সুর শুনতে পাস না? সব সময় মনে হয় একটা কান্না আসছে ওর ভেতর থেকে—ওয়েলিং—যেন সমুদ্র পার হয়ে—আকাশ পার হয়ে অনেক দূর থেকে—মরা মানুষের জগৎ থেকে আসছে।'

কথাগুলো কি পাগলের মতো? ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু বিকাশ একটু চমকালো। আবার হয়তো পাগানিনির মতো বিকট গল্প শুরু হবে একটা। কে কার রক্তনাড়ী ছিঁড়ে নিয়ে—তার ভালোবাসার জনকে হত্যা করে বেহালার তার তৈরী করেছিল—সেই রকম গল্প।

কিন্তু আজ আর মেজদা সেদিক দিয়ে গেল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোর

নাম কি?'

'বিকাশ। বিকাশ মজুমদার।'

'তুই বিকাশ ঘোষকে চিনিস?'

'আজ্ঞে না।'

'খুব ভালো ছাত্র ছিল। আমাদের সঙ্গে পড়ত। ওর হীরো ছিল নেপোলিয়ান। বলত, ওই একটা বীরের মতো বীর জন্মেছিল ইয়োরোপে। ওর মতো লোকই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। তুই কী বলিস?'

'আজ্ঞে কিছুই না। হিস্ট্রি আমার সাবজেক্ট নয়। আমি কমার্সের ছাত্র।'

'তোর কোনোদিন কিচ্ছু হবে না।'

নিঃসন্দেহ। বিকাশ একটু হাসল।

'আমি কী বলতুম—জানিস?'

'না।'

'আমি বলতুম, টাইর‍্যাণ্ট। ইয়োরোপের লিবারেশনে নেমেছিল—শেষে সম্রাট সেজে বসল। দিলে রেভোলিউশনটাকেই শেষ করে। তবু ওই নেপোলিয়নের নাম শুনলে রূপসীদের চোখ দিয়ে জল পড়ে—ননসেন্স!'

বিকাশ শুনে যেতে লাগল। আশ্চর্য, এই লোকটা পাগল! এই লোকটার গাঁজা খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

মেজদা বললে, 'বিকাশ ঘোষের শেষে কী হল বল্ তো?'

'জানি না।'

'নেপোলিয়ান হতে চেয়েছিল। বলেছিল, আমাকে কেউ সেণ্ট-হেলেনায় নিয়ে যেতে পারবে না, আমি উইণ্ড্সের প্যালেসে যাব ঘোড়ার পিঠে। তারপর কি হল, জানিস? ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে এক গাদা বই পড়ে যেই চৌরঙ্গীতে নেমেছে, অমনি চাপা পড়ে গেল ট্যাক্সির তলায়। হা-হা-হা—'

ভেরেণ্ডার দাঁতনটা দ্বিগুণ বেগে চলতে লাগল মাড়ির ওপর দিয়ে। চোখ আবার কাকেদের দিকে।

বিকাশ বললে, 'আচ্ছা মেজদা—চলি।'

মেজদা জবাব দিল না। বিড় বিড় করে কী বলতে লাগল নিজের মনে।

বিকাশ দু-পা এগিয়েছিল, হঠাৎ মেজদা ডাকল: 'শোন্। এই—শুনে যা।'

ফিরে আসতে হল।

'তুই লোকের বই চুরি করিস?'

অদ্ভুত প্রশ্ন! বিকাশ হেসে ফেলল: 'না।'

'কারো বাড়িতে গিয়ে, তার টেবিল-শেল্ফ্—আলমারি থেকে টুক করে একটা বই তুলে নিয়ে চাদরের তলায় পাচার করবার অভ্যেস নেই তোর?'

'আজ্ঞে না।' বিকাশ কৌতুক বোধ করে বললে, 'খামোকা চোর ভাবলেন কেন আমাকে?'

'আরে সিঁদেল চোরকে তো চেনা যায়, সে তো রাতের বেলা গায়ে তেল-কালি মেখে সিঁদকাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে—কিন্তু ভদ্রলোককেই বোঝা যায় না—কোন্‌টা চোর, কোন্‌টা খুনী। তা হলে তুই বলছিস, পরের বই তুই হাতাস নে?'

'আজ্ঞে না—কোনো দিন নয়।'

'তা হলে আয় আমার সঙ্গে।'

বলেই আর কথা নেই, খপ করে মেজদা বিকাশের হাতটা ধরে ফেলল। অস্থিসার ঠাণ্ডা শক্ত আঙুলগুলোর ছোঁয়ায় সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল বিকাশের—একটা নখের খোঁচাও যেন লাগল বলে মনে হল।

'কোথায় যাব?'

ভেরেণ্ডার ডালটা মেজদা ছুঁড়ে দিলে জলের ভেতরে। ঘোলাটে চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল একবার। বললে, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তো আর শশাঙ্ক নিয়োগী নই যে মানুষ ধরে খাব। চলে আয় আমার সঙ্গে।'

প্রথম দিনে লোকটাকে দেখে 'কপালকুণ্ডলা'র মতো মনে হয়েছিল, এখন হাতের মুঠোটা একেবারে কাপালিকের মতো বোধ হল তার। অস্থিসার আঙুলগুলো কী অস্বাভাবিক শক্ত। পাগলের গায়ে বেশি জোর থাকে—এই রকম জনশ্রুতি আছে একটা। বিকাশ হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না—কিছুই বিশ্বাস নেই, হয়তো মেরেই বসবে।

মেজদা আবার বললে, 'ভয় নেই, আয়।'

নিয়ে চলল বাড়ির দিকেই। কিন্তু বাড়িতে নয়। খিড়কির দিকে টেনে নিয়ে চলল। তারপর পেছনের সেই পুকুরটা—যেটা বিকাশের জানলা দিয়ে দেখা যায়—যার আধভাঙা ঘাটে মেয়েরা দুপুরে বাসন মাজে, তার পাশ দিয়ে একটা ছাইগাদা পার হয়ে—সোজা এনে একটা ভাঙা দরজার মধ্যে তাকে ঢোকালো।

একবার তাকিয়েই বিকাশ বুঝতে পারল কোথায় এনেছে। সামনেই জঙ্গলে-ভরা চণ্ডীমণ্ডপ। মাথার ওপরে ঝুলে পড়া দোতলা। সেখান থেকে পায়রার ডাক। ঠিক তার মুখোমুখি একটু নতুন—একটু রঙ-করা দোতলার বারান্দা একটা, তার রেলিংয়ে শাড়ি ঝুলছে। নীল রঙের ওই ডুরে শাড়িটা বিকাশের চেনা—কালকেই ওটা সে দেখেছিল স্বপ্নর পরনে।

মেজদা তাকে টেনে এনেছে নিজের মহলে। সে একতলার ঘরগুলো বিকাশের

বারান্দা থেকে ভালো করে দেখা যায় না—তারই একটাতে।

চুন-বালির স্তূপ। বারান্দা জুড়ে বড়ো বড়ো গর্ত—সাপের নিশ্চিন্ত উপনিবেশ তৈরী হতে পারে সেখানে। ইঁট বেরিয়ে আছে দেওয়ালে। চামচিকের ময়লার কটু দুর্গন্ধ।

মেজদা বললে, 'এই ঘরে।'

ঘরে পা দিয়েই বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

মস্তবড়ো হল্, কোনো ভালো পড়বার ঘর ছিল এককালে। সাত-আটটা আলমারিতে ছন্নছাড়াভাবে কতগুলো বই—কিছু তাদের মেজেতে ছড়ানো। চারদিকে বইয়ের ছেঁড়া পাতার কুচি। ধুলোয়-ভরা একটা ডেক চেয়ার, অনেকদিন তাতে কেউ বসেনি। একটা বড়ো টেবিলে অস্বচ্ছ কাচের ডুম-দেওয়া মস্ত রীডিং ল্যাম্প—কতকাল সে ল্যাম্প জেলে লেখাপড়া করেনি কেউ।

ইতিহাসের বই সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই বিকাশের। কিন্তু বইগুলোর চেহারা দেখলে আন্দাজ করা যায়। সন্দেহ নেই, হেড মাস্টারমশাইয়ের লোভ হওয়া স্বাভাবিক।

মেজদা বললে, 'দেখছিস? মাই স্টাডি!'

'দেখছি।'

'খবর্দার—কোনো বইতে হাত দিবি নে।'

'আজ্ঞে না।' হেডমাস্টারমশাইয়ের লোভ স্বাভাবিক, তাড়া খাওয়াটা আরো স্বাভাবিক।

বলতে বলতে মেজদা মেজেয় ছড়ানো খান-কয়েক মোটা বইকে নির্মমভাবে মাড়িয়ে চলে গেল। কয়েকটা ছেঁড়া পাতা পড়ে ছিল তাদের কুড়িয়ে নিয়ে ছিঁড়তে লাগল কুচি-কুচি করে।

বিকাশ বললে, 'বই ছিঁড়ছেন কেন?'

'আমার খুশি।' মেজদা চোখ পাকালো: 'তোর কিছু বলবার আছে?'

'আজ্ঞে না—না', সভয়ে পেছিয়ে এল বিকাশ।

মেজদা বললে, 'সব চোর, বুঝলি—সব চোর। ওই শশাঙ্কটার মতলব জানিস? আমাকে পাগল সাজিয়ে বইগুলো বিক্রি করে দেবে। তাই চোরের হাতে পড়বার আগে আমি সব শেষ করে দিয়ে যাব। কিন্তু—' মেজদা একটু থামল: 'খুকু মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে?'

বিকাশ একটু চমকালো। বললে, 'ভালো।'

'ভালো নয়—খুব ভালো। ঠিক ওর মা-র মতো। ওর মা-র নাম জানিস? সুধা। সুধাময়ী। একেবারে ঠিক নাম। শশাঙ্কর মতো রাস্কেলের হাতে পড়ে—'

বিকাশ চুপ করে রইল। মেজদা কি পাগল?

মেজদা আবার বললে, 'আমার একটা ইচ্ছে ছিল। ওই মেয়েটাকেই আমার লাইব্রেরিটা দিয়ে যাব। কিন্তু তা কি হতে দেবে শশাঙ্কটা? ঠিক কেড়ে নেবে।'

'যদি কেড়ে না-ও নেন—' বিকাশ হাসতে চেষ্টা করল: 'আপনিই তার আগে সব শেষ করে দেবেন বলে মনে হচ্ছে আমার।'

'তোর কী—তোর কী তাতে? তুই কে এ-সব কথা বলবার?' মেজদার চোখ আবার অস্বাভাবিক হয়ে উঠল: 'তুই তো নরবলির পাঁটা—শশাঙ্ক একদিন তোকে এক কোপে সাবাড় করে দেবে।'

ঘরটা গম গম করে উঠল অস্বাভাবিক গলার আওয়াজে। বিকাশ পিছিয়ে এল দরজার দিকে।

'দাঁড়া।' মেজদা এগিয়ে এল, কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো, কয়েকটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরল বিকাশের কাঁধ: 'আমার কথা শোন্—পালা এখান থেকে। বিয়ে করেছিস?'

বিভ্রান্তভাবে বিকাশ বললে, 'না।'

'তা হলে স্বনুকে নিয়ে পালা। বিয়ে কর্ মেয়েটাকে। বাঁচা ওটাকে—তুই-ও বাঁচ্। তা হলে এই লাইব্রেরি তোদের যৌতুক দেব। নইলে রাস্কেল—'

কিন্তু বিকাশের দু কান ভরে ঝড় উঠেছিল এর আগেই। বুকের ভেতরে দেখা দিয়েছিল ঢেউ। এক সেকেণ্ড আর সে দাঁড়ালো না—বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে, চুন-বালি-ইট-খানা-খন্দল টপকে, ছাইগাদা আর খিড়কির পুকুর পার হয়ে চলে গেল। হেডমাস্টার মশাইও সেদিন এত জোরে ছুটে পালিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ।

অফিসে এসে বিকাশ প্রিয়গোপালবাবুকে ডাকল।

'দু-তিন দিনের মধ্যেই বাসাটা ঠিক করে দিন মশাই। নইলে এর পরে বাক্স-বিছানা নিয়ে আমাকে উঠতে হবে আপনার ওখানেই।'

এগার

অফিস-ফেরত সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে বিকাশ একবার থেমে দাঁড়ালো। বাইরে শশাঙ্ক কাকার বসবার ঘর জমজমাট। কাকা রয়েছেন—চার-পাঁচজন ভদ্রলোকও এসে বসেছেন। ঘরের চেয়ার তিনটেতে কুলোয়নি, বাইরের বারান্দা থেকে বেঞ্চিটাকেও ভেতরে টেনে আনা হয়েছে।

কী একটা উত্তেজিত আলোচনা চলছে মনে হল। একজন কে যেন বললেন, 'না,

আর বাড়তে দেওয়া যায় না।'

চড়া সুরে শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'বাড়তে দেওয়া কী! বিষদাঁত এবার ভেঙে দিতে হবে। ছোটলোকের পয়সা হলে ধরাকে একেবারে সরার মতো দেখে!'

লক্ষ্যটা কানাই পাল নাকি? বিকাশ একবার ভাবল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের পলিটিক্সে তার কোনো উৎসাহ নেই। যিনি যাঁর খুশি বিষদাঁত উপড়ে দিতে পারেন, তার কিছুই আসে যায় না।

নিজের ঘরে গিয়ে, কাপড়-জামা ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসতে সুনু রোজকার মতো চা নিয়ে এল। কিন্তু আজ আর বিকাশ সুনুর মুখের দিকে চাইতে পারল না। কালকের সারাটা রাত—আজ সমস্ত দিন মেজদার কথাগুলো ঝিনঝিন করেছিল তার মাথার ভেতরে। পাগলের প্রলাপ—কোনো মানে হয় না। তবু একটা মানে হয়তো কোথাও আছে। এই মেয়েটিকে এই বাড়ি থেকে উদ্ধার করতে পারলে হয়তো একটা ফুল অন্ধকারে ঝরে যেত না—সূর্যমুখী হয়ে ফুটে উঠতে পারত আলোর ভেতরে। কিন্তু কী করতে পারে সে? এ বাড়ির সে কে?

সুনু বললে, 'এত শুকনো কেন বিকাশদা? শরীর ভালো নেই?'

'না—না, বেশ আছি। ব্যাঙ্কে একটু বেশি খাটনি ছিল আজ, কতগুলো এরিয়ার পরিষ্কার করতে হল।'

একটু চুপ করে থেকে সুনু বললে, 'বেহালাটার কথা কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন।'

ক্লান্তভাবে বিকাশ বললে, 'মেজাজ নেই।'

সুনু আবার মিনিট খানেক চুপ করে রইল, দুটো গভীর চোখ মেলে চেয়ে রইল বিকাশের দিকে। তারপর আবার বললে, 'আমি জানি।'

অকারণেই বিকাশ চমকে উঠল: 'কী জানো তুমি?'

'এখানে আপনার ভালো লাগছে না। একদম ভালো লাগছে না।'

বিকাশ জোর করে হাসতে চেষ্টা করল।

'খুব সবজান্তা হয়ে বসে আছো দেখছি। এটুকু মেয়ের এত পাকামো কেন?'

সুনু হাসল না—চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার বললে, 'আমি ছেলেমানুষ নই বিকাশদা—আমি জানি। সেই ভালো—আপনি আর কোথাও বাসা নিয়ে চলে যান।'

আর দাঁড়ালো না—বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চূড়ান্ত একটা বিরক্তি নিয়ে চুপ করে বসে থাকল বিকাশ। খাবার মুখে দিতে ইচ্ছে করল না, চা খাওয়ার উৎসাহ এল না। চলে যাওয়াই ভালো। মাত্র তিন সপ্তাহ আগেও নিয়োগীবাড়ির অস্তিত্ব তার জীবনে কোথাও ছিল না—সেখানকার সুখ-দুঃখ মন্দ-ভালোর কোনো খবরও কোনোদিন তার কাছে গিয়ে পৌঁছোত না। তা হলে আজই এ নিয়ে

তার ভাববার কী আছে? যেমন এসেছিল, তেমনি চলে যাবে। বাংলাদেশে হয়তো লক্ষ লক্ষ স্বত্নু—স্বর্ণা—সোনালী এমনি করে হারিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকদিন—তাদের সকলকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে সে পৃথিবীতে আসেনি। মনীষাকে পর্যন্ত যে উদ্ধার করতে পারল না—কোন্ সোনালির দিকে সে হাত বাড়াবে?

তা হলে—কাল প্রিয়গোপাল যে বাসাটার কথা বলেছেন সেইটেই একবার দেখে আসা দরকার। পছন্দ হোক আর না-ই হোক, এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে। নিয়োগীবাড়িকে মন থেকে একেবারে মুছে দেবে সে।

যা হোক কিছু খেয়ে, এক চুমুকে ঠাণ্ডা চা-টা শেষ করে বিকাশ উঠে পড়ল। ঘরে সন্ধ্যার সেই শীতার্ত বিশ্রী ছায়াটা, জানলা-দরজা দিয়ে মশার ঝাঁক। পুরোনো বাড়ির গন্ধ। মেজদার মহলে পায়রার পাখা ঝাপটানি। বিবর্ণ আকাশের তলায় ছড়িয়ে পড়া চামচিকের দল। এই আসন্ন সন্ধ্যাটাই সবচেয়ে বিরক্তিকর, যেন বুকের ওপরে চাপ দিতে থাকে একটা। এই সময়ে এই রকম একটা ঘরে বসে থাকলে খুব স্বাভাবিক মানুষও আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারে।

বিকাশ বেরিয়ে আসছিল, দেখা হয়ে গেল শশাঙ্ক কাকার সঙ্গে। তখন তাঁর বাইরের ঘরের আসর ভেঙেছে। জামা-কাপড় পরে তিনিও বেরুতে যাচ্ছেন।

'কোথায় চললে হে?'

'আজ্ঞে কোথাও না।'

সত্যিই কোথাও নয়। যেতে হলে এক প্রভাকরের বাড়ি। কিন্তু কোনো উৎসাহ হচ্ছে না। এমনি এলোমেলো ঘোরা। যেদিকে চোখ যায়।

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'তবে চলো আমার সঙ্গে।'

বিকাশ আশ্চর্য হল।

'আপনার সঙ্গে? কোথায়?'

'একটা মীটিঙে।'

'কিসের মীটিঙ?'

'এখানে একটা কলেজ করবার কথা হচ্ছে জানো তো? তারই প্রিপ্যারেটরী কমিটির।'

'সেখানে আমি যাব কেন? আমি তো মেম্বার নই।'

'আরে মেম্বার-টেম্বার আবার কী? এ-সব জায়গায় তোমাদের কলকাতার মতো ফর্মালিটি নেই।' শশাঙ্ক কাকা একটা ভঙ্গি করে হাত নাড়লেন: 'চলো—চলো। বেশ জমে উঠবে—দেখে নিয়ো।'

'জমে উঠবে মানে?' বিকাশ সন্দিগ্ধ হল একটু।

'গেলেই বুঝতে পারবে।' শশাঙ্ক কাকা মিটমিট করে হাসলেন।

'কিন্তু আমার যাওয়াটা ঠিক হবে?'

'যে-কোনো ইন্টারেস্টেড্ ম্যানই যেতে পারে। চলো হে—'

আমি ইন্টারেস্টেড্ নই, এ-কথা বলা গেল না। এই একঘেয়েমিটাও অসহ্য হয়ে উঠেছে। কলকাতায় ক্লান্তি জমে ওঠে—মধ্যে মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিক্‌বিদিকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কলকাতার বাইরে এলে দিন-রাত্রি যে অবসাদে এমন ভারগ্রস্ত হয়ে ওঠে—কলকাতার ছেলের রোম্যান্টিক কল্পনায় এই সত্যটা কোথাও ছিল না।

তার চেয়ে যে-কোনা একটা অভিজ্ঞতা হোক। সময় কাটুক।

চলতে চলতে শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'কানাই পালের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—না?'

বিকাশ মুহূর্তে সতর্ক হল। ক'দিন ধরেই শশাঙ্ক কাকার কাছ থেকে এই প্রশ্নটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। অপেক্ষা করছিল অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে।

ছোট্ট করে বিকাশ জবাব দিলে, 'হয়েছে। ব্যাঙ্কে এসেছিলেন।'

'তারপর তোমাকে তো গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিল ওর সেই বাগানবাড়িতে।'

বিকাশ চমকালো না। শশাঙ্ক কাকার কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না—কাক-বকের পেটের খবরও তিনি টের পান। তাঁর কাছে আত্মগোপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা।

'হাঁ—সেদিন সেই স্পোর্টসের পর।'

'হুঁ।' মেঘলামুখে শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'বেশ নিরিবিলি জায়গাটি করে নিয়েছে—মদ গেলবার, বেলেল্লাপনা করবার। বদমাইসির ঘাঁটি ওটা।'

'আমি ও-সব কিছু দেখিনি।'

'আহা—প্রথম দিনেই তোমার সামনে কি আর আসল চেহারা বের করবে? কিন্তু আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, বাবাজী। তুমি অবিশ্যি ভালো ছেলে, ফাঁদে তোমায় ফেলতে পারবে না, কিন্তু আর যা করো তা করো—ওই পাপের জায়গাটিতে আর যেয়ো না। মুনিরও তো মতিভ্রম হয়।'

কিছুক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে চলল। তারপর:

'কানাই পাল তোমায় কী বললে?'

আবার সতর্ক হতে হল। একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হবে।

'বিশেষ কিছু না। নিজের জীবনের কথা বলছিলেন। খুব গরীব ছিলেন, ব্যবসা-ট্যাবসা করে কিভাবে উঠে দাঁড়ালেন—এইসব কথা।'

'হুঁ—একেবারে কর্মযোগী মহাপুরুষ!' শশাঙ্ক দাঁতে দাঁতে ঘষলেন: 'সবাইকে ডেকে ডেকে আত্মজীবনী শোনাচ্ছেন—আমি কী মহৎ কর্ম করেছি, চোখ মেলে ভাখো এক-

বার! কানাই পাল তো নয়—কেষ্টদাস পাল! কিন্তু কত মানুষকে ঠকিয়েছে, কত ব্ল্যাক-মার্কেট করেছে—কত বোকা লোকের সর্বস্ব গিলেছে—সে-সব কিছু বলেনি?'

'আভাস দিয়েছেন। বলেছেন সম্পূর্ণ সৎপথে থাকেননি।'

'সৎপথে!' শশাঙ্ক কাকার হাতে একটা ছড়ি ছিল, তাই দিয়ে একটুকরো ইটকে ছিটকে দিলেন হাত সাতেক: 'দশ বছর ঘানি ঘোরানো উচিত ছিল ওর—ব্যাটা শয়তান!'

শত্রুতা আছে, বিকাশ জানে। কিন্তু বিদ্বেষটা কতখানি বিষাক্ত এই মুহূর্তে সেটা ধরা পড়ল। এর আগে শশাঙ্ক কাকার এ-রকম ধৈর্যচ্যুতি তার চোখে পড়েনি।

করাত চালানোর মতো শব্দ উঠতে লাগল শশাঙ্ক কাকার গলায়: 'বুঝেছ—এরাই হচ্ছে এখন দেশ-গাঁয়ের মুরুব্বি, এদের হাতেই পঞ্চায়েত, বি-ডি-ও এদেরই লোক, এদের বাড়িতেই এস-ডি-ওর খানাপিনা, মন্ত্রীরা এদের কথাতেই ওঠে বসে। টাকা—টাকা। সেইটেই হল আসল কথা! চুরি, ডাকাতি, বাটপাড়ি—যেভাবে হোক, টাকা করতে পারলেই হল। তারপরেই তুমি নৈবেদ্যের চুড়োয় উঠে সন্দেশটির মতো বসে রইলে, তোমাকে ঘাঁটায় সাধ্য কার!'

বিকাশ জবাব দিল না।

'আর মরাল ক্যারেক্টার!' যেন চুরি-ডাকাতিটা মর‍্যাল ক্যারাক্টারের আওতায় আসে না, সেইভাবে শশাঙ্ক কাকা বলে যেতে লাগলেন: 'একদম ক্যারেক্টারলেস। ওর ওই যে বাগানবাড়িটি দেখলে না? মূর্তিমান পাপের আড্ডা। ওখানে যে-সব কাণ্ড ঘটে—কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ—সেগুলো শুনে তোমার আর কাজ নেই।'

একটু চুপ করে থেকে শশাঙ্ক বললেন, 'কানাই পাল আর কিছু বলেনি?'

'আর কী বলবেন?'

'আমার নিন্দে করেনি তোমার কাছে?'

একটা ঢোক গিলল বিকাশ।

'আজ্ঞে না—সে-রকম কিছু—'

'সে রকম কিছু?' শশাঙ্ক কাকার স্বর শক্ত হল: 'দু-চার কথা তা হলে বলেছে?'

'আজ্ঞে না—না—' ত্রস্ত হয়ে বিকাশ বললে, 'কোনো কথা বলেননি।'

'তোমাকে আমার নিজের লোক ভেবে সাহস পায়নি তা হলে। কিন্তু রাতদিন আমার নামে যা নয় তাই বলে বেড়ায় সে আমি জানি। আমি ওর জিভটা একেবারে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

পারলে ভালোই, বিকাশ ভাবল। কিন্তু কানাই পালের জিভটা অনেক উঁচুতে—অতদূর পর্যন্ত কাকার হাত পৌঁছবে কিনা—সেইটেই বোঝা গেল না নিশ্চিন্ত ভাবে।

পাশ দিয়ে পর পর দুটি সাইকেল বেরিয়ে গেল আলো ফেলে। অল্পবয়সী ছেলে দুজন। তাদের দেখে একজন কিছু বলল, আর একজন হেসে উঠল তাতে।

অন্ধকারে শশাঙ্কর চোখ দেখা গেল না। কিন্তু আবার করাত-কাটার মতো করকর করে শব্দ হল গলায়।

'ওই চললেন দুজন।'

'ওরাও কি কানাইবাবুর দলের লোক নাকি?'

'আরে না—না, ওদের কাছে তো কানাই পাল মুর্দাবাদ।'

'আপনার সাপোর্টার বলুন।'

'আমার? কোন্ দুঃখে হে?' ঝাঁ-ঝাঁ করে শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'আমার জমির ধান যাতে আমার গোলায় না ওঠে সেই তালেই তো আছে এরা। আমিও এদের কাছে মুর্দাবাদ। বুঝতে পারছ না? এঁরা হলেন সব ইনকিলাবের দল।'

বিকাশ নিঃশব্দে হাসল একটু। অন্ধকারে শশাঙ্ক কাকা দেখতে পেলেন না।

'এখানে এদেরও দল আছে বুঝি?'

'কোথায় নেই? রক্তবীজের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে কাউকে আর বাকী রাখবে না—সব একেবারে রোলার দিয়ে পিষে সমান করে দেবে। সেজন্যে আমার দুঃখ নেই, বুঝেছ? ওই কানাই পাল আর অভয় কুণ্ডুরাও যাবে—সকলের আগেই যাবে। তখন আমিও বলব—গলা ছেড়ে বলব—ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

প্রাণপণে একটা গলা-ফাটানো হাসিকে সামলে নিলে বিকাশ। একেবারে আদর্শ শত্রুতা। নিজের ঘর পোড়ে তো পুড়ুক—কিন্তু পরের বাড়ি ছাই করতে পারলেই হল।

কালীবাড়ির সামনে নাটমন্দির। সেখানেই মিটিং।

একটা চেয়ার-টেবিল রয়েছে—কানাই পাল বসেছেন সভাপতি হয়ে। সামনে গোটা-আটেক বেঞ্চিতে বসেছেন কুড়ি-পঁচিশজন স্থানীয় ভদ্রলোক। সভাপতি ছাড়া তাঁদের একজনকে বিকাশ চিনল, তিনি হেডমাস্টার কুমুদ সেনগুপ্ত। আরও কয়েকজনও তার মুখ চেনা, ব্যাঙ্কে তাঁদের সে আনাগোনা করতে দেখেছে। অধিকাংশই মাঝবয়েসী—শুধু দু-তিনজন বৃদ্ধ ঝিমন্ত চোখে চেয়ে আছেন। আর একটু পেছনে—জন-চল্লিশেক যুবক নিঃশব্দে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে—যেন কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এসেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কুমুদবাবুই কথা শুরু করলেন। অত্যন্ত সাধু বক্তব্য। বহুদিন থেকেই এখানে একটা কলেজের অভাব অনুভব করা যাচ্ছে। এখানকার ছেলে-মেয়েরা পাস করে অনেক দূরে দূরে পড়তে যায়। অথচ এই এলাকায় যে-সব ফীডার স্কুল রয়েছে, তাতে একটি কলেজ এখানে স্বচ্ছন্দেই চলতে পারে। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় কানাই পাল দশ বিঘা জমি দিতে চেয়েছেন, মাননীয় অভয় কুণ্ডু মশাই পঁচিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন। আশা করা যায়, একটু চেষ্টা করলেই লাখ-দুই টাকা সংগ্রহ করা কিছুমাত্র শক্ত হবে না। কুমুদবাবু বললেন, একটু তৎপর হলে সামনের সেশন থেকেই কলেজ শুরু করা যেতে পারে—আপাতত স্কুলের বাড়িতেই সকালে কলেজ চলতে পারবে।

আপত্তির কোনো কারণ কারো ছিল না।

কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন শশাঙ্ক কাকা।

'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি ?'

সভাপতি বললেন, 'নিশ্চয়।'

'কলেজ ছেলেদের জন্যেই হচ্ছে তো ?'

কুমুদবাবু বললেন, 'শুধু ছেলেদের জন্যে আলাদা কলেজ করা কি সম্ভব ? বহু ছাত্রীও তো রয়েছে। তাদেরও তো পড়তে দিতে হবে।'

'কো-এডুকেশন ?'

'আপাতত তাই। পরে ছাত্রী বেশি হলে সেপারেট সেকশন করা যেতে পারে তাদের জন্যে।'

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'আপত্তি করছি।'

কানাই পাল বললেন, 'কারণ ?'

শশাঙ্ক কাকা বললেন ; 'কারণটা বিজ্ঞ সভাপতিমশাই নিজেও জানেন। এই বয়েসের ছেলেমেয়েরা হল ঘি আর আগুন। পাশাপাশি রাখলেই—'

কথাটা শেষ হল না। পেছনে গোল হয়ে দাঁড়ানো যুবকদের মধ্য থেকে ধ্বনি উঠল : 'শেম-শেম।'

'শেম ?' শশাঙ্ক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : 'কিসের শেম ? এই সবের প্রশ্রয় দিয়ে দেশ-সমাজ-জাত অধঃপাতে গেল—কলকাতায় কী শ্রীক্ষেত্তর চলছে তার খবর অজানা আছে কারো ? কো-এডুকেশন চলবে না, পারেন তো মেয়েদের জন্যে আলাদা কলেজ করুন।'

আবার একটা চিৎকার উঠতে যাচ্ছিল পেছন থেকে, কানাইবাবু হাত তুলতেই সেটা থেমে গেল। কানাইবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'আলাদা কলেজ করতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো হত, কিন্তু শশাঙ্কবাবু জানেন তা সম্ভব নয়। কাজেই আপাতত এ-ব্যবস্থাই চলুক।'

এবার দু-তিনজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমরা শশাঙ্কবাবুকে সমর্থন করছি। কো-এডুকেশন চলবে না।'

'মেয়েরা কলেজে না পড়লেও ক্ষতি নেই। যাঁরা পারেন—বাইরে পাঠিয়ে পড়াবেন।'

'শুধু ছেলেদের কলেজ করুন।'

'নইলে বন্ধ করে দিন সব। দরকার নেই কলেজ হয়ে।'

'ফসিল—ফসিল—রক্ষণশীলের দল—' যুবকদের সমস্বর শোনা গেল।

কানাইবাবু আবার হাত তুললেন।

'আপনারা একটু শান্ত হয়ে বুঝতে চেষ্টা করুন। দিনকাল সব বদলে গেছে। মেয়েরা এখন এরোপ্লেনের পাইলট পর্যন্ত হচ্ছেন, কোথায় তাঁদের ঠেকিয়ে রাখবেন? গায়ের জোরে আপনারা বান রুখতে পারবেন না। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়া নিয়ে যে আপত্তি আপনারা কেউ কেউ তুলছেন, তা শুনলে পাড়াগাঁয়ের দিদিমারাও আজকাল হেসে ওঠেন। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে সবটা বোঝবার চেষ্টা করুন।'

'আমাদের বোঝবার মতো বয়েস হয়েছে—অনুগ্রহ করে উপদেশ না দিলেও চলবে।'

'শেম-শেম।'

সভার আবহাওয়া তেতে উঠতে লাগল ক্রমশ। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিকাশ। এ-কালের দিনে এটাও যে একটা সমস্যা হয়ে উঠতে পারে, এ নিয়ে এমন একটা উগ্র উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে, কলকাতার ছেলেদের কাছে তা কল্পনারও বাইরে ছিল। বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে এখনো তার চিনতে বাকী আছে—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ এখনো একেবারে রূপকথা হয়ে যায়নি!

বিরক্তির সঙ্গে ভাবছিল উঠেই পড়া যাক, এই বুদ্ধিহীন, অসংলগ্ন আর অবাস্তব খানিকটা গেঁয়ো ঝগড়ার মাঝখানে এভাবে বসে থাকার কোনো অর্থই হয় না। এর চাইতে যে-কোনো একটা নির্জন পথ ধরে নিজের মতো করে হাঁটা ভালো, এমন কি প্রিয়-গোপালের বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ ঠাকুরের 'কথামৃত' পাঠ শোনাও মন্দ লাগবে না—প্রিয়গোপাল সেজন্য তাকে বারবার নিমন্ত্রণ করেছেন। বিকাশের এইসব চিন্তার মধ্য দিয়ে সময় যাচ্ছিল, আলোচনার ঝাঁঝ বাড়ছিল, যুবকের দল মধ্যে মধ্যে নানারকম ধ্বনি দিচ্ছিল, দুই পক্ষের বক্তাদেরই স্বর চড়ছিল। বিকাশের আবছাভাবে এগুলো কানে আসছিল—কিন্তু সে ভালো করে কিছুই শুনছিল না। বরং এতক্ষণে মনে হচ্ছিল, আসলে এ-সব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারই নয়। যেহেতু কানাই পাল এই কলেজটা করবার জন্যে উৎসাহী—সেই জন্যে যেমন করে হোক একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে হবে—এইটেই শশাঙ্ক কাকাদের এক-মাত্র লক্ষ্য।

কানাইবাবু চিৎকার করে বললেন, 'আমি সভাপতি হিসেবে বলছি, আপনারা একটু স্থির হোন। এ-ভাবে সভার কাজ চলতে পারে না।'

মিনিটখানেকের জন্যে শান্তি স্থাপিত হল।

কানাইবাবু বললেন, 'যাঁরা দর্শক হিসেবে উপস্থিত আছেন, তাঁদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে সভার কাজে যেন তাঁরা কোনোরকম ভূমিকা না নেন। আমি কমিটির সদস্য-

দের বলছি, তা হলে ভোট হোক। আর সেই ভোটেই ঠিক হয়ে যাক—কলেজে সহ-শিক্ষা হবে, কি হবে না। প্রসঙ্গত আমি জানাতে চাইছি যে কমিটির স্থায়ী সভাপতি আমাদের মাননীয় সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার—'

আবার দাঁড়িয়ে উঠলেন শশাঙ্ক কাকা।

'এস-ডি-ও তো আপনার দোস্ত মশাই। তিনি তো আপনার সঙ্গেই গলা মেলাবেন।'

কানাইবাবুর মুখের চেহারা শক্ত হয়ে এল।

'এ-ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ—'

'ব্যক্তিগত আক্রমণ?' মুহূর্তে যেন ক্ষেপে গেলেন শশাঙ্ক নিয়োগী: 'এর তো সবটাই ব্যক্তিগত। এই সমস্ত কলেজ-ফলেজ করবার মানে বুঝি না আমরা? চলুক কো-এডুকেশন, কলেজে তৈরি হোক প্রেমের বৃন্দাবন, আর পালমশাইয়ের ভাইপো যেমন করেছে, তেমনিভাবে ছোট জাতের ছেলেরা বামুন-কায়েতের জাত মারুক।'

এক মুহূর্তে সভা যেন পাথর হয়ে গেল। একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারল না কেউ।

তারপরেই সাইক্লোন ভেঙে পড়ল।

পেছনে দাঁড়ানো যুবকদের মধ্য থেকে ক্ষিপ্ত গর্জন উঠল: 'ছোটলোক! আমরা ছোটলোক!'

দপ করে নিবে গেল নাটমন্দিরের ইলেকট্রিক ল্যাম্পগুলো। তারপরে মুষলধারে ইটের বৃষ্টি। হাতের কাছে তৈরিই ছিল বোধ হয়।

সেই বীভৎস তাণ্ডবের মধ্যে কানাইবাবু তারস্বরে কী বলতে চাইলেন, কিছুই শোনা গেল না। তখন যে যেদিকে পারে—ঊর্ধ্বশ্বাসে কেবল ছুটে পালানোর পালা!

বারো

নির্বোধ আর নিরর্থক পাড়াগেঁয়ে মারামারিতে ইট খাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে বিকাশের ছিল না। এখানকার কলেজে তার ছাত্র হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই—এখানে একটা কলেজ যদি শেষ পর্যন্ত না-ও হয়, তাতেও কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না তার। সুতরাং অন্ধকারে ইটের বৃষ্টি শুরু হতেই সে গোটা কয়েক লাফ দিয়ে কয়েক শো গজ নিরাপদ দূরত্বে সরে এল। এভাবে পালাবার অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট আছে—কলকাতায় তো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে খেলার মাঠ পর্যন্ত যে-কোনো জায়গা যে-কোনো সময়ে

একটি রণক্ষেত্র হয়ে দেখা দিতে পারে।

কিন্তু পালিয়ে এসে, পথের ধারের একটা পুকুরের কোণায় দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট হাঁপিয়ে, বিকাশের মনে হল খুব কাপুরুষের মতো হয়ে গেল ব্যাপারটা। এ-রকম একটা কিছু হবে আন্দাজ করেই বোধ হয় শশাঙ্ক কাকা বলেছিলেন, 'বেশ জমে উঠবে, দেখে নিয়ো।' এবং এ আশাও নিশ্চয়ই তাঁর ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে বিকাশ তাঁর পৃষ্ঠরক্ষার কাজ করবে। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ইট খেয়ে শশাঙ্ক কাকা এতক্ষণে ধরাশায়ী কি-না, তাই বা কে বলবে!

সুতরাং বিবেকের দংশনে ব্যাকুল হয়ে সে আবার গুটি গুটি পা বাড়ালো কালীবাড়ির দিকে।

কিন্তু ততক্ষণে সেখানে বিরাট জনসমাবেশ। সেই সন্দেহজনক যুবকের দল উধাও। আলো জ্বলছে নাট-মন্দিরে। শ-খানেক লোকের একটা বৃত্তের মধ্যে কানাইবাবুর মাথাটা দেখা যায়—তিনি কিছু বুঝিয়ে বলছেন মনে হয়। কিছু লোক ধিক্কার দিচ্ছেন : ছি-ছি, এ-সব কী কাণ্ড! উত্তেজিত হয়ে জনকয়েক বলছেন—এভাবে জাত-টাত তুলে—

তা হলেও এখন শান্তি-পর্ব। আর কোনো বিপর্যয় ঘটবে বলে মনে হল না। ইটের ঘায়ে আহত হয়েছেন, এমনও দেখা গেল না কাউকে। একজন পুলিসের দারোগা গোছের কেউ জন-দুই পাহারাওলা নিয়ে বিব্রতভাবে ঘুরছিলেন এর ভেতরে।

কিন্তু শশাঙ্ক কাকা গেলেন কোথায়? এদিক-ওদিক খুঁজে বিকাশ তাঁকে আবিষ্কার করল একটা মিষ্টির দোকানের ভেতর। না—রসগোল্লা খাচ্ছেন না। আরো চার-পাঁচ-জনকে জুটিয়ে নিয়ে—অন্তত এদের তিনজন বিকেলে তাঁর বসবার ঘরে হাজির ছিলেন—তারস্বরে বক্তৃতা করছেন তিনি।

'আগে থেকেই দল সাজিয়ে এনেছিল। ইন্‌কিলাবের ছোকরারাও সঙ্গে ছিল, তাদের তো কিছু একটা বাধাতে পারলেই হয়। টাকা আর গুণ্ডাবাজী দিয়েই—'

বলতে বলতে বিকাশকে তাঁর নজরে পড়ে গেল।

'এই যে বিকাশ, তখন থেকে তোমার কথা ভাবছি। কোথায় ছিলে?'

পালানোর কথাটা বলা গেল না—মান বাঁচানো দরকার।

'আজ্ঞে কাছাকাছিই।'

'চোট-ফোট লাগেনি তো?'

'আজ্ঞে না।'

'দেখলে তো ব্যাটাদের কাণ্ড? কি ডেনজারাস সব!'

বিকাশ চুপ করে রইল।

'তুমি আর এ-সবের মধ্যে থেকো না, বাড়ির দিকে যাও। আমার ফিরতে একটু

দেরী হবে।'

স্বাভাবিক। উত্তেজিত আলোচনা এখনো অনেকটাই বাকী। কানাই পালের মুণ্ডপাত করবার জন্যে পরিকল্পনা আরো জোরালো হওয়া দরকার।

'আপনার কোথাও লাগেনি তো কাকা?'

'আমার!' শশাঙ্ক নিয়োগী এমন একটা উঁচু দরের হাসি হাসলেন যে বোঝা গেল, সামান্য ইটের তিনি অনেক উর্ধ্বে, গাইডেড মিসাইলও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে কিনা সন্দেহ।

'আমার গায়ে ইট লাগলে ব্যাটাদের ছাতু করে দেব।' শশাঙ্ক বললেন, 'সেজন্যে ভাবতে হবে না। কিন্তু তুমি বাড়ি যাও—পরে কথা-টথা হবে। আর একটু সাবধানে, দেখেশুনে যেয়ো—দেখছই তো কী নচ্ছার জায়গা এটা!'

'আমার আর কী হবে বলুন, আমি তো কিছুর মধ্যেই নেই।'

'তবু সাবধানে যেয়ো। তুমি তো আমাদেরই লোক হে।'

'আজ্ঞে আচ্ছা।'

ভীড়, আলোচনা, কোথাও কোথাও দু হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাদের কী সব বলবার চেষ্টা—এ-সবের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বিকাশ। ব্যাঙ্কের সূত্রে চেনা কেউ কেউ নমস্কার জানালেন, একজন কয়েক পা সঙ্গও নিলেন।

'মীটিঙে তো আপনিও ছিলেন দেখেছি।'

'ছিলুম।'

'বলুন দেখি—এইসব ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি করে কিছু হয়? আসলে কী জানেন, কো-এডুকেশন নিয়ে মাথাব্যথা কারোরই নেই, ও-কথা কেউ ভাবেই না। ঝগড়া একটা বাধানো দরকার, যা হোক করে পাকিয়ে তুলতে পারলেই হল।'

'খুব সম্ভব।'

'এইজন্যেই দেশের কিছু হয় না—কোনোদিন হবেও না। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

অন্যমনস্কভাবে বাড়ির দিকে খানিকটা হাঁটবার পর বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ল। এই মারামারি আর হট্টগোলের ব্যাপারটা নিশ্চয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে নিয়োগীপাড়ায়, শশাঙ্ক কাকার জন্যে ভাবছেন কাকিমা, ভাবছে সুমু। সুতরাং গিয়ে বলা দরকার যে কাকার জন্যে চিন্তার কিছু নেই, তিনি বহাল-তবিয়তেই রয়েছেন এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করে নেবার জন্যে ঘোট পাকাচ্ছেন অনেক বেশি উৎসাহের সঙ্গে। তারপরেই মনে হল, ওঁরা কি আর কাকাকে জানেন না? এ-রকম অনেক যুদ্ধের দুর্ধর্ষ সেনাপতি শশাঙ্ক কাকা—এ-সবে তাঁর যে কিছুই হবে না—এটা বুঝেই ওঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন।

না—ওই বাড়িতে ফিরতে এখন তার ভয় করে। আগে কাকিমার জন্যে তার করুণা হত, সুমুর মুখ মনে হলে একটা কোমল বেদনা ঠাণ্ডা ছায়ার মতো ছুঁয়ে যেতে থাকে। কিন্তু মেজদা তাকে তার অদ্ভুত লাইব্রেরীতে ডেকে নিয়ে ওই সব কথা বলবার পরে—

মনীষা—মনীষা। একটু একটু করে মরে যাচ্ছে সে, সংসারের দাবি তাকে শুষে খাচ্ছে প্রেতিনীর মতো। মনীষা ছাড়া আর কোনো মেয়ের কথা ভাবা তার উচিত নয়, আর কারুর জন্যে কিছুই সে করতে পারে না। নিয়োগীবাড়ি তার কেউ নয়। বাংলাদেশে অসংখ্য সুবর্ণা আছে, অসংখ্য সোনালির রঙ অন্ধকারে কালো হয়ে আসে, সে কার জন্যে কী করতে পারে?

বিকাশ একবারের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। তারপর ফিরে চলল আবার বাজারের রাস্তায়।

প্রিয়গোপালবাবু আশাই করেননি। একেবারে চমকে উঠলেন বলতে গেলে।

'স্যার, আপনি!'

'নেমন্তন্ন তো আপনিই করেছিলেন।'

'সত্যি সত্যিই যে আসবেন—'কুঁজো মানুষ প্রিয়োগোপাল হাত কচলাতে লাগলেন: 'আমি ভাবতেই পারিনি। আসুন স্যার—বসুন, বসুন।'

একতলা, পুরোনো পৈতৃক বাড়ি। কয়েক বছর হোয়াইট-ওয়াশের পোঁচড়া না পড়ে দেওয়ালগুলোর রং বিমর্ষ। সামনের এই ঘরটিতে একটা জীর্ণ টেবিলের ওপর পরিচ্ছন্ন লণ্ঠনের আলো, প্রিয়গোপাল ইলেক্‌ট্রিক নেননি এখনো। দুখানা কাঠের চেয়ার, নীচু তক্তপোষে সতরঞ্চির ওপর বেড-কভার—বসাও চলে, শোয়াও চলে। দেওয়ালে পরমহংসদেবের ছবি, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ছবিওলা ক্যালেণ্ডার। দেওয়াল-আলমারীর ভেতরে যত্নে সাজানো বাঁধানো কয়েক খণ্ড কথামৃত আর স্বামীজীর রচনাবলীর নতুন সংগ্রহটি দেখা যাচ্ছে। চন্দন ধূপের একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে আছে ঠাণ্ডা ঘরটা।

'বসুন স্যার—বসুন। না—না, ও চেয়ারগুলো ভালো নয়, তক্তপোষেই বসুন।'

তথাস্তু।

প্রিয়গোপালের গায়ে গরদের একটা চাদর, পায়ে খড়ম। কপালে ফোঁটাও রয়েছে মনে হল।

'পুজোয় বসেছিলেন নাকি?'

'ওই একটা অভ্যাস।' লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন ভদ্রলোক।

'ডিসটার্ব করলুম মনে হচ্ছে। যান না—পুজো সেরেই আসুন। আমি বরং বসছি একটু।'

'সে হয়ে গেছে। তবু একটু দয়া করে বসুন। আমি ছেড়ে আসি এগুলো।'

'ক্ষতি কী! বেশ ভালোই লাগছে তো আপনাকে।'

ভালো লাগছে—নিঃসন্দেহ। ব্যাঙ্কের সেই অকাল-বৃদ্ধ কুঁজো কেরানীটি নন, ক্যাশের বাইরে আর কোনো জগৎ যিনি দেখতে পান না—পথে বেরুলে সদাসঙ্গী সেই ছাতাটিতে প্রায় ভর দিয়ে যিনি চলেন। এখন এই গরদের চাদর, পায়ের এই খড়ম, কপালের ফোঁটা, সব মিলে লোকটির যেন একটা ব্যক্তিত্ব ফুটেছে।

বিকাশের কথায় আবার একটু সলজ্জ হাসি দেখা দিল প্রিয়গোপালের মুখে।

'একটু চা আনাব তো স্যার?'

'কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শুধুই চা।'

'সে কি স্যার! প্রথম আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়ল, শুধু—'

'ও-সব ভদ্রতার চেষ্টা যদি করেন, এখনি ছুটে পালাব এখান থেকে।'

'আচ্ছা—আচ্ছা—' প্রায় তটস্থভাবে খড়মের খটখটানি তুলে প্রিয়গোপাল চলে গেলেন ভেতরে।

সামনের টেবিলে দু-তিনটে পত্রিকা পড়ে ছিল। একটা তুলে নিতেই আশ্চর্য হল বিকাশ। কড়া একটা রাজনৈতিক দলের সাপ্তাহিক পত্রিকা। লক্ষ্য করে দেখল, সব ক'টিই তাই—তারিখ অনুসারে ওপরে সাজিয়ে রাখা।

একদিকে ধর্ম, অপর একদিকে সব ধর্ম ভাঙ-চুর করা চড়া পর্দার রাজনীতি। এ দুইয়ের ভেতরে সামঞ্জস্য কী করে করছেন প্রিয়গোপাল? ওই অহিংস নিরীহ চেহারার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক স্বাভাবিক, কিন্তু এই যে শিরোনামা: 'চটকল মালিকদের শোষণবাদী চক্রান্ত—আম্‌লাদের নির্লজ্জ ধনিক-তোষণ নীতি'—এতটা তো প্রিয়গোপালের কাছে আশা করা যায় না!

কিন্তু তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লোকটি বোধ হয় জ্বলে উঠতেও জানেন। প্রথম দিকেই কানাই পাল সম্পর্কে ক'টা তীক্ষ্ণ আর স্পষ্ট মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

'ত্রিশঙ্কু বুদ্ধিজীবী ও বন্ধ্যা সাহিত্য'—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ওপর তীব্র আলোচনা একটা। বিকাশ তাতেই মনোনিবেশ করল। দু-একজন অতি তরুণ ছাড়া বাংলাদেশের কোনো লেখককে আর ক্ষমা করা হয়নি—একেবারে তুলো ধুনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। লেখকেরা এ প্রবন্ধ পড়বেন কিনা কে জানে, কিন্তু যদি পড়েন তাহলে হয়তো সারাজীবনের জন্যে লেখাই ছেড়ে দেবেন তাঁরা।

ভেতরের দরজায় পায়ের শব্দ। বিকাশ কাগজটা সরিয়ে রাখল। প্রিয়গোপাল ঢুকলেন এক পেয়ালা চা নিয়ে। গরদের চাদর নেই, গায়ে র‍্যাপার। পায়ে খড়মের বদলে চটি।

'একি—আপনি কেন!'

'তা কী হয়েছে। মা বুড়ো-মানুষ, সন্ধ্যের পরে আর চোখে দেখেন না।'

চায়ের কাপ টেবিলে রাখলেন প্রিয়গোপাল।

'তার মানে? চা-ও নিজে করলেন নাকি?'

'আজ তাই করতে হল।' কুণ্ঠিত হয়ে প্রিয়গোপাল বললেন, 'একটি রাঁধুনি মেয়ে আছে, কিন্তু দু-তিন দিন আসছে না—ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বর হয়েছে তার।'

'তা হলে রান্না-বান্না—'

'দিনের বেলা মা যা পারেন করেন, আমিও সাহায্য করি। কী আর উপায় আছে—বলুন।'

বিকাশ একবার প্রিয়গোপালের ক্লান্ত-শীর্ণ মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলল।

'বিয়ে কেন করলেন না মশাই? তাহলে তো আর এ-বয়সে কষ্ট করতে হত না।'

'সে আর ভেবে লাভ কী!' প্রিয়গোপাল একটা চেয়ারে সংকুচিতভাবে বসে পড়েছিলেন: 'সময় তো চলেই গেছে। তবে যা ভাবছেন—কষ্ট বিশেষ হয় না। অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আপনার মা? তাঁর তো বয়েস হয়েছে। আপনি দশটা-পাঁচটা ব্যাঙ্কে থাকেন, বাড়িতে তিনি একা—তাঁর দেখাশোনা কে করে?'

'সে কথা অবশ্য বলতে পারেন। কিন্তু তখন—অল্প বয়সে দেশ-মায়ের কথাই ভাবতুম, নিজের মায়ের কথা আর ভাবিনি। কালীমন্দিরে সবাই মিলে শপথ নিয়েছিলুম—কখনো বিয়ে করব না। তারপর তো বছর দশেক জেলেই—'

'রাজনীতি করতেন নাকি?' চায়ের পেয়ালা তুলেই নামিয়ে ফেলল বিকাশ।

'কিছু না স্যার—ওই যাকে রেভোলুশনারী মুভমেণ্ট বলেন, তারই এক-আধটু আর কি। ও তো সে-সময় সবাই করত। সে ছেড়ে দিন। কিন্তু মা-র কষ্ট দেখে এখন মধ্যে মধ্যে ভাবি, আমি ছাড়া প্রতিজ্ঞা তো কেউ-ই রাখল না—বিয়ে করলে মাকে অন্তত দেখাশোনা করবার লোক একজন থাকত।' অন্যমনস্কভাবে বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হলেন প্রিয়গোপাল: 'কই—চা-টা খেলেন না? ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!"

এতক্ষণে প্রিয়গোপালকে খানিকটা চেনা যাচ্ছে—মনে হল বিকাশের। বিবেকানন্দের সঙ্গে এ-কালের রাজনীতির একটা সমন্বয় করে নেওয়া পুরোনো বিপ্লবীর পক্ষে স্বাভাবিক। এইবার মানুষটির দিকে একটু সম্ভ্রমের চোখে চাইল বিকাশ, নিজের হাতে তাকে চা করে দিয়েছেন ভাবতে তার অস্বস্তি লাগল।

'এখনো রাজনীতির নেশা আছে?'

প্রিয়গোপাল হাসলেন, 'না। এদের সঙ্গে আর মন মেলে না—এদের সব কথা বুঝিও

না। জেলে গিয়ে দু'বার হাঙ্গার স্ট্রাইক করার পর সেই যে শরীর ভাঙল, তারপর তো এমনিই সব কাজের বাইরে চলে গেছি। তা ছাড়া—মা। সত্তরের মতো বয়েস হল, দেখবারও তো কেউ নেই।'

'ব্যাঙ্কে কাজ করছেন কত দিন?'

'তা প্রায় কুড়ি বছর হল। আগে যিনি ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন, রাজনীতির আমলে দলের সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর। তিনিই চাকরিটা দিয়েছিলেন আমাকে। কলকাতাতেই ছিলুম। তারপর এখানে ব্র্যাঞ্চ হলে চলে আসি।'

একটু চুপ। বিকাশ নিঃশব্দে শেষ করল চা-টা।

'আজকাল ঠাকুরকে নিয়ে আছেন?'

'শান্তি পাই একটু।' প্রিয়গোপাল হাসলেন: 'ও-সব ছেড়ে দিন স্যার। খালি নিজের কথাই বকছি। আপনি কালীবাড়ির দিক থেকে এলেন নাকি?'

'হাঁ, একটা মিটিং হচ্ছিল, কাকা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মিটিংয়েই ছিলুম।'

'সেই মারামারির ভেতর?'

'আপনি জানলেন কী করে? পুজো করছিলেন না?'

'বসেছিলুম পুজোয়। রাস্তায় চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে আসতে হল। লোকের মুখেই শুনলুম সব। শশাঙ্কবাবু জাত তুলে গাল দেওয়ায় ছেলেরা ইট ছুঁড়ে মীটিং ভেঙে দিয়েছে। জঘন্য ব্যাপার! আপনার লাগেনি তো?'

'না। ছুটে পালিয়েছিলুম।'

ক্ষোভের চিহ্ন ফুটে উঠল প্রিয়গোপালের মুখে।

'কিছু না—স্রেফ দলাদলি। এই নিয়েই আছে ওরা। আরো কিছুদিন থাকুন—অনেক দেখতে পাবেন। কিন্তু কলেজ কানাইবাবু করবেনই—কো-এডুকেশনও হবে, শশাঙ্ক নিয়োগী রুখতে পারবেন না।'

'আচ্ছা প্রিয়গোপালবাবু!'

'বলুন।'

নিয়োগীরা কি চিরদিনই এ-রকম? যে-কোনো ভালো কাজেই বাধা দেন?'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'না। মজা কি জানেন? এই গ্রামের যা কিছু বাড়-বাড়ন্ত, সব ওই নিয়োগীদের দৌলতেই। এক সময় ওঁরাই দিয়েছেন রাস্তা-ঘাট করবার টাকা, ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের স্কুল, সবই ওঁদের পয়সায় তৈরী। ওই কালীবাড়ি কে করে দিয়েছিল, জানেন? শশাঙ্কবাবুর ঠাকুর্দা। এই জেলার প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন ওঁর প্রপিতামহ—আর প্রথম রায়সাহেব। তখন কোথায় কানাই পাল, কোথায় বা কুণ্ডুরা।'

'আর আজ নিয়োগীরাই কলেজের ব্যাপারে বাধা দিচ্ছেন ?'

'বুঝতে পারছেন না ? জমিদারেরা তো শেষ। যেটুকু বাকী ছিল, জমিদারী উচ্ছেদ আইনে তারাও ফুরিয়ে গেছে। আর বংশ বাড়া মানেই তো বিষয়-সম্পত্তি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, শেষে আর তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। এখন নিয়োগীদের নাম আছে—আর কানাই পালদের টাকা আছে। সেইটেই জ্বালা।'

'অর্থাৎ সেই জ্বালায় পালেরা যা করবেন, নিয়োগীরা তাতে বাধা দেবেন।'

'নিঃসন্দেহে। ওঁরা কিছুতেই একথা ভুলতে পারেন না যে একদিন যারা পায়ের তলায় ছিল, তারা আজ মাথার ওপর উঠে বসেছে। আর কানাই পালও ঠিক করেছেন, নিয়োগীদের শেষ বিষদাঁত ক'টা উপড়ে দেবেন। নোংরামোতে কেউ-ই কম যান না—তবে কানাই পাল বুদ্ধিমান লোক, অন্তত ভদ্রভাবে চলতে জানেন, কিন্তু শশাঙ্কবাবু—'

প্রিয়গোপাল থেমে গেলেন। বোধ হয় বিকাশের সঙ্গে শশাঙ্কর সম্পর্কের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

বিকাশের মনের ভেতরে সেই সন্ধ্যায়—সেই বাগানবাড়িতে—মদের গেলাস হাতে কানাইবাবুর কথাগুলো ফিরে আসছিল। ছোট লোক—ছোট জাত। বাংলাদেশের আসল মানুষ তো তারাই—এই উঁচু জাতগুলোকে বে অব বেঙ্গলে ছুঁড়ে দিতে তাদের কতক্ষণ লাগে ? 'কাস্টিজম্—কম্যুনালিজম'—কানাইবাবু বলেছিলেন, 'কলকাতায় বসে অনেক বড়ো বড়ো তত্ত্বই কপচানো যায়, কিন্তু দেশ আর জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণে বাসা বেঁধেছে, নইলে লেফ্‌ট পার্টিকেও কোন বিশেষ এরিয়ায় বিশেষ কম্যুনিটির প্রার্থী দিতে হয় ?'

বিকাশ বিমর্ষভাবে বসে রইল। এই আলোচনাগুলো তার ভালো লাগছিল না।

প্রিয়গোপাল নিজেও যেন ক্লান্তি বোধ করলেন। বললেন, 'ছেলে-ছোকরাদের মত আমি মানি না বটে, কিন্তু এটা ঠিক বুঝি মশাই যে একেবারে তলা থেকে সব বদলানো দরকার, নইলে কিচ্ছু হবে না, কিছুই না। বিবেকানন্দও তাই বলেছিলেন।'

'খুব সম্ভব।'

এতক্ষণে প্রিয়গোপালের বোধ হয় আসল কথাটা মনে পড়ে গেল।

'আপনার বাসার ব্যাপারটা স্যার—'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, কী করলেন তার ?'

'যে নতুন বাড়িটার কথা বলেছিলুম, ওটা কম্‌প্লীট হতে আরো দিন পনেরো লাগবে।'

'পনেরো দিন !'

'তার আগে তো হবে না। আর একটা খুবই ভালো বাসা দেখেছি, স্টেশনের কাছাকাছিই—ব্যাঙ্ক থেকে সামান্য দূর হলেও চমৎকার, খোলা-মেলা, ছাত রয়েছে,

অনেকটা জায়গা রয়েছে, কিন্তু—'

'আবার কিন্তুটা কোথায় ?'

'ফ্যামিলি না হলে ভাড়া দিতে চায় না, স্যার। বলে একেবারে লাগাও হয়ে থাকবেন, কিন্তু একলা পুরুষমানুষ আর আমার বাড়িতে দুটি বড়ো মেয়ে—'

বিকাশ বললে, 'বুঝেছি।'

'আমি কর্তাকে রাজী করিয়েছিলুম। বলেছিলুম, উনি আমাদের ব্যাঙ্কের চার্জ নিয়ে এসেছেন, বড়ো ফ্যামিলির উচ্চ শিক্ষিত ছেলে—ওঁদের সম্বন্ধে এ-সব কথা ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সাইকোলজী তো জানেন—কর্তার ইচ্ছে থাকলেও গিন্নী কিছুতেই—।' কথাগুলো বলতে বলতে নিজেকেই যেন অপরাধী বোধ করতে লাগলেন প্রিয়গোপাল: 'আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার—এরা পাড়াগেঁয়ে—একেবারে কন্‌জারভেটিভ্—'

বিকাশ বাধা দিল: 'এদের দোষ দিচ্ছেন কেন, কলকাতাতেও গৃহস্থবাড়ির ভেতরে কেউ ব্যাচেলরকে ঘর ভাড়া দেয় না।'

'তাই বলে আপনার মতো লোক—'

'আমি যে বিপজ্জনক নই, আপনি তা কী করে জানলেন ?'

'ছি—ছি—কী যে বলেন!' প্রিয়গোপাল জিভ কাটলেন।

'কিছু না জেনেও যে আমার সম্পর্কে আপনি এত নিশ্চিন্ত, এতেই আমার বাসা না পাওয়ার দুঃখটা মিটে গেল।' বিকাশ হাসল: 'কিন্তু সত্যিই কী করা যায় বলুন তো ? সেই টীচার্স মেসেই উঠব ?'

'পারবেন না।' ওঁরা থেকে থেকে নিজেদের গ্রামে চলে যান—চিঁড়ে-মুড়ি-মোয়া নিয়ে আসেন, রান্না যেমনই হোক—মোয়া-টোয়া খেয়েই ওঁদের চলে যায়। কিন্তু সে তো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়—না খেয়েই মারা পড়বেন।'

'তাহলে কি আরো পনেরো দিন বসে থাকতে হবে ? 'কিন্তু আমি তো আর পারছি না প্রিয়গোপালবাবু।'

'আমি চেষ্টা করব স্যার। আরো খবর নিচ্ছি। কিন্তু যে-কথা বলছিলুম—আমার এখানেই এসে থাকুন না।'

'তারপরে আমার জন্যেও আপনাকে রাঁধতে হবে তো ? আমি জীবনে আলুও কখনো সেদ্ধ করিনি।'

প্রিয়গোপাল খুশি মুখে বললেন, 'সে হয়ে যাবে স্যার। আমি মোটামুটি রাঁধতে জানি।'

'কিন্তু কাকা কী বলবেন ? আলাদা বাসা করে যদি থাকি, সে একরকম। কিন্তু

তাঁর বাড়ি থেকে আপনার বাড়িতে এসে উঠলে কী ভাববেন বলুন দেখি?'

'সে একটা কথা বটে।' প্রিয়গোপাল চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলেন একটু।

বিকাশ ঘড়ির দিকে চাইল, তারপর বললে, 'আপনিই ভেবে-চিন্তে যত তাড়াতাড়ি পারেন আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন। রাত হল, আমি উঠি।'

প্রিয়গোপালও উঠলেন: 'একদিন আপনাকে নিয়ে একটু গান-বাজনার ইচ্ছে ছিল স্যার, সখের মধ্যে ওইটুকুই যা এখন আছে। কিন্তু আপনার একটা বাসার যোগাড় না হলে কিছু আর হবে না।' বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাইরে এসে একটু হাসলেন: 'সব ঝামেলাই মিটে যায় স্যার—যদি একটা বিয়ে করেন এখন। বিয়েটা স্যার আপনার দরকার।'

দরকার! বিকাশ একটু চমকালো। তারপরেই সামলে নিলে নিজেকে।

'নমস্কার প্রিয়গোপালবাবু, আসি তা হলে—'

একটু জোরেই পা চালিয়ে দিলে সে। দরকার? কেন একথা বললেন প্রিয়গোপাল? কিছু দেখেছেন তার চোখে মুখে? সন্দেহ করেছেন কোনোরকম?

কিসের সন্দেহ? কেন সন্দেহ?

কিন্তু এই প্রশ্নটার মুখোমুখি হওয়ার সাহস নিজের কাছেও খুঁজে পেলো না বিকাশ। জোরে পা চালিয়ে নিয়োগীপাড়ায় ফিরতে ফিরতে সে ভাবতে লাগল: শনিবার—পরশু শনিবার। তাকে কলকাতায় যেতেই হবে। কোথায় যেন কী সব ঘুলিয়ে উঠছে—মনীষার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া তাকে করে নিতে হবে।

নিতেই হবে।

তেরো

হাওড়া স্টেশনে নেমে বিকাশ একটা ট্যাক্সি নিলে।

এই বিলাসিতার দরকার ছিল না। ভোরবেলায় বাস-ট্রামে ভীড় নেই, তার ওপরে আজ তো রবিবার। কাঁধে একটা ঝোলা ছাড়া জিনিসপত্রও নেই কোনো। তবু সে ট্যাক্সি নিলে, গড়পারে যাওয়ার কথা বলে দিয়ে, সীটে শরীর এলিয়ে চোখ বুজল।

শীতের কনকনে হাওয়া আসছে—হাওড়া ব্রীজ। ঠাণ্ডা লাগছিল, তবু জানলার কাচ সে তুলে দিল না। ট্রেনে শোবার জায়গা করা যেত বাঙ্কে উঠে, ঝোলার ভেতরে রবারের বালিশ ছিল, চাদরও ছিল একটা। তবু সে বসেই কাটিয়েছে। মাথার ভেতরে সারাটা রাত একরাশ এলোমেলো চিন্তা পাক খেয়েছে, অর্থহীন কতগুলো অস্বস্তি জ্বলেছে আগুনের বিন্দুর মতো, ঝিমুনি এসেই ঝোঁকটা কেটে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। কেবল স্টেশনের পর

স্টেশন—একটা অন্ধকার থেকে আর একটা অন্ধকার—বাইরে নক্ষত্র, শীত, হাওয়া আর কুয়াশার মাখামাখি।

নিজের ভেতর কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে—সে বুঝতে পারছিল। বৈচিত্র্যহীন একটা আধা-শহর, তার নিয়োগীপাড়া, তার কানাই পাল, তার বিশ্রী দলাদলি—এগুলোর সঙ্গে বাইরে থেকে তার কোন যোগ নেই; ব্যাঙ্কের অবস্থা ভালোই—ব্যবসা বাড়ছে—এর পরে তার কিছু না ভাবলেও চলে।

কিন্তু কালকে সারাটা রাত—ঝিমুনি-আসা আর ছিঁড়ে যাওয়ার ভেতরে—সব এলোমেলো চিন্তাগুলোকে ছাপিয়ে তার বার বার মনে হয়েছে, এদের সব কিছুর সঙ্গে কোথায় যেন জড়িয়ে যাচ্ছে সে। কী একটা তাকে ঘিরে ধরছে মাকড়সার জালের মতো, আর এতটুকু দেরী না করে তার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। বিশেষ করে শশাঙ্ক কাকার ওখানে যদি সে না উঠত, আগে থেকে প্রেমানন্দের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে টীচার্স মেস বা অন্য যে-কোনো জায়গায় একটা ব্যবস্থা করে রাখত—

বাতাসে ক্লান্ত শরীরে ঘুম জড়িয়ে আসছিল, মধ্যে মধ্যে রাস্তার এক-একটা ঝাঁকুনিতে ভেঙে যাচ্ছিল সেটা। বিকাশ সোজা হয়ে উঠল, বসল এবার। কিন্তু তাতেই বা তার কী আসে-যায়? প্রিয়গোপাল নিশ্চয় দিন পনেরোর মধ্যে তার বাসা ঠিক করে দেবেন। তখন শশাঙ্ক নিয়োগী যত ইচ্ছে ঘোঁট পাকাতে পারেন, কানাইবাবু ছোকরাদের নিয়ে দল তৈরী করতে পারেন, কলেজ গোল্লায় যেতে পারে, মেজদা চিৎকার করতে পারে—মুনু—

সঙ্গে সঙ্গে কোথায় একটা ধাক্কা লাগল।

মুনুর সম্পর্কেও ঠিক এই কথাগুলো ভাবতে পারে সে? ওই মেয়েটির যা হওয়ার হোক, তার কিছুই আসে যায় না!

বিকাশ একবার ঠোঁট কামড়ে ধরল। এই মেয়েটি সম্পর্কে বড় বেশি চিন্তা করছে সে।

আর একটা ঢেউ উঠল মনের ভেতরে। সেটা জাগিয়ে' দিয়েছেন শশাঙ্ক কাকা। কাল রাত্রে—স্টেশনে আসবার আগে।

'বাবাজী, কবে ফিরছ কলকাতা থেকে?'

'সোমবার ছুটি নিয়েছি। আসব মঙ্গলবার সকালে।'

'ইয়ে—একটা কথা বলব ভাবছিলুম, তা—'

'কী বলবেন বলুন না, সঙ্কোচ করছেন কেন?'

'তুমি তো বেহালা-টেহালা বাজাতে পারো—বেশ গুণী আছো ওদিকে। মুনুও একটু গান-বাজনা শিখতে চায়।'

'তা শেখান না, ভালোই তো। শেখাবার লোক এখানেও নিশ্চয় রয়েছেন।'

শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন শশাঙ্ক কাকা।

'থাকবে না কেন, আছে ক'টা ছোঁড়া—এখানে-ওখানে গান শিখিয়ে বেড়ায়। একটা আবার ইস্কুলের মতো কী করেছে, সেখানে সেতার-টেতারও নাকি শেখায়।'

'তবে তো সুবিধেই রয়েছে।'

'সুবিধে!' শশাঙ্ক কাকা মুখভঙ্গি করে বললেন, 'হাঁ-হাঁ করে হার্মোনিয়ম নিয়ে খানিক চ্যাঁচাতে পারলে আর সেতার-এস্রাজে খানিক পিড়িং-পিড়িং আর ক্যাঁ-কোঁ করতে পারলেই গান-বাজনা হল? বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা সব। তাছাড়া এইগুলোকে এনে ঢোকাব বাড়িতে—আমার মাথা খারাপ? গান শেখাতে এসে মেয়ের সঙ্গে লভ্ জমিয়ে বসবে শেষ পর্যন্ত!'

এমন বীভৎস কথাটা এমন সুরে বললেন যে লজ্জায় বিকাশের কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল।

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'না না, ও-সব ফক্কড়কে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিচ্ছি না আমি—কানাই পালের চেলা সব। কিন্তু কথাটা কী জানো, দুদিন বাদে তো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—একটু গান-বাজনা জানা থাকলে মেয়ের কদর বাড়ে। তোমার কাকিমা অনেকদিন ধরে বকর-বকর করছে, মেয়েটাও কী বলে একবারে তাল-কানা নয়, তুমি যদি ওকে একটু বেহালায় তালিম দাও—'

'আমি!'

'হাঁ, বাবাজী। তুমি তো ঘরের ছেলে। আমাকে তা হলে আর ভাবতে হয় না।'

নিজের মধ্যে একটুখানি অকারণ চঞ্চলতা টের পেলো বিকাশ।

'কিন্তু বেহালা তো একটু কঠিন। মেয়েরা কেউ কেউ বাজান বটে কিন্তু ওটা ঠিক মেয়েদের বাজনা নয়। বরং ওকে সেতার শেখান না।'

'সেতার জানা আছে তোমার?'

'সামান্য। তবে বেশি দূর যেতে পারব না, গোড়ার দিকে একটু তালিম দিতে পারি।'

'ব্যস—ব্যস—ওতেই যথেষ্ট!' শশাঙ্ক কাকা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন: 'খুকুর জন্যে আমি আর এনায়েৎ খাঁকে পাচ্ছি কোথায়।'

শশাঙ্ক কাকার মুখে ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর নাম! বিকাশ আশ্চর্য হল।

'একটা সেতারের দাম কেমন হবে হে?'

'জিনিস বুঝে।'

'খুব একটা আহা-মরি গোছের দরকার নেই, বুঝেছ না? তুমি কলকাতা থেকে কাজ চালানো গোছের কিছু একটা কিনে এনো—আমি দাম দিয়ে দেব।'

'দামের জন্যে আটকাবে না—' বিকাশ হাসল ঃ কিন্তু তৈরী সেতার তেমন ভালো হবে না কাকা। ওগুলো একটু দেখে-শুনে অর্ডার দিয়ে বানানো উচিত।'

'তুমিও যেমন! মেয়ে আমার একেবারে কী বলে হীরাবাঈ—যে তাঁর জন্যে স্পেশ্যাল যন্ত্রর বানাতে হবে! যা হোক একটা নিয়ে এসো। তারে এক-আধটু কিড়িং মিড়িং করতে পারলেই বিয়ের বাজারে পার করে দেব।'

এবার অবশ্য তথ্যে একটু ভুল হয়ে গেল কাকার। হীরাবাঈ বরোদেকার সেতার বাজান না। কিন্তু ও ব্যাপারে কাকাকে আলোকিত না করলেও কিছু যায় আসে না।

'দেখি।'

'মনে করে এনো কিন্তু। মেয়েটাও ক'দিন ধরে আমায় জ্বালিয়ে খাচ্ছে। কিছু টাকা দিয়ে দেব?'

'থাক না এখন, পরে হবে।'

ট্যাক্সি সার্কুলার রোড ধরে চলেছে। বিকাশ একটা আড়মোড়া ভাঙল। খুকুর জন্যে সেতার নিয়ে যেতে হবে একটা, সেতার শেখাতে হবে তাকে।

আর একটা জাল? তাকে নিয়োগীবাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবার জন্যে আর একটা নিঃশব্দ আয়োজন?

কিসের জাল? সকালের সোনালী আলোয় ঝকঝকে কলকাতার দিকে তাকিয়ে, তার চিরদিনের পরিবেশের মধ্যে ফিরে এসে, সব এখন কতগুলো খেয়ালী কল্পনার মতো মনে হল। পনেরো দিন পরেই তো নিয়োগীবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক মিটে যাচ্ছে তার। তার পর মধ্যে মধ্যে এক-আধ দিন গিয়ে সেতার শিখিয়ে এলেই চলবে।

কিন্তু কেবল মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যেই সেতার শেখানো? এই কথাটাই বিরক্তিকর ও-ভাবে কোনোদিন যে গান-বাজনা শেখানো যায় না—একথা শশাঙ্ক কাকাকে কে বোঝাবে!

দরকার নেই। কাউকে তার কিছু বোঝাবার দরকার নেই। শুধু মনীষার সঙ্গে কয়েকটা কথা তার পরিষ্কার করে নিতে হবে। সেইজন্যেই তাকে কলকাতায় আসতে হয়েছে।

বিকাশ চকিত হল। ট্যাক্সি বাড়ির রাস্তা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে।

'সর্দারজী—ডাহিনে মোড়্‌না—ডাহিনে—'

বাড়ির জন্যে ভাববার কিছু নেই। দাদা না থাকায় ছোট ভাই বিনয় যেন এর মধ্যেই সাবালক হয়ে উঠেছে—সব দেখাশোনা করছে, মা জানালেন।

তারপর মা-র নজর পড়ল ছেলের দিকে।

'রোগা হয়ে গেছিস।'

'না মা, বিন্দুমাত্রও নয়।'

'বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে তোকে।'

'ট্রেন জার্নির জন্যে। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। স্নান করলেই চাঙ্গা হয়ে উঠব।'

খেতে বসলে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, ওদের বাড়ির খাওয়া-দাওয়া—'

'খুব ভালো মা। এত যত্ন করেন যে কী বলব।'

'তবু ও-বাড়ি ছেড়ে বাসা করতে চাইছিস কেন?'

'সম্পর্ক তো কেবল মুখের মা—আসলে ওঁরা তো আমাদের কেউ নন। পরের বাড়িতে কতদিন আর পড়ে থাকব?'

'তা বটে। কিন্তু তুই যদি কিছু খরচ দিস, তাহলে তো—'

'আভাস দিয়েছিলুম, মা। কাকার কথায় বুঝেছি, ওঁরা নেবেন না।'

'তবে আর—' মা চুপ করে রইলেন বিষণ্ণ মুখে।

মা-র মনের কথাটা আন্দাজ করা শক্ত নয়। অচেনা জায়গায় তবু একটি চেনা পরিবার। বাড়ির আদর-যত্ন দেখা-শোনা কিছুটা তবু আছে সেখানে। কিন্তু আলাদা বাসা করলে কে দেখবে ছেলেকে—কী খায়—কীভাবে যে থাকে, কে খবর নেবে তার? বাসা করার প্রস্তাবটা মা-র ভালো লাগছে না।

কিন্তু সব কথা তো বলা যায় না মাকে। বলা যায় না—শশাঙ্ক কাকার নাম শুনলে ও-অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ তটস্থ হয়ে ওঠে। বলা যায় না যে, প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি মাত্র উপদেশ সে যখন-তখন শুনতে পায়: 'ও-বাড়িতে বেশিদিন থাকবেন না—না থাকাই ভালো।' বলা যায় না যে, গত বৎসরের একটা আত্মহত্যার স্মৃতি ও বাড়িকে এখনো অভিশাপের মতো জড়িয়ে আছে আর সেই মেজদা—

মা বললেন, 'একা বাসা করে থাকতে পারবি?'

'কেন মা? তুমি কি ভাবছ ভূতের ভয় করবে আমার?'

'ঠাট্টা নয়।' মা-র নিঃশ্বাস পড়ল: 'সে তো বিস্তর ঝঞ্ঝাট। তোর তো ওসব অভ্যেস নেই। কে দেখবে—রান্নাবান্না করবে—'

সেই কথা, সেই চিন্তা।

'তুমি ভেবো না। ব্যাঙ্কের একজন পিয়নকে বলেছি। সে-ই থাকবে। বিশ্বাসী লোক, রান্না জানে।' বিকাশ হাসল: 'না হয় তুমিই ক'দিনের জন্যে গিয়ে সব গুছিয়ে দিয়ে এসো।'

'আমার ওপর যে এই সংসার পড়ে রয়েছে—কোন্ দিকে আমি যাই?' মা আবার নিঃশ্বাস ফেললেন: 'সত্যি খোকন, আর আমাকে জ্বালাস নে। এবারে একটা বিয়ে-টিয়ে করে—'

'হবে—হবে, সময় আসুক।'

'আর কবে সময় আসবে? আমি মরলে?'

'কী যে পাগলামো করো তার ঠিক নেই।' অবিলম্বে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল বিকাশ। মার কাছ থেকে পালাবার এ ছাড়া আর রাস্তা নেই কোনো।

শরীরে মনে অস্বস্তি ছিল, কিছু ভালো লাগছিল না, তবু দুপুরটা গড়িয়ে গেল খানিক অবসন্ন ঘুমের ভেতরে। বিকেলে যখন উঠল, তখন মাথাটা ভারী হয়ে আছে, একটা মৃদু যন্ত্রণা দপদপ করছে কপালের শিরায়। শীতের দুপুরে শরীর খারাপ করতে বাধ্য। এখন আর নড়তে ইচ্ছে করছিল না।

তবু বেরোতে হল। মনীষার সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার।

শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় নেমে, মোহনলাল স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বিকাশ ভাবতে চেষ্টা করল, আসলে এই দরকারের চেহারাটা কী। মাত্র এক মাস আগেও তার মনে হয়েছে, ঠিক আছে—আমি অপেক্ষা করব; যতদিন তোমার সময় না হয়—তুমি তৈরী হতে না পারো, ততদিন আমি লোভীর মতো তোমায় কেড়ে আনতে চাইব না। ক্ষুধার্ত সংসারের অন্ন যখন তোমাকে যোগাতে হয়, তখন আমি স্বার্থপরের মতো বলতে পারব না—অন্যের যা খুশি হোক, তোমাকে একান্ত করে চাই। যদি সারাটা জীবনেও তোমার সময় না হয়,—যদি শুধু আমাকে অপেক্ষাই করে যেতে হয়, আমি তাই করব।

কখনো কখনো কাছে আসব, কথা বলব, তোমাকে দেখব। তারপর চলে যাওয়ার সময় ভাবব, এই যথেষ্ট, এর বেশি আমার চাওয়ার নেই, পাওয়ারও নেই।

বেশ রোম্যান্টিক আত্মতৃপ্তি। বাড়ি ফিরে বেহালায় একটা বিষণ্ণ স্বর তোলা। দিনের পর দিন কেটে যাবে, বছরের পর বছর। মনীষা তিলে-তিলে ফুরিয়ে যাচ্ছে, এই বোধ তাকে দুঃখ দেবে, তবু আশা থাকবে একদিন—কোনো একদিন—

কিন্তু হঠাৎ তার জেদ চেপে গেল কেন? ছুটে এল কলকাতায়? এবারেই যা হোক কিছু একটা করে নিতে হবে—একথা তার মনে হল? বাসা করতে হবে, সেই জন্যে ব্যাচেলারকে কেউ ঘর ভাড়া দিতে রাজী হয় না—সেই অপমানে? স্ত্রীর সেবা-যত্ন না হলে বিদেশে বাসা করে থাকা যায় না, এই একান্ত একটি বাস্তব ভাবনা থেকে?

কিংবা—কিংবা বিকাশের এখন আত্মরক্ষা করা দরকার?

আত্মরক্ষা? কার কাছ থেকে?

'পালা—পালা—ওই মেয়েটা বড্ড ভালো রে—ওকে নিয়ে এখান থেকে—'

মেজদার চিৎকার যেন কানের ভেতরে ফেটে পড়ল তার। বিকটভাবে বিকাশ হোঁচট খেল একটা হাইড্রান্টের ঢাকনার সঙ্গে। জুতোর ভেতরেও যেন আঙুলগুলো ছেঁচে গেছে, এই রকম মনে হল তার।

দরজা মনীষাই খুলে দিয়েছিল। শ্যামল শীর্ণ মুখখানা আলো হয়ে উঠল তার।

'তুমি হঠাৎ ?'

'আসতে নেই ?'

'চিঠিতে তো কিছু লেখোনি।'

'লিখে কী লাভ ? তুমি তো জবাব দিতে চাও না।'

'অসুখ হলেও ক্ষমা নেই বুঝি ?' মনীষা বিমর্ষভাবে হাসল: 'আচ্ছা ঝগড়া পরে হবে। এখন চা নিয়ে আসি তোমার জন্যে।'

'চায়ের ভদ্রতা একটু পরে হলেও চলবে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।' চেয়ারটায় বসতে গিয়ে তীব্র খানিক যন্ত্রণা টাটিয়ে উঠল আঙুলে, বিকাশ মুখ বিকৃত করল।

'খোঁড়াচ্ছ কেন ? কী হয়েছে পায়ে ?' মনীষা উৎকণ্ঠিত হল।

'একটা হোঁচট লেগেছিল আসবার সময়ে।'

'কেটে-টেটে গেল নাকি ? জুতোটা খোল তো।"

'কিছু দরকার নেই, ঠিক আছে।'

মনীষা চুপ করে রইল। যেন জোর খাটাবার মতো এতটুকু উৎসাহও আজ তার নেই।

'ভালো আছো তো ওখানে ?'

প্রায় নিঃশব্দ জিজ্ঞাসা মনীষার। শীতের শেষ বেলায় এই ঘরটা তারই মতো অবসাদে নিষ্প্রভ, একতলার এই ঘরটায় যেন রাশি রাশি ক্লান্তি জমানো। বাইরের গলিতে এর মধ্যেই কয়লার উনুনে ধোঁয়া দিয়েছে কেউ—জাল-বসানো জানলার ভেতর দিয়ে মধ্যে মধ্যে চোখে তারই জ্বালা ধরানো উচ্ছ্বাস।

'কথা বলছ না যে ? ভালো আছো ওখানে ?'

'আমি ভালোই আছি।' বিকাশ নিঃশ্বাস ফেলল। এই ঘরে এসে, মনীষার মুখোমুখি বসে কোনো জোর খাটানো যায় না—মনে হল তার। জীবন যেন এখানে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে—একটা নীরন্ধ্র হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে চায়।

'আমি ভালোই আছি—' নিজের কথার পুনরুক্তি করল বিকাশ: 'কিন্তু তোমার কী হয়েছিল ?'

'ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর।' একটু থেমে মনীষা বললে, 'তা সেরে গেছে এখন।'

'কিন্তু তোমাকে এত পেল্ দেখাচ্ছে কেন ?'

'পেটে প্রায়ই চিনচিনে একটা যন্ত্রণা হয় আজকাল।'

'সে কি ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে ও কিছু নয়—সেরে যাবে।'

'সেরে যাবে? ম্যাজিকে?' বিকাশ উত্তেজিত হল: 'মণি, দিস ইজ টু মাচ!'

'না—আমাদের বাড়ির ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম।'

'কী বললেন তিনি?'

'স্টোন হয়েছে বলে সন্দেহ করেন।'

'স্টোন!' এই বিষণ্ণ ঘরটা যেন ঠাণ্ডা একটা সাপের আলিঙ্গনের মতো মুহূর্তে পাকিয়ে ধরল বিকাশকে: 'সে তো অত্যন্ত পেনফুল।'

'কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে। একটা এক্স-রে করাতে বলেছেন।'

'মণি, তোমার কাছে তো সবই ঠিক হয়ে যায়। আসলে কিছুই ঠিকভাবে চলছে না। ইরেগুলার খাওয়া-দাওয়া, শরীরের ওপর অযত্ন, সংসারের জন্যে নিজেকে শেষ করে দেওয়া—এ তো আত্মহত্যা। মণি, এ চলবে না, চলতে পারে না।'

সঙ্কল্পটা ফিরে এল। যে-কথাটা বলবার জন্যে সে ছুটে এসেছে কলকাতায়, সেই কথাটাই এবার উদ্যত হয়ে এল মুখের সামনে। আর তখনি পা-টা লাগল টেবিলের একটা পায়ের সঙ্গে। আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার বিদ্যুৎ তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে আঘাত করল—যেন সব স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে দিলে তার।

চোদ্দ

এবারে মনীষা চমকে উঠল দারুণ ভাবে। আরো বিষণ্ণ হয়ে উঠল মুখ, ভয়ের ছায়া পড়ল চোখে।

'কী হয়েছে তোমার পায়ে?'

'বললুম তো—একটা হোঁচট লেগেছিল কেবল।'

'কেবল একটা হোঁচট লেগেছিল?' মনীষা বিকাশের কাছে এগিয়ে এল: 'খোলো তো জুতোটা।'

'কিছু হয়নি, বলছি তো।'

'হয়েছে কিনা, আমি দেখছি।' সম্ভ্রস্ত শাসনের সুর লাগল মনীষার গলায়: 'খোলো জুতো।'

বিকাশের আর কষ্ট করতে হল না। মনীষাই বসে পড়ল পায়ের কাছে, খুলে নিলে জুতোটা। আবার একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার চমক পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মস্তিষ্কের দিকে ছুটে গেল—যেন কেউ হঠাৎ একটা পেরেক বিঁধিয়ে দিলে ঘাড় আর গলার মাঝখানে।

তারপরেই চাপা একটা চিৎকার করল মনীষা।

'একি কাণ্ড! তুমি মানুষ, না আর কিছু!'

'আর কিছু—' যন্ত্রণার মধ্যেও রসিকতাটা একটু এগিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল বিকাশের, কিন্তু তার আগে চোখ পড়ল মনীষার চোখের দিকে, তারপর নিজের পায়ের দিকে। বুড়ো আঙুলটা কিছুক্ষণ ধরেই চট-চট করছিল, দেখা গেল খানিক রক্ত জমে আছে সেখানে। নোখের খানিকটা ফেটে গেছে।

'কী সাংঘাতিক! এই যন্ত্রণা মুখ বুজে সইছ তুমি?' মনীষা উঠে পড়ল তৎক্ষণাৎ, প্রায় ছুটে গেল ভেতরে, নিয়ে এল খানিকটা জল, একটা অ্যান্টি-সেপটিকের শিশি, একটু তুলো, স্টিকিং প্লাস্টারের কৌটো একটা।

'কী ব্যাপার, বাড়িতে ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা রাখো নাকি?'

'থামো, বোকো না।'

বিকাশ চোখ বুজে চুপ করে রইল। পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসেছে মনীষা, কয়েকটা স্নিগ্ধ কোমল আঙুল নিবিড় মমতায় অতি সাবধানে ধুয়ে দিচ্ছে ফাটা জায়গাটা। এই আঙুলগুলোকে হাতের মুঠোয় টেনে নিলে এরা কাঁপতে থাকে—কয়েকটা চাঁপার পাপড়ির মতো মিলিয়ে যেতে চায়—কোথাও এতটুকু জোর থাকে না। কিন্তু এখন নরম আঙুল-গুলোতেই আত্মপ্রত্যয় আর নিশ্চয়তা এসেছে—আত্মসমর্পণ নয়, নিজের অধিকার পেয়েছে তারা।

ভেজানো তুলো দিয়ে মুছে নিচ্ছে আস্তে আস্তে, অ্যান্টি-সেপটিকের গন্ধ উঠছে, খুব হালকা করে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে দিতে একটা নিঃশ্বাস পড়ল মনীষার।

'লাগছে?'

'না।'

বিকাশ তেমনি চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ। নিঃশব্দ সেবা, মমতা, ভালোবাসা। মনীষা। এই সেবা আর নীরবতার ভেতরেই নিজেকে লুকিয়ে রাখল চিরকাল—কোনো-দিন দাবি করল না, কখনো চাইল না। এই মেয়েটির নিজস্ব এই একান্ত জগৎটুকুর ভেতরে বিকাশ যে কী করে এসে পড়ল, সেইটেই আশ্চর্য—হঠাৎ মনে হল, এখানে সে-ও প্রক্ষিপ্ত, মনীষার জীবনে তাকে মানায় না।

অ্যান্টি-সেপটিকের গন্ধ ছাপিয়ে মনীষার চুলের একটা মৃদু গন্ধ। তার শরীরের একে-বারে কাছে আর একটা শরীরের আভাস—শাড়ি তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাগছে। এখনি দুটো হাত বাড়িয়ে বিকাশ তাকে বুকের মধ্যে তুলে নিতে পারে, বলতে পারে—চলো তুমি আমার সঙ্গে, তোমাকে আমি এই নিঃসঙ্গতার দুর্গ থেকে কেড়ে নিয়ে যাব।

কথাটা বলতে সে এসেছিল। কিন্তু বলা যাচ্ছে না, কিছুতেই বলা যাচ্ছে না। এত নিরুপায় বলেই কোনমতে জোর খাটানো যাচ্ছে না এই মেয়েটির ওপর।

অন্যমনস্ক হয়ে পায়ের জুতোটা খুঁজতে যাচ্ছিল, মনীষা ধমক দিল একটা।

'জুতোটা—'

'আর জুতো পরে দরকার নেই, রক্তারক্তি হবে আবার।'

'খালি পায়ে থাকব?'

'মান যাচ্ছে নাকি?' মনীষা আর এক পায়ের জুতোটাও খুলে নিলে, একপাশে সরিয়ে রেখে বললে, 'রইল এখন আমার জিম্মায়।'

'বাড়ি ফিরব কী করে?'

'ট্যাক্সিতে। আমার রবারের স্লিপার আছে, তাই দেব তোমায়। তোমার পা মেয়েদের মতো ছোট ছোট, আমার পা বড়ো একটু—কাজ চলে যাবে।'

মনীষা উঠে দাঁড়ালো। শাসনের ভঙ্গিতে বললে, 'বেশি নাড়ানাড়ি কোরো না—চুপ করে বসে থাকো একটু। আমি তোমার জন্যে কফি করে আনি।'

'কফি তো খুকুই দেয়। তুমি কেন?'

খুকু মনীষার ছোট বোন।

মনীষা হাসল: 'বাড়িতে কেউ নেই আজ—সবাই গেছে কালীঘাটে মাসিমার ওখানে। আমার মাসতুতো বোনের পাকা দেখা আজ। আমি আছি একলা বাড়ি পাহারা দিতে।'

'তুমি গেলে না?'

'মা বলেছিল অনেকবার। কিন্তু আমার ভালো লাগে না ও-সব। কী যে বিশ্রী অভ্যেস হয়েছে, ভীড় যেন আজকাল সইতেই পারি না একেবারে। তাছাড়া শরীরটাও—' মনীষা থেমে গেল।

'মানে, পেটে সেই ব্যথাটা? সেই স্টোন?'

'ও কিছু না—আমি তোমার কফি করে আনি।'

কিছু না—আত্মনিগ্রহ করতে মনীষার কিছুতেই কিছু আসে যায় না। অথচ এই সব স্টোনের যন্ত্রণা কী, তা বিকাশ দেখেছে। 'এক্সক্রুশিয়েটিং শুটিং পেন—' ছটফট করতে করতে বলেছিলেন এক ভদ্রলোক: 'মৃত্যু-যন্ত্রণা মশাই!'

কিন্তু সব যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করবে মনীষা। পাছে কারুর এতটুকু অসুবিধে হয়, সেজন্যে এতটুকুও শব্দ করবে না হয়তো—দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকবে।

অর্থহীন সহিষ্ণুতা—নিরর্থক আত্মবঞ্চনা। মনীষা তো সেকেলে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নয়, যে নিঃশব্দে ভাগ্যকে মেনে নিত—কশাইখানার জন্তুর মতো এগিয়ে যেত সমাজের খড়্গের মতো, জোর করে সতীদাহের চিতায় তুলে দিলেও যার মুখ থেকে একটা কাতরোক্তিও শোনা যেত না। সে একালে জন্মেছে, এই কলকাতার ঝড়ের মধ্য দিয়ে বেড়ে

উঠেছে, কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে পাস করে, নিজে চাকরি করে, টিউশন করে। এ যুগের মেয়েরা নিজেদের কথা বলবার শক্তি রাখে—দাবি আদায় করে নিতে জানে, এমন কি শশাঙ্ক নিয়োগীর কড়া ডিক্‌টেটরশিপের মধ্যে থেকেও ছেলেমানুষ স্নুনু বলতে পারে: 'আমাকে কলকাতার কলেজে নিয়ে ভর্তি করে দেবেন বিকাশদা?' কিন্তু মনীষা যদি স্নুনু হত, একটা কথা বলত না, বাজনা শিখতে চাইত না, কলকাতায় পড়তেও চাইতো না—ওই ছায়া আর জীর্ণতায় ভরা বাড়িটার ভেতরে নিজেও ধীরে ধীরে ছায়া হতে হতে কোথায় মিলিয়ে যেত একদিন।

মেয়েরা নিপীড়িত হতে ভালোবাসে—নিগ্রহেই পায় তারা সুখের স্বাদ—এই ধরনের অশ্লীল অশ্রদ্ধার কথা শুনিয়েছে কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক। কতগুলো নোংরা ধরনের বইও লেখা হয়েছে এ নিয়ে। এই সব সিদ্ধান্তকে মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে বিকাশ। তবু মনীষাদের দেখে কখনো কখনো সন্দেহ হয় তার। না—নিগ্রহের আনন্দ নয়, আসলে সেই পিতৃ-পুরুষের পাপ, সেই আদিম অত্যাচারের উত্তরাধিকার। মেয়েদের—বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের রক্তে রক্তে সেই নিরুপায় বশ্যতা—সেই নব্বুই বছরের কুলীন স্বামীর চিতায় পঞ্চদশী কিশোরীর নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ। সেই বশ্যতার হাত থেকে আজও নিস্তার মেলেনি মনীষাদের।

বিকাশ কী করতে পারে?

মনীষা কফি নিয়ে এল।

'শুধুই কফি দিচ্ছি তোমাকে। বাড়িতে আজ এক টুকরো বিস্কুট পর্যন্ত নেই, যে—'

'ভদ্রতার দরকার নেই।'—বিকাশ মনীষার দিকে তাকালো অনিশ্চিতভাবে: 'মণি, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

মনীষা একটু হাসল: 'খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে তোমাকে। এই—খবর্দার পা নাড়বে না এখন ও-ভাবে।'

'চুলোয় যাক পা!' সতীদাহের কথা ভাবতে গিয়ে কখন ভেতরে ভেতরে চটে উঠছিল বিকাশ—এবার আর রাশ মানল না—প্রায় ডাকাতের মতো মনীষাকে কুড়িয়ে নিল বুকের ভেতর।

'এই—কী হচ্ছে পাগলামি!'

'বাড়িতে আজ কেউ নেই, তুমি আমার।'

মনীষার ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা আর শুকনো মনে হল। একবার শিউরে উঠল মনীষা। কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বললে, 'ভীষণ ক্ষেপে আছো আজ। এবার ছাড়ো দেখি আমাকে।'

'ছাড়ছি। কিন্তু বোসো আমার পাশে।'

'বসছি। কিন্তু পাগলামো করবে না আর। আর পা-টাও নাড়বে না ও-ভাবে। কী অধৈর্য মানুষ, পাঁচটা মিনিটও কি স্থির হয়ে বসতে পারো না ?'

'আবার পা!' বিকাশ এবার সত্যিই ক্ষেপে গেল : 'আমার কাছে যদি লক্ষ্মী মেয়ের মতো না বসো, তাহলে আমি পা ছুঁড়তে শুরু করে দেব।'

'আর বীরত্বে কাজ নেই, আমি বসছি—' মনীষা একটা টুল টেনে এসে বসল : 'ব্যাপারটা কী, বলো এবার।'

'মণি, আর আমি ওয়েট করতে রাজী নই।'

মনীষার বাঁ হাতটা মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে নিয়েছিল বিকাশ, অন্যদিনের মতো আজও সেটা হারিয়ে যাচ্ছিল, গলে যাচ্ছিল, মিশে যাচ্ছিল আত্মসমর্পণের ভেতরে। কিন্তু এই-বারে সেটা নড়ে উঠল একবার, শক্ত হয়ে উঠল।

মনীষা জবাব দিল না।

'মণি আমি একটা বাসা করব ওখানে।'

'বেশ তো, করো না।' মনীষা আস্তে আস্তে বললে, 'ভালোই তো।'

'হ্যাঁ, ভালোই, কিন্তু ব্যাচেলরকে বাড়ি ভাড়া দিতে চাইছে না কেউ।'

আবার সেই অন্ধ গলি, কানা দেওয়াল। যেখানে এসে বার বার থেমে যেতে হয়েছে দুজনকে, যেটাকে পেরিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মনীষার হাতটা আবার ভেঙে পড়ল শিথিল হয়ে। টানা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ উঠল একটা।

'ভালো দেখে একটা বিয়ে করো তা হলে।'

যন্ত্রণার চমকটা বুড়ো আঙুল থেকে নয়, মাথার ভেতরেই ঝলকে উঠল এবার।

'মণি, ঠাট্টা করছ ?'

'না—ঠাট্টা নয়।'

'কথাটার মানে কী ?'

'মানে খুব সোজা। ভালো দেখে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে বলছি তোমায়।'

বিকাশের মুঠো খুলে এল।

'মণি, কথাটা এভাবে উড়িয়ে দেবার নয়। অত্যন্ত সিরিয়াস।'

'আমিও সিরিয়াসলিই বলছি।'

'একটি মাত্র ভালো মেয়েকেই আমি পেয়েছি।' বিকাশের চোখ জ্বলে উঠল : 'সে যে কে, তা তুমি জানো।'

'হয়তো জানি।' মনীষার মৃদু গলায় ক্লান্তি ভেঙে পড়ল : 'কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে বিকাশ, ভালো মেয়ে সে নয়। কালো, রোগা, রূপ-গুণ কিছুই নেই—যে-সব মেয়েদের

কেউ কখনো একবার চেয়েও দেখে না, যারা সাধারণের চাইতেও সাধারণ, তাদেরই একজন।'

'মণি!'

'আমি বলছি, ভুলটা এবার কেটে যাক। তুমি আর কাউকে—'

কথাটা থেমে গেল একটা হিংস্র চাপা গর্জনের ভেতরে। মনীষার চোখের তারায় ছলছল করে উঠল ভয়।

'মণি, আমার একটা কথার জবাব দেবে?'

মনের অস্বস্তি কাটাবার জন্তে জোর করে হাসতে চাইল মনীষা।

'একটা কেন, এক হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী আছি।'

'না—একটার জবাব পেলেই আমার চলবে।' বিকাশের গলা কাঁপতে লাগল: 'তুমি কি আর কাউকে—'

'কী বললে?'

'আর কাউকে তুমি কি ভালোবাসো? আর কেউ এসেছে তোমার জীবনে? আমি সরে গেলে তুমি কি খুশি হও?'

ঘরের আবহাওয়াটা অদ্ভুত গুমোট হয়ে এসেছিল, সেই কানা গলি আর বন্ধ দেওয়ালের মধ্যে দম আটকে আসছে এমনি মনে হচ্ছিল দুজনের। হঠাৎ যেন তারই ভেতরে পাগলামির হাওয়া ছুটে এল একটা। অন্তত মনীষার যে হাসিটা গত তিন বছরের মধ্যেও শোনেনি বিকাশ, সেইটেই খিলখিল করে ভেঙে পড়ল ঘরের ভেতর।

'কী অদ্ভুত ভাবতে পারো তুমি!' মনীষা মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজল।

'হাসি নয় মণি—' বিকাশ কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল: 'সত্যিই আর কেউ যদি তোমায় চেয়ে থাকে—'

মনীষা চকিতে তার সব ক্লান্তি সব অবসাদ পেরিয়ে কলেজের ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে ফিরে গেল: 'তাহলে সিনেমা কিংবা নাটকের নায়কের মতো তুমি নিঃশব্দে সরে যাবে—এই তো? না—সে রকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।' এতক্ষণে বিপন্ন সংসারের বোঝাটা মন থেকে নামিয়ে প্রগল্ভ হয়ে উঠল একাকিনী মেয়েটি: 'কেউ আমাকে চাইছে না, নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার মতো শিল্পীর চোখ সকলের নেই যে একটা রোগা কালো সাধারণ মেয়েকে নিয়ে রোম্যান্টিক হয়ে উঠবে। চারদিকে ফর্সা রং দেখতে দেখতে তিতোবিরক্ত রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণকলির স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু জীবনে ও-ভাবে কোনো কালো মেয়ের বরাত খোলে না। তা ছাড়া আমি তো কৃষ্ণকলিও নই—একেবারেই শুকনো ডাল।'

'মণি!' আরো নীরস হয়ে উঠল বিকাশের গলা, মনীষার উচ্ছলতা থমকে গেল।

আবার ক্লান্তি নামল শীর্ণ মুখের ওপর, চোখে ঘনিয়ে এল ভয়ের ছায়া।

'এসব ভাবনা কেন তোমার মনে আসে? তুমি কি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ?'

'আর তুমিই বা ভাবলে কী করে যে আমি অন্য মেয়েকে—'

'কিন্তু তোমার তো এখন ঘর বাঁধা দরকার—বাসা করা দরকার।'

'সেইজন্যেই তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি এখান থেকে। চলো—কালই নোটিস দেব রেজিস্ট্রির। তারপর বাড়ি থেকে ওঁরা যদি কিছু করতে চান, করবেন।'

'আর এদের কী হবে?'

খুব আস্তে আস্তে বলল মনীষা। কিন্তু স্বরটা একেবারে ফাঁপা। মনে হল যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা অতলান্ত খাদের সামনে।

সেই বাধা। সেই দেওয়াল।

একটা কোনো প্রতিবাদ দরকার। কোনো স্বার্থপর নগ্ন যুক্তি। আমি মহামানব নই—অন্যের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আসিনি। সকলের আগে নিজের কথা ভাবব। আমাকে যাঁরা পৃথিবীতে এনেছিলেন, তাঁদের কাছে চিরকালের জন্যে দাসখৎ লিখে দিইনি আমি। একালের বিদ্রোহী ছেলেমেয়ে হলে বুনো ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলতে পারত—

কিন্তু মনীষার মতো মেয়েরা এ-সব কথা কোনোদিন বলবে না। তাদের রক্তে রক্তে বশ্যতা। তারা চিরদিন শুধু মেনেই এসেছে। পুরোনো মূল্যবোধগুলো তাদের সামনে আদ্যিকালের রাক্ষসের মতো চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে। সংসার সম্পর্কে দায়িত্ব—মা-বাপের ওপর কৃতজ্ঞতা—ভাইবোনদের জন্যে কর্তব্য।

দায়িত্ব—কৃতজ্ঞতা—কর্তব্য। শুধু কতগুলো অত্যাচারের ছদ্মবেশ। আর এই অত্যাচারগুলোকে মেনে নিয়ে ধীরে ধীরে আত্মহত্যার নিশ্চিত আত্মতৃপ্তি।

ছেলেরা অনেক বেশী স্বার্থপর হতে জানে। মেয়েরা জানে না। সত্যিই কি তারা নিপীড়িত হতে ভালোবাসে?

ননসেন্স! একটা নিরুপায় হিংস্রতায় বিকাশ নিজের ঠোঁট কামড়াল।

অনেক দূর থেকে মনীষার গলার স্বর ভেসে এল: 'কফি খেলে না?'

'খাচ্ছি।'

'জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে।'

'যাক।'

'আমার ওপরে খুব রাগ করেছ—না?'

'না।'

'আচ্ছা, পরে হবে ও-সব কথা। এখন কফিটা খেয়ে নাও না, লক্ষ্মীটি।'

কফি সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। দুই চুমুকেই শেষ হয়ে গেল।

'মণি!'

'উঁ!'

খসখসে গলায় বিকাশ বললে, 'আমি যদি সত্যিই অন্য মেয়েকে বিয়ে করি, তুমি খুশি হবে?'

শীর্ণ রেখায় হাসল মনীষা।

'এত বড়ো মিথ্যে কথা বলি কী করে? খুব খারাপ লাগবে, ভীষণ কষ্ট হবে।'

'আমার খুব ভালো লাগবে বোধ হয়?' বিকাশ বিদ্রূপ করল।

একটু চুপ করে রইল মনীষা। নিরুপায় আঙুলে আঁচড় কাটতে লাগল টেবিলটার ওপরে। বাইরের রাস্তায় একটা বুড়ো চানাচুরওলার ভাঙা গলার ডাক উঠতে লাগল।

মনীষার আঙুলের টানগুলো তার অস্পষ্ট মনের মতো কতগুলো আবছায়া রেখা ফোটাতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে মনীষা বললে, 'বিকাশ, শুধু তর্কের জন্যেই তর্ক করছ তুমি। তুমি তো জানো আমার কোনো উপায় নেই—আমি চলে গেলে এদের দাঁড়াবার মতো মাটিটুকুও কোথাও থাকবে না। অন্তত একটা ভাইকেও দাঁড় করাবার জন্যে আমাকে হয়তো আরো চার বছর পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে। জানি না, তখনও আমার সময় হবে কিনা। আর এর ভেতরে শরীর মনের দিক থেকে আমি—'

বিশ্রী গলায় একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল বিকাশের। হাজার বার শোনা—হাজার বার বলা সেই এক কথা। অথচ কোন জবাব দেওয়া যায় না। সেই আদিম রাক্ষসের শাসনের সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। আর ক্লীব আত্মগ্লানিতে মনে হয়, কেন আমরা স্বার্থপর হতে পারি না—কেন সব দ্বিধাকে নগ্ন নির্লজ্জ স্বার্থপরতা দিয়ে মুছে ফেলতে পারি না?

চিৎকার করল না, তার বদলে মরীয়া হয়ে বলে ফেলল: 'আমি একটা উপায় ভেবেছি মনীষা।'

মনীষার চোখে আলোর একটা আভা ফুটল কি ফুটল না।

'কী?'

'আজ নয়। কাল বলব। কাল ম্যাটিনীতে সিনেমায় যাব মেট্রোতে। সেখান থেকে বেরিয়ে অনেকখানি সময়—অনেকটা সন্ধ্যা আমাদের হাতে থাকবে।'

'কী পাগলামি! ম্যাটিনীতে কী করে হবে? অফিস নেই? তারপর সন্ধ্যেয় আমার টিউশন আছে আবার।'

'অফিস থেকে পালাও। কামাই করো টিউশন।'

'টিউশন না হয় কামাই করতে পারি, কিন্তু অফিস পালাতে পারব না।'

'ঠিক আছে। তাহলে সন্ধ্যে ছটায়। মেট্রোতে। কোথায় পাব তোমাকে?'

'মেট্রোর সামনেই।'

কোনো উৎসাহ নেই মনীষার স্বরে। চোখে একটু আগেই যে আভাটুকু ফুটেছিল, কখন তা আবার নিরাসক্তির শূন্যতায় তলিয়েছে।

বিকাশ উঠে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে জুতোজোড়া পায়ে গলাতে চেষ্টা করল।

'কী করছ!' মনীষা চঞ্চল হয়ে উঠল: 'রক্তারক্তি হবে যে আঙুলে। দোহাই, লক্ষ্মীটি, জুতো থাক—আমি স্লিপার দিচ্ছি—'

'কিছু দরকার নেই—'

যেন কারো ওপরে একটা প্রতিশোধ নিচ্ছে, এমনি নিষ্ঠুরভাবে বিকাশ জুতো পরে নিলে। আবার সেই শারীরিক যন্ত্রণাটা চমকে উঠল বিদ্যুতের মতো—মনে হল কে একটা পেরেক সজোরে বসিয়ে দিলে তার ঘাড়ের তলায়।

বিকৃত মুখে বিকাশ বললে, 'আসি আজ।'

'তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ।'

'না।'

শেষবার হতাশ গলায় মনীষা বললে, 'একটা ট্যাক্সি করে যেয়ো।'

'যাব। কিন্তু কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।'

'আচ্ছা।'

'মেট্রোর সামনে।'

'মনে থাকবে।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বিকাশ, নেমে পড়ল রাস্তায়। আর দরজা ধরে শূন্য দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকল মনীষা।

একটু একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে, যন্ত্রণাটাকে খানিক সইয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বিকাশের মনে হল, নিশ্চয় উপায় পাওয়া যাবে একটা। কালকে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার আগেই। কিছু একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যাবে—একটা ম্যাজিক, মির্যাক্‌ল—যা কিছু। এমন একটা উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে—যা সামনেকার অন্ধ বদ্ধ প্রাচীরটাকে একেবারে মিলিয়ে দেবে হাওয়ায়।

আর তখন আর একটা কথা মনে হল। ছোট্ট কথা একটা।

ম্যাটিনী শোতে না গিয়ে ভালোই হয়েছে। খুকুর জন্যে একটা সেতার তাকে খুঁজতে হবে কাল বিকেলে।

খুকু।

এক ঝলক হাওয়া এসে মুখে পড়ল। শীতের ছোঁয়া নেই, যেন বসন্তের স্পর্শ বয়ে এনেছে। বসন্ত এসে পড়ল নাকি? এত তাড়াতাড়ি?

পনেরো

আবার রাত্রির ট্রেন, আবার বন্ধ জানালার ফাঁকে-ফাঁকে সরু সরু সুতোর মতো বাইরের হিমেল হাওয়ার স্রোত, কাচের ওপর কুয়াশা—আঙুল টানলে দাগ পড়ে। আজ গাড়িতে ভীড়, কোনোমতে একটু বসবার জায়গা, পাশের লোকটির বার বার ঘুমের ঘোরে কাঁধের ওপর ঢুলে-পড়া, আর পায়ের নীচে কতগুলো বাক্স-বিছানার অসমতলে পা রেখে—সামনের ঘোলাটে আলোটার দিকে তাকিয়ে, সারাটা রাত—সারাটা রাত জেগে থাকা।

ট্রেনের শব্দের ওঠা-পড়া। লাইনের জোড়-পেরুনো। একটানা বাজনার মতো লাগে কখনো কখনো। ব্রীজগুলো গম গম করে ওঠে—যেন মধ্যে মধ্যে তাল পড়ে পাখোয়াজে।

বাজনার কথায় মনে পড়ল সুমুকে। সেতার একটা অর্ডার দিয়েই আসতে হল। তৈরী জিনিস যা ছিল তা হয় খেলো—নইলে দামী কিছু শৌখিন জিনিস—যেগুলো আজকাল আমেরিকায় চালান যায়। সুমুর জন্যে দেখে-শুনে একটা তৈরী করতে দিয়েছে—যাতে শিখতে পারবে, পরে বাজাতেও পারবে।

অবশ্য টাকাটা শশাঙ্ক কাকার কাছ থেকে কোনোমতেই নেওয়া যাবে না। ও বাড়িতে থাকার জন্যে কিছুই যখন দেওয়া চলবে না, তখন এই সেতারটা অন্তত দিয়ে একটুখানি ঋণ শোধের চেষ্টা করা যাক। তাছাড়া সুমুকে এটা দেবার মধ্যে তৃপ্তিও আছে খানিকটা, ও বাড়ির সব বিষাদ, সব বিষণ্নতা, সব অনিশ্চয়তার মধ্যে এই মেয়েটির চোখেই এখনো আলো জ্বলছে। লেখা-পড়া কত দূর হবে কে জানে, কবে হঠাৎ একটি সুপাত্র কোথা থেকে জুটিয়ে কাকা মেয়েটিকে পার করে দেবেন তা তিনিই বলতে পারেন। তারপর আরো অসংখ্য মেয়ের মতো ম্লান হতে হতে সুমু ছায়া হয়ে যাবে, ছায়া থেকে হারিয়ে যাবে অন্ধকারে। কিন্তু তখনো যদি সেতারটা থাকে, যদি সুর জেগে থাকে, তাহলে ওই অন্ধকারের ভেতরও কখনো কখনো ওর আকাশে সন্ধ্যাতারা ফুটবে, সপ্তর্ষি দেখা দেবে।

পাশের ঘুমন্ত লোকটির মাথা এবার বিকাশের কাঁধের ওপর নেমে এল। এক মাথা চুলের ছোঁয়া লাগল নাকে-মুখে। এই রাতেও তেল জ্যাব-জ্যাব করছে ভদ্রলোকের মাথায়, লেমন-জুসের মতো একটা তীব্র আর অসহ্য গন্ধ এসে আক্রমণ করল বিকাশকে।

'শুনছেন—'কামরার দেওয়ালে নিজেকে সঙ্কীর্ণ করে কাতরভাবে ডাকতে হল বিকাশকে।

সাড়া নেই। কাঁধের ওপর মাথাটা নিশ্চিন্ত আরামে এলিয়ে পড়েছে এবার। গুর গুর

করে নাকও ডাকছে অল্প-অল্প।

হাসি পেলো, সহানুভূতিও বোধ হল। ভারী সুখে ঘুমোচ্ছেন ভদ্রলোক। বিব্রত না করলেই ভালো হত। কিন্তু গালে-মুখে তেল-জবজবে চুলের ছোঁয়া। লেবুর মতো তীব্র গন্ধটায় গুলিয়ে ওঠে গায়ের ভেতরে।

'শুনছেন ?' এবার ছোট্ট করে ধাক্কাই দিতে হল একটা।

'অাঁ ?' চমকে জেগে উঠলেন ভদ্রলোক।

'ঘুমিয়ে পড়ছেন আমার কাঁধের ওপর।'

'সরি।' জড়ানো গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'সারাটা দিন বড়োবাজার আর পোস্তা —কেনা-কাটা—'বলতে বলতে পেছনে হেলান দিলেন এবং পরক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখনো সেই লেবুর মতো তীব্র গন্ধটা। বোধ হয় কোটে, গালে তেল লেগেছে খানিকটা। রুমাল বের করে ঘষে ঘষে গালগলা মুছে ফেলল বিকাশ। ঘষাটা জোরেই হয়ে গেল একটু—জ্বালা করতে লাগল। আর সেই বিরক্তিতে সুমু মিলিয়ে গেল, সেতার মিলিয়ে গেল, ট্রেনের চাকায় যে সুর বাজছিল, তাও গেল। হঠাৎ মনে হল গাড়িটা দুলছে—বিরক্তিকরভাবে দুলছে।

তখন যন্ত্রণার একটা চমক উঠল পায়ের সেই আঙুলটাতে। জুতোসুদ্ধ পা-টা নেমে পড়েছে একটা কালো ট্রাঙ্ক আর একটা হোল্ড-অলের ফাঁকের মধ্যে। চাপ পড়েছে জুতোয় আর তা থেকে আঙুলের সেই যন্ত্রণাটা—যেটা অনেকখানি কমে এসেছিল এবং যার কথা এতক্ষণ প্রায় মনেই ছিল না, সেইটে আবার নাড়া দিয়ে উঠেছে।

না—সুমু নয়। মনীষা।

সোয়া পাঁচটা থেকেই অপেক্ষা করছিল মেট্রোর সামনে, মনীষা এল পাঁচটা বত্রিশে।

মনীষার দিকে তাকিয়েই একটা ঘা লাগল মনের ভেতরে। নিজের কুশ্রী স্বার্থপরতাটা যেন মনীষার ভেতর দিয়েই ফুটে উঠল সামনেটায়।

এই সিনেমায় আসার দিনগুলো আগে অন্য রকম ছিল। তখন সন্ধ্যায় সুর ছিল। চৌরঙ্গীর ভীড়, ফিরিওলার হাঁক, গাড়ির আওয়াজ—সব নিয়ে মিলে যেত একটা পরি-তৃপ্তির বিন্দুতে। তখন মনীষার মতো শাদা-মাটা মেয়ের শামলা মুখেও একটুখানি প্রসাধনের ছোঁয়া পড়ত। বরাবর শাদা শাড়িই সে পরে, কিন্তু সেদিন সেই শাড়ির পাড়ে দেখা দিত জরির ঝিলিক। শরীরে খুশির দোলাটুকু টের পাওয়া যেত—চকচক করত চোখ দুটো।

একটা নির্ভার সন্ধ্যা। সময় নষ্ট করার মতো অনেকখানি সময়।

কী ছবি ?

যে-কোনো ছবি। ছবি দেখাটাই আসল। ছবিটা উপলক্ষ্য।

তারপর কয়েকটা বছর। যুগ-যুগান্ত। প্রসাধনের কথা ভাববার আর সময় নেই মনীষার। চোখের আলো নিবে এসেছে। কত দিন মনীষা খিল খিল করে হেসে ওঠেনি? মনে করা শক্ত।

আজও মনীষা এসে দাঁড়ালো সামনে। ক্লান্ত মুখে শূন্যতা ভাসছে। শাড়িটা আধ-ময়লা। কাঁধে ঝোলা একটা।

দরকার ছিল না। একটা অনিচ্ছুক শ্রান্ত শরীরকে এভাবে টেনে আনবার কোনো দরকার ছিল না।

বিকাশ শুকনো গলায় বললে, 'অফিস-ফেরত?'

মনীষা হাসতে চেষ্টা করল: 'বাড়ি ফিরে গিয়ে তো আসবার সময় পাওয়া যেত না।'

'অফিসেই ছিলে এতক্ষণ?'

'না—সাড়ে চারটেয় বেরিয়েছি। বাবার জন্যে একটা ওষুধ কেনবার দরকার ছিল, আর বাড়ির ছুটো-একটা খুঁটিনাটি। ওইগুলোই কিনলুম ঘুরে ঘুরে।'

'তার মানে কিছুই খাওয়া হয়নি?'

'তুমি খাওয়াবে।' মনীষা সহজ হতে চাইল: 'এখনো তো সময় আছে মিনিট পঁচিশেক।'

'আরো কিছু বেশি। বিজ্ঞাপন, নিউজ রীল। অবশ্য সেগুলোর জন্যে যদি তোমার খুব আকর্ষণ থাকে—'

'একেবারেই না।'

শুধু বিজ্ঞাপন, শুধু নিউজ? ছবিটার জন্যেও কি কোনো আকর্ষণ আছে মনীষার? বিকাশ ভাবতে চেষ্টা করল। একদিন সময় নষ্ট করবার জন্যেই সময় পেতো মনীষা—আসত নির্ভার হয়ে, শ্যামবাজারের কোনো অভাব কোনো যন্ত্রণা সেদিন সে বয়ে আনত না। আজ তার কাঁধের ঝোলায় বাবার ওষুধ, সংসারের টুকিটাকি। একটা সন্ধ্যার টিউশন নষ্ট হল বলে হয়তো মনের ভেতরে কাঁটা বিঁধছে তার।

মনীষা বললে, 'কী ভাবছ, চা খাওয়াবে না?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, চলো।'

'টিকেট কেনা হয়ে গেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

...আবার কাঁধের ওপর সেই তেলতেলে চুলওলা মাথাটার আবির্ভাব, আবার সেই উগ্র লেবুর গন্ধ। গালে মুখে চুলের সুড়সুড়ি—মাথার ভারটা চেপে পড়ছে ঘাড়ের ওপর। হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন ভদ্রলোক। প্রথমে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে ছিলেন, তারপর

ওপাশে ঢুলে পড়েছিলেন, ওদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে আর একবার সোজা হয়েছিলেন, এবং এইবারে—

'ও মশাই !'

'অ্যাঃ !'

'দয়া করে যদি একটু সরে যান—'

'সরি, ভেরি সরি—' শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় জবাব দিয়ে এবার উঠে বসলেন ভদ্রলোক। চোখ খুললেন জোর করে। একটু ঝিমোলেন, আবার সোজা হলেন আপ্রাণ চেষ্টায়।

'কটা বেজেছে বলুন তো ?'

'সোয়া বারোটা।'

'ইস্—আরো দু ঘণ্টা ! স্টেশনে নেমে আবার সাড়ে তিন মাইল রাস্তা। গাড়ি পাঠাতে লিখেছি—যদি চিঠি না পায় তো সারা রাত এক বোঝা মাল-পত্তর নিয়ে বসে থাকতে হবে স্টেশনে !'

'ব্যবসা আছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ মশাই, পৈতৃক।' কথা বলতে বলতে জেগে উঠলেন ভদ্রলোক: 'তেল-নুন থেকে চুলের ফিতে, সাইকেল টিউব পর্যন্ত সব বিক্রী করি। আপনি কত দূর ?'

গন্তব্য জানাতে হল বিকাশকে।

'অ—তবে তো সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তি আপনি। ওখানেই বাস ?'

'না—চাকরিতে বদলি হয়ে গেছি।'

'ওখানকার কানাই পালকে জানেন ?'

এখানেও কানাই পাল ! একটু চকিত হল বিকাশ।

'তিনি তো মস্ত লোক। তাঁকে আর কে না চেনে !'

'আমাদের জ্ঞাতি মশাই। কিন্তু এখন তো বিরাট ধনী—আমাদের কি আর চিনতে পারবেন ?'

সেই ঈর্ষা। একজন কৃতী হয়ে উঠলে অন্যদের অন্তর্জ্বালা।

'বড়লোকেরা সব আলাদা জাতের। গরিব আত্মীয়-কুটুম ওদের কেউ নয়।'

'কিন্তু কানাইবাবু তো লোকের উপকার-টুপকার করেন শুনেছি।'

'ওসব এক-আধটু করতে হয় মশাই। ওটাও বড়লোকীর অঙ্গ—বুঝলেন না ?'

ঈর্ষা। কোনো পথেই পরিত্রাণ নেই।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'দেখাতে হয়—ও-সব দেখাতে হয়। ধরুন, স্বজাতের কেউ গিয়ে ধরে পড়ল, দিলে হয়তো নিজের কোম্পানিতে ছোটখাটো একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে।

সবাই বলতে লাগল, কানাই পালের মতো মানুষ আর হয় না। কিন্তু আমি ও-সবে ভুলি নে মশাই।'

'কেন ভোলেন না?' বিকাশ কৌতূহলী হতে চেষ্টা করল। এ-সব আলোচনায় তার কোন উৎসাহ নেই। যেদিন থেকে গরিবের ছেলে কানাই পাল অনেক ওপরে মাথা তুলেছেন, সেদিন থেকেই শশাঙ্ক নিয়োগী থেকে আরো অনেকের নিশ্চিন্ত অন্ন আর সুখের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিকাশ তাঁর জ্ঞাতি নয়, নিয়োগীপাড়ার প্রেসটিজ নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয় না।

তবু প্রশ্নটা সে করল। করল একটি মাত্র স্থূল কারণে। এই সূত্রে কিছুক্ষণ জেগে থাকবেন ভদ্রলোক—কথা বলবেন এবং বলতে বলতে যদি ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দিতে পারেন তাহলেই স্টেশনটা এসে পড়বে তাঁর। অর্থাৎ বিকাশের কাঁধে মাথা নামিয়ে, গালে এক-রাশ জ্যাবজেবে তেলের গন্ধ ছড়িয়ে এবং উৎকট লেবুর গন্ধে দম আটকে দিয়ে হাঁ করে খানিকটা ঘুমিয়ে পড়বার আগেই নেমে পড়বেন তিনি।

ভদ্রলোক এবারে পকেট হাতড়ে হায়দ্রাবাদী সিগ্রেট বের করলেন এক প্যাকেট।

'আসুন।'

'ধন্যবাদ। আমি খাই না।'

ভদ্রলোক সিগারেট ধরালেন। একটা ঘুমন্ত স্টেশনে এসে গাড়ি থেমেছে। কেউ উঠল কিনা বোঝা গেল না, ঘণ্টা বাজল, হুইসেল বাজল, ট্রেন আবার নড়ল।

'হুঁ—কানাই পাল।' স্বগতোক্তি শোনা গেল একবার। বন্ধ কামরাটার মধ্যে কড়া সিগ্রেটের খানিক উগ্র ধোঁয়া পাক খেতে খেতে রওনা হল সামনের ইলেকট্রিক বালবটার দিকে। তারপর:

'ওর কোম্পানি অত বড়ো হল কী করে, জানেন?'

'শুনেছি নিজের চেষ্টায় করেছেন।'

'হুঁ—নিজের চেষ্টায়!' এবার কানাইবাবুর জ্ঞাতির গলায় একেবারে শশাঙ্ক নিয়োগীর সুর লাগল। বলে চললেন, 'ওঁর এক মামা ছিল যোগেন পাল—জানতেন তাকে?'

'আজ্ঞে না। আমি বাইরে থেকে চাকরিতে গেছি, কাউকে চিনি না।'

'বড়ো মহাশয় লোক ছিল যোগেন পাল, বুঝলেন? তারই ব্যবসা ছিল কলকাতায়। কানাই গিয়ে ভিড়ল তার সঙ্গে। পয়সা তো নেই—ওয়ার্কিং পার্টনার। মামা বিশ্বেস করে সব ছেড়ে দিয়েছিল ভাগনের হাতেই। তারপর কী হল, আন্দাজ করুন।'

'আপনিই বলুন।'

'কী আর বলব—' ভদ্রলোক এবার এঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়লেন এক রাশ: 'কদিন পরেই মামার ব্যবসা এসে ঢুকল শ্রেফ ভাগনের পেটের ভেতর। মামা দেখলে সে কেউ

নয়। বিয়ে-থা করেনি মশাই, ভারী সাধু লোক ছিল। একেবারে এক বস্ত্রে চলে গেল কাশীতে। যাওয়ার আগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে গেল—আমার তো ছেলেপুলে নেই, সব ওকেই দিয়ে যেতাম, কিন্তু এই ক'টা দিনও কানাইয়ের তর সইল না? মনের দুঃখে লোকটা কাশীতেই মারা গেছল মশাই। অসুখের খবর কানাই পেয়েছিল, কিন্তু একবার দেখতে পর্যন্ত গেল না, মরবার সময় যোগেন পালের মুখে এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল দেবারও কেউ ছিল না তা জানেন?'

সত্যি! হওয়া অসম্ভব নয়। কানাই পাল নিজেই তো বলেছেন—শুধু সৎ পথে থেকে অনেক টাকা কারুও হয় না—তাঁরও হয়নি। এ-রকম অনেক যোগেন পালেরা বলি না হলে কানাই পালদের ভিত তৈরী হবে কী করে?

অথবা এর অনেকটাই—হয়তো সবটাই বানানো গল্প। যাকে ঈর্ষা করা যায়, তাকে নিয়ে কুৎসা তৈরী করবার স্বর্গীয় আনন্দ আছে একটা।

ভদ্রলোক বললেন, 'শুধু কি এই সব কারবারই নাকি? ভাইপোর নামে একটা বেনামদার মেছো ভেড়ী তৈরী করেছে দক্ষিণে—জানলেন? এক-আধটু নয় মশাই—বিশাল ধানী জমি ছিল, কতটা—আমি ঠিক বলতে পারব না। রাতারাতি জমিটা জলে ভাসিয়ে দিলে—পঞ্চাশ-ষাট ঘর চাষীর মুখের ভাত কেড়ে নিলে। লোকগুলো মাথা কুটল, কেঁদে ভাসাল, তারপর মরীয়া হয়ে এল দাঙ্গা করতে। কিন্তু তখন থানা থেকে বন্দুক নিয়ে পুলিস এসে হাজির—কী আর করবে?'

বিকাশ চুপ করে রইল।

'এই তো কানাই পাল মশাই—মান্যিগণ্যি লোক, অনেক টাকা এখন। দুনিয়াটাই বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে বুঝলেন না—চোর-জোচ্চোরদেরই এখন ষোল কলা, তাদেরই বাড়-বাড়ন্ত!'

চরম জ্ঞানের কথা। একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলেন ভদ্রলোক। সিগ্রেট খেতে লাগলেন নিঃশব্দে, গাড়ির কামরায় ধোঁয়ার মেঘ ঘন হতে লাগল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাই, একবার বাথরুম থেকে—'

'বাথরুমে' তিনি গেলেন, ফিরলেন, সারা দিন বড়োবাজার আর পোস্তায় দৌড়োদৌড়ি করে অসম্ভব খাটুনি হয়েছে তা বললেন, সৎ লোক সংসারে যে কোথাও নেই সেকথা আর একবার জানালেন, আঙুল মটকালেন, হাই তুললেন গোটা তিনেক, এবং—

এবং আবার ঘুমুলেন, একটু একটু করে ঝুঁকতে লাগলেন, তারপর লেবুর সেই উগ্র গন্ধভরা তেলজবজবে চুলওলা মাথাটা যথাসময়ে নামিয়ে দিলেন বিকাশের কাঁধের ওপর। নাকও ডাকতে লাগল অল্প অল্প। তাঁর স্টেশন আসতে এখনো দেড় ঘণ্টা দেরি।

আর—এতক্ষণের এই সব সদালাপের পর বিকাশ আর কিছুতেই বলতে পারল না—

'দয়া করে আমার কাঁধের ওপর থেকে মাথাটা সরান, আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে।'

অদৃষ্ট!

আবার মনীষা ফিরে এল।

'তোমার আঙুলের ব্যথাটা কেমন আছে—বললে না?'

'ও সেরে গেছে।'

'এক দিনেই?'

'কাজের লোক। ও-সব বেশিদিন পুষে আবার বিলাসিতা আমাদের পোষায় না।'

'কাজের লোকের সঙ্গে অসুখেরও বুঝি রফা থাকে?'

'থাকে। কিন্তু তুমি চুপ করে বসে যে বড়ো? আর একটা পুডিং?'

'না—খেতে পারছি না।'

বিকাশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মনীষার শীর্ণ মুখের দিকে।

'মণি, আমার একদম ভালো লাগছে না।'

'কেন—কী হল আবার।'

'অদ্ভুত খারাপ হয়ে গেছে তোমার শরীর।'

'ওটা বয়েস।'

'বয়েস?' বিকাশ বিরক্তি বোধ করল: 'ছাব্বিশ বছরেই তুমি এমন কিছু ঠান্‌দি হয়ে যাওনি। তোমার ভালো ট্রীটমেণ্ট দরকার।'

'ডাক্তার তো দেখছে।'

'ছাই দেখছে।'

'ভাবছ কেন!' মনীষা হাসল: 'মেয়েরা অত সহজে মরে না।'

'আদ্যিকালের এ-সব মেয়েলি বুকনি রাখো—' বিকাশ উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'চলো আমার সঙ্গে। চেনা ডাক্তার রয়েছে আমার, তাঁকে দিয়ে চেক-আপ করাব।'

'কিছু দরকার হবে না—' মনীষা বিকাশের হাতে হাত রাখল: 'এবার কলকাতায় এসে দেখবে আমার শরীর অনেক সেরে গেছে। কিন্তু ওদিকে তো ছবি আরম্ভ হয়ে গেল, এখনো কি ঝগড়া করবে?'

না—ছবি দেখাও জমল না। একটা যে-কোনো ধরনের কমেডি, মাঝে মাঝে মার্কিনী রীতিতে কিছু উঠ্‌তি-যৌবন এবং বিগত-যৌবনকে অল্পসল্প সুড়সুড়ি দেওয়া। কখনো কখনো বাকি সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে ওঠা যায়—থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না।

ছবি দেখে বেরিয়ে আসবার পরও মনে মুক্তির হাওয়া এল না কোথাও। মনীষার নিরুত্তাপ শ্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বিকাশ ভাবল দরকার ছিল না—কিছুই এর দরকার

ছিল না। এ শুধু জোর করে টেনে আনা—প্রতিবাদ করবার শক্তি যার নেই, সেই নিরুপায়ের ওপর জোর খাটানো।

পথে ভিড়, আলো, মানুষ। ময়দানে শীতের কুয়াশা। গাছের পাতা ঝরবার পালা।

হতাশভাবে বিকাশ বললে, 'চলো—বাড়ি পৌঁছে দিই তোমাকে।'

'তুমি কী বলবে বলছিলে।'

স্বরে উৎসাহ ছিল না—কৌতূহলও না।

কী বলবে বিকাশ? একটা উপায় পাওয়া গেছে কোথাও? মাথায় এসেছে এমন অব্যর্থ একটা পরিকল্পনা—যা মনীষার সংসারের সব দাবি মিটিয়ে দেবে অথচ মনীষাকে নিয়ে ঘর বাঁধতেও কোনো বাধা থাকবে না?

কাল সন্ধ্যায় জেদের মাথায় মনে হয়েছিল—সে উপায়টা আছে, হাতের কাছেই কোথাও আছে। আজ রাত্রের চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে—ময়দানের কুয়াশা আর হিমের হাওয়ায় পাতা ঝরবার ভেতরে অনুভব করা গেল, কোথাও কিছু নেই—মনীষার শূন্য চোখের ভেতর দিয়ে সব শূন্যে হারিয়ে গেছে।

বিকাশ বললে, 'আজ থাক। আমি চিঠিতে লিখব তোমাকে।'

'আচ্ছা।'

পথে যেতে যেতে একটাই কথা হল কেবল।

'এক্স্-রেটা করিয়ে নিয়ো মণি। দেরি কোরো না।'

'না।'

'টাকার দরকার হবে কিছু? দিয়ে যাব?'

'এখন থাক।'

নামবার আগে মনীষার হাতটা একবার টেনে নিয়েছিল মুঠোর ভেতরে। ঠাণ্ডা ছোট ছোট আঙুলগুলো সাড়া দিল না। অফিসে কাজ করতে করতে ওরাও টাইপ-রাইটারের চাবি হয়ে গেছে।

'এক্স্-রের রিপোর্ট আমায় জানাবে?'

'জানাব। কিন্তু পায়ের আঙুলটা নেগলেক্ট কোরো না। সেপটিক হয়ে যেতে পারে।'

……তেলের গন্ধভরা মাথাটা চমকে উঠে পড়ল কাঁধ থেকে। ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন থেমে পড়েছে আর একটা ঘুমন্ত স্টেশনে।

'কটা বেজেছে মশাই?'

'পৌনে ছটো।'

'আর বেশী দেরি নেই তা হলে। কী স্টেশন?'

কাচের ভেতর দিয়ে পড়লেন নামটা।

'আরো তিনটে স্টেশন বাকি। যাক গে—সব দেখে শুনে নিই। সোজা জিনিস-পত্তর মশাই! লগনসার বাজার। বড়োবাজার, পোস্তা, মুর্গীহাটা, রাধাবাজার—সব ঘুরে ঘুরে—'

আড়ষ্ট, বিনিদ্র শরীর নিয়ে স্টেশনে নামা। মুখে একটা বিস্বাদ অনুভূতি। তবু স্টেশনের বাইরে এসে, গাছের পাতায় প্রথম রোদ দেখে মনে হল—এর চেয়ে কলকাতা ভালো! হিংসা-নীচতা-অন্ধকার এখানে সব আছে, কিন্তু কলকাতা কেবল ক্লান্ত করে—ক্লান্ত করে।

হাসিমুখে একটি অল্পবয়েসী রিক্‌শাওলা এগিয়ে এল।

'চিনতে পারেন?'

প্রথম দিনের সেই গণেশ।

'নিশ্চয়। কেন চিনব না?'

স্যুটকেসটা রিকশায় তুলে নিয়ে গণেশ বললে, 'এখনো সেই নিয়োগীকর্তার বাড়িতেই আছেন তো? চলুন—পৌঁছে দিচ্ছি।'

শীতের সকাল, সোনালি রোদ, মাঠ, গাছপালা আর শিশিরে ঝিকঝিক করছিল। বিকাশের আবার সুস্থুকে মনে পড়ল। ভালো নাম সুবর্ণা—সে নাম দিয়েছে সোনালি।

ষোলো

'শ্মশান ভালোবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি—'

উৎকট গলায় প্রচণ্ড চিৎকারে শ্যামাসঙ্গীত। চকিত হয়ে বিকাশ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা বুড়ো জামরুল গাছের তলায় মেজদা বসে। সেখান থেকেই চলছে তার সঙ্গীত-চর্চা।

'শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি—'

জামরুল গাছটায় অজস্র লাল পিঁপড়ে। তারই গোটাকয়েক ঘুরছে মেজদার গায়ে, তার চুলে-দাড়িতে। কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ নেই। সমান উৎসাহে চলছে গানটা।

কিন্তু দু লাইনের পরে আর এগোল না। এর পরে খানিক ইংরিজি আবৃত্তি। সেটা থামতে না থামতে আর একপ্রস্থ চিৎকার: 'চলে আয়—চলে আয়—'

কাকে এমন সমাদরের সঙ্গে ডাকাডাকি?

চোখে পড়ল মেজদার হাতে এক টুকরো রুটি। সেইটে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে সে। আর এক মনে ডেকে চলেছে—'আয়—চলে আয়—'

কাকের দল কাছাকাছি ছিলই। নেমে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। রুটির টুকরো নিয়ে উড়ে গেল কেউ-কেউ, কোনো-কোনোটা আবার উৎসাহের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে মেজদার দিকে এগোতে লাগল।

বেশ আছে লোকটা।

জানলা থেকে সরে আসতেই ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ছুটে এল মিতাস্তুমার নিয়োগী। হাতে গায়ে একরাশ কালি। মুখেও লেগেছে খানিকটা।

'ব্যাপারটা কী নিয়োগীমশাই? এই সাতসকালে কালি মেখে প্রসাধন হচ্ছিল নাকি?'

উত্তর এল: 'মেজদি মারবে।'

'এই রকম সেজেছো বলে? তাতে মেজদির বলবার কী আছে? তোমার যদি মনে হয়ে থাকে যে এতেই তোমাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে তাহলে আইনত তোমার মেজদির প্রতিবাদ করবার কিছু নেই।'

সত্যিই বেশ দেখাচ্ছিল। ফুলো ফুলো ফর্সা গালের ওপর দিব্যি খোলতাই হয়েছিল কালির দাগ। যাকে বলে কনট্র্যাস্ট। কিন্তু মিতাস্তুমারের পরের কথাটাতেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

'আমি মেজদির কালি ফেলে দিয়েছি।'

'অ্যা—এটা তো ভালো খবর নয়।'

তৎক্ষণাৎ মেজদির প্রবেশ আর মিতাস্তুমার পত্রপাঠ বিকাশের পেছনে।

'বুড়ো এদিকে আয়।' কড়া গলায় ডাকল সুমু।

'না, তুমি মারবে।'

'নিশ্চয় মারব—'সুমু অভয় দিলে, 'আমার বই-খাতায় কালি ঢেলে দিয়েছ? তোমার কান দুটো যদি ছিঁড়ে না নিই, তা হলে—'

সুমু এগিয়ে এল এক পা, বুড়ো দু হাতে জড়িয়ে ধরল বিকাশকে।

বিকাশ বললে, 'ও এখন আমার আশ্রিত। কিছু বলতে পারবে না।'

'আশ্রিত?' সুমু রাগ করে বললে, 'আশ্রয়ে কতক্ষণ থাকবে সে আমি দেখব। খিদে পাবে না একটু পরে? চান করতে হবে না?'

'ততক্ষণে তোমার রাগ পড়ে যাবে।'

সুমু হেসে ফেলল এবার।

'আপনি জানেন না—কী ভীষণ পাজী। এক দোয়াত কালি ঢেলে আমার বই-খাতা সব শেষ করে দিয়েছে। বেরো বলছি বাঁদর কোথাকার। আমার পড়ার টেবিলে কী দরকার তোমার?'

'তোমাকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। বই-খাতায় কালি পড়লে বিদ্যে বেশি হয়—' বুড়োর পক্ষ থেকে কৈফিয়ত দিলে বিকাশ।

'ঠাট্টা করবেন না বিকাশদা।' হাসতে গিয়েও সামলে নিলে সুমু: 'সব সময় বই-পত্তর টেনে এমন উৎপাত করে যে কী বলব।'

'শোনো বালিকা!' বিকাশ গম্ভীরভাবে বললে, 'তোমার নিজের শিশুকালেও এ-সব ভালো ভালো কাজের অনেক রেকর্ড আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কান দুটো তোমার যথাস্থানেই রয়েছে দেখা যাচ্ছে, কেউ তাদের উপড়ে নেয়নি।'

'আমি কক্ষনো করিনি ও-সব।'

'সেটা যাচাই করতে গেলে কাকিমাকে সাক্ষী মানতে হয়। তার ফল তোমার পক্ষে খুব ভালো না-ও হতে পারে। অতএব সসম্মানে বুড়োকে ছেড়ে দাও।'

সুমুর চোখ দুটো চকচক করে উঠল কৌতুকে। তারপর ডাকল: 'বুড়ো, আয়।'

'তুমি মারবে।'

'মারব না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

বুড়ো বেরিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ল সুমুর হাতে।

'এবার?'

বিকাশ বললে, 'উঁহু, কথার খেলাপ চলবে না। আমি সাক্ষী আছি।'

সুমু হেসে ছেড়ে দিলে বুড়োর হাত। আর সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে উধাও হল সে। সুমু চেঁচিয়ে বললে, 'শিগগীর নীচে মা-র কাছে যা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। হাত-মুখ ধুয়ে দেবে।'

একটু চুপ। বাইরের বাগান থেকে কাকের কোলাহল—মেজদা বোধ হয় এখনো খাওয়াচ্ছে তাদের। এই পুরোনো গন্ধে-ভরা বিমর্ষ বাড়িটাও এতদিনে তার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সামনের পোড়ো মহলটার হতশ্রী চেহারা আর অস্বস্তি বয়ে আনে না, মেজদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে কিংবা তার এক-আধটা বেয়াড়া চিৎকার শুনলে এখন আর ধ্বক করে ওঠে না বুকের ভেতরে। একটি পরিবার, তার সহজ দুঃখ-সুখের জীবন, ছেলে-মেয়ে নিয়ে শান্ত নির্বিরোধ কাকিমার সংসার—এর মধ্যে তো সরল নির্ভাবনায় দিন কাটিয়ে দেওয়া চলে। সব বেসুরো হয়ে যায় শুধু একটি মানুষের জন্যে—শশাঙ্ক কাকা! খুব তো একটা অভাব নেই তাঁর—পুকুর, জমি, ধান নিয়ে এই সহজ জীবনের মধ্যে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিতে পারেন তিনি। কানাই পালেরা যত খুশি বড় হয় হোক, তাঁর তাতে কী আসে যায়!

কিন্তু—

'রচনা বইটা একেবারে শেষ করে দিয়েছে—' ব্যাজার মুখে স্বস্থ বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিকাশ ডাকল।

'শোনো!'

দোরগোড়ায় স্বস্থ ঘুরে দাঁড়ালো।

'তোমার জন্তে একটা সেতার তৈরী করতে দিয়ে এসেছি কলকাতায়। কয়েক দিনের মধ্যেই আসবে।'

চোখে-মুখে উৎসাহের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না স্বস্থর। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

'কী, খুশি হলে না?'

স্বস্থ একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'কী হবে?'

'তার মানে?'

'আপনি তো বাসা খুঁজছেন। পেলেই চলে যাবেন।'

আবার সেই প্রশ্নটা। ভেতরে ভেতরে একটু সঙ্কুচিত হল বিকাশ, একটা অপরাধের ছোঁয়া লাগল কোথাও। মনে পড়ল, মশারিটা ফেলে দিতে এসে স্বস্থ বলেছিল, 'দোহাই আপনার বিকাশদা, এ বাড়ি ছেড়ে আপনি চলে যাবেন না।'

আজ আর সে অনুরোধ করল না। নিজের মতো করে একটা কিছু বুঝে নিয়েছে সে। জেনেছে, বিকাশ এ বাড়িতে আর থাকবে না।

একটু চুপ করে থেকে বিকাশ বললে, 'বাসা করে চলে গেলেই বা কী। তোমাদের এখানে আসতে বাধা হবে কেন?'

স্বস্থ হাসল: 'সময়ই পাবেন না।'

'কেন পাব না? কী আমার এত কাজ এখানে?'

আবার একটু হাসল স্বস্থ। তারপর—বিকাশকে সম্পূর্ণ চমকে দিয়ে কিশোরী মেয়েটি আশ্চর্য গম্ভীর গলায় বললে, 'এ বাড়ি থেকে যে চলে যায়, সে আর ফিরে আসে না।'

হঠাৎ ব্যাঙ্কে আবির্ভাব হল কানাইবাবুর।

'নমস্কার। অনেকদিন দেখা নেই।'

তটস্থ হয়ে বিকাশ বললে, 'নমস্কার, বসুন।'

চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে শব্দ করে বসলেন কানাইবাবু। সহজভাবে তিনি বসেন না—নিজের অস্তিত্বটাকে চারদিকে জানিয়ে দেওয়াই তাঁর চরিত্র। ছোট ব্যাঙ্কের কাউন্টারগুলোতে একটুখানি নীরব চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল—চশমার তলা দিয়ে একবার

মিটমিট করে চেয়ে দেখলেন প্রিয়গোপাল।

কানাইবাবু বললেন, 'কি রকম চলছে আপনাদের?'

প্রশ্নটার বিবিধ অর্থ হওয়া সম্ভব। ব্যাঙ্ক, শরীর, জীবনযাত্রা। বিকাশ বললে, 'আজ্ঞে ভালোই।'

একটু হাসলেন কানাইবাবু: 'সেদিন কালীবাড়ির মিটিং-এ আপনাকে দেখেছিলুম।'

বিকাশ বিব্রত বোধ করল। নিয়োগীপাড়ার দলবলের মধ্যে, শশাঙ্ক কাকার পাশে বসে ছিল সে। কানাইবাবু তাকে তাঁর প্রতিপক্ষ ঠাউরে বসে আছেন কিনা কে জানে।

'আমার কোনো উৎসাহ ছিল না—কাকাই ডেকে নিয়ে গেলেন—' কৈফিয়তের ভঙ্গিতে জবাব দিলে বিকাশ। আর বলেই তার খারাপ লাগল। কানাই পাল তার মনিব নন যে তাঁর কাছে তাকে এইভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

কানাইবাবু রূপোর কেস খুলে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'সে আমি জানি, আমাদের এ-সব ব্যাপারে আপনার কোনো ইন্টারেস্ট থাকবার কথা নয়। কিন্তু বেশ একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল তো?' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আবার একটু হাসলেন: 'এর আগে আপনাকে কী বলেছিলুম, মনে আছে? কলকাতায় থেকে আপনারা অনেক রকম স্বপ্ন দেখে থাকেন, কিন্তু বাংলা দেশকে চিনতে আপনাদের দেরি আছে। সে যাক—চোট-ফোট লাগেনি তো কোনোরকম?'

'আজ্ঞে না। কিন্তু এই রকম একটা ব্যাপার নিয়ে যে—'

বাধা দিয়ে কানাইবাবু বললেন, 'এ হল আপনাদের কর্পোরেশন-অ্যাসেম্বলির একটা মিনিয়েচার সংস্করণ। আমাদের গণ্ডি ছোট—প্রব্লেমও ছোট। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কাউনসিলার কিংবা এম. এল. এ'দের চাইতে উদ্দীপনায় আমরা পিছিয়ে আছি। বীররসের নমুনাও তো দেখলেন। একদিন কষ্ট করে আসুন না পঞ্চায়েতের বৈঠকে। আরো কিছু অভিজ্ঞতা হবে।'

'মাপ করবেন, আমার উৎসাহ নেই।'

'দেখা দরকার মশাই, জানা দরকার। নইলে কল্পনার একটা বাংলা দেশকে গড়ে নিয়ে বসে থাকবেন, তাকে কখনো চিনতে পারবেন না। কলেজ তো কলেজ, স্কুলকমিটির মিটিং-এ কী হয় ভাবতে পারেন? লোক্যাল পলিটিক্স্ যে কী জিনিস যদি একবার ভালো করে টের পান তো আপনার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে।'

এমনিতেই নিঃশ্বাস আটকে আসছিল বিকাশের। কী দরকার তার লোক্যাল পলিটিক্সে? এ-সব করবার জন্যে তো সে এখানে আসেনি। কেন কাকা তাকে জোর করে এ-সব বীভৎস মীটিং-এ ধরে নিয়ে যেতে চান, কেনই বা কানাইবাবু তাকে জড়িয়ে নিতে চান সবকিছুর সঙ্গে? অথবা এই হচ্ছে এঁদের চরিত্র, কিংবা গ্রামের

রীতি, কলকাতার মতো কেউ এ-সব জায়গায় নিজেকে আলাদা করে—একান্ত করে নিয়ে থাকতে পারে না— ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় তার সব নোংরামির শরিক হয়ে যেতে হয়।

ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে বিকাশ চুপ করে রইল।

কানাই পাল কিছু বুঝলেন কিনা তিনিই জানেন। নিঃশব্দে সিগারেট টানলেন কিছুক্ষণ। তারপর: 'আমার পাস-বইটা আপ-টু-ডেট করে দেওয়া দরকার। ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন দিতে হবে একটা।'

'নিশ্চয়।' কাজের দায়িত্বে বিকাশ সচেতন হয়ে উঠল: 'কবে চাই বলুন?'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

'কালকেই রেডি হয়ে যাবে। পাঠিয়ে দেব আপনাকে।'

'তার দরকার নেই, আমার লোক আসবে—' কানাইবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আচমকা বললেন, 'শুনেছি আপনি নাকি বাসা খুঁজছেন একটা?'

কথাটা কানাইবাবু কী করে জানলেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাও বিড়ম্বনা। কানাই পাল জানবেন না এমন একটা ঘটনা এখানে কিছুতেই ঘটতে পারে না। এমন কি, গাছের একটা পাতা খসলেও তাঁর কাছে খবর পৌঁছোয়।

'ভাবছি।'

'যদি ইচ্ছে করেন—' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কানাইবাবু বললেন, 'আমি একটা খোঁজ দিতে পারি বোধ হয়। আমারই একটা বাড়িতে দোতলায় খান-দুই ভালো ঘর খালি আছে —সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ। নীচে একটা গো-ডাউন রয়েছে কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

আস্তে বললেন না, কথাটা ছড়িয়ে গেল। বিকাশ একবার চেয়ে দেখল সামনের দিকে কাউন্টারে কুঁজো হয়ে বসে থাকা প্রিয়গোপালবাবু একবার সোজা হলেন, চোখ দুটো যেন মিটমিট করে উঠল তাঁর।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়া গেল না।

কানাইবাবু বললেন, 'আমি জানি, আপনার অস্বস্তিটা কোথায়। হয়তো শশাঙ্কবাবু—'

এতক্ষণে একটা বিশ্রী ক্রোধে বিকাশের মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। অর্থাৎ সে এখানে কেউ নয়। হয় কানাইবাবু নয় শশাঙ্ক কাকা—এঁদের যে-কোনো একজনের মন জুগিয়ে চলতে হবে তাকে। ঠিক শাটলককের দশা—হয় এঁর র‍্যাকেটে নইলে ওঁর র‍্যাকেটে।

শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'আমি কোথায় বাসা ভাড়া নেব ভাবনা আমার। শশাঙ্ক কাকার কী যায় আসে। আপনাদের দলাদলির মধ্যে আমি তো কোথাও নেই।'

'সে তো ভালো কথা।' কানাইবাবুর চোখে চাপা কৌতুকের একটা ঝিলিক দেখা

দিল : 'দরকার হলে বলবেন আমাকে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলব বৈকি।'

'আচ্ছা—নমস্কার—'কানাইবাবু বেরিয়ে গেলেন।

বিকাশ বসে রইল চুপ করে। সন্দেহ নেই—মানুষটি একটি চরিত্র। সেদিন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে তাকে গাড়িতে তুলেছিলেন, নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের সেই বাগানবাড়ি কিংবা খামারবাড়িতে। একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন বন্ধুর মতো, মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বিকাশকে শোনাতে শুরু করেছিলেন আত্মজীবনী। কিন্তু তারপরই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন স্বাভাবিক দূরত্বে—যেন সামাজিক পরিচয়ের অতিরিক্ত কোনো সম্পর্ক তাঁর আর তার সঙ্গে নেই।

আসলে সে রাত্রিটা কিছুই নয়। কানাইবাবু এক-একদিন নিজের সঙ্গে কথা বলতে চান। তখন বিকাশের মতো যে-কোনো একটা উপলক্ষ তাঁর দরকার।

বিরক্তিকর—সব কিছু বিরক্তিকর। কলকাতায় গিয়ে বিতৃষ্ণার মাত্রাটা আরো বেড়ে উঠেছে এবারে। মনীষা। ক্লান্তি। সিনেমা দেখাটার কোনো মানেই হয় না। মনীষার কাঁধের ঝোলায় একরাশ ওষুধপত্র। পেটের ভেতরে দুর্বোধ একটা চিনচিনে যন্ত্রণা—ডাক্তার বলেছে, স্টোন। হাইড্রান্টের ঢাকনাটার মতোই জীবনটা সিম্বলিক। চলতে চলতে রূঢ় নিষ্ঠুর সংঘর্ষ—নখ ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যাওয়া। ভূতুড়ে নিয়োগীবাড়ি থেকেও জোর করে পালানো যায় না। কাকিমার বিষণ্ণ মুখ মনে পড়ে—স্বস্তুর চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে।

অথচ, এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। খুব সহজ, খুব স্বাভাবিক হয়ে তার দিন-গুলো কেটে যেতে পারত। স্বাস্থ্যে ঝকঝকে হয়ে মনীষা এসে বলতে পারত : আমার সময় হয়েছে, এবার তুমি আমাকে নাও। যে-কোনো গ্রাম্য ভদ্র গৃহস্থের মতো শশাঙ্ক কাকা স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করতে পারতেন, সুখী হতে পারতেন, একটি সুপাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন। অনেক টাকা আর মস্ত ব্যবসায়ের মালিক কানাই পাল গ্রামের রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে স্বচ্ছন্দে কলকাতায় গিয়ে আরো বড়ো প্রতি-যোগিতায় নেমে পড়তে পারতেন।

কিন্তু জীবনে সরলরেখা কোথাও নেই। অস্পষ্ট আলোয় উত্তর কলকাতার একটি সরীসৃপ গলির মতো সব—বাঁকে বাঁকে কোথা থেকে কোথায় চলেছে, যে পথ চেনে না—তার কাছে মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন!

বিকেলে বেরুতেই আজও সঙ্গ নিলেন প্রিয়গোপাল।

'স্যার, কানাই পাল বাড়ির কথা বলছিল আপনাকে—না?'

ক্লান্তভাবে বিকাশ বললে, 'হুঁ।'

'যাবেন না স্যার ওর ওখানে। একটা শার্ক, একটা ক্যাপিটালিস্ট।'

ব্যাঙ্কের সে কেরানীই আর নন। এখন অন্য মানুষ। যে প্রিয়গোপাল একসময়ে রাজনীতি করে জেল খেটেছিলেন, যিনি এখনো কথামৃতের সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র বামপন্থী পত্রিকা পড়ে থাকেন।

বিরস মুখে বিকাশ বললে, 'কী করতে বলেন তা হলে? বাসা তো আমার একটা দরকার।'

'তাই বলে ওঁর বাড়িতে থাকবেন?'

বিরক্ত হয়ে বিকাশ বললে, 'কেন, কানাইবাবু ক্যাপিটালিস্ট বলে? অদ্ভুত লজিক তো মশাই আপনাদের। কলকাতার অর্ধেক বাড়িওলাই তো ক্যাপিটালিস্ট—আপনাদের থিয়োরী অনুসারে তা হলে তো বাড়িভাড়া নেওয়াই চলে না—ফুটপাথে পড়ে থাকতে হয়।'

'আমি ঠিক তা বলিনি—' প্রিয়গোপাল লজ্জিত হলেন একটু: 'মানে স্যার—ও-সব টাইপের লোকের কাছ থেকে একটু দূরে সরে থাকাই ভালো। যদি সময় থাকে, এখন একটু চলুন না আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'সেই যে বাড়িটার কথা বলেছি, স্টেশনের দিকে? বাড়ির মালিক কেশব হালদারের তো কোনো আপত্তিই নেই, আমি ভাবছি, আপনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে—আপনাকে একবার দেখলে ওর বৌও—'

হিংস্র উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল বিকাশের। তার মানে নিজে গিয়ে এখন ইণ্টারভিউ দিতে হবে পাড়াগেঁয়ে একটি গিন্নীর কাছে, হয়তো হাঁটু গেড়ে করজোড়ে নিবেদন করতে হবে: 'মা জননী, আমি অতি সচ্চরিত্র যুবক, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি যে আপনার দুটি বালিকা কন্যার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানোর এতটুকু পাপ ইচ্ছেও আমার নেই!' বীভৎস!

কিন্তু রাগটা সামলে নিতে হল।

নীরসভাবে বিকাশ বললে, 'ও বাড়ি আমার দরকার নেই—ওঁদের বলে দেবেন।'

হনহন করে জোর পায়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। কেমন বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইলেন প্রিয়গোপাল, চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল চশমার ভেতরে।

খানিকটা সামনে এগিয়ে আবার একরাশ অবসাদ আর বিরক্তিতে তার পা দুটো আলগা হয়ে এল। নিয়োগীপাড়ার পথ, পুরোনো গাছের ছায়া, দু পাশের ভাঙা বাড়ি আর ইটের পাঁজায় কবরের মতো একটা কুৎসিত ঠাণ্ডা—সব মিলে সারা শরীর শিউরে উঠতে চাইল। দরকার নেই এখন বাড়ি ফিরে, তার চাইতে বরং একবার ঘুরে আসা যাক

ডাক্তার প্রভাকরের ওখান থেকেই।

কিন্তু স্কুলটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার ডাক পড়ল।

'বিকাশবাবু নাকি? শুনুন—শুনুন—'

ডাক দিলেন হেডমাস্টার কুমুদ সেনগুপ্ত।

সতেরো

হেডমাস্টার মশাইয়ের বসবার ঘরটি যেমন হওয়া দরকার ঠিক সেই রকম। দেওয়ালে গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ। এক আলমারি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। টেবিলে খাতাপত্র, ফাইল। কয়েকটি চেয়ার। এক দিকের একটি শেলফে কিছু ইংরেজি ক্ল্যাসিক্স্।

কুমুদবাবু বললেন, 'আসুন—বসুন, বসুন।'

বসতে বসতে বিকাশ একটু হাসল।

'একটা কথা ভুলে গেছেন। আমাকে তুমি বলবেন বলেছিলেন। আমি আপনার ছাত্রের বয়সী।'

'সব সময় খেয়াল থাকে না।' হেডমাস্টারও হাসলেন: 'তা ছাড়া দিনকাল যা পড়েছে, তাতে নিজের ছাত্রকেও তুমি বলতে ভরসা হয় না আর। যা হোক, চেষ্টা করব।'

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'অথচ আমাদের সময়—'

বয়েস হয়ে গেলে নিজেদের অতীত সম্পর্কে যে দীর্ঘশ্বাস পড়ে; যে-সব দিন অনেক আলো-অন্ধকারে জড়িয়ে ছিল, তারা দূর থেকে যেভাবে শুধু সোনার আলোতেই রাঙিয়ে ওঠে; যে-ভাবে নতুন কালটাকে বিশ্রী, বিরস, দুর্বিনীত মনে হয়।

'এখন রাস্তায় দেখা হলে পুরোনো ছাত্র দূর থেকে পাশ কাটায়—পাছে সামনাসামনি হলে প্রণাম করে বসতে হয় একটা। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে এমন ভাবে চলে যায় যেন দেখতেই পায়নি। আর আমরা—'

এই দীর্ঘশ্বাস সকলের। বিকাশের ছেলেবেলাটা কুমুদ সেনগুপ্তের চাইতে অনেক কাছে। তবু বিকাশের মনে হয়, তাদের কালটা অনেক সজীব, অনেক উজ্জ্বল ছিল। এই-ই হয়। কিন্তু দিনের পর দিন যে অনিশ্চয়তা, যে আক্রোশ, যে যন্ত্রণা সমস্ত জাতটার হৃৎপিণ্ডে জ্বলছে, আজকের ছাত্ররাও সে দহনের শরিক হবে না—এমন আশাই বা কে করতে পারে?

বিকাশ জবাব দিল না, শুনে যেতে লাগল। বাইরে শীতের বেলা ডুবল, ছায়া ঘনিয়ে

এল ঘরে। হেডমাস্টার মশাইয়ের চাকর একটা লণ্ঠন জেলে আনল।

'বুঝেছ, এই গ্রামের ছেলেরা আগে—মানে কিছুদিন আগেও একটু আলাদা ছিল, ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, প্রণাম করত একেবারে সাষ্টাঙ্গে। কিন্তু এখন সিনেমা-টিনেমা দেখে এরাও শহুরে ছেলেদের টেক্কা দিচ্ছে। একেবারে চাষাভুষোর গাঁয়ে চলে যাও সেখানেও দেখবে কী বলে ওই চোঙা প্যান্ট আর ট্র্যানজিস্টার রেডিয়ো।'

'আজ্ঞে হাওয়া যেদিকে বয়—'

'বিষের হাওয়া। দেশটা গেল। যেটুকু বাকি ছিল তাও যাবে ওই পলিটিক্সে। এক লাইন ইংরিজি-বাংলা শুদ্ধ করে লিখতে পারে না, কিন্তু লেনিন আর মাও সে-তুংয়ের বাণী একেবারে গড়গড় করে শুনিয়ে দেবে।'

বিকাশের বলতে ইচ্ছে করল, ক্ষতি কী। বাংলা দেশের ছেলেরা তো চিরকাল সপ্ত সমুদ্রের ডাক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ। একদিন শহরের ছেলেরা বার্ক-শেরিডান-কার্লাইল থেকে সুরেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ আউড়ে যেত। তারপর গান্ধীজী-অরবিন্দ-দেশবন্ধু এলেন, ক্রমে ক্রমে দিলেন মার্কস-লেনিন-স্তালিন, আজ যদি মাও সে-তুং, হো চি মিন এসে থাকেন —তা হলে সেই সমুদ্রধ্বনিকে ঠেকাবে কে! একদিন যা ছিল শহরের জিনিস—শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তা যদি গ্রামের বুকের ভেতরেও গুরু-গুরু করে ওঠে—তা হলে সে তো ইতিহাসেরই নিশ্চয়তা। তার ফল—সেও ইতিহাস বিচার করবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, কুমুদবাবুর কথায় তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইল।

'তোমাকে যে-জন্যে ডেকেছি। একজন টীচার যোগাড় করে দিতে পারো স্কুলের জন্যে?'

'কীসের টীচার?'

'ফিজিক্সের। এম.এস-সি.।'

'টীচারের অভাব? এত বেকার!'

'না হে, অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছ না। এই থ্রী ইয়ার ডিগ্রী কোর্স আর স্কুলগুলো আপগ্রেডিং হয়ে মহা মুশকিলে পড়েছি। হিউম্যানিটিজের লোক একরকম পাওয়া যায় —কিন্তু সায়ান্সের টীচার যোগাড় করাই শক্ত। নতুন পাস করে যদি বা এল, দু-এক মাস থেকেই কলেজে একটা কাজ যোগাড় করে নিয়ে চলে গেল, যেন স্কুল একটা স্টেপিং স্টোন। পুরোনো বি এস-সিদের দিয়েও তো আর চলে না—ওপরের ক্লাসগুলোতে কলেজ স্ট্যাণ্ডার্ডে পড়াতে হয়। কলকাতায় তোমার জানাশুনো আছে কেউ? যোগাড় করে দিতে পারো কাউকে? ম্যাক্সিমাম গ্রেড দেব আমরা।'

'ঠিক মনে পড়ছে না। খুঁজে দেখব।'

'হাঁ, একটু খুঁজে দেখো।' বিরক্তভাবে হেডমাস্টার বললেন, 'সমস্ত এডুকেশনটা

নিয়েই যেন ছিনিমিনি চলছে। এ-সব আপগ্রেডিং—থ্রী ইয়ার কোর্স—এসব করে যে কী লাভ হল কিছুই বুঝতে পারছি না। বিদ্যে বাড়ছে বলে তো মনে হচ্ছে না, বাড়ছে কেবল কনফিউশন। তুমি কিন্তু আমার জন্যে একটু সিরিয়াসলি লোক দেখবে।'

'আজ্ঞে দেখব। খবর নেব কলকাতায় গেলে।'

'একটা কলেজ এখানে থাকলে—' স্বগতোক্তির মতো কুমুদবাবু বললেন, 'না হয় প্রফেসারদের ডেকে এনে কয়েকটা ক্লাস করানো যেত। কিন্তু কবে যে কলেজ হবে, আর হলেও সায়ান্স আদৌ হবে কিনা ভগবানই জানেন। যা খেয়োখেয়ি। জঘন্য!'

বিকাশের সেই সভাটার কথা মনে পড়ে গেল। কলেজ হয়তো হবে, কিন্তু তার আগে কত টন থান ইটের বৃষ্টি হয়ে যাবে সে খবর হয়তো শশাঙ্ক কাকা আর কানাই পালই বলতে পারেন।

'কানাইবাবু চেষ্টা করলে একটা স্পনসর্ড কলেজ হতে পারত এখানে।' হেডমাস্টার আবার স্বগতোক্তি করলেন: 'কিন্তু ওঁরও আর সেদিন নেই। ওপর মহলে যাঁদের সঙ্গে মাথামাখি ছিল, তাঁদের অবস্থাও এখন ভালো নয়—পলিটিক্সের পাশার উল্টো দান পড়ছে।' বিরক্তিতে একবার বিকৃত করলেন মুখটা: 'এই সব রাজনীতিই দেশকে ডোবালো, কেবল দল আর দল।'

বিকাশ ভাবছিল, কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছিল। হেডমাস্টার মশাই তো টীচার খুঁজছেন। তিনি কি একটা কিছু করতে পারেন না মনীষার জন্যে? কলকাতা থেকে মনীষাকে যদি এখানে নিয়ে আসা যায়—যদি একটা স্কুলে সে কাজ পায়, তা হলে—মাইনে হয়ত কিছু কম পাবে, কিন্তু বিকাশ তো কিছুটা ক্ষতিপূরণ করে দিতে পারে। তা হলে মনীষাদের সংসারটা একভাবে চলে যেতে পারে, মনীষা বেঁচে যেতে পারে, তিল-তিল মৃত্যুর হাত থেকে, আর কেশব হালদারের মতো বাড়ির মালিকের ঘোমটা-টানা স্ত্রীর সামনে গিয়ে সে বুক ফুলিয়ে বলতে পারে: 'আমাকে নির্ভয়ে ঘর ভাড়া দিতে পারেন আপনি, এই দেখুন—একেবারে স্ত্রীকে সঙ্গে করে এনেছি।'

হেডমাস্টার বললেন, 'ভালো কথা—তুমি তো বোধ হয় অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছ। নিশ্চয় কিছু খাওয়া হয়নি। আমি তোমার জন্যে একটু জলখাবার—'

'মাপ করবেন, আমার কিছু দরকার নেই—' বিকাশ তটস্থ হয়ে উঠল: 'ও-সব আপনি ভাববেন না। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ ছিল আপনার কাছে।'

'বলো বলো।'

'এখানকার গার্লস স্কুলের সঙ্গে নিশ্চয় যোগ আছে আপনার।'

'আছে বইকি। আমি রয়েছি ওদের গভর্নিং বডিতে।'

'ওখানে একটি মেয়ের চাকরি হয় না?'

হেডমাস্টারের চোখ জলজল করে উঠল উৎসাহে।

'সায়ান্স? নিশ্চয়, এখুনি—এখুনি।'

'না—সায়ান্স নয়। অর্ডিনারী আর্টস গ্র্যাজুয়েট।' হেডমাস্টারের চোখের আলো নিবে গেল: 'অনার্স ছিল না?'

'না।'

'তা হলে তো—' একটু ভেবে বললেন, 'বি-টি?'

'আজ্ঞে না, তাও নয়। অফিসে কাজ করে।'

'মুশকিল—' হেডমাস্টার মাথা নাড়লেন: 'অনার্স নেই, বি-টি নেই—এ অবস্থায় এখন আর কোনো স্কুলে কাউকে ঢোকানো—'

আর বললেন না, থেমে গেলেন। বলবার দরকার ছিল না। মনীষাকে তিনি চাকরি দিতে পারবেন না। মোহনলাল স্ট্রীট থেকে ডালহাউসির টানা ছকে দিনের পর দিন কাটবে মনীষার, কলকাতা আরো ক্লান্ত, আরো জীর্ণ হয়ে উঠবে, সেই কানা দেওয়ালটা সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে নিশ্চল হয়ে, বিকাশ কোনোদিন ঘর বাঁধতে পারবে না।

ম্লান গলায় বিকাশ বললে, 'বি-টি তো শুনেছি চাকরি করতে করতে পড়ে নেওয়া যায়।'

'তা যায়। কিন্তু অনার্স না হলে—' বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কিছু আন্দাজ করলেন কুমুদ সেনগুপ্ত: 'মেয়েটি তোমার আত্মীয় হয় কেউ?'

কী বলা যায়? আমার ভাবী স্ত্রী? সে একটা চাকরি পেলে আমি তাকে বিয়ে করতে পারি, ঘর বাঁধতে পারি? কিন্তু এই কালটা সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হেডমাস্টার কিভাবে নেবেন সমস্ত জিনিসটাকে?

'হাঁ, আত্মীয়ই বলতে পারেন।'

হেডমাস্টার সহৃদয় মানুষ। বিকাশের নৈরাশ্যটা যেন বুঝতে পারলেন।

'বি.এ.তে কী সাবজেক্ট ছিল, জানেন?'

'ম্যাথমেটিক্‌স ছিল। আর সংস্কৃতও ছিল বোধ হয়। ঠিক মনে নেই।'

'অঙ্ক ছিল?' একটু যেন উৎসাহ বোধ করলেন কুমুদবাবু: 'তা হলে একবার বলে দেখতে পারি। শুনেছি অঙ্কের লোক ওদের দরকার হতে পারে।'

কুমুদবাবু একটু হাসলেন: 'দাঁড়াও—দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে নিই। তারপরে আমিই জানাব তোমাকে। কিন্তু আমার ফিজিক্সের টীচারের কথা মনে আছে?'

'আমি কলকাতায় চিঠি লিখব দু-একজনকে।' বিকাশ উঠে পড়ল: 'তা হলে আসি আজ।'

তখন হঠাৎ চোখে পড়ল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার গায়ে সোনার জলে লেখা

সারি সারি নাম : মালিকের নাম। 'পি.কে. নিয়োগী।'

পি.কে. নিয়োগী! এই নামটা আগেও চোখে পড়েছে তার। মেজদার সেই অদ্ভুত লাইব্রেরিতে। মেজদার নাম—হাঁ মনে পড়েছে, প্রদ্যোতকুমার নিয়োগী।

একবারের জন্যে বিকাশ শক্ত হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল না, তবু কথাটা বেরিয়ে পড়ল মুখ ফসকে।

'এই এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো—'

'ও—হ্যাঁ—' হেডমাস্টার একটু হাসলেন : 'ওগুলো সেই পাগলার বই। সব নষ্ট করে ফেলছিল। কয়েকটার পাতাও ছিঁড়েছে এখানে-ওখানে। শশাঙ্কবাবু আমাকে বের করে এনে দিয়েছেন। দাম নিতে চাননি, তবু আমি যথাসাধ্য দিয়েছি। এমন ভ্যালুয়েবল বই তো আর বিনি পয়সায় নেওয়া যায় না। একটু পুরোনো এডিশন, কিন্তু জানো তো—এসব বই একেবারে খাঁটি সোনা।'

'টাকাটা মেজদাকে দিলেন না কেন—' এ প্রশ্ন করা যেত। মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল মন, কথাটা একেবারে এগিয়ে এসেছিল জিভের ডগায়। কিন্তু বলা গেল না। এখন তাকে মনীষার চাকরির জন্তে তদ্বির করতে হচ্ছে মাস্টার মশাইয়ের কাছে, এখন তাঁকে চটানো চলে না।

ঠিক কথা—মেজদার সেই ধুলোয়-ভরা লাইব্রেরীতে দিনের পর দিন পচে জীর্ণ হয়ে গেলে, কিংবা সেই পাগলটার খেয়াল-খুশি মতো এই সব দুর্মূল্য বইকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলে এ কারো কাজে লাগত না। জ্ঞান আলোতে আসবার জন্যেই—অন্ধকারে হারিয়ে যাবে বলে নয়। এ বইকে উদ্ধার করে এনে কেউ অন্যায় করেননি—শশাঙ্ক কাকা নন, হেডমাস্টারও না। কিন্তু টাকাটা যদি কাকা না নিতেন—

কিন্তু মেজদাকে তো তিনি খেতে দেন। পরতেও হয়তো কিছু দিয়ে থাকেন, কিন্তু মেজদার বোধ হয় সেজন্যে বিশেষ কোনো দরকার পড়ে না।

বিকাশ একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আসি তা হলে।'

'আচ্ছা—এসো, এসো।'

না, এসব বই মেজদার কোনোদিন কাজে লাগবে না।

তবু চলতে চলতে বিকাশের খারাপ লাগছিল। একটা শিশুর হাত থেকে একজন জোয়ান লোক তার খেলনাটা কেড়ে নিচ্ছে, এইরকম একটা নিষ্ঠুরতা যেন অনুভব করছিল সে।

শশাঙ্ক কাকা সম্পর্কে নতুন করে ভাববার কিছু নেই। কিন্তু যে শ্রদ্ধাটুকু নিয়ে সে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে ঢুকেছিল, সেটুকু সঙ্গে করে বেরুতে পারলেই তার ভালো লাগত।

প্রভাকরের ওখানে যাব ?

কী হবে ? কোথাও যেতে ভালো লাগছে না। মনের ভেতরটাই এলোমেলো হয়ে গেছে, সমস্ত যেন বেসুরো বাজছে এখন। শুধু একটি মাত্র চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। আবার ধরতে হবে কুমুদবাবুকে, এনসাইক্লোপিডিয়াগুলোর দিকে তাকাতে অদ্ভুত খারাপ লাগলেও তাঁর কাছেই বলতে হবে মনীষার চাকরির কথা।

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনের একটা দোকানে রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত। 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে—'

এই সন্ধ্যেবেলায় সকালের গান কেন ? তবু ভালো লাগল গায়িকার গলা—উচ্চারণের ভঙ্গি। এই সব গান শুনলে একটা পবিত্র উজ্জ্বল বাংলা দেশকে মনে পড়ে, যে-দেশ হারিয়ে গেছে, যে-দেশ কখনো আর ফিরে আসবে না। সে দেশের আকাশ নম্র নীল, তার সোনালি ধানের ক্ষেতে জলভরা মেঘের ছায়া, সে দেশে অঞ্জনা নামে একটি ছোট নদীর এপারে-ওপারে দুটো হৃদয়ের সুর বাঁধা। সেই দেশের মেয়েদের চোখ শান্তি আর বিশ্রামে ভরা—জীবনানন্দের নায়িকার মতো ; সে দেশের মেয়েরা শিশির-জ্যোৎস্না পাতার রঙ—আলোছায়া দিয়ে গড়া।

এই গান যাকে মনে আনে—সে সোনালি।

হঠাৎ যেন একটা চাবুক খেলো বিকাশ।

এত তাড়া কেন তার মনীষার জন্যে ? কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঘর বাঁধবার ভাবনায় ? এখানে আসবার আগে এই সমস্যাটা কি এত বেশি জরুরি ছিল তার কাছে ? মনীষার শরীর তো কেবল এই ক'দিনের মধ্যেই এমন করে ভেঙে পড়েনি—মাত্র এই একটা মাসের ভেতরেই তো সে ডুবে যায়নি ছায়ার ভেতরে—ক্লান্তির এই শূন্যতায় ? বিকাশ তো তা দেখেছে দিনের পর দিন, ভেবেছে কোনো উপায় নেই, তারপর একদিন অতল অবসাদের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এই সত্যকেই মেনে নিয়েছে যে, মনীষা কোনোদিন আসবে না—আসতে পারবে না—সে কেবল সমস্ত জীবন ধরে অপেক্ষা করবে, ধিক্কার দেবে নিজের পৌরুষকে।

মনের কাছে পরাভবের এই চুক্তিটাই তো পাকা হয়েছিল। আজ হঠাৎ—

সুমু—সোনালি ? তার কৈশোর দিয়ে, তার প্রথম জাগা রূপ আর সরল দুটি চোখ দিয়ে, শশাঙ্ক কাকার বাড়িতে তার নিরুপায় আর নিষ্ঠুর পরিণামের কথা ভেবে, সে কি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সুমুর দিকে ? তার মনের ভেতর কি ঘনিয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের বাংলা দেশ, অঞ্জনার পারে সেই মেয়েটি—যে-সব স্বপ্ন এখন আর কেউ দেখে না, সেই স্বপ্নই কি তার চিন্তায় এখন গুনগুন করে উঠছে ?

মেজদা—মেজদা সেদিন কি বলেছিল ?

'পালা—পালা এখান থেকে। উদ্ধার করে নিয়ে যা মেয়েটাকে, তুই বাঁচবি, মেয়েটাও বেঁচে যাবে।'

বিকাশ জোরে পা চালালো।

না—বাড়িই ফিরতে হবে। আজ, এই রাত্রেই একটা চিঠি লেখা দরকার মনীষাকে।

'আমি এখানে একটা মেয়েদের স্কুলে চাকরি খোঁজ করছি তোমার জন্যে। যদি হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ চলে আসবে। এখানে মাইনে পাবে, সবই পাঠাতে পারবে বাড়ির জন্যে। যা কম পড়বে, তা আমি পুষিয়ে দেব। তুমি তো জানো, আমার রোজগার খুব খারাপ নয়—আমাদের সংসারও সেজন্যে খুব অসুবিধেয় পড়বে না। তা ছাড়া তখন তো আমার টাকার ওপরে তোমারও একটা দাবি জন্মে যাবে, তুমি অন্যের কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নিচ্ছ, এ গ্লানি তোমাকেও—'

নিয়োগীপাড়ার পথে শীতের অন্ধকার। শুকনো হাওয়ায় শুকনো পাতা ঝরছে—খস-খস করে যেন অশরীরী হাসি বাজছে চারদিকে। চলতে চলতে অসতর্ক পায়ে হোঁচট লাগল একটুকরো ইটের সঙ্গে—সেই বুড়ো আঙুলটাতেই লাগল—মাথার মধ্যে খানিকটা যন্ত্রণা ছুটে গেল ঝনঝন করে। একবারের জন্যে দাঁতে দাঁতে চাপল বিকাশ—যন্ত্রণাটা সইয়ে নেবার জন্যে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল একটু।

এই যন্ত্রণাটা সিম্বলিক। এবারে কলকাতা থেকে সঙ্গে এসেছে। স্টোন হয়েছে মনীষার—ডাক্তার বলেছেন। থেকে থেকে সেই যন্ত্রণা মনীষাকে কুরে কুরে খায়। এবার বিকাশ তার ভাগ নিয়ে এসেছে।

মনীষাকে তার উদ্ধার করে আনতে হবে। শুধু মনীষার জন্যে নয়, তার নিজের জন্যেও। না—এইভাবে সুমুকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যেতে দেওয়া যায় না। এ খারাপ লক্ষণ।

কিন্তু মনীষা যদি রাজী না হয় ? যদি বলে, সে এতদিনের নিশ্চিত চাকরিটা ছেড়ে স্কুল-মাস্টারির অনিশ্চয়ে নেমে পড়তে চায় না ? যদি বলে, মাস্টারি তার ভালো লাগবে না—ওতে তার কোনো ন্যাক নেই ? যদি বলে, স্ত্রী হিসেবে তোমার টাকা আমি না হয় নিতে পারি, কিন্তু আমার মা-বাপ-ভাই-বোন কেন হাত বাড়িয়ে নিতে যাবেন সেই অনুগ্রহের দান ?

তা হলে ?

আর একবার দাঁতে দাঁতে চেপে ধরল বিকাশ, একটা কিছুকে পিষে ফেলতে চাইল। ভাবনার কোনো শেষ নেই—ওতে করে কেউ কোনোদিন কোনো জট খুলে ফেলতে পারে না। এবার শক্তি। জোর করে তুলে আনতে হবে মনীষাকে। বলতে হবে, পৃথিবীতে

সবাই স্বার্থপর। সবাই নিজের ভাবনাই ভাবে। তুমি আমি উদার হয়ে, আত্মদান করে—কেবল দিনের পর দিন নিজেদের বঞ্চনাই করে যেতে পারি। এবার আমরাও স্বার্থপর হবো। মা-বাবা-সংসার? একটা কিছু হবেই, কারুর কোথাও আটকে থাকে না।

'বিকাশবাবু নাকি?'

বিকাশ চমকালো। গাছপালার ভেতর দিয়েও শীতের জ্যোৎস্নায় চেনা যায়। নিয়োগীপাড়ার আর এক ভদ্রলোক—কাকার বয়েসীই হবেন। ও-বাড়িতে মাঝে মাঝে আসেন। ভালো একটা নাম নিশ্চয় আছে তাঁর—কিন্তু বাঁকাবাবু বলেই ডাকা হয় তাঁকে।

বাঁকাবাবু যাচ্ছিলেন বাজারের রাস্তায়। তাকে সামনে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

'আজ্ঞে হাঁ, আমি বিকাশ।'

'কোনো খবর-টবর পাচ্ছেন নাকি?'

'কিসের খবর?' বিকাশ আশ্চর্য হল।

'ব্যাঙ্কে তো নানারকম লোক আসে। কানাই পালের দল নাকি দারুণ ঘোঁট পাকাচ্ছে একটা। খুব চেঁচামেচি চলছে—জাত তুলে গালাগাল? আমরা দেখে নেব। কিছু শুনেছেন নাকি?'

আবার একরাশ বিস্বাদ বিরক্তি। মাথার মধ্যে জ্বালা করে উঠল বিকাশের।

'না, আমি কিছুই শুনিনি।'

'ছোটলোকের টাকা হলে আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না!' কাকার কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল বাঁকাবাবুর মুখে: 'ঠিক আছে, দেখে নিতে আমরাও জানি।'

বাঁকাবাবু এগিয়ে গেলেন।

বিষাক্ত—সমস্ত বিষাক্ত। এখান থেকে ছুটে পালানো ছাড়া আর পরিত্রাণ নেই। মনীষাকে যেমন করে হোক আনতে হবে এখানে। আমরা নির্লজ্জভাবে স্বার্থপর হয়ে উঠব। আমাদের বাঁচা দরকার।

কেবল—কেবল স্বস্থ যদি ওই বাড়িটায় না থাকত!

কিন্তু শুধু শশাঙ্ক কাকাই?

হতে পারে, মনীষার বাবা শিবদাসবাবুর বয়েস হয়েছে; হতে পারে তিনি অসুস্থ, তাঁর সেবা দরকার, ওষুধপত্র দরকার। কিন্তু তিনি তো অশিক্ষিত নন। ইচ্ছে করলে বাড়িতে বসেও তো দু-চারটে ছেলে পড়াতে পারেন, তাতেও তো সংসারে কিছু আসে। মনীষার যে ভাই কলেজে পড়ে সে-ও তো একটু টিউশন করতে পারে কোনো স্কুলের ছেলের। এমন কত ছাত্রই তো আছে যাদের দাঁড়াতে হয়েছে সম্পূর্ণ নিজের পায়ে—কত উঞ্ছবৃত্তি করে, টিউশন করে নিজেদের পড়ার খরচটা চালিয়ে নেয় তারা। কিন্তু কেউ

কিছু করবে না। সব দায়িত্ব, সব ভার মনীষার ওপরে। বিন্দু বিন্দু করে ওই একটা মেয়ের রক্ত শুষে নিয়ে চমৎকার চলছে সংসারটা।

আজ যদি মনীষা হঠাৎ মারা যায়? তখন?

তখনো সব ঠিক চলবে। সবাই গুছিয়ে নেবে নিজের মতো। কারো জন্যে কোথাও আটকে থাকবে না।

সব সমান, সব স্বার্থপর। কী হবে শশাঙ্ক কাকার ওপরে রাগ করে?

এই সময়, পুকুরটার পাশ দিয়ে, নিয়োগীবাড়ির বাইরের উঠোনে এসে পৌঁছেছিল বিকাশ। কিন্তু সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পা দুটো তার জমে গিয়েছিল মাটিতে।

বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকটা নিষ্ঠুর মারের শব্দ। একটা মেয়েলি চিৎকার হঠাৎ শীতের অন্ধকারকে চিরে দিয়েই ফোঁপানো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

নিশ্চিত—নিশ্চিতভাবেই কাকিমার গলা।

আর সেই কান্না ছাপিয়ে বিকট বীভৎস গলায় কাকার সিংহনাদ শোনা গেল: 'চুপ কর,—চুপ কর, হারামজাদী। বোনের শোক আবার নতুন করে উছলে উঠছে। আর একবার চেঁচিয়ে উঠবি তো একেবারে গলা টিপে খুন করে ফেলব!'

'কালী—কালী—নররক্ত খাব, নররক্ত!'

সমস্ত জঘন্য নাটকটাকে উদ্দাম বীভৎসতায় পৌঁছে দিয়ে সুপুরি গাছগুলোর আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মেজদা—ছায়া-জ্যোৎস্না-কুয়াশাকে সম্পূর্ণ আবিল করে দিয়ে দু হাত তুলে শুরু করল এক ভৌতিক তাণ্ডব, আর বিকাশের মনে হল, তার কপালের সব শিরাগুলো এই মুহূর্তেই ছিঁড়ে-ফেটে একাকার হয়ে যাবে!

আঠারো

'লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্—' বিকাশের একেবারে মুখের সামনে এগিয়ে এসে মেজদা তার ভৌতিক তাণ্ডব নাচতে লাগল: 'নরবলি হচ্ছে—বাজনা শুনতে পাচ্ছিস না?'

বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েলী আর্তনাদের আর একটা ঢেউ উঠেই অদ্ভুত আওয়াজ তুলে থমকে গেল, ঠিক মনে হল কেউ যেন গলাটা টিপে ধরেছে। এক ধাক্কায় পাগলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিকাশ বাড়ির দিকে ছুটে গেল।

'কোথায় পালাবি? এবারে তোর পালা—তোর পালা—' পেছন থেকে আবার জয়ধ্বনি উঠল।

বাড়ির মধ্যে এই মুহূর্তে একটা খুন হয়ে যাচ্ছে—এইরকম ভাবনায় বিকাশের মাথায় যেন রক্ত ছুটছিল। ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল ভেতরে, সরু ফালি পথটায় নোনাধরা

দেওয়ালে ধাক্কা খেল একটা, তারপর একসঙ্গে একেবারে ছুটো করে ধাপ পেরিয়ে পৌঁছুল দোতলার বারান্দায়।

কিন্তু ঠিক ওপরে পৌঁছুবার আগেই কোথাও ধড়াস করে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ এল। আর দোতলায় উঠে এসে—চারদিকে তাকিয়ে তার মনে হল, হয় সবটাই ম্যাজিক—নইলে যা কিছু সে শুনছিল সব স্বপ্ন। সারা বাড়ি মাঝরাতের ঘুমের মতো নিথর। মেজদার পোড়ো মহল থেকে পায়রার পাখা-ঝাপটানি। আর ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোথাও আর এতটুকুও শব্দ নেই, বারান্দার এক কোণে মিটমিটে লণ্ঠনটা না থাকলে মনে হত এ-বাড়িতে কোনো লোক থাকে না—কোনোদিন ছিল না।

শুধু দূর থেকে আবার মেজদার বিকৃত গলার চিৎকার ভেসে এল: 'কালী—কালী—কালী—'

কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। নিজের উত্তেজিত হৃৎপিণ্ড ধক্-ধক্ করে আওয়াজ তুলছে দুই কানে, নিশ্বাস পড়ছে ঝড়ের মতো। কপালের একদিকে বোবা যন্ত্রণা জানান দিলে একটা—সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ধাক্কা লেগেছিল।

এক বোন সামনের বন্ধ ঘরটায় গলায় দড়ি দিয়েছিল; আর এক বোনকে কি গলা টিপে খুন করা হয়ে গেল এইবার?

হঠাৎ শশাঙ্ক কাকার ঘরের দরজাটা খুলে গেল, একটু শব্দ হল, এক ঝলক জোরালো আলো আছড়ে পড়ল বাইরে। নিদারুণভাবে চমকে উঠল বিকাশ। বাইরের সমস্ত শীত একটা সরীসৃপ রেখায় জমাট হয়ে লিকলিক করে খেলে গেল সারা শরীরে। এই মুহূর্তে—ওই ঘরটার দিকে তাকালেই একটা বিকট হত্যাকাণ্ড দেখতে হবে তাকে।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। প্রশান্ত মুখে দরজার আলোয় পিঠ রেখে এসে দাঁড়ালেন শশাঙ্ক কাকা।

'এই যে বিকাশ, কখন এলে?'

অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ স্বর। কল্পনা করা যায় না—মাত্র তিন-চার মিনিট আগেও এই লোকটা চিৎকার করছিল: 'খুন করে ফেলব হারামজাদী, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব তোকে।'

একটি পরিপূর্ণ নির্বোধের দৃষ্টি নিয়ে বিকাশ চেয়ে রইল শশাঙ্ক নিয়োগীর দিকে। একটি শব্দ বেরুল না মুখ দিয়ে।

শশাঙ্ক অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে হাসলেন।

'রাস্তা থেকে চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলে—না?' বেশ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে চললেন, 'ও কিছু নয় বাবাজী। তোমার কাকিমার এক ছোট বোন ছিল, ভারী ভালো মেয়েটি—গত বছর হঠাৎ মারা যায়। সেই বোনটির কথা মনে হলেই তোমার কাকিমার

কেমন হিস্টিরিয়ার মতো হয়, একটু-আধটু চেঁচিয়েও ওঠেন কখনো-কখনো। তারপরেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ও-সব কিছু না—কিছু না।'

বিকাশ তেমনি দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। শশাঙ্কের দিকে চোখ তুলে তাকানোই অসম্ভব এখন।

আরো সহজ অন্তরঙ্গ হয়ে শশাঙ্ক বললেন, 'এত দেরি হল যে আজ ফিরতে? কোথাও গিয়েছিলে নাকি?'

'না—তেমন বিশেষ কোথাও নয়—' কোনোমতে একটা জবাব দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল বিকাশ। কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে বিছানার ওপর—তারপর চেয়ারটায় বসে রইল কাঠ হয়ে। তখনো বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডের শব্দ—তখনো দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে তার, কপালে দপ্‌দপ্‌ করছে যন্ত্রণা।

অভিনয়?

অসাধারণ অভিনয়। কলকাতার কোনো পেশাদার স্টেজেও এমন আশ্চর্য নিপুণতা কল্পনা করা যায় না।

কে বলেছিল কথাটা? প্রভাকর, না কানাই পাল? স্ত্রীটি এত ভালো, এত শান্ত—অথচ শশাঙ্ক নিয়োগী তারও গায়ে হাত তোলেন।

সে তো পরিষ্কার দেখাই গেল আজকে। কিন্তু তাতে চমক লাগেনি, শশাঙ্ক কাকার কাছ থেকে কিছুই আর প্রত্যাশিত নয়। তার চাইতেও বড়ো বিস্ময় সমস্ত নাটকটা সাজিয়ে তোলবার ভেতর। হিংস্র ক্রোধে একটা দানবের মতো চিৎকার করার সময়েও সবদিকে লক্ষ্য ছিল ভদ্রলোকের, ছুটন্ত বিকাশের পায়ের শব্দ বাইরে থেকেও শুনতে পেয়েছেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে থামিয়ে ফেলেছেন নাটকটা, বিচক্ষণ পরিচালকের মতো চোখের পলকে যবনিকা ফেলে দিয়েছেন।

নিজের ভেতরকার উন্মত্ত জানোয়ারটাকে এক মিনিটে এমন করে লুকিয়ে ফেলতে পারে কেউ? অলৌকিক কোনো ক্ষমতা না থাকলে? এ যেন একটা পিশাচ-তান্ত্রিকের জগৎ, যে-কোনো কদর্যতম কাণ্ড এখানে ঘটতে পারে যে-কোনো সময়, পরক্ষণেই সব আবার মিলিয়ে যেতে পারে বাতাসে।

এ ক'দিন ভুলে গিয়েছিল, আজ আবার নতুন করে জীর্ণ বাড়িটার পুরোনো চুনবালি, দেওয়ালের নোনা আর চারদিকের মৃত আবর্জনার স্তূপ একটা দুঃসহ গন্ধের বৃত্ত তৈরী করে বিকাশের শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আনতে চাইল। বন্ধ ঘরে যেন ছুরিতে শান দিতে লাগল মশার ঝাঁক। এই নরকে আর সে কতদিন কাটাবে, কেন কাটাবে?

পায়ের শব্দ। ঝুমু।

বিকাশ একবার চেয়ে দেখল মেয়েটার দিকে। ভালো লাগল না, মন খুশি হল না,

অন্যদিনের মতো একটা মমতার ঢেউ দুলে উঠল না কোথাও। তার বদলে একটা কুটিল চিন্তা পেয়ে বসল তাকে। এই মেয়েটার একটা কোমল কৈশোর, সরল চোখ, সারা চেহারায় জড়ানো মমতা—এরা সব কোনো একটা অলক্ষ্য চক্রান্তের অংশ—বিকাশকেও এই নরকের মধ্যে ডুবিয়ে নেবার একটি মনোরম প্রলোভন!

ঝুমু আস্তে আস্তে বললে, 'চা খাবেন বিকাশদা?'

'না। দরকার নেই।'

তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঝুমু।

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বিকাশ বললে, 'আমার কিছু দরকার নেই ঝুমু, একলা একটু চুপ করে থাকতে দাও।'

স্বরটা যেমন শক্ত, তেমন ঠাণ্ডা। ঝুমু যেন পিছিয়ে গেল একটু। তারপর একটাও কথা না বলে—যেমন ছায়ার মতো এসেছিল তেমনি ছায়ার মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

টেবিলের ওপরে লণ্ঠনটা তুলে এনে, আলো বাড়িয়ে দিয়ে সে চিঠি লিখতে বসল মনীষাকে।

এখন মনীষাই তার মুক্তি—তার একমাত্র পরিত্রাণের পথ। এই নরক থেকে—ঝুমুর নিশ্চিন্ত মোহ থেকে মনীষাই তাকে বাঁচাতে পারে।

চুরি করা এনসাইক্লোপিডিয়াগুলোর দিকে তাকিয়ে যত খারাপই লাগুক, কুমুদ সেন-গুপ্তকে কিছুতেই তার ছাড়া চলবে না।

প্রিয়গোপাল রাগ করবেন?

বুর্জোয়া কানাই পাল সম্পর্কে যত বিদ্বেষই তাঁর থাকুক, একটা বাসা তো জোটাতে পারলেন না এখনো। তাঁর দলের ছেলেরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে কানাই পালের প্রজাদের উস্‌কে দিক, সামনে যে বাই-ইলেকশনে কানাই পাল দাঁড়াবার কথা ভাবছেন—তাতে তারা যত খুশি মূর্দাবাদ বলে চ্যাঁচাক—তাতে তার কী আসে যায়? কোন যোগেন পালকে তিনি সর্বস্বান্ত করেছেন, কত মানুষকে ঠকিয়েছেন, তাঁর জবরদস্তি বে-আইনী মাছের ভেড়ির জলে কত চাষীর চোখের জল মিশেছে—এসব তথ্য দিয়েই বা সে কী করবে? তার একটা বাসা দরকার।

আর সে-বাসা তাকে এখনি দিতে পারেন কানাই পাল।

শশাঙ্ক নিয়োগীর চাইতেও কানাই পাল খারাপ? হতে পারে। কিন্তু কানাই পালের বাসায় অন্তত একটা জীর্ণ সন্ধ্যার গন্ধ তার বুকের ওপর চেপে বসবে না, একটা অপমৃত্যু আর একরাশ অত্যাচারের অপচ্ছায়া ঘিরে থাকবে না কোথাও—যে-কোনো একটা বীভৎস পারিবারিক নাটকের মাঝখানে এসে পড়ে এমন করে তার মাথায় রক্ত ছুটে যাবে না, ঝুমু একটা সোনালী জাল দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরবে না তাকে। কানাই

পালের সঙ্গে তারও উদ্দেশে 'মুর্দাবাদ' আউড়ে চলুন প্রিয়গোপাল, তৈরী করুন কথামৃত আর মার্কসবাদের সিন্‌থিসিস, বিকাশের কিছু দেখবার নেই, ভাববারও না।

কানাই পালের বাড়িটা সে চেনে, কেইবা না চেনে এখানে? অফিসে বসে ভাবছিল—যা থাকে কপালে, ছুটির পরে একবার যাওয়াই যাক তাঁর ওখানে, এমন সময় কয়েকটা চেক নিয়ে কানাইবাবুর একজন কর্মচারী এল ব্যাঙ্কে।

'কখন গেলে কানাইবাবুর সঙ্গে দেখা হতে পারে জানেন?'

কিছু দূরের চেয়ারে একবার নড়ে বসলেন প্রিয়গোপাল।

'বাবু? বাবু তো এখন নেই এখানে। একটা জরুরি কাজে কাল রওনা হয়ে গেছেন কলকাতায়। সেখান থেকে প্লেনে দিল্লী যাবেন। ফিরতে আরো দিন-পাঁচেক।'

'আচ্ছা।'

প্রিয়গোপাল আরো বেশি করে নুয়ে পড়লেন একটা মোটা লেজারের ওপর।

তাহলে আরো পাঁচদিন কিছু করবার নেই। বসে থাকা, অপেক্ষা করা। এর মধ্যে হয়তো মনীষার চিঠিও এসে পড়বে। তাছাড়া কানাই পালের দিকে ভাবনাটা একটু এগিয়ে যেতেই আরো একটা কথা মনে এল। মনীষার চাকরির জন্যে তদ্বির যদি করতেই হয়, তাহলে কুমুদবাবুরই বা দ্বারস্থ হওয়া কেন? কানাই পাল তো এখানে মুকুটহীন সম্রাট—নিয়োগীপাড়ার সমস্ত অক্ষম ঈর্ষা সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছাই এখানে শেষ কথা। তিনি বললে এখানকার মেয়েদের স্কুলে চাকরি থাক আর নাই থাক, চাকরি তৈরী হয়ে যেতেও সময় লাগবে না।

প্রিয়গোপাল তাঁর আদর্শবাদ নিয়ে ক্ষেপে যাবেন। সে শত্রুর দলে যোগ দিয়েছে বলে শশাঙ্ক কাকা তার আর মুখদর্শন করবেন না। চুলোয় যাক সব। তার বাঁচা দরকার—মনীষাকে তার বাঁচানো দরকার।

অফিস থেকে বেরুবার পর আজ আর প্রিয়গোপাল তার সঙ্গ নিলেন না, কুঁজো হয়ে, চিরসঙ্গী ছাতাটায় ভর দিয়ে অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে গেলেন। এর মধ্যেই চটতে শুরু করেছেন তার ওপর। বিকাশের একবার হিংস্রভাবে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল: 'এতই যদি বিদ্বেষ ক্যাপিটালিস্টদের ওপরে, তাহলে তাদের ব্যাঙ্কেই বা কেন চাকরি করেন আপনি?'

কিন্তু প্রিয়গোপাল এমন গুরুতর ব্যক্তি নন। তাঁকে সিরিয়াসলি না নিলেও চলে।

চলতে চলতে একবার স্কুলের কাছে এসে, হেডমাস্টারের বাসার দিকে চেয়ে দেখল সে। বসবার ঘরে আলো, লোকজন। কোনো একটা জরুরি আলোচনা চলছে মনে হয়। হয়তো স্কুল-সংক্রান্ত কিছু হবে। এত লোকের ভেতরে আর ভদ্রলোকের কাছে

গিয়ে মনীষার জন্যে উমেদারী করা চলে না।

তার চেয়ে—

তার চেয়ে—হাঁ, ডাক্তার প্রভাকর। অনেকদিন দেখা হয় না তার সঙ্গে।

শীতের ধার কমে আসছে। এলোমেলো হাওয়ায় বসন্তের ছোঁয়াচ লাগছে মধ্যে মধ্যে। কালই চোখে পড়েছিল। নিয়োগীপাড়ার এখানে-ওখানে আমের মুকুল। শশাঙ্ক কাকার বাগানে সজনে ফুল দেখা দিয়েছে। দেখতে দেখতে প্রায় একটা মাস কেটে গেল এখানে?

প্রভাকর বারান্দায় বসেছিল হাত-পা মেলে। লাফিয়ে উঠল।

'আরে বিকাশ যে!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'পাত্তা নেই কেন এতদিন?'

'পাত্তা তোরই নেওয়া উচিত ছিল—' বসতে বসতে বিকাশ বললে, 'আমি তো তোদের অতিথি।'

'এতদিন আর অতিথি নেই, বাসিন্দা হয়ে গেছিস।' প্রভাকর বিমর্ষ হল একটু: 'তা ছাড়া জানিস তো, তুই যেখানে আছিস সেটা আমার কার্ফিউ এরিয়া, ইচ্ছে থাকলেও যাওয়ার উপায় নেই।'

'এবারে ছাড়ব ও বাড়ি।' শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'ডিসাইড করে ফেলেছি।'

'রিয়্যালি?' প্রভাকর উৎসাহিত হল: 'খুব ভালো কথা। কালই বাক্স-বিছানা নিয়ে স্ট্রেট চলে আয় আমার এখানে। ডাল-ভাত যা জোটে খাবি।'

'ডাল-ভাতের জন্য ভাবছি না। কিন্তু তোমার এই হাসপাতালের ভিসিনিটিতে থাকা আমার পোষাবে না ব্রাদার। ক্রমাগত ওখান থেকে ওষুধের গন্ধ আসবে, দিন-রাত তুমি ছুটবে রোগী দেখতে আর অপারেশন করতে, আর আমার মনে হবে আমি তোমার পেশেন্ট—একটা ক্রনিক অসুখে ভুগছি। ও চলবে না।'

প্রভাকর হাসল: 'বাসা পেয়েছিস?'

'কানাইবাবু—মানে মিস্টার পাল একটা দেবেন বলেছেন।'

'ও—কানাই পাল?' প্রভাকর যেন নিবে গেল।

বিরক্তিতে বিকাশের মুখের স্বাদ তেতো হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'তোদের এখানকার লোকের সাইকোলজী আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ভদ্রলোক সামনে এলেই সবাই হাতজোড় করে বসে থাকে, আর আড়ালে রাত-দিন নিন্দা করা চাই! তাঁর কাছ থেকে একটা বাসা ভাড়া নিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি?'

প্রভাকর সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, নামিয়ে রাখল। একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালো

বিকাশের দিকে।

'তুই খুব উত্তেজিত হয়ে আছিস মনে হচ্ছে। আমি তো সে-ভাবে কিছু বলিনি। একটু দাঁড়া, চা-টা খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নে, তারপরে কথা হবে।'

খরখরে গলায় বিকাশ বললে, 'চায়ের দরকার নেই, ধন্যবাদ। যদি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস তা হলেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।'

'আমি ডাক্তার।' প্রভাকর হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে শক্ত থাবাটা রাখল বিকাশের কাঁধের ওপর, বললে, 'কথা শুনলেই বুঝতে পারি কে সম্পূর্ণ সুস্থ, কে একটু অ্যাবনর্মাল। তুই ক্লান্ত, অ্যাজিটেটেড। একটু ঠাণ্ডা হ—কিছু খা, তারপরে আলোচনা করা যাবে।'

'কিন্তু—'

'চুপ। অমলা—অমলা—'

সাড়া দিয়ে অমলা এসে হাজির হল।

'বিকাশবাবু যে! নমস্কার—নমস্কার। এতদিন পরে মনে পড়ল?'

'নমস্কার। সময় পাইনি।'

'সময় পাবে কী করে—বিজি ব্যাঙ্কার!' প্রভাকর বললে, 'বোধ হয় কারো সঙ্গে চটাচটি করে এসেছে, মেজাজ খারাপ। তুমি আগে এর জন্যে চা আর খাবারের ব্যবস্থা করো।'

'আমার খাবারের দরকার নেই। একটু চা হলেই—'

'ওর কথায় কান দিয়ো না অমলা, তুমি যাও।'

প্রভাকর সিগারেট ধরিয়ে কিছু ভাবতে লাগল, বিকাশ বসে রইল বিরস মন নিয়ে। কোথাও শান্তি নেই, কোথাও সুর মিলছে না। প্রভাকরের এখানে এসেও তার ভালো লাগছে না।

একটু পরে প্রভাকর বললে, 'একটা কথা বলব বিকাশ?'

'বল।'

'বিয়ে কর তুই।'

বিকাশ আস্তে আস্তে চোখ তুলল: 'বিয়ে করব না সে তো বলিনি।'

'গুড। চমৎকার কথা। তা হলে ঠিক করে দিচ্ছি।'

'কী ঠিক করবি?'

'বিয়ে। অমলার একটি মামাতো বোন আছে—আই মীন, আমার একটি মামাতো শালী। দিব্যি দেখতে রে—এম.এ. পাস করেছে গত বছর। তা ছাড়া একস্ট্রা কোয়ালিফিকেশন—মানে তুই যা পছন্দ করিস, খুব ভালো গান—'

বিকাশের ধৈর্যচ্যুতি হল।

'থাম প্রভাকর। তোর রূপবতী গুণবতী শালীর জন্তে বিস্তর সুপাত্র জুটবে—আর আমার জন্তেও তোর ঘটকালির দরকার নেই। বিয়ে যদি করি, পাত্রী আমার ঠিকই আছে।'

'দ্যাট সেট্‌ল্‌স!' প্রভাকর বললে 'তবে তো কথাই নেই, বিয়েটা করে ফেল।'

'সেই জন্তেই তো এত করে বাসা খুঁজছি।'

'ও!' একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তার মধ্য দিয়ে বিকাশের দিকে চেয়ে রইল প্রভাকর। চেয়ে রইল একটু অদ্ভুতভাবেই।

চাকরের হাতে চা আর খাবার নিয়ে অমলা এল।

'আবার এত খাবার? সেই রাজসূয় যজ্ঞ?'

প্রভাকর ধমক দিয়ে বললে. 'বকিসনি—যা পারিস খা।'

'তোর প্র্যাকটিস খুব ভালো চলছে মনে হয়। যদি হাসপাতাল আর ওষুধের গন্ধ না থাকত, তা হলে হয়তো তোর এখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেতুম।'

'খবর্দার, এ-সব বলিসনি। আমার চাকরি নন-প্র্যাকটিসিং। তোর কাকার কানে গেলে আবার একটা লম্বা রিপোর্ট চলে যাবে আমার নামে।'

খাওয়া, টুকরো টুকরো কথা। বিকাশের মাথাটা অল্প অল্প করে শান্ত হয়ে আসছিল। তারপর একসময় সমস্ত পৃথিবীর ওপর যে বিরূপতাটা তার জমে উঠেছিল, সেটা ফিকে হয়ে এল। তখন মনে হল, এখানে একমাত্র প্রভাকরের ওপরেই সে নির্ভর করতে পারে, সমস্যাটা একমাত্র তাকেই বলা চলে।

ক্লান্ত গলায় বললে, 'একটা পার্সোনাল আলোচনা ছিল তোর সঙ্গে।'

প্রভাকর চোখের কোণা দিয়ে একবার তাকালো অমলার দিকে। অমলা নিঃশব্দে সরে গেল বাড়ির ভেতরে।

'তুই তো ডাক্তার। একটা মেয়ের মনের জট খুলে দিতে পারিস?'

'ওটা সাইকিয়াট্রিস্টের কাজ।' প্রভাকর হাসল: 'তবু বলে যা। শুনি।'

শীতের হাওয়ার সঙ্গে বসন্তের ছোঁয়া মিশছিল, হেনার গন্ধ আসছিল, সামনের মাঠে জ্যোৎস্না জলছিল। বাড়ির ভেতর চলে গিয়ে অমলা রেডিয়ো খুলে দিয়েছিল, চাপা একটা সুরের নেপথ্য-সঙ্গীত চলে আসছিল বাইরে। এতদিন ধরে যা বিকাশ আর মনীষার ভেতরে একান্ত হয়ে ছিল আজ ক্লান্তি আর বিরক্তির পথ ধরে তা বেরিয়ে এল তৃতীয় আর একজনের কাছে।

চুপ করে শুনল প্রভাকর, পর পর সিগারেট পুড়ল গোটা তিনেক। এর মধ্যে বাড়ির চাকরটা কখন চা এনে দিয়ে গেল দু-বার।

প্রভাকর বললে, 'রাগ করবি না ?'

'না।'

'তোর একটা ঘর বাঁধা নিশ্চয় দরকার। মনীষার চাকরি—তারও দরকার আছে। কিন্তু সবচেয়ে আগে যেটা দরকার সেটা ভদ্রমহিলাকে ভালো করে ডাক্তার দেখানো। দিনের পর দিন শুকিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।'

'স্টোনের কথা বলছিস ?'

'সেটা পেনফুল বটে, কিন্তু এমন কিছু নয়, অপারেশন করলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু শরীর শুকিয়ে যাওয়াটাই কাজের কথা নয়।'

'ম্যাল-নিউট্রিসন ?'

'হতে পারে। কিন্তু সেজন্যে জ্বর হবে কেন মধ্যে মধ্যে ?'

হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় বিকাশ শিউরে উঠল : 'তুই কি টি-বি বলে সন্দেহ করিস ?'

'এত দূর থেকে কী আন্দাজ করব, বল ?' বিকাশের দিকে তাকিয়ে প্রভাকরের যেন সম্বিৎ ফিরে এল : 'হয়তো কিছুই নয়—হয়তো উইকনেসের জন্যে জ্বর হয়। একটু শরীরের ওপর যত্ন নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু সত্যিই যদি টি-বি হয় ?'

প্রভাকর শব্দ করে হেসে উঠল।

'এই রে, মাথায় একটা ভাবনা ঢুকল তো ? ডাক্তারদের সবরকম স্পেকুলেশনই করে রাখতে হয়, তার জন্যে তুই এত তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন ? ধর—যদি ওয়ার্স্ট-টাই ভাবা যায়, টি-বিই হল, তাতেই বা কী ? আজকাল টি-বি সেরে যাওয়াটা কিছুই নয়।'

দাঁতে দাঁত চাপল বিকাশ।

'সব ওই সংসারের জন্যে। ওদের স্বার্থপর ওই ফ্যামিলিটাই ওকে খুন করল।'

প্রভাকর বললে, 'পাগলামি রাখ। শোন—দিন সাতেক বাদে আমি একবার কলকাতায় যাচ্ছি। ভদ্রমহিলার কথা শুনে যেটুকু বুঝতে পারছি, তাতে সিরিয়াসলি ডাক্তার উনি কিছুতেই দেখাবেন না। তুই পারিস তো আমার সঙ্গে চল। আমাদের প্রোফেসার ডাক্তার চৌধুরীকে দিয়ে একবার দেখিয়ে দিই। তার পরে ওর চাকরিবাকরির ব্যবস্থা যেমন হয় করিস।'

একটু চুপ করে হতাশভাবে বিকাশ বললে, 'দেখি। তাই করতে হবে মনে হচ্ছে।'

হাসপাতালের পেটা ঘড়িতে ন'টা বাজল। বিকাশ বললে, 'আজ উঠি তা হলে।'

আবার অনেকখানি পথ। নিয়োগীপাড়ার ভূতুড়ে রাস্তা। শশাঙ্ক নিয়োগীর প্রেতপুরী।

রঙ্গমঞ্চ তেমনি সাজানো। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। কাকার সদালাপে নয়, কাকিমার মুখে নয়, এমন কি সুমুর চোখের তারাতেও নয়। সবাই নিপুণ অভিনেতা। কতদিন ধরে মহলা দিয়ে দিয়ে এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওরাই জানে।

অসীম বিতৃষ্ণায় কিছুই খাওয়া গেল না—প্রভাকরের ওখানে খেয়ে এসে খিদেও ছিল না। কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে বিকাশ এসে সোজা শুয়ে পড়ল বিছানায়। আজও মশারি ফেলতে সে ভুলে গেল, লেপটাকে একটা বিসদৃশ চাপের মতো মনে হতে লাগল বুকের ওপর, মশার গুঞ্জনে কান ছিঁড়ে যেতে লাগল, তারপর নিজের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে কখন তার ঝিমুনি এল।

'বিকাশদা!'

একটা মিষ্টি ডাকের ছোট্ট ঢেউ ভেঙে পড়ল কানের কাছে। সুমু।

'আবার মশারি ফেলতে ভুলে গেছেন তো?'

কমানো লণ্ঠনের আলোয় ছায়া-ছায়া একটুকরো মুখ। একখণ্ড স্বপ্নের মতো।

বিকাশ আচ্ছন্নভাবে বললে, 'রোজই তুমি এসে দেখে যাও বুঝি?'

'যাই-ই তো। আপনার মতো মানুষকে বিশ্বাস করতে আছে?' সুমু মশারি ফেলে গুঁজে দিতে লাগল। তারপর একসময় বিকাশের মুখের কাছে মাথাটা নুয়ে এল তার, চুলের গন্ধ এল, নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগল গালে।

সুমু প্রায় বাতাসের সঙ্গে গলা মিশিয়ে বললে, 'এখান থেকে চলেই যান বিকাশদা—একেবারে ভুলে যান আমাদের।'

এক সেকেণ্ড—দু সেকেণ্ড চুপ করে রইল বিকাশ। তারপর—অসুস্থ মনীষার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, একান্ত কুতন্দ্রের মতো আবিষ্ট ঝাপসা স্বরে বললে, 'তোমাকে ভুলব না সুমু, তোমাকে ভোলা যায় না।'

উনিশ

রাতের বেলা, সুমু চলে যাওয়ার পরে—আরো অনেকক্ষণ জেগে রইল বিকাশ। নেশা ঝিম-ঝিম করতে লাগল রক্তের ভেতর, বুকের মধ্যে একটার পর একটা ঢেউ উঠতে লাগল। সুমু কি বুঝেছে সে কী বলতে চেয়েছিল? সুমুর মন কি এতখানি জেগে উঠেছে এর ভেতরে?

তারপরে নেশাটা কেটে এল আস্তে আস্তে। তখন মশারির বাইরে মশাদের ক্রুদ্ধ গর্জন। ঘর ভরে সেই অস্বাস্থ্যকর জীর্ণ গন্ধটা। বাইরের বাগানে বাদুড়ের শব্দ—ঝিঁঝির ডাক। সেখান থেকে কলকাতা। মনীষা।

মনীষা। একটু একটু করে অন্ধকারে ডুবছে। তাকে তুলে নেবার জন্যে—দু হাত বাড়িয়ে রক্ষা করবার জন্যে প্রতিশ্রুতি ছিল তার। অথচ—

একটা যন্ত্রণা। ছুটে আসবার সময় দেওয়ালে কপাল ঠুকে গিয়েছিল যেখানে? অথবা পায়ের সেই বুড়ো আঙুলটা থেকেই—শীতের ব্যথা সহজে যেতে চায় না? যন্ত্রণাটা কোনখান থেকে উঠে আসছে বিকাশ বুঝতে পারল না, কিন্তু ধীরে ধীরে সেইটেই এসে তার মাথার মধ্যে ঘন হতে লাগল।

না—আমি মনীষাকে ঠকাইনি। আমার জীবনে সে ছাড়া আর কোনো মেয়ে আসবে না—কোনোদিন নয়। স্বস্থকে আমার ভালো লাগে। এই মৃত্যু আর কুশ্রীতা দিয়ে ঘেরা বাড়িটায় এই মেয়েটি প্রাণের দিকে বেড়ে উঠতে চাইছে। সেই চাওয়াটা তার দুটি চোখের তারায়, তার নতুন মনে, তার নতুন শরীরে। আমার এই মেয়েটিকে ভালো লাগে। ভালো লাগা মানেই ভালোবাসা নয়। মনে করা যাক একজন সুখী বিবাহিত পুরুষের একটা বিশেষ ফুলকে ভালো লাগে, কোনো গায়িকার গান ভালো লাগে, ছবির কোনো নায়িকাকে ভালো লাগে। তার অর্থ এই নয় যে, দাম্পত্য-জীবনে সেই মানুষটা অবিশ্বাসী।

এই ভালো লাগাটা ইম্‌পার্সোন্যাল। ঈসথেটিক। নিজের ভেতরে যে অস্বস্তিটা খচখচ করছিল, তাকে ধমক দিয়ে বিকাশ বললে, তর্ক কোরো না। অত নীতিবাগীশ হলে পৃথিবীতে একেবারে চোখ-কান বুজে প্যাঁচার মতো বসে থাকতে হয়। স্বস্থ মেয়েটি বেশ। ভারী ছেলেমানুষ। আমার মায়া হয় ওকে দেখলে। ওর জন্যে আমি কিছু করতে চাই। চারদিকের এই অসুস্থতা আর বিকারের মধ্যে আমি ওর জন্যে মুক্তির পথ খুঁজে দিতে চাই একটা। ওকে আমি সেতার শিখিয়ে দেব। সুরের মতো এমন মুক্তি আর কোথায় আছে—আর কে পারে এমন করে জীবনকে আলোর দিকে মেলে দিতে? কিন্তু—

'তোমাকে ছেড়ে আমি কখনো যাব না।' কী মানে হয় এই কথাটার?

বিব্রত হয়ে বিকাশ আবার ধমক দিয়ে উঠল: তর্ক কোরো না। ছেলেমানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছি একটা। তবু রাতটা ভালো কাটল না। থেকে থেকে মনীষা এসে দাঁড়াতে লাগল সামনে। সেই সিনেমা দেখবার প্রহসন। মনীষার ক্লান্ত চোখে শ্রান্ত শরীরে এতটুকু সাড়া ছিল না কোথাও। তার কাঁধের ঝোলায় সংসারের খুঁটিনাটি ছিল, বাপের জন্যে ওষুধ ছিল। কিন্তু তার নিজের জন্যে?

রাতটা ভালো কাটল না—ঘুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগল বার বার। মশার ডাক, ঝিঁঝির শব্দ। চুন-বালির গন্ধ—বাইরের বাগানে হাওয়া। বিরক্ত হয়ে বিকাশ উঠে বসল বিছানার মধ্যে।

ভোরের হালকা ঘুমে—একটা মিষ্টি স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে, অনেক দূর থেকে বেহালার সুর শুনতে পাচ্ছিল সুমু। সেই সুরটা শুনতে শুনতে—স্বপ্নের ভেতরেও একটা কান্না কাঁপছিল তার পাতলা ঠোঁটে। কান্না কেন আসছিল সুমু জানত না, জানত না—জীবনের গভীর কান্নার পালা এই প্রথম শুরু হল তার।

আর একটা ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে—শশাঙ্ক নিয়োগীর বাড়ির অন্ধকার সিঁড়িটার নীচে বসে থাকতে থাকতে আর বিকৃত মুখে মশা মারতে মারতে হঠাৎ উৎকর্ণ হল মেজদা। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট বেহালার সুর তারও কানে গিয়ে পৌঁছেছে।

মেজদা হিংস্রভাবে একবার দাঁতে দাঁতে ঘষল।

'পাগানিনির বেহালা! যে মেয়েরা তাকে ভালোবাসে, তাদেরই খুন করে সে। তারপর তাদের বুকের শিরা ছিঁড়ে নিয়ে তৈরী করে বেহালার তার।'

সেই সময়, শশাঙ্কর স্ত্রী সুধাময়ী আলগা একটা ধাক্কা দিলেন মেয়েকে।

'এই, কী হয়েছে তোর? ঘুমের মধ্যে কাঁদছিস কেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে?'

সুমু চমকে জেগে উঠল।

তখনো ঠোঁটে তার কান্না কাঁপছিল। সেই কান্না—যা জীবনের সবচেয়ে গভীর থেকে আসে, যা এই প্রথম দুলে উঠল তার ভেতরে।

বিকাশ সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। বিকাশ তাকে অনেক বেশি ছেলেমানুষ ভেবেছিল।

তবু তিন-চারটে দিন কেটে গেল নিছক বর্ণহীনভাবে। মনীষাকে চাকরির কথা লিখে চিঠি দেওয়া হয়েছে, জবাব আসেনি। কেমন আছে, কে জানে। তা ছাড়া ইচ্ছে করলেই মনীষা এতদিনের চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারে না—তাকে সব দিক ভেবে দেখতে হবে। আর চাকরিও তো চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাচ্ছে না।

কুমুদবাবুর সঙ্গে একদিন পথে দেখা হয়েছিল। নিজে থেকেই বললেন তিনি।

'তোমার সেই মেয়েটির চাকরির জন্যে খোঁজ করছি হে।'

'কোনো আশা আছে এখানে?'

'হেডমিসট্রেস্ বললেন, একজন টীচার শীগগিরই যাচ্ছেন লীভ-ভেকান্‌সিতে। বোধ হয় বিয়ে হবে মেয়েটির। তার মানে এখন লীভ-ভেকান্‌সি হলেও পরে পার্মানেণ্ট্ হওয়ার সম্ভাবনা। বিয়ের পরে মেয়েটি খুব সম্ভব তার স্বামীর সঙ্গে আসামে চলে যাবে।'

'কবে সে মহিলা যাচ্ছেন বিয়ে করতে?'

'এখনো বলতে পারি না। বিয়ে এ মাসে হতে পারে, সামনের মাসেও হতে পারে।'

'আচ্ছা—' বিকাশ নিশ্বাস ফেলল।

হেডমাস্টার একটু হাসলেন।

'এত ব্যস্ত হলে কি চলে হে—যা দিনকাল! দলে দলে এম. এ. পাস মেয়ে চাকরির

জন্যে পাড়াগাঁয়ের স্কুলে ধর্না দিচ্ছে। যাই হোক, একটু অপেক্ষা করো—ব্যবস্থা একটা করে দেব। ভালো কথা, আমার জন্যে সায়ান্স-টীচার কী হল? খোঁজ নিয়েছ?'

'আজ্ঞে সাত-আটদিনের মধ্যেই আমায় আর একবার কলকাতা যেতে হবে, তখন—'

'দেখো, দেখো—একটু ভালো করে দেখো। বোলো, আমরা ম্যাক্সিমাম পে দেব এখানে। তা ছাড়া সায়ান্সের লোক, এখানে টিউশনও পাবে অনেক। তুমি আমার জন্যে চেষ্টা কোরো, আমিও তোমার জন্যে দেখছি।'

তার মানে, একটা চুক্তি। আমার স্কুলের টীচার জুটিয়ে দাও, আমি মনীষাকে চাকরি যোগাড় করে দেব।

সবাই একটি শর্তই বোঝে। গিভ্ অ্যাণ্ড্ টেক। কিন্তু কুমুদবাবুর জন্যে টীচার খুঁজলেও কি সে পাবে? তার জানাশুনো কোন্ এম.এস্-সি. পাড়াগাঁয়ের স্কুলে চাকরি করবার জন্যে বসে আছে? কলকাতায় গিয়ে দুদিন ঘুরলেই কি সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে?

বিস্বাদ মন নিয়ে বিকাশ ভাবল কানাইবাবুকেই ধরতে হবে। শশাঙ্ক তাঁর যত বড়ো শত্রুই হোন, প্রিয়গোপালেরা যতই স্লোগান তুলুন তাঁর নামে, তিনিই এ অঞ্চলের ভাগ্য-বিধাতা! হয় সোজাসুজি, নয় ঘুরে-ফিরে সকলকেই হাত পাততে হয় তাঁরই কাছে গিয়ে। শুধু এখানে নয়—এখনো তো সমস্ত সমাজের এই একটাই চেহারা। মধ্যবিত্তের—নিম্নবিত্তের—শ্রমিকের—কৃষকের—সকলের স্বার্থ ই কখনো সরলরেখায়, কখনো বা অর্থনীতির জটিল চক্রান্তে কানাই পালদের মতো মানুষের মুঠোর ভেতর। আমরা তারস্বরে এই লোকগুলোকে ধিক্কার দিয়ে নরকে পাঠাতে পারি, কিন্তু বেঁচে থাকবার অত্যন্ত মোটা দাবিতেও শেষ পর্যন্ত এদের কাছেই আমাদের দু হাত মেলে দাঁড়াতে হয়।

প্রিয়গোপালেরা যে বিপ্লবের কথা ভাবেন, তা যদি সত্যি সত্যিই কখনো আসে, তা হলে সেদিন ইতিহাস আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ-জীবন-অর্থনীতির রূপ না বদলাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কানাই পালদের অচ্ছুত ভেবে মুখ ঘুরিয়ে থাকা উপবাস আর আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই দেবে না।

অতএব আসুন কানাই পাল। তাঁকেই ধরতে হবে। চাকরি যদি না থাকে, চাকরি তৈরি করে দিতে তাঁর সময় লাগবে না।

কিন্তু কানাই এখনো ফেরেননি।

ব্যাঙ্ক-ফেরত বাসায় ফেরার সময় সে ভদ্রলোক আসছিলেন উল্টো দিক থেকে। একবার অস্বস্তিভরে চারদিক চেয়ে দেখল বিকাশ। না—প্রিয়গোপাল সঙ্গে নেই। তাঁর আজকে বেরুতে দেরি হবে, কিছু বকেয়া কাজের ঝঞ্ঝাট নিয়ে পড়েছেন। বিকাশের আর এক জ্বালা হয়েছে এই প্রিয়গোপালকে নিয়ে। প্রথম প্রথম বেশ লেগেছিল লোকটিকে।

জেল-খাটা বিপ্লবী বলে—মানুষটির কাছাকাছি এসে, বেশ শ্রদ্ধাও হয়েছিল একটু; এমন কি, একথাও মনে হয়েছিল, ব্যস্ত ডাক্তার প্রভাকরের ওখানে গিয়ে ঘন ঘন আড্ডা দিয়ে তো তাকে বিব্রত করা যাবে না, বরং মাঝে মাঝে এসে বসা যাবে প্রিয়গোপালের কাছে, আলাপ-আলোচনা করা যাবে, গান-বাজনাও চলবে একটু-আধটু। কিন্তু বাসা—মনীষার চাকরি, তার এবং মনীষার বাঁচবার প্রয়োজন—এই সব দাবিগুলো মেটাতে গেলে এখানে কানাই পালকে বাদ দিয়ে চলবে না। এবং তাঁদের ব্যাঙ্কের এই ব্রাঞ্চের যিনি সবচাইতে বড়ো পেট্রন তাঁর বিরোধিতা করলেও হেড অফিসে—

অথচ, প্রিয়গোপাল যেন মূর্তিমান বিবেক। সেই কোন এক বাড়িওলা কেশব হালদারের ঘোমটা-টানা স্ত্রীর কাছে গিয়ে সে জোড়হস্তে নিজের সচ্চরিত্রতা ঘোষণা করেনি বলে এবং কানাই পালের কাছে বাসার খবর নিচ্ছে বলে সেই যে তাঁর ভুরু কুঁচকেছে, তা এখনো সোজা হল না।

চুলোয় যাক। বিরক্ত হয়ে বিকাশ ক'বারই মনে মনে বলেছে, চুলোয় যাক। এক বুড়ো ব্যাচেলারের আদর্শবাদী বেলুনে চেপেই যদি আকাশে পাড়ি দেওয়া যেত, তা হলে আর ভাবনা ছিল না।

তবু সামনে কানাইবাবুর সরকারকে দেখে, সেই অবাঞ্ছিত বিবেকের তাড়নাতেই বিকাশ তাকিয়ে নিলে চারদিকে। না—আশপাশে কোথাও নেই ছাতাধারী প্রিয়গোপাল। ঘাড় গুঁজে এখনো তিনি ব্যাঙ্কের খাতা নাড়াচাড়া করছেন।

বিকাশ বললে, 'এই যে—নমস্কার।'

সরকার বললে, 'এজ্ঞে নমস্কার—নমস্কার।'

'মিস্টার পাল ফিরেছেন নাকি দিল্লী থেকে?'

'না, ফেরেননি এখনো। তবে চিঠি যখন কিছু দেননি, তখন দু-একদিনের মধ্যেই আসবেন।' একটু উৎসুক ভাবে সরকার তাকালো: 'জরুরি দরকার আছে কিছু?'

'এমন কিছু নয়। উনি এলে একবার দেখা করব।'

'আমি খবর দেব আপনাকে।'

'আচ্ছা। নমস্কার।'

'এজ্ঞে নমস্কার—নমস্কার।'

কোথায় যেন সব অনিশ্চয়তায় ঝুলছে। একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। মনীষার ব্যবস্থা হচ্ছে না—ওই বীভৎস নিয়োগীবাড়িটা, সেই সন্ধ্যার পর যেটা আরো বিকট হয়ে উঠেছে, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে না—সুস্থর মনে সুর ধরিয়ে দিয়ে অন্তত একটি মুক্তির আকাশ তাকে এনে দেওয়া যাচ্ছে না। কিছুই হচ্ছে না। শুধু পর পর কতগুলো বর্ণহীন বিরস দিন কেটে যাচ্ছে তার।

সে-রাতের পর সুমু কী বুঝেছে সেই জানে। চা কিংবা খাবার নিয়ে আসে, কিংবা কিছু বলবার জন্যে ঘরে পা দেয়—কিন্তু আর কখনো ভালো করে তাকাতে পারে না তার দিকে। চোখ নামিয়ে রাখে মাটিতে, গালে রঙ পড়ে, শাড়ির আঁচল জড়াতে থাকে আঙুলে। হঠাৎ নিজের কাছে কেমন অপরাধী মনে হয় বিকাশের। বেশ তো ছিল এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটি। বিকাশ কি তাকে—

'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না'—এই কথাটা ও-ভাবে না বললে কি কোনো ক্ষতি ছিল? অথবা—সেই রাত্রে—সেই ঘুম-জড়ানো বিহ্বলতার ভেতরে, সুমুর অতি-সান্নিধ্যে, তার দুটো চোখের ছায়ায়, তার শরীরের একটা মৃদু সুগন্ধের ভেতর—কথাটা বলবার ওপর কি তার নিজেরও সম্পূর্ণ হাত ছিল!

তবু বিকাশ সাধ্যমতো সহজ করে নিতে চাইল।

'পড়াশোনা কেমন চলছে?'

চোখ একবারের জন্যে উঠেই আবার নেমে গেল মাটিতে।

'ভালো।'

'বুড়ো আর কালি ঢালেনি বই-খাতায়?'

একটুকরো হাসি দেখা দিল ঠোঁটের কোণায়: 'না।'

'পড়াশোনায় দরকার হলে আমি সাহায্য করতে পারি।'

'আপনাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না।'

'এত ভদ্রতা কেন? হঠাৎ আমি পর হয়ে গেছি নাকি?'

কোন জবাব এল না। মুখের রঙটা যেন নিবিড় হল একটু। তারপর:

'সেদিন ভোরবেলা আপনি বেহালা বাজাচ্ছিলেন, না?'

'তুমি জেগে ছিলে নাকি তখন?'

'না, ঠিক জেগে ছিলুম না, ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলুম। খুব অদ্ভুত লাগছিল।'

'তুমি সুর ভালোবাসো?'

'খুব।' সুমুর চোখ এবার কিশোরীর সরলতায় স্বচ্ছ হয়ে উঠল: 'আরো আপনার বাজনা শুনলে আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

'আমি তো ভালো বাজিয়ে নই। সামান্য শিখেছিলুম কেবল। নিজের আনন্দে যা হোক বাজিয়ে যাই। তবে তোমার মতো সমঝদার পেলে আমার মতো বাজিয়েরও যশ হওয়া শক্ত নয়।'

'জানি না।' একটু চুপ করে থেকে সুমু বললে, 'জানেন, মা কতবার বাবাকে আমার গান শেখার কথা বলেছেন। বাবা শুনলেই চটে যেতেন। বলতেন, হাঁ, গান শিখুক, তারপর ছোট মাসীর মতো—' বলতে বলতে থমকে থেমে গেল সুমু, সারা মুখে

ছায়া নামল তার।

তৎক্ষণাৎ উৎকর্ণ হল বিকাশ।

'ছোট মাসীর মতো কী?'

ভয়ে আবছায়া হয়ে গেল সুনুর স্বর।

'সে থাক, পরে বলব।'

একটু চুপ। এই বাড়ির সেই অপচ্ছায়াটা। একটা আত্মহত্যা ঘটে গেছে এখানে, তার স্মৃতিটা সুদূর নয়। সন্ধ্যার পর সেই বন্ধ ঘরটার পাশ দিয়ে যেতে সুনু ভয় পায়। কানাই পাল না প্রভাকর—কে বলেছিল? না—অমলা। দুই বোনের সম্পত্তি সবটাই একা আত্মসাৎ করবেন বলে শশাঙ্ক কাকা—

শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'এখন তো তোমাকে বাজনা শেখাবার জন্যে কাকার খুব উৎসাহ দেখছি।'

'আপনি আসবার পরে মত বদলেছে।'

কেন? একটা কূট প্রশ্ন ঝলকে গেল বিকাশের মনে। কী কারণে হঠাৎ এই সদিচ্ছাটা জেগে উঠল কাকার? কোনো উদ্দেশ্য নেই কি কোথাও? হিসেবী মানুষ শশাঙ্ক নিয়োগী কি উদ্দেশ্য ছাড়া একটি পা-ও ফেলেন কোনোদিন?

কিন্তু সব সন্দেহ মুছে যায় সুনুর দিকে তাকালে। সুনু—সুবর্ণা। আসবার পরেই কী ভেবে সে নাম দিয়েছিল সোনালি। শীতের আড়ষ্টতায় জড়ানো এই বাড়িতে এক ঝলক সোনার আলোর মতো মেয়েটি। এখানে অনেক ফাঁকি থাকতে পারে কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে কোথাও নেই। আর নেই কাকিমার মধ্যেও—সংসারের আড়ালে একান্তে হারিয়ে-যাওয়া তাঁকে যতটুকু সে দেখেছে, তা থেকে এটুকু অন্তত বুঝেছে সে।

বিকাশ বললে, 'তোমার সেতার আসছে। আমি ক'দিন বাদে কলকাতায় যাচ্ছি, নিয়ে আসব।'

সুনুর চোখ খুশি হয়ে উঠল।

'আমি বাজাতে পারব?'

'নিশ্চয়। কেন পারবে না?'

'যদি ঠিকমতো না পারি—' সুনু কথাটা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল: 'আপনি তো রাগ করে বলবেন: না—যাও, তোমাকে আমি শেখাব না?'

'না—কোনোদিন বলব না। আমার যেটুকু বিদ্যে আছে, তোমাকে আমি সাধ্য-মতো [illegible] দেব।'

[illegible] এগিয়ে এল সুনু। প্রণাম করল বিকাশের পায়ে হাত ঠেকিয়ে।

আশ্চর্য হয়ে বিকাশ বললে, 'কী হল? প্রণাম কেন হঠাৎ?'

আচমকা—কী করে যে হল মুন্নু জানে না, সেই গভীর কান্নাটা আবার কেঁপে উঠল মুন্নুর ঠোঁটে। ধরা গলায় বললে, 'এমনি—' তারপরেই পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

একান্ত বিরস হয়ে ব্যাঙ্কে বসেছিল বিকাশ। একটা কাজেও মন দিতে পারছে না। দু-তিন জায়গায় ভুল সই করবার পর, ক্ষিপ্তভাবে নীচের চায়ের দোকান থেকে চা আনলো এক গ্লাস। চা-টা মনে হল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি বিস্বাদ। গ্লাসটা সরিয়ে দিয়ে বসে রইল গুম হয়ে।

পকেটে মনীষার চিঠি। আজ এসেছে।

'চাকরি খুঁজছ, ভালো কথা। কিন্তু টাকাই তো একমাত্র প্রবলেম নয়। আসলে বাড়ির সব যে আমাকেই দেখতে হয়। আমি এখানে না থাকলে—'

তুমি ওখানে না থাকলে! বিকাশের এমন একটা দানবিক চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল যেটা এই একশো মাইল দূর থেকেও কলকাতায় পৌঁছে যায়। তুমি ওখানে না থাকলে পৃথিবী অচল হয়ে যাবে, চন্দ্র-সূর্য উঠবে না। তুমি যদি আদৌ না জন্মাতে, তাহলে বিশ্ব-সংসারে তোমার মা-বাপ ভাই-বোনের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। আজ যদি তুমি হঠাৎ মরে যাও, তাহলে তোমাদের সারা সংসার একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। তুমি ওখানে না থাকলে জগতে সব থেমে যাবে, কারণ তোমার কলেজে-পড়া ভাইটাও পুরুষমানুষ নয়!

চিঠিতে আরো আছে।

'আমার সেই স্টোনের যন্ত্রণাটা এখন আর নেই। তবে মধ্যে মধ্যে স্লাইট টেম্পারেচার হয়। ও কিছু না, মনে হয় ঠাণ্ডা-ফাণ্ডার জন্যে—'

ঠাণ্ডা-ফাণ্ডার জন্যে। অবলীলাক্রমে সব মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন ডাক্তারী-বিদ্যা একেবারে সহজাত প্রতিভা মনীষার। বিকাশ দাঁতে দাঁতে চেপে ধরল। এর পরে একটি মাত্র কাজই করবার আছে। একেবারে কলকাতায় গিয়ে ডাকাতের মতো লুট করে আনা মনীষাকে। আর কিছু করবার নেই, কিছু না।

'এই যে ব্যাঙ্কার!'

উল্লসিত সম্ভাষণে মুখ ফেরালো বিকাশ। সামনে প্রভাকর।

'বোস।' জোর করেও চেহারায় প্রসন্নতা আনা গেল না: 'হঠাৎ কী মনে করে?'

'তোদের ব্যাঙ্কে আমারও যে ছোট্ট একটা অ্যাকাউন্ট আছে রে। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবে তাই থেকেই কিছু তুলে নিয়ে যেতে হবে আজকে। কিন্তু ব্যাপার কী? এমন একটা আনপ্লেজেন্ট চেহারা করে বসে আছিস কেন? কেউ চেক জাল করে টা[illegible]য়ে সরে পড়েছে নাকি?'

'তোর চেক দে, পরে বলছি।'

প্রভাকরের চেকটা নিয়ে, ক্যাশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে বিকাশ পকেট থেকে বের করল মনীষার চিঠিটা।

'পড়্ এটা।'

'সেই—সেই তাঁর চিঠি নাকি?'

'হাঁ। মনীষারই চিঠি।'

'আমি? আমি পড়ব?' কিন্তু-কিন্তু করতে লাগল প্রভাকর।

'স্বচ্ছন্দে পড়তে পারিস। ওটা প্রেমপত্র নয়। আমাদের বয়স হয়ে গেছে।'

'প্রেমপত্রের বয়েস তোর পার হয়ে গেল সাতাশ বছরেই?' প্রভাকর হাসতে চেষ্টা করল: 'এ-যুগে তো ষাট বছরেও মানুষের যৌবন যায় না রে!'

'ইয়ার্কি ভালো লাগছে না প্রভাকর, পড়্।'

প্রভাকর পড়ল। হাসল না। চিঠিটা বিকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে রইল।

'কী করতে বলিস?'

'একবার কলকাতায় গিয়ে ওঁকে ভালো করে মেডিক্যাল চেকআপ করা। মনে হচ্ছে রেস্ট দরকার—নিউট্রিশন দরকার। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে ফেল্—নিয়ে আয় এখানে। বাসা না পাস, আমার কোয়ার্টারে বাড়তি ঘর তো রয়েইছে। তারপর আছি আমি আর আমার ডিসপেনসারী, কতদিন অসুস্থ হয়ে থাকতে পারেন আমি দেখে নেব।'

'তুই তো নিজেই যাবি বলেছিলি কলকাতায়।

'হাঁ, কথা একটা ছিল। কিন্তু আপাতত বোধ হয় যাওয়া হবে না, কতগুলো অসুবিধে রয়েছে। কিন্তু একটা চিঠি দিয়ে দেব আমাদের প্রোফেসরকে। তুই দেখাস তাঁকে। ফীজ্—'

'সেজন্যে আটকাবে না।'

প্রভাকর হাসল: 'তা বলছি না। আমার কাছ থেকে গেলে ফীজ্ নেবেন না।

'আমি ডাক্তারকে ফাঁকি দিতে চাই না।'

'আচ্ছা তুই অফার করিস।' আবার হাসল প্রভাকর: 'কিন্তু তুই যাচ্ছিস কবে? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আর বেশি দেরি করা উচিত নয়।'

'নমস্কার। এই যে ডাক্তারবাবু ভালো তো?'

প্রভাকর বললে, 'ভালোই। কী খবর?'

'খবর এই ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। বাবু এসেছেন আজ দিল্লী থেকে। বলে পাঠিয়েছেন, আজ অফিসের পরে ম্যানেজারবাবু যদি ওঁর সঙ্গে চা খান, বাবু খুব খুশি হবেন।'

একটা চকিত বিস্ময় ফুটল প্রভাকরের মুখে। ওদিকের কাউন্টার থেকে কাশির আওয়াজ এল প্রিয়গোপালের। সেই কাশিটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্পষ্ট গলায় বিকাশ বললে, 'হাঁ, নিশ্চয় যাব। কানাইবাবুকে বলবেন আপনি।'

কুড়ি

বিরক্ত হয়ে টেলিফোনটা পাশে নামিয়ে রাখলেন কানাইবাবু।

'যেমন এক্‌সচেঞ্জ—তেমনি তার টেলিফোনের ব্যবস্থা! কোনো মানে হয় না একরাশ পয়সা দিয়ে এই সব টেলিফোন রাখবার।' তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু: 'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি না?'

'না, বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচেক।'

'একটু বিশ্রাম নেই মশাই, কাজ আর ছাড়ে না!' বলতে বলতে হঠাৎ উদাস হলেন কানাইবাবু: 'কখনো কখনো মনে হয় মশাই, এর চাইতে সেই গরীবের ছেলে হয়ে থাকলেই ভালো হত। সেই মূর্তি গড়া, সেই জাত-ব্যবসা। টাকা থাকত না হয় তো, সুখ থাকত।'

বিকাশ একটু কৌতুক বোধ করল। ভাগ্যবানদের এই সব রোম্যাণ্টিক স্বগতোক্তি শুনতে মন্দ লাগে না। পোলাও খেয়ে অরুচি ধরে গেলে পান্তাভাত আর কাঁচা লঙ্কার স্বপ্ন। তাদের ব্যাঙ্কের এক কর্তা-ব্যক্তিকে মনে পড়ল। কথায় কথায় বলেছিলেন, 'ডু ইয়ু নো—আই স্টার্টেড্ মাই লাইফ অ্যাজ এ স্কুল-টীচার। তখন বাইরে ছিলুম দরিদ্র, কিন্তু হৃদয়ে? আই ওআজ রিচার দ্যান অ্যান এম্পেরার, কিন্তু এখন? ওহো—মাই সোল —আই হিয়ার ইট্‌স্ স্টার্ভড ক্রাই এভরি ডে!'

এই বলে, হৃদয়ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাত দেড়েক লম্বা একটি চুরুট ধরিয়ে প্রকাণ্ড আমেরিকান মোটর গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন।

'ভূতের বোঝা মশাই, ভূতের বোঝা!' কানাইবাবু আবার উদাস হয়ে অফিস ঘরের দিকে চোখ বোলালেন: 'ভালো লাগে না—এত ক্লান্তি বোধ করি মধ্যে মধ্যে!' তারপর বললেন, 'সে যাক—চলুন, চা-টা খাওয়া যাক।'

বাগানবাড়ি নয়, বসতবাড়ি। নতুন করা হয়েছে কয়েক বছর আগে। মোজেইক-করা চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বিকাশের মনে হল এ বাড়িটা এখানে না হয়ে কলকাতার কোনো কুলীন পাড়ায় হলেই মানাত ভালো।

দোতলায় উঠে সামনে মস্ত দক্ষিণের বারান্দা। দুটো সোফাসেট—চামড়া-বাঁধানো ছোট ছোট বসবার আসন। কালো কালো মেহগনি স্ট্যাণ্ডে ইতস্তত দু-তিনটি পাথরের মূর্তি।

'এখানেই বসা যাক—কী বলেন ?' কানাইবাবু বললেন, 'আজ তো ঠাণ্ডা নেই বললেই চলে, দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নাকি ঘরে বসবেন ?'

'এখানেই ভালো।'

কানাইবাবু বসলেন, বিকাশ বসল। সামনে অনেকখানি ফাঁকা পেরিয়ে জ্যোৎস্না-মাখানো গাছের সার। হাওয়ায় আমের মুকুলের গন্ধ। একটা উজ্জ্বল নীলচে আলোয় ভরে আছে বারান্দাটা।

কানাইবাবু বললেন, 'বাড়িতে আপনাকে চা খেতে বলেছি বটে, কিন্তু আমার গোটা ফ্যামিলিই এখন কলকাতায়। কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া গেল না।'

'সে পরে হবে অন্য সময়।'

'হ্যাঁ, পরেই হবে।' কানাইবাবু হাসলেন: 'কিন্তু আপনাকে আসতে বলতেও আমার একটা ডেলিকেসি বোধ হয়। আপনার কাকা—'

আবার সেই বিরক্তিকর প্রসঙ্গটা।

বিকাশ বিরস মুখে বললে, 'উনি আমার আপন কাকা নন। ওখানে বরাবর থাকা আমার চলবে না। আপনি আমাকে একটা বাসা দেবেন বলেছিলেন, সেই জন্যেই—'

'ওঃ, বাসা ? তার জন্যে সঙ্কোচ করছেন কেন ? আমি তো ভাড়া দেবই। আমার সরকারকে বললেই পারতেন, সে-ই ঠিক করে দিত।'

একটু চুপ করে থেকে বিকাশ বললে, 'শুধু তাই নয়। আর একটা অনুরোধ ছিল আপনার কাছে।'

দুজন চাকরের হাতে ট্রে-তে করে এল খাবার, টি-পট।

'আর একটা অনুরোধ ?' ভ্রূ দুটো একবারের জন্যে জুড়ে এল কানাইবাবুর: 'আচ্ছা সে পরে হবে, এখন একটু চা খান।'

কেক আর সন্দেশগুলো কলকাতা থেকে কানাইবাবুর সঙ্গে এসেছে মনে হল। সন্দেশে ক্ষীরের শীতলতা।

'আরো দু-চারটে নিন মশাই। এই বয়েসে এত কম খেলে চলে ?'

'মাপ করবেন, এর বেশি চলবে না।'

চা শেষ করে সিগারেট ধরালেন কানাইবাবু।

'কী অনুরোধ বলছিলেন ?'

একবারের জন্যে প্রিয়গোপালের মুখটা মনে এল বিকাশের, অস্বস্তি বোধ হল একটু। বুর্জোয়া স্যার—ক্যাপিটালিস্ট। কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না—অ্যাভয়েড করবেন যতটা পারেন।

ননসেন্স। কোনো মানে হয় না।

তবু একটু চুপ করে রইল বিকাশ। মনীষার জন্যে চাকরির কথাটা কিছুতেই বলা যাচ্ছে না সহজভাবে।

কানাইবাবুর ভ্রূ দুটো আবার জুড়ে এল এক মুহূর্তের জন্যে।

'কী অনুরোধ বলুন তো?'

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বিকাশ বললে, 'চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন একটা?'

'চাকরি?' কানাইবাবু আশ্চর্য হলেন: 'কেন, ব্যাঙ্কের চাকরিতে অসুবিধে হচ্ছে নাকি আপনার?'

'আমার নিজের জন্যে নয়।' বিকাশ একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস জমিয়ে তুলতে লাগল: 'একটি মেয়েকে—এখানে বা কাছাকাছি কোনো স্কুলে—' একবার থেমে বিকাশ কথাটা শেষ করল: 'মেয়েটি গ্র্যাজুয়েট, বি.এ.তে ম্যাথমেটিকস ছিল। এখানকার মেয়েদের স্কুলে একটা ভেকান্সি হতে পারে শুনেছি।'

কানাইবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন: 'আপনার রিলেটিভ?'

স্পষ্টগলায় বিকাশ বললে, 'না, আমার স্ত্রী।'

'আপনার স্ত্রী?' আরো আশ্চর্য হলেন কানাইবাবু: 'বিয়ে করেছেন নাকি? আমি তো জানতুম আপনি এখনো ব্যাচেলর।'

'আমার বোধ হয় বলতে একটু ভুল হল—' একটু কুণ্ঠিত হয়ে বিকাশ বললে, 'আমার ভাবী স্ত্রী। মানে এখানে একটা চাকরির ওপরে বিয়েটা নির্ভর করে আছে।'

প্রয়োজনের কথাটা যখন বলতে আসাই হয়েছে, তখন নিজেকে নগ্ন করে দেওয়াই ভালো। কানাইবাবুর কাছে কোনো আড়াল রাখা যাবে না—রেখে কোনো লাভ নেই।

মিনিট খানেক পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ চোখে বিকাশের দিকে চেয়ে থাকলেন কানাইবাবু।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। যতদূর জানি, ব্যাঙ্কে তো আপনারা ভালো মাইনেই পান। আর এ-সব পাড়াগাঁয়ে তো মোটামুটি খরচ-খরচাও কম। এখানে এনেও মেয়েটাকে জুড়ে দেবেন কাজের জোয়ালে?' কানাইবাবুর স্বরে অপ্রসন্নতার ছায়া পড়ল: 'এ আপনাদের এক অদ্ভুত ক্যালকাটা-কালচার মশাই। ঘরের সুখ-শান্তি বলে আপনারা আর কিছু রাখলেন না—বাড়ির মেয়েদের তাড়া দিয়ে অফিসে না পাঠালে স্বস্তি নেই আপনাদের।'

এই বাঁকা কথাটার এখুনি ধারালো জবাব দেওয়া যেত একটা। বলা যেতে পারত, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা চাকরি করতে বেরোয় ক্যালকাটা-কালচার হিসেবে নয়, পেটের দায়ে, বাঁচবার তাড়ায়। ঘরটাকে প্রাণপণে টিঁকিয়ে রাখবার জন্যেই হাজার হাজার মনীষাকে আত্মহত্যায় এগিয়ে যেতে হয়। ট্রামে-বাসে যারা দু-বেলা অফিসে যাতায়াত করে তাদের ক্ষুধিত-পীড়িত মুখের দিকে চেয়ে দেখবার সুযোগ কখনো কানাই-

বাবুরা পান না—বিকেল পাঁচটা-ছটা-সাড়ে ছটায় যে মেয়েরা গঙ্গার হাওয়ায় ক্লান্ত মাথা ভিজিয়ে অসাড় পা টানতে টানতে হাওড়া ব্রীজের ওপর দিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারীর ট্রেন ধরতে যায়—তাদের কানাইবাবুরা কখনো দেখেননি।

কিন্তু চাকরির তদ্বির করতে এসে দুর্বিনীত হওয়া যায় না। ম্লান গলায় বিকাশ বললে, 'ঠিক ক্যালকাটা-কালচার নয়। চাকরিটা ওর দরকার।'

বিরূপভাবে একটু চুপ করে রইলেন কানাইবাবু।

'আপনার বিয়ের সঙ্গে চাকরিটার সম্পর্ক আছে কিছু?'

'আছে একটু। আপনি যা ভাবছেন তা নয়। চাকরিটার সঙ্গে আর একটা ফ্যামিলিও জড়িয়ে রয়েছে।' কথাগুলো বলতে বিকাশ একটা তিক্ততা বোধ করছিল মুখের ভেতর: 'সব হয়তো এখন আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারছি না। কিন্তু যদি একটু হেলপ করেন—'

কানাইবাবু কী বুঝলেন তিনিই জানেন। সিগারেট শেষ করে গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রের ভেতরে।

বিকাশ আবার বলল, 'আমি হেডমাস্টার কুমুদবাবুর সঙ্গেও কথা বলেছিলুম।'

'তিনি কী বললেন?'

'বললেন, শীগগিরই একটা পোস্ট খালি হতে পারে গার্লস্ স্কুলে।'

'আচ্ছা, দেখছি।' কানাই পাল অফিশিয়াল হয়ে উঠলেন: 'আপনার কাছে অ্যাপ্লিকেশন আছে?'

'একটা আশা যদি পাই—' বিকাশ শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বোলালো: 'তা হলে—দু-তিনদিন পরেই তো আমি কলকাতা যাচ্ছি, দরখাস্তটা নিয়ে আসতে পারি।'

'আসুন। করা যাবে একটা ব্যবস্থা।'

একটা ধন্যবাদ দেবে কিংবা উচ্ছ্বসিত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে, বিকাশ ঠিক বুঝতে পারল না। বরং নিজের এই দৈন্যের জন্যে একটা গ্লানি এসে ধীরে ধীরে তাকে ছেয়ে ফেলছিল।

কানাইবাবু একটু হাসলেন।

'আমি আপনার পজিশনটা ঠিক জানি না বটে, কিন্তু একটা চাকরির জন্যে যদি আপনার বিয়েটা আটকে থাকে, তা হলে সে ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে।'

প্রবৃত্তি ছিল না, তবু একটা বিশ্রী চাটুকারিতা বিকাশের মুখ ফসকে ঝরে পড়ল।

'আপনি ইচ্ছে করলে সব হতে পারে এখানে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতরটা আরো তেতো হয়ে গেল। কিন্তু নিজের জন্যে, মনীষার জন্যে এখন আর তার ফিরে যাওয়ার পথ নেই।

'সব হতে পারে?' কানাইবাবু আবার মৃদু রেখায় হাসলেন: 'না—সব হতে পারে না। তবু একটু চেষ্টা করতে পারি—এই যা।' হাসিটা ঠোঁটের দু ধারে আর একটু ছড়ালো: যদিও আমি এখানে বিখ্যাত মিস্টার ব্যাডম্যান—তবু আমাকে যতটা ভিলেন বলে শুনেছেন—হয়ত আমি তা নই।'

কে বলেছে আপনি ব্যাডমান? এইটেই এ অবস্থায় স্বাভাবিক বক্তব্য ছিল বিকাশের। কিন্তু এত বড়ো মিথ্যেটা কিছুতেই বলা গেল না। সেই কে এক যোগেন পাল; সেই মাছের ভেড়ী—এগুলো সবই মায়া বলে মনে ভাবা শক্ত।

'ক্ষমতা থাকলেই শত্রু থাকে—কী করবেন বলুন?' কানাইবাবু যেন বিকাশকেই সান্ত্বনা দিলেন: 'সে যাক, যেতে দিন ওসব। দিন কয়েকের মধ্যে একটা দরখাস্ত এনে দেবেন আমার কাছে। তারপর দেখব আমি কী করতে পারি।'

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো। কৃতজ্ঞতা জানানোর ভদ্রতাটা মনে এল এবার।

'আপনাকে কী বলে যে—'

'ধন্যবাদ জানাবেন? ওটা পরে। আগে চাকরিটা হয়ে যাক—এখুনি বাজে খরচ করবেন কেন?' কানাইবাবু প্রগল্‌ভ ভঙ্গিতে বললেন, 'চাকরির সঙ্গে সঙ্গে নীড়ও বাঁধবেন তো?'

'তাই তো ইচ্ছে।' মাথা নামিয়ে বিকাশ জবাব দিলে।

'তা হলে বাসার ব্যবস্থা করে রাখব?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সামনের মাস থেকেই। কিন্তু ভাড়া-টাড়া—'

'হবে, হবে, সব হবে। ওসব সরকারমশাই করে দেবেন।'

'আপনাকে বিরক্ত করলুম—কোনো অপরাধ—'

'খুব হয়েছে, আর ভদ্রতার দরকার নেই।'

'আজ চলি তা হলে—নমস্কার—'

কানাইবাবু উঠে এলেন। বললেন, 'চলুন, আপনাকে বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

'কোনো দরকার নেই, আমি যেতে পারব। আপনি বসুন।'

'চলুন মশাই—'

নিঃশব্দে সিঁড়ি পেরিয়ে, সদর দরজার সামনে এসে কানাইবাবু বললেন, 'একটা কথা বলব আপনাকে?'

'বলুন।'

'আপনার স্ত্রীর চাকরিটা কত দরকার, সে আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আপনার বিয়েটা যে একটু তাড়াতাড়িই করা দরকার—সেটা আমি বুঝতে পারছি।'

নমস্কার করবার জন্যে হাত জড়ো করছিল বিকাশ, চমকে হাত দুটো খুলে পড়ল।

কানাইবাবুর গলার স্বরটা একটু অন্তরকম মনে হল।

'একথা কেন বলছেন আপনি?'

দরজার আলোয় একটা রহস্তময় হাসি দেখা গেল কানাইবাবুর মুখে।

'এমনি। হয়তো কোনো কারণ নেই। হয়তো ইনটুইশনও বলতে পারেন। আজ যদি না শুনতুম যে ভাবী স্ত্রী একজন রয়েছেন আপনার, তা হলে এই কথাটা হয়তো বলবার দরকারও হত না আপনাকে।'

সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ গলায় বিকাশ বললে, 'আপনি কিছু একটা বলতে চাইছেন মনে হচ্ছে।'

'কিছু না—কিছু না।' এবার কানাইবাবু বেশ উচ্চগলায় হেসে উঠলেন: 'পাড়া-গাঁয়ের মানুষ মশাই, এত বয়েস পর্যন্ত আইবুড়ো রয়েছেন, ভাবতেই খারাপ লাগে। তাই উপদেশ দিচ্ছিলুম। যত তাড়াতাড়ি পারেন বিয়েটা করে ফেলুন। আমাদের একেবারে ফাঁকি দেবেন না, দু-একটা মিষ্টি-টিষ্টি যেন পাই। আচ্ছা—নমস্কার।'

আলোচনা থামিয়ে দিয়ে দু হাত জুড়ে নমস্কার করলেন, তারপরই চলে গেলেন বাড়ির ভেতরে।

বিকাশ চলা শুরু করল বাড়ির দিকে। চাঁদটা উঠেছে পেছনে। বিকাশের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছিল সামনের দিকে। সে ছায়াটার সঙ্গে আরো একটা ছায়া এগিয়ে যাচ্ছে—এই কথাটাই ক্রমাগত মনে হল তার।

'পঞ্চনদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে, দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে—' বিকট চিৎকারের আবৃত্তি থেমে গেল। তারপরই শোনা গেল সমালোচকের বিদগ্ধ ভাষ্য: 'ধাঃ বাবা, গুরু-ফুরুতে হবে না। শেষকালে মোগল সৈন্য বেণী ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে আর কচাকচ সাবাড় করে দেবে। চাই—কালী। কালী, কালী, মহাকালী—কালিকে কালরাত্রিকে—'

মেজদা। শশাঙ্ক নিয়োগীর বাড়ির সামনে উঠোনে জ্যোৎস্নার ভেতরে দাঁড়িয়ে। জটায়, দাড়িতে দুটো বড়ো বড়ো চোখে চাঁদের আলো জ্বলছে—যেন শ্মশান-ভৈরবের মূর্তি।

একবারের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল বিকাশ। মেজদার দৃষ্টি পড়ল তার দিকে।

'তোর নাম বিকাশ না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' লোকটাকে দেখে এখন আর ভয় করে না, বরং কৌতূহল আর সমবেদনা বোধ হতে থাকে। তার নিজের নামটা সম্পর্কে মেজদার এই প্রশ্ন কবার শুনতে হয়েছে—বিকাশ ভাবতে চেষ্টা করল।

'তুই বেহালা বাজাস?'

'বাজাই মধ্যে মধ্যে।'

হঠাৎ মেজদা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এল তার। একরাশ চিমশে দুর্গন্ধ ছেয়ে ফেলল বিকাশকে। বিকাশ সরে যেতে চাইল, পারল না। তার একটা হাত কড়াপড়া ফাটা শক্ত আঙুলে চেপে ধরে মেজদা বললে, 'খুন করতে পারবি?'

'সে কি!'

'না হলে বড়ো বাজিয়ে হবি কী করে?' হঠাৎ মেজদা দানবিকভাবে চেঁচিয়ে উঠল: 'সুনুকে খুন করবি নাকি রাস্কেল—ওর বুক ছিঁড়ে নাড়ী বের করে নিবি? তা হলে রাস্কেল—' আচমকা মেজদার থাবার মতো একটা হাত কতগুলো নোংরা নখ নিয়ে বিকাশের গলার দিকে এগিয়ে এল; 'তা হলে—তা হলে তোর গলা টিপে আমি মেরে ফেলব।'

বাঘ কিংবা ভালুকের পাল্লায় পড়লে মানুষের কি অনুভূতি হতে পারে তা বিকাশের জানা ছিল না। কিন্তু ওই জান্তব দুর্গন্ধ, ওই থাবা, মুখের ওপর ওই কুৎসিত নিশ্বাস—ভয়ে বাক্‌রোধ হয়ে গেল তার।

কী ঘটত বলা মুশকিল, এমন সময় বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়লেন শশাঙ্ক নিয়োগী। বাজের মতো চিৎকার ছাড়লেন একটা: 'মেজদা!'

মেজদার মুঠি খুলে গেল, থাবা নেমে এল। একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেন মুহূর্তের ভেতরে।

বিকাশকে ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিন পা পেছিয়ে গেল মেজদা।

শশাঙ্ক বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে এলেন: 'আবার বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে তোমার—না? হতভাগা গাঁজাখোর কোথাকার! থামে বেঁধে আচ্ছা করে না চাবকালে তুমি শায়েস্তা হবে না মনে হচ্ছে।'

'ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে। এবার আমায় ধরে নিয়ে ঠিক বলি দেবে—' মেজদা ডুকরে কেঁদে উঠল তারস্বরে। তারপরেই বাগানের ভেতরে টেনে দৌড়।

'এবারে হাত-পা বেঁধে এই সুইসেন্সটাকে রাঁচি কিংবা বহরমপুরে পাঠিয়ে দেব—' সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে এলেন শশাঙ্ক: 'ওই গেঁজেলটা গায়ে হাত দিয়েছে নাকি তোমার?'

হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করছে তখনো। তবু বিকাশের মনে হল, মেজদা যে তার গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল এই কথাটা অন্তত শশাঙ্কর কাছে গোপন করা ভালো। না হ চাবুকের চোটে মেজদার পিঠ আর আস্ত থাকবে না।

কাঁপা গলায় বিকাশ বললে, 'না—এমনি ভয় দেখাচ্ছিলেন।'

'নিশ্চয় আজ কোথা থেকে গাঁজা জুটিয়ে টেনেছে এক কলকে। নইলে, আমি বাড়ি থাকলে এত বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায় না। তোমার কাকিমার আবার দয়ার

শরীর—সেইজন্মে এইরকম একটা পাবলিক হুইসান্সকে আমাকে বাড়িতে পুষতে হচ্ছে। নইলে—' শশাঙ্ক কাকা একটু থামলেন : 'তুমি কিছু ভেবো না বাবাজী, আমি ওকে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে দেব। পালাবে কোথায়—খাবার সময় তো আসতেই হবে বাড়িতে।'

'না না, কিছু বলবেন না ওঁকে—' বিকাশের মনে পড়ল মেজো জ্যাঠার কথায় কিভাবে সুন্দুর স্বর মমতায় ভরে ওঠে : 'উনি আমার কোনো ক্ষতি করেননি।'

'সে দেখা যাবে।' বিকট একটা মুখভঙ্গি করে শশাঙ্ক বললেন, 'এই যে বনেবাদাড়ে গিয়ে ঢুকল—সাপে-খোপে কেটে দিলেও বাঁচতুম। কিন্তু পাগলকে সাপেও কামড়ায় না—আশ্চর্য !'

সাপের এই অবিবেচনায় শশাঙ্ক কাকাকে বেশ ক্ষুণ্ণ বলে মনে হল।

বললেন, 'যেতে দাও ও-সব। এসো ভেতরে। আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম এতক্ষণ। একটা দরকার আছে তোমার সঙ্গে।'

'বলুন।'

'এসো, বলছি।'

বাইরের সেই ঘরটায় টেবিলে খাতাপত্র রেখে কি সব হিসেবপত্র বোধ হয় লিখছিলেন শশাঙ্ক। দেওয়ালের ছবিগুলো লণ্ঠনের আলোয় আবছায়া। কোনার ড্রামগুলো কত-গুলো জটলা বাঁধা মানুষের মতো। ভাঙা আলমারিটার পাশে পাশে ছায়া। নতুন চুনকাম থেকেও দেওয়ালে পুরোনো গন্ধ। শীতের আভা মেশানো দক্ষিণের হাওয়ায় সুধাময়ী দেবীর সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাতুলীর থান দুই বিজ্ঞাপন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'বোসো, একটু কথা আছে।'

একটু আগেই গিয়েছিল কানাই পালের কাছে মনীষার চাকরির জন্মে তদ্বির করতে। অর্থাৎ এইমাত্র সে ফিরে আসছে শশাঙ্কর শত্রু-শিবির থেকে। তা ছাড়া যে সন্ধ্যায় শশাঙ্ক কাকিমার গায়ে হাত তুলছিলেন, সেই রাত থেকে এই লোকটার মুখের দিকে সে চাইতে পারে না, তার গায়ে কিলবিল করে যেন একটা বিশ্রী পোকা উঠে আসছে এই-রকম মনে হয়। কী বলবেন শশাঙ্ক কাকা ? মেজদার হাতে সেই ভয়ের চমকটা কেটে গেছে—কিন্তু অনিশ্চিত অস্বস্তিবোধ হচ্ছে এখন।

বিকাশ চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। শশাঙ্ক কাকা লণ্ঠনের পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তুমি কলকাতায় যাবে নাকি শীগগিরই ?'

'হাঁ, দু-তিনদিন পরেই একবার যাব। তিন-চারদিনের ছুটি নিয়ে।'

'তবে তো ভালোই হল। তোমাকে একটা অনুরোধ করব বাবাজী। একটু উপকার করতে হবে।'

'বলুন না।'

'তোমার ওপর একটু উপদ্রব হবে হয়তো—' টেবিলে পড়ে থাকা একটা পায়রার পালক কুড়িয়ে নিয়ে, মুখটা একটু বেঁকিয়ে একটা কান কিছুক্ষণ চুলকে নিলেন শশাঙ্ক: 'মানে—যদি খুব অসুবিধে বোধ না করো, তা হলে সুষুকে এই ক'দিনের জন্যে তোমার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব।'

সুষুকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে? বুকের ভেতরে খানিকটা রক্ত চলকে পড়ল বিকাশের।

'বেড়াতে?'

'না বাবাজী, বেড়াতে নয়। গরীব গেরস্ত—পয়সা খরচ করে কলকাতায় মেয়েকে বেড়াতে পাঠাব, এমন সখ আমার নেই। তুমি যদি সময় করে একজন ডাক্তারকে দিয়ে মেয়েটার চোখটা একটু দেখিয়ে দাও, বড়ো ভালো হয় তা হলে।'

'কী হয়েছে চোখে?'

'রাত্রে পড়াশুনো করতে পারে না। প্রায়ই জল পড়ে চোখ দিয়ে। মাথা ধরে।'

'চোখ খারাপ হয়েছে বোধ হয়।'

'খুব সম্ভব।' এবার ব্যাজার মুখটাকে আবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে পায়রার পালক দিয়ে আর একটা কান চুলকোতে লাগলেন শশাঙ্ক: 'কিন্তু কী গেরো বলো দেখি! এখন চশমা দাও—হ্যানো করো, ত্যানো করো। মেয়ে তো চশমা চোখে দিয়ে ফ্যাশন করে বেড়াবেন, এদিকে আমার খরচান্ত।'

'ফ্যাশন বলছেন কেন! চোখ খারাপ হলে চশমা তো নিতেই হবে—' বিকাশ হাসল: 'কিন্তু এখানে কোনো চোখের ডাক্তার নেই কি? তাঁদেরও তো দেখাতে পারেন।'

'আরে ডাক্তার থাকবে না কেন? কিন্তু সেগুলো আবার ডাক্তার নাকি? কিছু মনে কোরো না বাবাজী, প্রভাকর তোমার বন্ধু—কিন্তু এখানকার সব ডাক্তারেরা ওর দলের—মানে ভেটিরিনারী সার্জন, গোরু-ঘোড়ার চিকিচ্ছে করতে পারে, মানুষের নয়।'

বিকাশ চুপ করে রইল। শশাঙ্ক আবার বললেন, 'এখানকার ডাক্তার—হুঁ! চোখ দেখাতে নিয়ে যাব—অ্যাসিড-ম্যাসিড ঢেলে দেবে চিরকালের মতো কানা করে। শেষ-কালে একটা অন্ধ মেয়ে গলায় বেঁধে আমি সাগরে ডুবে মরি আর কি!'

'আজ্ঞে তা কি সম্ভব?' বিকাশ আপত্তি করল: 'তাঁরা ডাক্তার, পাগল নন তো।'

'পাগল নয় হে—ভিলিয়ান-ভিলিয়ান। ('ভিলেন'কে ভিলিয়ান বলা হল খুব সম্ভব) তুমি এ সব পাড়াগেঁয়ে লোককে জানো না—একেবারে ডেঞ্জারাস। তুমি যাওয়ার সময় মেয়েটাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাও, বড়ো উপকার হয় আমার। আর থাকবে তোমাদের বাড়িতে—তোমার মায়ের কাছে, সে তো আমাদের নিজেদের বাড়িই হে। তোমার

বাবার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক যে ছিল সে তো আর তুমি জানো না।'

'আপনিও সঙ্গে চলুন না, কাকা।'

'আমি! আমার সময় কোথায় হে! একা মানুষকে যে কত দিক সামলাতে হয় সে তুমি কী বুঝবে বাবাজী! একটা বড়ো ছেলে যদি থাকত তা হলেও কথা ছিল, কিন্তু লাইন দিয়ে জন্মালো এক দঙ্গল মেয়ে—পর পর তিনটে। কিছু ভেবো না হে, তুমি আমাদের ঘরের ছেলে, তোমার সঙ্গে যাওয়া যা, আমার সঙ্গেও তাই। যদি একটু অসুবিধে হয়ও—মেয়েটাকে একটু কষ্ট করে সঙ্গে নিয়ে যাও বাবাজী।'

সুনু—সুনু তার সঙ্গে কলকাতায় যাবে। একটা ট্রেনের কামরা, একটি রাত—কলকাতায় তিনটে দিন। ছেলেমানুষ সুনু কলকাতা চেনে না, তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা-ওটা দেখাতে হবে। বিকাশের ভাবনার ওপর একটা মিষ্টি স্বপ্নের জাল ছড়িয়ে যেতে লাগল। আর—এই স্বপ্নের মধ্যে তার একবারও মনে পড়ল না যে আসলে সে কলকাতায় চলেছে মনীষাকে ডাক্তার দেখাতে, এখানকার স্কুল-মাস্টারির জন্যে তাকে রাজী করাতে, তার কাছ থেকে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে আনতে, আর—আর কানাইবাবুর কাছ থেকে একটা ছোট বাসা ভাড়া নিয়ে সেখানে নীড় বাঁধতে।

মাথা নামিয়ে মৃদু গলায় বিকাশ বললে, 'আচ্ছা—নিয়ে যাব।'

একুশ

পকেটে প্রভাকরের লেখা একটা চিঠি, তার প্রোফেসার ডাক্তার চৌধুরীর কাছে। মনীষাকে একবার ভালো করে দেখবেন তিনি—অ্যাডভাইস দেবেন। এই চিঠিটার দরকার হবে কাল, কলকাতায় পৌঁছুলে। আপাতত সামনের সীটেই একটুখানি জায়গায় ছোট্ট শরীরটাকে আরো ছোট করে নিয়ে সুনু ঘুমন্ত। কখনো কখনো এ-রকম অঘটনও ঘটে যায় অর্থাৎ ট্রেনের এই সেকেণ্ড ক্লাস কামরাটিতে আজ ভীড় নেই, বাকী জনচারেক যাত্রীও এর মধ্যে শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। সুনুর বেঞ্চিতে আর একটি মাঝ-বয়েসী মহিলা ঘুমের ভেতরেও থেকে থেকে ছটফট করছেন, গায়ের পায়ের কম্বল গুছিয়ে নিচ্ছেন বার বার, কখনো চোখ দুটো সম্পূর্ণ মেলে তাকিয়ে থাকছেন ওপরের লালচে আলোটার দিকে। বিকাশ জানে, মহিলাটি আজ সারা রাত ঘুমুতে পারবেন না, সঙ্গী দেবরের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা থেকে আগেই জানা গেছে—বিবাহিতা মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে তাকে কলকাতায় দেখতে যাচ্ছেন তিনি।

কিন্তু সুনু ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্তে, একান্ত নির্ভরতায়। বিকাশ—অভ্যাসমতো সীটের কোণায় যেখানে বসে আছে, সেখানে একটুখানি হাত-পা মেলে যে ঘুমিয়ে নিতে পারত

না তা নয়, বাঙ্কেও জায়গা ছিল। কিন্তু একে তো ট্রেনে তার কখনো ঘুম আসে না, রিজার্ভেশন থাকলেও না, তার ওপর—তার ওপর, আজ রাতটাই আলাদা। দেড় মাস আগেও যে স্বর্ণা তার জীবনে কোথাও ছিল না—দেখতে দেখতে সে কখন সোনালি হয়ে গেছে, কখন সে বিকাশের মনের মমতা অনেকখানি দখল করে নিয়েছে, কখন তার এক-একটা অবসরকে আলোয় ভরে দিয়েছে, এ-কথা ভাবতেই তার আশ্চর্য লাগছিল। তারও চেয়ে আশ্চর্য, শশাঙ্ক কাকা অত্যন্ত সহজে—এবং নিজেই উৎসাহ করে স্বনুকে তার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

স্বনু ঘুমুচ্ছে। গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। কয়েকটা ঝুরো চুল উড়ে পড়ছে মুখে, একটা কানে চিকচিক করছে সোনার রিং। ট্রেন চলেছে রাত ছিঁড়ে ছিঁড়ে—কাচের জানলার বাইরে মরা শীতের জ্যোৎস্নায় পৃথিবীটা আকারহীন অর্থহীন ভূতুড়ে দেশের রূপ নিয়েছে একটা। মনে হচ্ছে এই অবাস্তব ভৌতিক জগতের মধ্য দিয়ে এই যে গাড়িটা লোহা-লক্কড়ের ঝাঁঝর বাজিয়ে খ্যাপার মতো ছুটছে—এ কোথাও পৌঁছুবে না, কোনো-দিন না—কেবল এমনি করে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এই মরা জ্যোৎস্নার ভেতরে হারিয়ে যাবে। স্বনুর ভাগ্যও এমনি একটা ট্রেন, কোথায়—কিভাবে—

নিজের ভাবনার গতিতে বিরক্ত হয়ে বিকাশ মুখ ফিরিয়ে নিলে স্বনুর দিক থেকে, চোখ বুজে বসে রইল। আজ রাত্রে—এই চলন্ত ট্রেনে স্বনু অন্তত নিশ্চিন্ত। শশাঙ্ক তাকে অসঙ্কোচে পাঠিয়ে দিয়েছেন বিকাশের সঙ্গে, বিকাশ তার সব ভাবনা, সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছে।

কিন্তু অস্বস্তি কাটছে না। কোথায় কী যেন একটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হয়তো রাজী না হলেই ভালো হত। 'তোমাকে ভুলব না—তোমাকে ভোলা যায় না—' এই কথাটা সে-রাত্রে বলবার পর থেকেই নিজের কাছে অদ্ভুত রকম কুণ্ঠিত হয়ে আছে সে। স্বনু কী ভেবেছে কে জানে, হয়তো কিছুই ভাবেনি, ভাববার মতো বয়েসই হয়নি তার। তবু বিকাশ জানে, এই কথাটা—এমন করে, মনীষা ছাড়া আর কাউকে বলা যায় না, কাউকে বলা উচিত নয়।

আর মেজদা—

পাগল, বদ্ধ পাগল। কিন্তু বার বার কেন টেনে আনে স্বনুকে? কেন জড়িয়ে দিতে চায় তার সঙ্গে? কেন বলে—

ননসেন্স। কোন মানে হয় না।

কিন্তু একটা মানে হয়। সেই গল্পটা। সেই পাগানিনি।

পাগানিনি! তাঁর কথা সে কিছু জানে না, আবছা ভাবে নামটা যেন শুনেছিল। তবে ভাগনার সম্বন্ধে কবে যেন কিছু কিছু পড়েছিল সে। সেই লোকটাও মেয়েদের

জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। তাদের যন্ত্রণা নিয়েই কি সুর বাঁধত ভাগনার—জমে উঠত তার কম্পোজিশন? পাগানিনি কি ভাগনারের রূপক?

চুলোয় যাক এ-সব তত্ত্ব। মাথা খারাপ না হলে এ-সব নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না কেউ। কিন্তু বার বার ওই পাগানিনির গল্প শোনায় কেন লোকটা? বিকাশ বেহালা বাজায় বলে? মেজদা কি বলতে চায়—ওই বেহালার সুর বিকাশের একটা ফাঁদ—ওই ফাঁদে একটা পাখির মতো ধরা পড়বে সুমু, তারপর বিকাশ যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে হত্যা করবে তাকে, আর সেই যন্ত্রণা সুর হয়ে বাজতে থাকবে তার বেহালায়?

পাগল! পাগল ছাড়া এ-রকম ভাবতে পারে কেউ?

এ থেকে আর একটা সিদ্ধান্ত এসে যায়। তার মানে—সোজা বাংলা ভাষায় যা দাঁড়ায়—সুমু তাকে ভালোবাসবে, এবং—এবং মরবে!

ভালোবাসবে তাকে! বিকাশ চমকে চোখ মেলল। সুমু পাশ ফিরেছে। একটি শীর্ণ শাদা হাত বেরিয়ে এসেছে কম্বলের আড়াল থেকে। কী অদ্ভুত কোমল আর ছোট ছোট আঙুলগুলো, একটা চাপও সইবে না, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে একতাল মাখনের মতো গলে যাবে। এই চলন্ত ট্রেনে, এই ঘুমের ভেতর, মেয়েটাকে কী করুণ আর বিষণ্ণ লাগল!

'তুমি তা হলে কলকাতায় যাচ্ছ আমার সঙ্গে।'

বিকাশের মনে পড়ল, পরদিন সকালে তাকে চা দিতে এসে কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল সুমু।

'কেন?'

বিকাশ একটু আশ্চর্য হল: 'কেন, কাকা তোমাকে কিছু বলেননি?'

'না তো।'

'তা হলে পরে বলবেন। ডাক লাগিয়ে দেবেন তোমায়।'

বড়ো বড়ো চোখ মেলে সরল বিস্ময়ে সুমু তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'হঠাৎ আমি কেন কলকাতায় যাব বিকাশদা? কিছু বুঝতে পারছি না তো!'

'তোমার চোখ তো ট্রাবল দিচ্ছে কিছুদিন ধরে।'

'তা দিচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় পড়তে পারি না, মাথা ধরে, চোখ দিয়ে জল পড়ে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার কথা কেন বিকাশদা?'

বিকাশ হাসল।

'কেন, কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না তোমার?'

'করে, খুব করে।' সুমুর মুখে আলো পড়ল: 'খুব ছোট্ট বেলায় কেবল একবার গিয়েছিলুম, একটা দো-তলা বাসে চেপেছিলুম, তা ছাড়া আর কিছু মনে নেই আমার।'

'কী দেখবে কলকাতায় গিয়ে?'

তৎক্ষণাৎ, এক সেকেণ্ড দেরি না করে সুমু বললে, 'চিড়িয়াখানা।'

'চিড়িয়াখানা?' বিকাশ স্নিগ্ধ চোখে তাকালো: 'সে তো বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দেখতে যায়। তুমি তো বড়ো হয়ে গেছ, এখন ও-সব বাঘ-সিঙ্গি-হাতি-গণ্ডার দেখতে তোমার ভালো লাগবে?'

সুমু ফিক করে হাসল। তারপর ঘাড নেড়ে জানালো, তার ভালো লাগবে।

'আর সিনেমা?'

একটু রাঙা হল সুমুর মুখ। আর একবার ঘাড় নড়ল তার। তার মানে, সিনেমা দেখতেও ভালো লাগবে তার।

'আর?'

'প্ল্যানেটারিয়াম। আমাদের ক্লাসের মীরা দেখে এসেছে। বলেছে, একটা ঘরের ভেতর আকাশ—সেখানে চন্দ্র-সূর্য-তারা সব দেখা যায়।'

'আর কিছু দেখবার নেই?'

'কেন? কালীঘাটে যাব, দক্ষিণেশ্বরে।'

'আবার কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর কেন? ও-সব তো বুড়ো-বুড়ীদের জায়গা।'

সুমু আর হাসল না, আবার বড়ো বড়ো চোখ দুটো ভরে উঠল সরল বিস্ময়ে।

'বা-রে, ও তো মা-র মন্দির। বুড়ো-বুড়ীদের জায়গা কেন হবে? মা-র মন্দির দেখে আসব না?' সুমু দু হাত তুলে নমস্কার করল উদ্দেশে, তারপর বয়স্ক মানুষের মতো ভারিক্কি গলায় বললে, 'ছি বিকাশদা, মাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই, ওতে পাপ হয়।'

এই সুমু।

ট্রেন থামল। স্টেশন। ঘুম-জড়ানো গলায় কে যেন স্টেশনের নাম ডাকছে। কয়েকটি মানুষের ব্যতিব্যস্ত ওঠা-নামা। ঘণ্টি, হুইসেল। ট্রেনের চলা। লাইনের জোড় —একটু দোল খাওয়া, ঘটাং ঘটাং করে গোটা দুই শব্দ। তারপর আবার বাইরের মরা জ্যোৎস্নায়—আকারহীন একটা ভুতুড়ে পৃথিবীর মধ্য দিয়ে ছুটে চলা।

সেই মহিলাটি নড়ে উঠলেন। একবার চেয়ে দেখলেন বিকাশের দিকে। নিশ্বাস ফেললেন একটা, আবার চোখ বুজলেন। সন্দেহ নেই, ঘুমুতে পারছেন না।

কাঁচের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না, জোলো-কালিতে আঁকা গাছের সার, ধোঁয়াটে মাঠ, বিবর্ণ গরদের মতো আকাশের রঙ, এক-আধটা মরা তারা দেখা যায়, দেখা যায় না। ঘড়ির কাঁটায় রাত একটা চল্লিশ। ট্রেনটা কলকাতায় যাচ্ছে, অথবা কোথাও যাচ্ছে না। কিন্তু সুমুর কোনো ভাবনা নেই, সে ঘুমুচ্ছে।

চিড়িয়াখানা—সিনেমা—প্ল্যানেটারিয়াম—দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। আরো অনেক

বিস্ময়, অনেক রোমাঞ্চ, অনেক আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছে কলকাতা। তবু কলকাতা আসার ব্যাপারে কোথাও একটা খটকা ছিল মুনুর মনে।

'চোখ দেখাবার জন্যে কলকাতা কেন? এখানেই তো শচীন কাকা রয়েছেন।'

'শচীন কাকা কে?'

'চোখের ডাক্তার। সকলকে তো তিনিই চশমা দেন, লোকের দাঁত-টাঁতও বাঁধিয়ে দেন।'

'কিন্তু কাকা এখানকার কাউকে বিশ্বাস করেন না। তিনি বললেন, ওঁরা ভালো ডাক্তার নন।' কাকার বাকি মন্তব্যটুকু চেপে যাওয়া ভালো বলেই মনে হল বিকাশের। এখানকার ডাক্তারেরা চোখ পরীক্ষা করতে গিয়ে মানুষকে অন্ধ করে দিতে পারেন, এই তত্ত্বটুকু মুনুর না জানলেও চলবে।

মুনু চুপ করে রইল। বিকাশের মনে হল, কলকাতায় বেড়াতে আসবার আনন্দ যাই হোক, মুনু যেন জিনিসটাকে খুব সহজভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না।

আশ্চর্য শশাঙ্ক কাকার ভাগ্য—বিকাশ ভাবল। এই ছোট্ট মেয়েটা পর্যন্ত অবিশ্বাস করে তাঁকে, সন্দেহ করে। শশাঙ্ক কাকা যে উদার হতে পারেন, নিজের সন্তানের জন্যে ভাবতে পারেন, মেয়েকে গান-বাজনা শেখবার জন্যে একটা সেতার কিনে দিতে পারেন, তাঁর এই সততাটুকুও কারো কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না!

এবং খেতে বসবার সময়—

কাকিমা বরাবর কম কথা বলেন, প্রায় চোখেই পড়ে না তাঁকে, ছায়ায় ভরা এই বাড়িটায় ছায়ার মতো মিলিয়ে থাকেন সব সময়। তবু আজ ক্লান্ত চোখে বিকাশের দিকে তাকালেন।

'মেয়েটা ভারী সাদাসিদে, বাবা। ওকে কোথাও পাঠাতে আমার ভয় করে।'

'কোনো ভাবনা নেই কাকিমা, আমি তো আছি।'

'হ্যাঁ বাবা, তুমি আছো। সেইটেই আমার ভরসা। একটু ভালো করে দেখো। রাস্তায় যেন একা না বেরোয়, চারদিকে গাড়িঘোড়া—'

'কিছু চিন্তা করবেন না কাকিমা, আমি কলকাতায় নিয়ে গিয়েই মার কাছে জিম্মা করে দেব।'

আবার নিঃশ্বাস পড়ল কাকিমার।

'দু-তিনদিন বেড়িয়ে আসবে কলকাতা থেকে, সে তো ভালোই কিন্তু এখানকার শচীনবাবু তো নামকরা চোখের ডাক্তার, সবাই তো তাঁর কাছেই—

শশাঙ্ক কাকার চটির শব্দ পাওয়া গেল, বাড়ির ভেতর আসছেন। কাকিমা চুপ করে গেলেন।

মানুষ কী সুখে সংসার করে? ভাতের থালায় আঙুল শক্ত হয়ে গেল বিকাশের। না—কোনো সন্দেহ নেই, কাকিমাও শশাঙ্ক কাকাকে বিশ্বাস করেন না।

সেই একটা আচমকা চিৎকার—সেই গর্জন। 'আর একবার চেঁচাবি তো গলা টিপে—'

না—সুনুকে কলকাতায় না নিয়ে এলেই বোধ হয় ভালো হত।

তবু আসবার সময় রিকশায় চেপে সুনুর খুশিটুকু। ট্রেনে ওঠবার আনন্দ। অনেক রাত পর্যন্ত জানলায়—কাচে মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা। ছেলেমানুষি উত্তেজনায় জলজলে চোখ।

সুনু নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। এই ট্রেনটা—তার ভাগ্যের মতো এই রাত্রের গাড়িটা যদি শেষ পর্যন্ত কোথাও গিয়ে না পৌঁছোয়, তাতেই বা কী আসে-যায়। সুনুর কোনো ভাবনা নেই।

না—ট্রেনটা পৌঁছোক। ভোরের আলোয়, প্রথম-জাগা কলকাতায়। চিড়িয়াখানা-সিনেমা-প্ল্যানেটারিয়াম-দক্ষিণেশ্বর। সুনুর চোখ-মুখ আলোয় ভরে উঠুক। আলোর জন্যেই ও জন্মেছে, সেই আলো পড়ুক ওর প্রথম-ফোটা শরীরের পাপড়িতে পাপড়িতে। সুনু সুখী হোক। বিকাশ চোখ বুজল।

'মা—মাগো—'

সেই মহিলা। ঘুমুতে পারছেন না। কিন্তু সুনু ঘুমোক—নিশ্চিন্তে ঘুমোক।

মা চিঠি আগেই পেয়েছিলেন। ভারী খুশি হলেন সুনুকে দেখে।

'শশাঙ্ক ঠাকুরপোর মেয়ে? বাঃ দিব্যি মেয়েটি তো। এসো মা, এসো।'

আপাতত বিকাশের দায়মুক্তি। সুনু এখন মার চার্জে, অন্তত একটা দিন সুনুর সম্পর্কে তার করণীয় কিছু নেই। তার চেনা অপটিশিয়ান ডাক্তার সান্যাল—যিনি তাকে আর তার ছোট ভাই বিনয়কে চশমা দিয়েছেন, তিনি রবিবারে চেম্বারে বসেন না। অতএব কাল সকালে যেতে হবে তাঁর ওখানে।

সুতরাং—সুতরাং মনীষা।

চা খেতে খেতে হঠাৎ বিকাশ চমকে উঠল। সবচেয়ে দরকারী কথাগুলোই যেন কখন তার কাছে গৌণ হয়ে গেছে, প্রভাকরের চিঠি, একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে মনীষাকে ডাক্তার চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাওয়া, তার কাছ থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখিয়ে আনা—এগুলো এতক্ষণ সব চিন্তার এক পাশে চাপা পড়ে ছিল। অথচ এরই জন্যে সে ছুটি নিয়েছে, কলকাতায় এসেছে। আশ্চর্য!

না, ঠিক হচ্ছে না। সন্দিগ্ধভাবে বিকাশ নিজেকে প্রশ্ন করল: তা হলে তুমি যে

ভয়টা করছ তাই কি ঠিক ? মনীষাকে ঠকাচ্ছ, সরে আসছ তার কাছ থেকে, এই সরল শান্ত মেয়েটা—অচেনা বনের ভেতরে হরিণের মতো যে এখনো পৃথিবীর কিছুই চেনে না, যে তোমাকে সহজভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে, যার মা তোমার কাছে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন, তাঁদের সবাইকে ঠকাচ্ছ তুমি। তুমি জানো—মনীষা ছাড়া কাউকে তুমি বিয়ে করতে পারো না, কোনো অধিকারই নেই তোমার—অথচ এই মেয়েটাকে তুমি ধীরে ধীরে টেনে আনছ নিজের দিকে, বাঁধতে চাইছ যন্ত্রণার ফাঁদে, তারপর একদিন—

আধ-খাওয়া চায়ের পেয়ালা রেখে বিকাশ উঠে দাঁড়ালো।

মা বললেন, 'কী হল রে ?'

'একটা জরুরী কাজ পড়ে গেল মা। এখুনি বেরুতে হবে।'

সুমু তখন দোতলার বারান্দায় তারের খাঁচার ভেতরে নিবিষ্ট বিস্ময়ে এক ঝাঁক লাল-মুনিয়ার নাচানাচি দেখছিল। বিকাশকে দেখে শিশুর মতো কলধ্বনি তুলল।

'কী সুন্দর পাখিগুলো বিকাশদা! কোথায় বেরুচ্ছেন ? আমাকেও নিয়ে চলুন না—' উৎসাহিত হয়ে সে বিকাশের দিকে এগিয়ে এল।

'এখন নয়—', সিঁড়ি দিয়ে টক টক করে নীচে নেমে যেতে যেতে শীতল স্বরে বিকাশ বললে, 'এখন নয়।'

রেলিঙে ভর দিয়ে ক্ষুণ্নভাবে দাঁড়িয়ে রইল সুমু।

থাকুক দাঁড়িয়ে। এখন সোজা মোহনলাল স্ট্রীট।

কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হল না আর। কয়েক পা এগোতেই দেখা গেল, মনীষা আসছে। আজ আর কাঁধে ঝোলা নেই, কিন্তু সেই ক্লান্ত পা, সেই শুকনো মুখ, চুলগুলো রুক্ষ। একটা শাদামাটা শাড়িতে আরো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে মনীষাকে। বিকাশ থমকে গেল। মনে হল, এই দিন-পনেরোর মধ্যে যেন আরো শীর্ণ, আরো নিঃশেষিত হয়ে গেছে মনীষা।

মনীষা দাঁড়িয়ে পড়ল: 'তুমি!'

বিকাশ শুকনো স্বরে বললে, 'তুমি তো জানতে আজ আমি কলকাতায় আসব। আমার চিঠি পেয়েছ নিশ্চয়।'

'পেয়েছি।' মনীষা বললে, 'কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, বিকেলে তুমি আসবে।'

'সকালেই আসতে হল। অনেকগুলো জরুরি কাজ আছে তোমার সঙ্গে।'

মনীষা হাসল: 'হবে সে-সব। কিন্তু তার আগে বলো, শরীর কেমন আছে।'

'আমার শরীর খারাপ থাকবার কোনো কারণ নেই। তোমার কাছ থেকেই ও-খবরটা জানা দরকার।'

'তোমার পায়ের ব্যথাটা ?'

বিকাশ ধৈর্যচ্যুত হল : 'বুড়ো আঙুলের একটা চোট অনন্তকাল থাকে না। কিন্তু তোমার চেহারা এ-রকম কেন ?'

'আমি তো এই রকমই।'

'মণি, আজ আর পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। এবার আমি কলকাতায় বেড়াতে আসিনি, এসেছি সব কথা ঠিক করে নিতে। কিন্তু এ-ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা হবে না। বাড়িতে হোক, মোড়ের কফির দোকানে হোক—আমার সঙ্গে এখন ঘণ্টাখানেক বসতে হবে তোমায়।'

বিব্রত হয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো মনীষা।

'কিন্তু কথাগুলো বিকেলে হলে হয় না ? আমার টিউশন আছে।'

'অধঃপাতে যাক টিউশন।'

'অধঃপাতে গেলে তো হবে না—' ক্লান্তভাবে হাসল মনীষা : 'আর ক'দিন বাদেই মেয়েটার পরীক্ষা।'

'একদিন না পড়লে যদি ফেল করে তো করুক। তুমি চলো আমার সঙ্গে।'

'আমাকে তো মাইনে নিয়ে পড়াতে হয়—' মনীষার মুখে ছায়া পড়ল : 'নিজের একটা দায়িত্বও তো আছে। লক্ষ্মীটি, এখন পাগলামি কোরো না। এত জরুরি না হলে জ্বর গায়ে নিয়ে আমি বেরুতুম না।'

'জ্বর নিয়ে বেরিয়েছ !' এটা যে সদর রাস্তা সে-কথা ভুলে গিয়েই বিকাশ মনীষার হাত চেপে ধরল। রোগা হাতটায় জ্বরের স্পষ্ট উত্তাপ, বুড়ো আঙুলের নীচে দপ-দপ করছে দুর্বল নাড়ী।

মনীষা হাতটা টেনে নিলে তৎক্ষণাৎ।

'কী পাগলামি হচ্ছে রাস্তার ভেতরে !'

'বাড়ি ফিরে যাও মণি।'

'না।'

'এই জ্বর নিয়েই তুমি যাবে ?'

'মাঝে মাঝেই আমায় বেরুতে হয় এ-ভাবে। ও জ্বরে আমার কিছু হয় না। অভ্যেস হয়ে গেছে।'

বিকাশ হিংস্রভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল নিজের।

'একটা কথার জবাব দেবে মণি ?'

অস্বস্তিভরে হাতঘড়িটার দিকে চোখ নামালো মনীষা : 'কী বলবে, বলো।'

'তুমি আত্মহত্যা করতে চাও—না ? সেই জন্যেই বেশ নির্বিকার একটা

পথ বেছে নিয়েছ ?'

মনীষা একটু চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'বিকেলে এসো, তখন কথা হবে।'

'তা হোক। তার আগে দুটো জিনিস তোমাকে বলে রাখি। আজই আমি বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব—কাল সকাল-বিকেল যখন হোক, দেখাতে যেতে হবে তোমাকে। আর তোমাকে এখানকার চাকরি ছাড়তে হবে, আমি সামনের মাসেই নিয়ে যাব তোমাকে।'

মনীষা বিকাশের দিকে চেয়ে রইল। ম্লান চোখ দুটো একটু-একটু করে নিবে এল, তারপর ঘষা কাচের মতো ঝাপসা হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আবছা গলায় মনীষা বললে, 'বিকাশ, দরকার নেই, কিছুই দরকার নেই।'

'মানে ?' সদর রাস্তা না হলে বিকাশ প্রায় গলা ফাটিয়েই চিৎকার করে উঠত।

মনীষা তেমনি ঝাপসা গলায় বললে, 'বললুম তো বিকেলে এসো, তখন সব কথা হবে।'

একটা দানবিক শক্তিতে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল বিকাশ।

'ঠিক আছে, বিকেলেই আসব। কিন্তু মণি, এবার আমি সব মিটিয়ে দিতে এসেছি। আমি তোমাকে নিয়ে এবার ঘর বাঁধব। তা ছাড়া উপায় নেই আমার।'

মনীষার চোখ দুটো আস্তে আস্তে নিবে গেল একেবারে। যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এল সেখানে।

'আমি তো তোমাকে কতবার বলেছি, তুমি অন্য কোনো মেয়েকে—'

'মণি !'

'আচ্ছা—আচ্ছা—' জোর করে হাসতে চেষ্টা করল মনীষা : 'রাস্তায় এখন আর ঝগড়া নয়। বিকেলে তুমি তো আসছই। সব হিসেব-নিকেশ হবে তখন।'

'কিন্তু এখন এই অসুস্থ শরীর নিয়ে, জ্বর নিয়ে তুমি পড়াতে যাবেই ?'

'আমাকে যেতেই হবে লক্ষ্মীটি। জ্বরের জন্যে ভেবো না—ওটা একটু টেম্পারেচার মাত্র, ডাক্তার বলেছেন ওতে ভয়ের কিছু নেই।'

'কোন্ ডাক্তার বলেছে ? কোন্ রাস্কেল ? সে কি লেখাপড়া শিখেছে কোনোদিন ? তাকিয়ে দেখেছে তোমার মুখের দিকে ? তাকে পেলে আমি—'

'কী মুশকিল, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো! তুমি কি ডাক্তারের সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাবে নাকি এখন ? শোনো—রাস্তায় দাঁড়িয়ে খ্যাপামি করতে হবে না। সব বিকেলে হবে।'

'এখন এ-ভাবে তুমি পড়াতে যাবেই ?'

মনীষা চোখ নীচু করে রইল, জবাব দিল না।

'আমার কথা শুনবে না ?'

'মাপ করো আমাকে।'

বিকাশ তৎক্ষণাৎ উল্টো দিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার মোড়ে এসে এক-বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনীষা, তার সামনে যে ছায়াটা পড়েছে, যেন তারই মধ্যে মিশে গেছে সে।

এখনি—এই মুহূর্তে ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করা দরকার। মনীষা তার আত্মহত্যার ইচ্ছেটা পূর্ণ করবার আগেই।

কিন্তু দরকার সত্যিই ছিল না। মিথ্যেই ডাক্তার চৌধুরী বেলা সাড়ে আটটায় সময় দিয়েছিলেন। মিথ্যেই বলেছিলেন, 'প্রভাকর পাঠিয়েছে ? নিশ্চয়—নিশ্চয় ভালো করে দেখে দেব, কিছু ভাববেন না।'

কারণ, বিকেল পাঁচটায় আবার মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়িতে এসে কড়া নাড়তে দোর খুলে দিলে মনীষার ছোট ভাই।

'বিকাশদা, কবে এলেন ?'

'আজই। তোমার দিদি কোথায় ?'

'দিদি ?' বিস্ময়ের ছায়া ফুটল ছেলেটির কপালে : 'আপনি জানেন না ?'

'না তো।'

'দিদি তো হঠাৎ কী কাজে দুপুরবেলা চলে গেল বর্ধমানে। বলে গেল, অফিসের কী ব্যাপারে পাঠাচ্ছে, ফিরতে তিনদিন দেরি হবে।'

'ঠিকানা জানো বর্ধমানের ?'

'না—দিয়ে যায়নি।' ভাইটির গলায় দুশ্চিন্তা ফুটল : 'দিদি কখনো এ-ভাবে যায় না। তার ওপর গায়ে জ্বর নিয়ে—'

'আচ্ছা—'

বিকাশ চলতে শুরু করল।

'বসবেন না বিকাশদা ?'

'না।'

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে সে প্রভাকরের চিঠিটা বের করল পকেট থেকে। তারপর সেটাকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিতে লাগল শীত-মেশানো দক্ষিণের হাওয়ায়।

এই সহজ সত্যটা তার বুঝতে বাকি ছিল না যে মনীষা তার হাত এড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে!

বাইশ

মোহনলাল স্ট্রীট থেকে হাঁটতে হাঁটতে দেশবন্ধু পার্ক।

কিছুক্ষণ পার্কের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল রেলিং ধরে। সামনের বিবর্ণ আকাশে বেলা পড়ে আসছে। পাতা ঝরছে শুকনো হাওয়ায়। কাকের ডাকাডাকি শুরু হয়েছে ক্লান্ত গলায়। একটু দূরে তোলা-উনুনে একটা লোক চীনেবাদাম আর মটর ভাজছে, তার তপ্ত গন্ধ আসছে একটা। সামনে দিয়ে গাড়ির আনাগোনা। একটা কাটা-ঘুড়ির পেছনে ছুটন্ত ক'টি রাস্তার ছেলে। কোন্ কারখানার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা ছোট একটা মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল তাদের স্লোগান: 'জুলুমবাজি বন্ধ্ করো—বন্ধ্ করো—'

কাটা-কাটা ছবির মতো বয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। ফুটে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনো অর্থ নেই, কোনো ছাপ রাখছে না। সারা কলকাতাই এই রকম। অনেকগুলো ফিল্‌মের টুকরো একসঙ্গে জুড়ে একটা অবিচ্ছিন্ন প্রোজেক্‌শন। সব মিলে মানে হয় না, কোনো কিছুরই মানে হয় না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন হাঁটু টনটন করতে লাগল, তখন মনে হল, ছ-সাত বছর আগেও এমনিভাবে মনীষার জন্যে অপেক্ষা করত সে। কোনো নির্দিষ্ট বাস-স্টপে, কোনো সিনেমার সামনে, কোনো রাস্তার মোড়ে। এক-একদিন অনেক বেশি দেরি হয়ে যেত মনীষার। অধৈর্যে আর নিরাশায় মাথার ভেতরে যখন আগুন জ্বলছে, তখন দূর থেকে দেখা যেত বাসন্তী রঙের আঁচলটি। তখন ওই একটা রঙ নিয়মিত ব্যবহার করত মনীষা—এমন করে তার বেশে-বাসে নিরাসক্তির শুভ্রতা লাগেনি।

'বড্ড দেরি হয়ে গেল, না?'

'আজ না এলেই চলত।'

'খুব রাগ হয়েছে—কেমন? কিন্তু কী করব বলো। বাড়িতে একটা কাজে এমন আটকে যেতে হল, যে—'

'বাড়ির কাজটাই তোমার সব। আমি কেউ নই।'

'তোমাকে বাদ দিয়ে আমার কিছুই নেই। তবু বোঝো তো—'

বরাবর। বাড়ির দাবি, সংসারের দাবি। সব সময় আড়াল তৈরি করেছে, বাধা দিয়েছে। একটা অপচ্ছায়ার মতো চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

একটা ব্যর্থ দিনের স্মৃতি কাঁটার মতো এসে বিঁধল হৃৎপিণ্ডের ভেতর। তার আগের দিন ছেলেমানুষি খুশিতে মনীষা বলেছিল, তার মিল্ক চকোলেট খেতে ভালো লাগে।

দুটো চকোলেট নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল বিকাশ। চিররুগ্ন বাবার কী একটা অসুখের ঝঞ্ঝাটে মনীষা এসে আর পৌঁছোয়নি সেদিন। রাত ন'টার সময় চকোলেট দুটোকে রাস্তার আবর্জনার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বাড়ি ফিরেছিল।

চিরদিন। এক বাধা। এক শত্রু।

তারপর—কলেজের সীমা পেরোলে, পথে দেখার পালা শেষ হল। মনীষা ঢুকল চাকরিতে, অর্থাৎ তার নিজের ওপর জোর এল অনেকখানি। তখন বাড়িতে আসা-যাওয়া। দু'জনের সম্পর্কের চেহারাটাও অজানা ছিল না মনীষার মা-বাবার।

বিকাশ জানে, তাঁদের ভালো লাগেনি, অন্তত মনীষার বাবার কখনোই নয়। স্বার্থ, নিরঙ্কুশ স্বার্থ। তিনি নিজে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। ছেলেরা ছোট। তাঁদের এই মেয়েটির ওপর ভর দিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। সেখানে বিকাশ একেবারে দস্যুর মতো এসে পড়েছে। মেয়েটিকে যেদিন সে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সেদিন তাঁদের ভাতের গ্রাসেও টান পড়বে।

তবু কিছু বলবার নেই। তবু হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতে হয়। কারণ, রোজগেরে মেয়ের বন্ধুকে কিছু বেয়াড়া বলে ফেললে বিপদের ভয় আরো বেশি। এক টানেই ছিঁড়ে যেতে পারে শিকলটা।

এই টানা-পোড়েনের ভেতরেই কাটছিল বছরের পর বছর। দু'জনেই নিঃশব্দে মেনে নিচ্ছিল এই হেরে যাওয়াটাকে। মনীষা একটু একটু করে আরো কালো, আরো ক্লান্ত, আরো শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, আর বিকাশ কখনো রবীন্দ্রনাথের হরিপদ কেরানীর মতো ভাবত : 'ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য যাওয়া-আসা।' যেদিন থেকে মনীষার চাঁপা রঙের শাড়িটি নিরাসক্তির শুভ্রতায় হারিয়ে গেল, সেদিন থেকে সে-ও জানত, আর কিছুই নেই।

কিছুই নেই—শুধু দুটো সমান্তরাল রেখা।

পাশাপাশি বয়ে যাবে, কোনোদিন মিলবে না। আবার সেই রবীন্দ্রনাথেরই গান : 'আমি কেন তিথিডোরে বাঁধা রে, ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে!' একটা অন্ধকারের নদী চিরকাল আলাদা করে রাখবে দুজনকে।

সেই একটা শূন্যতা—নিরুপায় রোমান্টিকতা দিয়ে যার ফাঁকটাকে জোর করে ভরে দিতে হয়—তাই নিয়েই হয়তো আরো অনেক বছর কেটে যেত। কিন্তু বিকাশকে যেতে হল বাইরে। তাতেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নিয়োগীবাড়ি তার সমস্ত স্নায়ুগুলোকে যেন পিষে দিতে চাইল মুঠোর ভেতরে। হঠাৎ কোথা থেকে ফুটে উঠল স্বস্তু—স্বর্ণা—সোনালি।

তারপর—

তারপর বিকাশ বুঝল আর দেরি করা চলে না। তার নিজের জন্ম, মনীষার জন্ম। যখন নিজের মতো করে সব একটা গুছিয়ে নেবার আয়োজন করে এনেছে, তখন—একটা কথাও না বলে সরে গেল মনীষা।

যে আসবে না, তাকে জোর করে আনা যায় না ; যে-মন অনেকদিন আগেই নিভে গেছে, তাকে নতুন করে জ্বালাতে যাওয়া বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভালোবাসাও ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে মরে যায় একদিন। সেই মৃত্যুটা প্রথমে বুঝতে পারা যায় না—একটা অভ্যাস, নিছক অভ্যাস তার শবটাকে বয়ে বেড়ায় ; তখনো সেইসব কথারা আসে, সেইসব সঙ্গগুলো থাকে, তখনো স্বপ্নেরা মধ্যে মধ্যে আসে যায়। কিন্তু তারপর—কোনো উলঙ্গ জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক-বার যাচাই করলেই চোখে পড়ে—জীবনের পালা শেষ করে দিয়ে কবে যেন অভিনয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন মনে হয়—এইবারে যবনিকা ফেলে দেওয়া যাক, আর কেন !

সংসারকে ছেড়ে যেতে হবে, চলে যেতে হবে নতুন দায়িত্বের ভেতরে, যেতে হবে নতুনভাবে শুরু করতে—এই সত্যগুলো কঠিন হয়ে সামনে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনীষা সেই মৃত্যুটাকে চিনে নিয়েছে। অভিনয়ের জের টেনে বিপদের বোঝা আর সে বাড়াতে চাইল না। এই পুরোনো, একঘেয়ে, বিস্বাদ নাটকটাকে থামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মঞ্চের বাইরে। অতঃপর—

অতঃপর একটা কুৎসিত ক্লান্ত কলকাতা। দেশবন্ধু পার্কের ওপর ধোঁয়াটে সন্ধ্যা। শুকনো পাতা ঝরে যাচ্ছে এলোমেলো হাওয়ায়। সামনের রাস্তার মস্ত গর্তে হোঁচট খেয়ে একটা লক্কড় লরির হাড়পাঁজরাগুলো হাহাকার করে উঠল। বাতাসে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো উড়তে উড়তে এসে বিকাশের পায়ে জড়িয়ে নিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকল।

মনীষার নাটক না হয় শেষ হয়েছে, কিন্তু তারও ?

মাথার ভেতরটা ফাঁপা। কিছু ভাববার নেই, করবার নেই, জুতোর নীচে কতগুলো চীনেবাদামের খোলাকে মাড়িয়ে যেতে যেতে অদ্ভুত একটা ধর্ষকাম অনুভূতি জাগল তার। পথে দু-দিক থেকে দুটো গাড়ি আসছিল উদ্দাম বেগে—বিকাশ কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল শ্বাস বন্ধ করে, একটা কুটিল অভীপ্সা নিয়ে—এই দুটো গাড়িতে যদি মুখোমুখি কলিশন হয় এখন ?

হল না। দু-জোড়া ব্যাক-লাইটের রক্তাক্ত আলো দু'দিকে ছিটকে চলে গেল।

বিকাশ ঢুকল পার্কের ভেতর। এক জায়গায়—একটু আবছায়ার ভেতরে দুটি তরুণ-তরুণী অন্তরঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল, ইচ্ছে হল একটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারে ওদের

দিকে কিংবা কটু মন্তব্য করে একটা, কিংবা অশ্লীলভাবে শিস দিয়ে ওঠে একবার।

আর একটু এগিয়ে, পুকুরটার ধারে, একমুঠো মরা ঘাসের ওপর বসে পড়ল বিকাশ ঘাসটা নোংরা। কিন্তু ভালোবাসার প্রথম ঘোরের মতো একটা অস্পষ্ট অন্ধকার এখন—ঘাসের ওপর কোনো আবর্জনা চোখে পড়ছে না। বিকাশ আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

তখন মাথার ওপর তারা। ওদিকে নীল উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে বৃহস্পতি। কার যেন চোখের কথা মনে হয়। সুনুর?

বিকাশ জোর করে নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল। মনীষা—সুনু। সব সমান।

সব সমান। তবু দায়িত্ব নিয়ে আসতে হয়েছে। পরদিন সকালে সুনুকে নিয়ে যেতে হল অপ্‌টিসিয়ানের চেম্বারে। ডাক্তার দেখে বললেন, 'চশমা নিতে হবে। মাইনাস টু।'

'এত?'

'আরো আগে দেখানো উচিত ছিল।'

শশাঙ্ক কাকা দেখাননি। আনাড়ী ডাক্তারেরা চোখ নষ্ট করে দেবে—সেই ভয়ে।

বিকাশ তাকিয়ে দেখল সুনুর দিকে। জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে এক কোণায়। ছোট মেয়েটিকে একমুঠো দেখাচ্ছে এখন। আসবার সময় আপত্তি করেছিল।

'আমার ভয় করছে বিকাশদা।'

'ভয় কেন?'

কেন ভয় করছে, তার উত্তর এল: 'ভীষণ ভয় করছে।'

'কী আশ্চর্য! চোখের ডাক্তার কি তোমায় অপারেশন করবেন নাকি?'

সুনু চুপ। মা-ই ভরসা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত।

পথে আসবার সময় ট্রামে চুপ করে বসেছিল সুনু। চোখ পরীক্ষার সময় যখন ভেতরের ঘরটায় ডাক্তার তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন, তখন পা আর তার চলতে চায় না।

'বিকাশদা, আপনিও আসুন।'

'আমার চোখে তো একজোড়া চশমা রয়েছে সুনু। আবার চশমা নিলে কোথায় পরব?'

তারপর চোখ দেখা হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন: মাইনাস টু। আরো আগে দেখানো উচিত ছিল।

'সুনু, তোমাকে চশমা পরতে হবে।'

সুনু নার্ভাসভাবে বিকাশের দিকে তাকালো।

বিকাশ বললে, 'তারপর তোমাকে ভীষণ গম্ভীর আর ভারিক্কি দেখাবে।'

এতক্ষণে একটুখানি হাসি ফুটল সুনুর মুখে: 'ধ্যেৎ!'

ডাক্তার বললেন, 'চশমা করে দেব তা হলে ?'

'নিশ্চয়।'

'পরশু কিন্তু ওকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

'কালকেই রেডি করে দেব—' ডাক্তার ফ্রেমের বাক্সগুলো নামিয়ে এগিয়ে দিলেন স্নুর দিকে : 'নাও, পছন্দ করো।'

স্নু আবার বিব্রতভাবে বিকাশের দিকে তাকালো। বিকাশ হেসে বললে, 'ওকে দিয়ে হবে না। দিন, আমি দেখছি।'

একটা ফ্রেম চোখে পরে, আয়নার দিকে তাকিয়েই খিলখিল করে হেসে ফেলল স্নু।

'এ মা, কিরকম দেখাচ্ছে আমাকে।'

'ঠিক তোমাদের স্কুলের বড়দির মতো। এরপর থেকে আমি তোমাকে আপনি বলে ডাকব।'

আবার হাসির ঝঙ্কার। বাইরে থেকে একটা হাওয়ার জোয়ার এসেছিল ঘরে, বিকাশের মনে হল, কলকাতায় বসন্ত আসতে আর দেরি নেই। স্নুর হাসিতে তার খবরটা নিশ্চিতভাবে পৌঁছে গেল এবার।

কালকে দেশবন্ধু পার্কের সন্ধ্যাটা এখন কোথাও ছিল না। এখন সকালের আলোয় কলকাতা ঝকঝক করছিল।

চশমার পাট মিটিয়ে পথে নামল দুজন।

বিকাশ বললে, 'এখনো ভয় করছে ?'

স্নু হাসল : 'না।'

'কিন্তু চশমা চোখে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাবে, তখন ?'

'সবাই ঠাট্টা করবে।'

'কেউ করবে না—ভীষণ খাতির করবে তোমাকে। আর যদি কেউ ঠাট্টা করতে আসে, তখন চশমাটা তুলে—তার তলা দিয়ে একটুখানি কটমট করে তাকাবে। দেখবে, কী দারুণ ভয় পাবে সবাই।'

স্নু আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

'বা রে, আপনি কী করে জানলেন ?'

'কেন, আমিও তো চশমা পরি।'

'তা নয়। আমাদের সংস্কৃত দিদিমণি কাউকে বকবার আগে ঠিক অমনি করে তাকায়।'

'এবার থেকে তুমিও ওইভাবে সংস্কৃত দিদিমণির দিকে তাকিয়ো। তা হলে আর বকবার সাহসই পাবেন না।'

'বাঃ!'

স্বস্থ সহজ, স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। নিয়োগীবাড়ির বাইরে এসে, এই কলকাতার মুক্তিতে, এই আলো-বাতাসের ভেতরে। এখানে মৃত্যুর সাধনা করে মনীষা, আর—

মনীষাকে মনে পড়ল বিশ্রী বেসুরোভাবে। এতক্ষণ একটা স্নিগ্ধ মধুরতার আবরণ তৈরী হয়েছিল, এই মেয়েটি বসন্তের প্রসন্নতা বইয়ে দিয়েছিল চারদিকে, জীবনের কাঁটা-গুলোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ কালকের যন্ত্রণা একটা তীরের ফলার মতো হৃৎপিণ্ডে সজাগ হয়ে উঠল।

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। স্বস্থ বললে, 'কী হল বিকাশদা?'

'কিছু না। চলো—আর একটা কাজ আছে।'

'আবার ডাক্তার না তো?' ভয় চকচক করে উঠল স্বস্থর চোখের তারায়।

এই মেয়েটি, সরল এই ছোট্ট মেয়েটি সেই কঠিন যন্ত্রণাটাকেও মধ্যে মধ্যে ভুলিয়ে দিতে পারে। বিকাশ হাসতে চেষ্টা করল।

'না, আর ডাক্তার নয়। এবার তোমার সেই সেতারটা।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'সেতারটা দেবে আজকে?'

'সেইরকমই তো কথা আছে। আমি চিঠি দিয়েছিলুম।'

'কী মজা!' আনন্দে হাততালি দিল স্বস্থ: 'আপনি আমাকে বাজাতে শেখাবেন?'

'নিশ্চয়। আমি ছাড়া আর কে শেখাবে।'

'কী মজা!'

বিকাশ একটা ট্যাক্সি ডাকল।

গাড়ি চলতে লাগল ধর্মতলার দিকে। স্বস্থ এইবার অনর্গল কথা বলছে খুশিতে। কলকাতা ভালো, ভীষণ ভালো। আমরা কালকে চিড়িয়াখানায় যাব—না? একটা বায়োস্কোপ দেখব যে। আজ সন্ধ্যায়? আচ্ছা। জেঠিমা যাবেন না? আমি জোর করে নিয়ে যাব। প্ল্যানেটারিয়াম কাল হবে? আর দক্ষিণেশ্বর? পরশু? কিন্তু পরশু রাতেই বুঝি ফিরে যেতে হবে? আমার এত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না বিকাশদা। কত দেখবার জিনিস আছে কলকাতায়। কলকাতা কী ভালো, কী ভীষণ ভালো।

কিন্তু কলকাতাও কাউকে কাউকে ক্লান্ত করে। কলকাতাও একটু একটু করে কাউকে কাউকে শুষে নেয়। কলকাতা দস্যুর মতো মুঠো বাড়ায় কারো কারো দিকে। কেউ কেউ তখন ছুটে পালায় বর্ধমানে—একটা ঠিকানা পর্যন্ত রেখে যায় না।

আবার বিস্বাদ যন্ত্রণা। আবার কালকের সন্ধ্যাটা। এই কলকাতায় স্বস্থকে থাকতে হলে একদিন হয়তো তারও চোখের রঙ মুছে যাবে, এই শহরের সব জীর্ণতা ধীরে ধীরে

প্রবেশ করবে তার রক্তে, সেও একটা ধূসর শূন্যতার মধ্যে ডুবে যেতে থাকবে দিনের পর দিন। তখন—

'আমি কলকাতায় চলে আসব বিকাশদা।'

বিকাশ চমকে উঠল: 'অ্যাঁ ?'

'আমি হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে কলকাতার কলেজে পড়ব বিকাশদা। আপনি বাবাকে বললে বাবা ঠিক রাজী হয়ে যাবে।'

অতখানি বিশ্বাস শশাঙ্ক কাকাকে করা যায় ? কিন্তু এই খুশি আর উচ্ছলতার মুহূর্তে সুন্দর স্বপ্নটাকে আঘাত করতে ইচ্ছে করল না।

অন্যমনস্ক গলায় বিকাশ বললে, 'আচ্ছা।'

রাত্রে খাওয়ার পর মা এলেন বিকাশের ঘরে।

'তোর শরীরটা কিন্তু একটু শুকিয়ে গেছে বুবু।'

বুবু বিকাশের ছেলেবেলার ডাক-নাম। ও-নামে কেউ আর ডাকে না এখন—কেবল মা ছাড়া। মনীষা আগে ঠাট্টা করত। 'বুবু! শুনলেই মনে হয় ছোট্ট খোকাটি মুখে একটা ফাড়িং বট্‌ল।'

মনীষাকে মন থেকে কিছুতেই সরিয়ে দেওয়া যায় না। সে পালা মিটিয়ে দিয়ে স্টেজের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু বিকাশের মুক্তি আসছে না কিছুতেই। রাগ করে নয়, অভিমান করে নয়—কিছুতেই নিস্তার মিলছে না যন্ত্রণার কাছ থেকে।

মা বললেন, 'কিরে, কথা বলছিস না যে ?'

লজ্জিত হয়ে বিকাশ বললে, 'কিছু বলছিলে ? শুনতে পাইনি।'

একটু চুপ করে মা ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'তোর মনটা ভালো নেই, না রে বুবু ?'

বিকাশ হাসল: 'কী আশ্চর্য, মন ভালো থাকবে না কেন ? কে বলেছে তোমাকে ও-সব কথা ?'

'কেউ বলেনি। তোর চেহারাটা যেন কেমন লাগছে।'

'তোমার মন-গড়া দুশ্চিন্তা, মা। কিছু ভেবো না, আমি খাসা আছি।'

আবার একটু চুপ করে থাকলেন মা।

'একটা কথা বলব বাবা ?'

মার বলার ভঙ্গিতে অস্বস্তি বোধ হল।

'কী ?'

'এবার তুই বিয়ে কর্।'

জ্বলে উঠল বুকের ভেতর। সে তো চেয়েইছিল। কিন্তু মনীষা সরে দাঁড়িয়েছে।

সে-কথা মাকে বলা যায় না।

মা আস্তে আস্তে বললেন, 'তুই মণির জন্যে অপেক্ষা করে আছিস। আমি জানি।'

জ্বালাটা বাড়ছে। মার না জানবার কথা নয়। মনীষা অনেকবার এসেছে বাড়িতে। গরীবের সংসারে এই কালো মেয়েটিকে মার যে খুব পছন্দ ছিল তা নয়। কিন্তু ছেলের মন বুঝে নিঃশব্দেই মেনে নিয়েছিলেন।

যে-কথাটা বিকাশের বলবার ছিল, সেইটিই বেরিয়ে এল মার মুখ দিয়ে।

'মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছিস বাবা। মণি বিয়ে করবে না।'

'মা!' চেয়ার ছেড়ে বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিষণ্ণভাবে মা বললেন, 'এই তো সেদিন যাচ্ছিলুম কালীঘাটে। পথে দেখা। বললুম, একি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তোমার—চেনা যায় না যে! অসুখ নাকি? উত্তরে বললে, আমায় কিছু বলবেন না—এখন তাড়াতাড়ি মরতে পারলেই বাঁচি। ও বিয়ে করবে না খোকা, কক্ষনো না।'

কথা বলা যাচ্ছিল না, যেন দম আটকে আসছিল। ধরা গলায় বিকাশ বললে, 'এসব থাক মা।'

'কিন্তু তোর জন্যে তো আমায় ভাবতে হয়, বুবু।'

'আমার জন্যে ভেবো না মা, বেশ আছি আমি।'

বাইরের বারান্দায় কলকূজন শোনা গেল। সুষু আর বিনু কথা বলছে। আলোচনাটা চলছে প্ল্যানেটারিয়াম নিয়ে। মুগ্ধ সুষুকে এম. এস-সি.র ছাত্র বিনু অ্যাস্ট্রনমির রহস্য বোঝাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। উল্লসিত হয়ে উঠেছে সুষু: 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখেছি স্যাটার্নকে। ওই-ই তো শনি।'

'শনির রিংটা—মানে—সায়েন্সে ওকে—'

গম্ভীর হয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছে বিনু।

মা আস্তে আস্তে বললেন, 'শশাঙ্ক ঠাকুরপোর এই মেয়েটি কিন্তু বেশ। দেখতেও ভালো—স্বভাবেও ভারী লক্ষ্মী।'

বিকাশ আর একবার চকিত হল। মা কোনো আভাস দিতে চাইছেন নাকি?

কিন্তু মেজদার কথায় রক্তে যে ঢেউ উঠেছিল, সেটা এখন আর জাগল না। এখন সমস্ত বুকের ওপর একটা পাথরের মতো জমাট হয়ে রয়েছে মনীষা। তার পাণ্ডুর মুখ, তার গায়ের টেম্পারেচার, তার ক্লান্তি—সব এসে বিকাশকে আচ্ছন্ন করছিল এখন। মনীষা বর্ধমানে চলে গেছে। মরবার আগে বুনো জন্তুরা দল ছেড়ে চলে যায়—কোনো একটা নিভৃত মরণের কেন্দ্রের দিকে নিঃসঙ্গ শিথিল পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে, তেমনি করেই কি চলে গেল মনীষা? আর একটা স্বার্থপর লোলুপতা নিয়ে এখন সে সুষুকে ঘিরে ঘিরে স্বপ্ন

গড়তে চাইছে ?

বিকাশ হঠাৎ অধৈর্য স্বরে বললে, 'এখন আর কিছু ভালো লাগছে না মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

মা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে তখনো গ্রহ-নক্ষত্রের আলোচনা চলছে সুমু আর বিনয়ের মধ্যে। মা একবার চেয়ে দেখলেন সুমুর দিকে। শান্ত সৌন্দর্যে টুকটুক করছে মুখখানা।

তারও আগে—তারও অনেক আগে মা সুমুর চোখের দৃষ্টি দেখেছিলেন। সে-দৃষ্টি বুঝতে মার ভুল হয়নি। এই ছেলেমানুষ মেয়েটা বিকাশকে ভালোবাসে।

মার নিশ্বাস পড়ল একটা।

সুমু বললে, 'জেঠিমা!'

মা থেমে দাঁড়ালেন।

'কাল আমরা দক্ষিণেশ্বর যাব কিন্তু। আপনি যাবেন তো ?'

মা হাসলেন : 'যেতে হবে বৈকি।'

'কিন্তু বিনুদা যেতে চায় না। বলে, ও-সব মানে না। এ-সব বললে পাপ হয় না জেঠিমা ?'

মা সস্নেহে বললেন, 'হয়। কিন্তু এরা সব এ-কালের ছেলেমেয়ে, পাপে ওদের ভয় নেই।'

'নেই বুঝি ? কিন্তু বিনুদা তুমি যে ঠাকুরকে মানছ না, দেখো পরীক্ষার সময় কী হয়।'

'ফেল করব ?' বিনু হেসে উঠল। হেসে উঠল সুমুও।

বিকাশের ঘরের দরজাটা শব্দ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। এত জোর আওয়াজটা এল বারান্দায়, এই তিনজনই চমকে উঠল একসঙ্গে।

বিষাক্ত জর্জরিত স্নায়ু নিয়ে বিকাশ বাইরে হাসি-জীবন-উচ্ছলতাকে আর সইতে পারছিল না।

তেইশ

বাকী ছিল দক্ষিণেশ্বর, দেখা হয়ে গেল। সেখান থেকে বেলুড়। সুমুর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, মেয়েটা যেন নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না এখনো।

মা সঙ্গেই ছিলেন। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, প্ল্যানেটারিয়াম—এ-সবে তাঁর আকর্ষণ নেই। সুমুকে যে বাংলা ছবিটা বিকাশ দেখিয়ে আনল, তাতেও না। কিন্তু বেলুড়-

দক্ষিণেশ্বর তিনি এড়াতে পারলেন না, কতদিন তো দেখা হয় না এ-সব।

শুধু থিয়েটারটাই আর হয়ে উঠল না এবার। সময় পাওয়া গেল না।

সুমুর ক্ষুণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বিকাশ বললে, 'বেশ তো পরের বারে হবে।'

নিশ্বাস ফেলল সুমু।

'আর পরের বার! বাবা আমাকে আর আসতেই দেবে না কখনো।'

'ঠিক দেবেন। আমি গিয়ে নিয়ে আসব সঙ্গে করে।'

বিশ্বাস করল কিনা কে জানে, ভরসা পেলো না অন্তত। চুপ করে রইল একটু। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'কাল ফিরে যেতেই হবে, না বিকাশদা?'

'আমার ছুটি নেই আর।'

সুমু উঠে গিয়ে দাঁড়ালো জানলার সামনে। শীতমেশানো দক্ষিণের হাওয়ায় বাইরের একটা কাঠ-মল্লিকার গাছ মাতলামো করছে। কলকাতা জুড়ে রাত্রির আলো। সন্ধ্যের দম আটকানো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সরে গিয়ে এখন তারার আকাশ। বিকাশ নিঃশব্দে দেখছিল সুমুকে। কালকেই আবার নিয়োগীবাড়ির জেলখানায় ফিরে যেতে হবে, এই কথাটাই এখন ভাবতে চাইছে না মেয়েটা।

সুমু কলকাতায় থাকতে চায়। আর কলকাতা অসহ্য হয় মনীষার। ছুটে পালাতে হয় তাকে।

কিন্তু মনীষা নয়। দাঁতে দাঁত চেপে বিকাশ ভাবল, মনীষা নয়। কী হবে তার কথা ভেবে, যে নিজেই সব হঠাৎ মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল? একটা তিক্ত আক্রোশে একবার ভেবেছিল কাল সকালে আর একবার যাবে মোহনলাল স্ট্রীটে। মনীষা ফিরুক আর নাই ফিরুক—ফিরবে না তা নিশ্চিত—অন্তত এক টুকরো চিঠি লিখে আসবে তাকে। সোজা বাংলায় জানতে চাইবে: অফিসের কাজে চলে যেতে হল, অথবা এড়িয়ে যাওয়ার দরকার ছিল বিকাশকে? যদি সব মিটিয়ে দেবার কথাই ভেবে ছিল, তা হলে সেটা অনায়াসেই মুখ ফুটে বলা যেতে পারত, এই রকম একটা ছেলেমানুষ লুকোচুরির কোনো দরকার তো ছিল না।

লুকোচুরি? তাই কি?

মনীষা কি বার বার বলতে চায়নি তাকে? বলেনি, তুমি আর কোনো মেয়েকে বিয়ে করো, সুখী হও? বলেনি, আমার উপায় নেই—বাবা-মা-ভাইবোনকে স্বার্থপরের মতো অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি নিজের সুখের কথা ভাবতে পারব না?

মোহ তারই কাটছিল না। সে-ই ছুটছিল আলেয়ার পেছনে। ভালো হল, এই ভালো হল সবচাইতে। একটা শক্ত ঘা দিয়ে মনীষা তার ঘোর ভেঙে দিয়েছে।

বিকাশ নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। ডাকল, 'সুমু!'

স্বস্থু ফিরে তাকালো। চোখ দুটো অন্যমনস্ক। বাইরে কলকাতার আলো আর আকাশভরা তারা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বিকাশ বললে, 'চশমা পরোনি যে?'

'ও—চশমা।' স্বস্থু একটু হাসল: 'ভুলে গেছি।'

'না পরলে অভ্যাস হবে কী করে?'

'ভারী বিশ্রী লাগছে। কান ব্যথা করছে। আর—' ছেলেমানুষী লজ্জায় ভরে উঠল মুখটা: 'কি রকম যেন প্যাঁচার মতোই দেখায়।'

বলেই হেসে উঠল।

'মোটেই প্যাঁচার মতো নয়। সুন্দর মানিয়েছে। যাও, পরে এসো। ডাক্তার সব সময়ে পরে থাকতে বলেছে।'

'বাড়িতে গেলে সবাই হাসবে।'

'কেউ হাসবে না। দারুণ রাশভারী লাগবে তোমাকে।'

'যাঃ।'

'যাও, পরে এসো। আর নিয়ে এসো সেতারটা।'

চশমায় আপত্তি ছিল, কিন্তু সেতারের কথায় আলো হয়ে উঠল দৃষ্টি।

'সত্যি আনব সেতার?'

'নিশ্চয়।'

'কিন্তু এখানে—' একটু অস্বস্তি বোধ করল স্বস্থু: 'জেঠিমা আছেন, বিনয়দা রয়েছে, ভারী লজ্জা করবে যে আমার।'

'লজ্জার কিছু নেই। বিনয়ের অবশ্য গান-বাজনা আসে না, পড়া আর ক্রিকেট ছাড়া আর কিছুতে মনও নেই ওর, কিন্তু আমার মাও সেতার বাজাতেন। মার ঘরে একটু তাকিয়ে দেখো, দেওয়ালে এখনো টাঙানো আছে সেতারটা।'

'সত্যি? জেঠিমাও বাজাতে পারেন?'

'বাজাতেন। বাবা চলে যাওয়ার পরে ছেড়ে দিয়েছেন।'

একটু ছায়া নামল ঘরে। কয়েক সেকেণ্ডের বিষণ্ণতা। বিকাশ আবার বললে, 'আনো সেতারটা, একটু পাঠ দিয়ে দিই আজকেই।'

স্বস্থু সেতার নিয়ে এল।

এই ভালো, বিকাশ ভাবছিলো, এই ভালো। মনীষা নেই, কোথাও ছিল না। জীবনটার কোনো লক্ষ্য নেই, কেবল একটা দিন থেকে আর একটা দিনে এগিয়ে যাওয়া। চাকরি করা, মাইনে পাওয়া, পদোন্নতির কথা ভাবা, সামাজিকতার সঙ্গে সায় দিয়ে যাওয়া; কখনো খুশি হওয়া, কখনো খানিকটা বিষাদের মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়া, কখনো কিছুই না—

একটা বিবর্ণ শূন্যতার ভেতরে ডুবে যাওয়া—যেমন করে অ্যানাস্থেশিয়ার প্রভাবে সব মুছে যেতে থাকে নির্ভার একটা নিশ্চেতনার ভেতরে। একটা দিন থেকে আর একটা দিনে এগিয়ে যাওয়াই জীবন। আর যে-সব সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা-আসক্তি দিয়ে এইসব দিনগুলো গাঁথা হয়ে যায়, তাদের কোনো অর্থ ই নেই।

অতএব সব একাকার। মনীষার চলে যাওয়াতেও যেমন কোথাও কিছু যায় আসে না, তেমনি সুমুকে সেতার শেখালেও কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। আজ সন্ধ্যায় সেতার বাজবে, কাল সন্ধ্যায় একটা ট্রেন থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বিরক্তিকর গতিতে এগিয়ে চলবে, পরশু সন্ধ্যায় নিয়োগী-বাড়ির জীর্ণ সোঁদা গন্ধের ওপর মশার হিংস্র গর্জন বাজবে, পোড়ো মহলে পায়রা ডানা ঝাপটাবে, মেজদা প্রেতের মতো চ্যাঁচাতে থাকবে। বাইরে থেকে এদের চেহারা আলাদা, কিন্তু তলিয়ে ভাবলে সব এক, সব অসঙ্গত, অসংলগ্ন অর্থ-হীনতার সুতোয় গাঁথা।

সুতরাং এই সন্ধ্যায় সুমুই থাকুক। বিনয় প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস করে এখনো ফেরেনি, মা রান্নাঘরে। সুমুই থাকুক এখন।

'এমনি করে ধরতে হয়, মেরজাপ পরে নাও আঙুলে, এইবারে সারগম—আচ্ছা আমি আগে দেখিয়ে দিই—'

হাতে হাত ঠেকেছে, আঙুল ঠিক করে দিতে হচ্ছে, শরীরের স্পর্শ ঘন হচ্ছে। মেজদা কী বলেছিল? ননসেন্স, কোনো মানেই হয় না পাগলের কথার। হ্যাঁ, এই হয়েছে—ঠিক হয়েছে। এখান থেকে সা-রে-গা-মা—এই কড়ি, এই কোমল—জানো এগুলো? বাঃ—বাঃ লক্ষ্মী মেয়ে—'

একটু চেষ্টা করে সুমু নামিয়ে রাখল সেতারটা। এই ঠাণ্ডা দিনেও কপালে কয়েক ফোঁটা ঘাম। মুখ রাঙা।

'আজ থাক বিকাশদা।'

'কেন?'

'ভয় হচ্ছে। আমি পারব না।'

'পারবে না কেন? বেশ তো হচ্ছিল।'

'তা ছাড়া ভীষণ লাগছে আঙুলে।'

'মেরজাপ? প্রথম প্রথম লাগে খুব, কেটে বসতে চায়। আস্তে আস্তে কড়া পড়লে ঠিক হয়ে যায় তার পরে। আচ্ছা, ছেড়ে দাও এখন। পরে হবে আবার।'

মেরজাপটা খুলে ফেলল সুমু। ছোট্ট শাদা আঙুলটিতে চোখ পড়ল বিকাশের। লাল হয়ে গেছে আঙুলের ডগা। একটা নিষ্ঠুর আরক্তিম বৃত্ত যেন কেটে বসেছে মাংসের ভেতর।

'ঈস্‌—অনেকটা বসে গেছে তো!'

কিছু ভাবেনি, কোনো ভাবনা ছিল না, একটা দিন কেবল অন্ধের মতো আর একটা দিনের দিকে এগিয়ে যায়, স্বস্নু-মনীষা—মা-চাকরি-জীবন—কোথাও কোনো কিছুর মানে হয় না, এই নির্বেদ থেকেই বিকাশ স্বস্নুর হাতটা তুলে নিয়েছিল মুঠোর ভেতর, তারপর আঙুলটার সেই দাগের ওপর নিজের আঙুল বুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কী থেকে কী হয়ে গেল, স্বস্নুর সমস্ত শরীরটা যেন শিথিল হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে, বুজে এল চোখ, মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বিকাশের বুকের ওপর।

সব নির্বেদ, সব শূন্যতার দর্শনের ধোঁয়াটে আকাশ ছিঁড়ে পর পর তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বইল কয়েকটা। ঝনঝন করে উঠল রক্ত। আচ্ছন্ন করে ধরল লোভ, স্বস্নুর শরীরটাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরবার আগেই—

আগেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো বিকাশ। একটা ছোট্ট ধাক্কা লাগল স্বস্নুর।

চমকে, যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল স্বস্নু। মনে হল, চশমার আড়ালে তার চোখ-দুটো কোথায় মুছে গেছে।

বিকাশ খাট থেকে নেমে পড়ল মাটিতে। স্বস্নুর দিকে না তাকিয়ে, পায়ে চটিটা গলিয়ে নিয়ে বললে, 'একটু ঘুরে আসছি আমি, একটা জরুরি কাজ আছে আমার।'

একবার রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া দরকার—নিজের কাছ থেকে পালানো দরকার—যেদিকে চোখ যায়, এলোমেলো বিশৃঙ্খল পায়ে হেঁটে আসা দরকার।

আর সন্দেহ নেই, নিজের কাছে নগ্ন হয়ে গেছে। স্বস্নুর কাছেও।

কখনো স্বস্নুকে দেখেনি। কিন্তু প্রিমোনিশন? একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি? তাই এমন করে সরে গেছে মনীষা? তাই মা—

না, অসম্ভব। নিজেকে এ-ভাবে ছোট করা যায় না।

প্রথমেই দেখা হয়ে গিয়েছিল বুড়ো—অর্থাৎ মিতাক্ষতুমার নিয়োগীর সঙ্গে। সে বাইরে একটা ছাগল-ছানার পেছনে ছুটোছুটি করছিল, দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই তার দারুণ চিৎকার।

'মা—মা—মেজদি চশমা পরে এসেছে।'

স্বস্নু সঙ্গে সঙ্গে চশমা খুলে ফেলল লজ্জায়।

'দেখলেন তো কী কাণ্ড!'

'কাণ্ডের তো কিছু নেই, এই জন্যেই তো তুমি কলকাতা গিয়েছিলে।'

বুড়োর ডাকে কাকা বেরুলেন, কাকিমা বেরুলেন, বুড়োর ছোটদি—শীতে মুখ ফাটা-ফাটা এখনো—বিনি, অর্থাৎ অপর্ণা বেরুল। তারপর নানাভাবে অভ্যর্থনা।

বিনি বললে, 'এ মা, দিদি তুই বুড়ো মানুষের মতো চশমা পরবি?'

শশাঙ্ক বললেন, 'বাঃ বাঃ, সঙ্গে সঙ্গে চশমা দিয়ে দিলে? দেখলে তো, এরই নাম কলকাতা। আর এরা? অ্যাট্রোপিন দাও, চব্বিশ ঘণ্টা পরে আবার পরীক্ষা হবে, যত সব হাতুড়ে!'

কাকিমা স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ চোখে তাকালেন বিকাশের দিকে।

'মেয়েটাকে তুমি বাঁচালে বাবা। রাত্রে পড়াশুনা করতে পারত না, ভারী কষ্ট পাচ্ছিল।'

নিজের ভেতরে একরাশ গ্লানি বয়ে বিকাশ চুপ করে রইল। কৃতজ্ঞতা! কৃতজ্ঞতা সে দাবি করতে পারে এই পরিবারের কাছে? যে রাত্রে সে বলেছিল, 'তোমাকে ভুলব না সুমু, তোমাকে ভোলা যায় না—' সেই রাত্রেই এদের আতিথেয়তাকে সে কালো করে দিয়েছে কৃতঘ্নতায়। তারপর কলকাতায়—! কী দরকার ছিল সুমুর কাছে অত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবার, সেতার বাজাতে গেলে অমন করে প্রথম প্রথম আঙুলে দাগ পড়েই, তার জন্যে হাতখানাকে আঁকড়ে ধরে ওভাবে পরিচর্যা না করলে কী ক্ষতি হত তার? চিড়িয়াখানা থেকে ফেরবার পথে সুমুর কাছে অত ঘেঁষে থাকবার কী দরকার ছিল, যখন ট্যাক্সিতে খালি ছিল অনেকখানি জায়গা?

তুমি—তুমি বিষ ঢুকিয়েছ মেয়েটার মনে। তার জীবনের প্রথম চেতনায় যখন সব নতুন ফুলের মতো পাপড়ি মেলছিল, তখন একটা কীট ছেড়ে দিয়েছ তার ওপরে। কাল ট্রেনে কথা বলবার সুযোগ ছিল, যাওয়ার রাত্রিটার মতো অনেক প্রগল্‌ভতার সুযোগ ছিল সুমুর, কিন্তু সারাক্ষণ, প্রায় চুপ করে বসে থেকেছে। সে রাতে অসুস্থ সন্তানের ভাবনায় যে মার সমস্ত প্রহরগুলো জেগে কেটেছে, তার মতো সুমুও কাল ঘুমোয়নি, শোওয়ার জায়গা পেয়েও উঠে বসেছে বার বার—জানলা দিয়ে চোখ মেলে রেখেছে বাইরের দিকে, নামিয়ে নিয়েছে দৃষ্টি।

সুমুর দোষ নেই। তারই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল অনেক আগে।

মনীষা আসবে না, তবু এ বাড়ি তাকে ছেড়ে যেতে হবে। আজকালের মধ্যেই কানাইবাবুর সঙ্গে তার দেখা করা দরকার।

একটু পরে সুমু নয়, কাকিমাই চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলেন শশাঙ্ক কাকা। তাঁর হাতে নিজের পেয়ালাটি। এসে তাকিয়ে দেখলেন চারদিক।

'এই কোণার ঘরটায় তোমার অসুবিধা হয় বাবাজী?'

এই দেড় মাস পরে ভদ্রতাটা অসঙ্গত ঠেকল। সেই সঙ্গে মনে পড়ল, এ বাড়িতে আসবার প্রথম দিনটির পরে তার এই ঘরটিতে কাকার পায়ের ধুলো পড়েনি কোনোদিন।

'অসুবিধে কেন হবে কাকা? বেশ তো আছি।'

কাকা চেয়ারটাতে বসে পড়েছিলেন। আবার পর্যবেক্ষণ করলেন চারদিক।

'এদিকের দেওয়ালে ফের নোনা লেগেছে দেখছি। বাড়িটা নিয়ে আমি আর পেরে উঠি নে বাবাজী। সেকেলে বুড়োকর্তারা এই সব এলাহী বাড়ি ফেঁদেছিলেন, তাঁদের পয়সা ছিল, দাপট ছিল। জাহাজের মতো একখানা বাড়ি না করলে তাঁদের মান থাকত না। কিন্তু তাঁরাও গেলেন, জমি-জমা তেজ-দাপট সব গেল, লক্ষ্মীর আর ভদ্দর লোকের ঘরে থাকতে ইচ্ছে করল না, তিনি পাত পেড়ে বসলেন গিয়ে যত ছোটলোকের আস্তানায়।' শশাঙ্ক মুখটা বিকৃত করলেন একটু: 'সে যাক, ও-সব নিয়ে আর দুঃখ নেই। এখন এই ইঁটের পাঁজা সামলাতে প্রাণান্ত। এদিকে তাপ্পি দিই তো ওদিক ধ্বসে পড়ে। এই ছাখো না—গত বর্ষার আগেও এ-সব দেওয়াল বেমালুম খুঁড়ে রাজ্যের তেঁতুল-গোলা ঢেলেছি, তবু ক' মাস যেতে না যেতেই নোনা বেরিয়ে পড়েছে।' এক চুমুকে শশাঙ্ক পেয়ালার তলানিটুকু পর্যন্ত গিলে ফেললেন: 'কিন্তু কতকাল আর এ-ভাবে চালাই বলো দেখি? তা ছাড়া দেশের অবস্থা যা হয়েছে—মান-সম্মান কিছু তো আর থাকছে না, মাঝে-মধ্যে ভাবি সব বিক্রীপাটা করে দিয়ে চলে যাই আর কোথাও। কিন্তু জঙ্গলের ভেতর এ-সব জগদ্দল পাহাড় কিনবেই বা কে!'

নিঃশব্দে শুনতে লাগল বিকাশ। জবাব দেবার কিছু নেই।

'পড়ে থাকতে হবে এই পৈতৃক ভিটেতেই। যতদিন পারা যায়, তুলসীতলায় প্রদীপটা জ্বালতে হবে অন্তত। ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে, বাকি মেয়ে দুটোকে বিয়ে দিতে হবে।' বলতে বলতে হঠাৎ যেন কথাটা মনে এসে গেল তাঁর: 'ভালো কথা বাবাজী, বয়েস তো কম হল না। বিয়ে-থার কথা ভাবছ না কিছু?'

বিকাশ শক্ত হয়ে উঠল হঠাৎ।

'আজ্ঞে না।'

'কেন হে? এখন তো ঘর-সংসার করবারই সময়।'

'আজ্ঞে ও নিয়ে আপাতত কিছু ভাবছি না।'

'আর কবে ভাববে হে? বুড়ো হয়ে গেলে?'

'তা জানি না কাকা। এখনো ও জন্যে তৈরি হতে পারছি না।'

'তবে যে শুনেছিলুম—' শশাঙ্ক কাকার চোখ দুটো একবার পিটপিট করে উঠল: 'তুমি বাসা খুঁজছ, পেলেই বিয়ে-থা করে—'

মুখের চা-টা বিকাশের তেতো হয়ে গেল। সেই মনীষা, সেই যন্ত্রণা। কিন্তু তারও চাইতে বড়ো কথা, এখানে একটা জিনিসও কানাই পাল কিংবা শশাঙ্ক নিয়োগীর কাছে লুকোনো থাকে না। বাতাসে একটা নিশ্বাস ছড়িয়ে দিলেও ওঁরা তা টের পান।

বিকাশ আস্তে আস্তে বললে, 'একবার ভেবেছিলুম, কিন্তু মত বদলেছি।'

'মত বদলেছ?' শশাঙ্ক নিয়োগীর মোটা মোটা ভুরু দুটো কাঁকড়া-বিছের ল্যাজের

মতো নড়ে উঠল একবার : 'কেন হে ?'

শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'এমনি।'

'অ।' শশাঙ্ক একটু চুপ করে থাকলেন, পা দুটোকে নাচালেন খানিকক্ষণ, মট মট করে গোটা তিনেক আঙুল মটকালেন। তারপর বললেন, 'তোমরা আধুনিক ছেলে, তোমাদের ব্যাপারই আলাদা। আমাদের সময় বাপ-জ্যাঠারা ঘাড়ে ধরে বিয়ে দিতেন, ও-সব মত-টতের কোনো বালাই ছিল না আমাদের। সে যাক —' শশাঙ্ক আর এক হাতের আঙুল মটকাতে আরম্ভ করলেন : 'যে জন্য এলুম তোমার কাছে। এই চশমা, সেতার —এ-সবের জন্যে তোমার তো অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল।'

'এমন কিছু নয়।'

'এমন কিছু নয় কি হে ? একটা সেতারের দাম চাট্টিখানি কথা নাকি ? তার ওপর চশমা—সেও তো—তা সবসুদ্ধ কত হয়েছে বলো দিকি ? টাকাটা দিয়েই দিই।'

'টাকার জন্যে ব্যস্ত হবেন না কাকা।'

'ব্যস্ত হব না কেন হে ? অনেকগুলো টাকা তো।'

'এমন বেশি কিছু নয়, ও জন্যে ভাববেন না।'

'না না বাবাজী, এটা কাজের কথা নয়। অবিশ্যি তুমি বাড়িরই তো ছেলে, সুনুকে তুমি কিছু নিশ্চয়ই দিতে পারো, তা বলে এতগুলো টাকা—' শশাঙ্ক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'তা হলে তো আপনার এখানে থাকি, খাই—সেজন্যেও খরচ দিতে হয় আমাকে।'

'আরে রাম-রাম—' শশাঙ্ক জিভ কাটলেন : 'এও কি একটা কথা হল! এই জগদ্দল পাথরের ঘর তো এমনিই পড়ে আছে হানাবাড়ির মতো। বরং মানুষজন কিছু থাকলে ভালোই লাগে। আর জমির ধান-চাল, নিজের ক্ষেতেরই দুটো চারটে আনাজ, ওর আর খরচ কি হে ? এ তো তোমার কলকাতা নয় যে নটেশাক কচুশাক পর্যন্ত পয়সা দিয়ে কিনতে হয়—এখানে তা আঁদাড়-পাঁদাড় ভর্তি হয়ে আছে। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, ও-সব ছাড়ো। কিন্তু সেতার আর চশমার দামটা তোমায় নিতে হবে।'

'আচ্ছা, হিসেব করে জানাব।'

'জানিয়ো।' শশাঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন, প্রসন্ন মুখে বললেন, 'মেয়ে তো কলকাতায় গিয়ে মুগ্ধ। বলে, জেঠিমার কী আদর যত্ন! আমি বললুম, মার কাছে আর মামাবাড়ির গল্প করবি কিরে, আমি কি আর দাদা-বৌদিকে চিনি নে! তোদের জন্মের আগে কতবার গেছি, কী খাওয়া-দাওয়া, কী আত্মীয়তা! তা দাদাও চলে গেলেন, আমাদেরও কলকাতার পাট মিটল।' শশাঙ্ক মুখখানাকে বিষণ্ণ করবার চেষ্টা করলেন : 'দাদার কথা ভাবলে চোখে জল আসে এখনো। সে যাই হোক, ভারী খুশি হয়েছে মেয়েটা। স্যাখো গে না, ভাইবোন দুটোকে জুটিয়ে কলকাতার গল্প চলছে এখন।' দরজার দিকে

পা বাড়িয়ে শশাঙ্ক বললেন, 'কিন্তু টাকার কথাটা ভুলো না বাবাজী।'

'আজ্ঞে না, আমার মনে থাকবে।'

অফিসে যাওয়ার সময়ও চিন্তার ভেতরে তার ভার জমে রইল। সুনু ভাত দিতে এসেছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো সহজ হয়ে তাকাতে পারছে না। এই মেয়েটা হঠাৎ নিজের ভেতরে গভীর হয়ে গেছে। এতদিন নিজের ছোটখাটো সহজ সুখ-দুঃখ নিয়ে একভাবে ছিল, এবার ছায়া পড়েছে তার ওপর। ভালোবেসেছে তাকে ? মেজদা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল সেটা ? আর সে নিজেই—

কী বলেছিল আসবার পরেই ? 'আমি তোমাকে আর একটা নাম দেব—সোনালী।'

দরকার ছিল, কোনো দরকার ছিল ? নিছক খেলার আনন্দে আর একজনের মনে কাঁটা বিঁধিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল তার ? আর মনীষা অপেক্ষা করছে বছরের পর বছর ?

যে বিস্বাদ গ্লানি বয়ে সে ব্যাঙ্কে এসেছিল, কিছুক্ষণ পরেই একটা বিশ্রী তিক্ততায় ফেটে পড়ল সেটা। কাগজপত্র দেখতে দেখতে তার ভুরু কুঁচকে উঠল।

'প্রদীপবাবু !'

বিকাশের সমবয়সী একটি ছেলে উঠে এল চেয়ার ছেড়ে।

'ডাকছেন ?'

'আমি যাওয়ার আগে এই পাসবইগুলো আপনাকে রেডি করে রাখতে বলেছিলুম।'

'সময় পাইনি।'

আরো বিরক্ত হয়ে বিকাশ বললে, 'সময় না পাবার কিছুমাত্র কারণ নেই। এমন কিছু কাজের প্রেশার আপনার ছিল না যে এই কাজটুকু কমপ্লিট করে রাখা যেত না।'

'বললুম তো, সময় পাইনি।' প্রদীপের মুখে চোখে বিদ্রোহ দেখা দিল: 'আমরা স্যার মানুষ, মেশিন নই।'

'তর্ক করবেন না। কলকাতার যে-কোনো অফিসে এর চাইতে ডবল কাজ করতে হয়।'

প্রদীপের সরু গোঁফের নীচে বিদ্রূপের হাসি ফুটে বেরুল।

'তারা সুপারম্যান হতে পারে, কিন্তু আমি সাধারণ মানুষ।'

'রসিকতা করছেন ?' পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল বিকাশের: 'এটা রসিকতার জায়গা ?'

দুটো শীতল কঠোর দৃষ্টি মেলে বিকাশের দিকে তাকালো প্রদীপ: 'তা হলে আপনাকেও একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার স্যার। আপনি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ম্যানেজার হতে পারেন, তাই বলে এমন কিছু গ্র্যাণ্ড মোগল নন যে আমাদের

ওপর চোখও রাঙাতে পারেন।'

বিকাশ থ হয়ে গেল প্রথমটায়। রাগে মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ পর্যন্ত বেরুল না তার। সমস্ত ব্যাঙ্কে যেন মধ্য-রাতের স্তব্ধতা নেমে এল।

'কাজ যথাসাধ্য করব। কিন্তু চোখ রাঙিয়ে আপনি মুরুব্বিয়ানা করতে পারবেন না।'

কথা বলার আগে তিনবার ঢোক গিলল বিকাশ। প্রাণপণে সংযত করতে চাইল নিজেকে।

'পাসবইগুলো কখন কম্প্লিট্ হবে ?'

'আমার সময় হলে।'

'আপনার সময় !' ধৈর্যের সীমা এতক্ষণে মিলিয়ে গেল বিকাশের : 'যা করা উচিত, তার অর্ধেকও করেন না আপনারা। বসে থাকেন, আড্ডা মারেন, পান চিবোন। ব্যাঙ্ক থেকে মাইনে নেন না ?'

'বড্ড বাড়িয়ে তুলছেন মিস্টার মজুমদার।' এবার আর 'স্যার' বলল না প্রদীপ, সাপের মতো শিঁ শিঁ করে বলে চলল : 'একটু বুঝে-সুঝে কথা বলবেন।'

'বুঝে-সুঝে ?' বিকাশ চিৎকার করে উঠল : 'আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? অল রাইট, আমি রিপোর্ট করব আপনার নামে।'

'করুন রিপোর্ট—যত খুশি করুন। কিন্তু আপনার নাদিরশাহী মেজাজ দেখিয়ে প্রদীপ মুস্তফিকে ঘাবড়ে দেবেন—এমন অফিসার আপনি এখনও হননি। আপনার মতো অনেককেই আমি চরিয়ে এসেছি।'

'চরিয়ে এসেছেন—' বিকৃত স্বরে বিকাশ বললে, 'তাই আপনার ধারণা—ব্যাঙ্ক আপনার পৈতৃক সম্পত্তি ?'

'শাট আপ !' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল প্রদীপ মুস্তফি : 'উইদ্ড্রে—আই সে, উইদ্ড্রে ! এত বড়ো সাহস আপনার যে বাপ তোলেন ?'

একবারের জন্যে থমকে গেল বিকাশ।

'আমি আপনার বাপ তুলিনি।'

'আলবৎ তুলেছেন।'

'না—তুলিনি।'

'ইয়ু ড্যাম লায়ার। আই সে উইদ্ড্রে, আর—'

'আর ? মারবেন ?' বিকাশ আস্তিন গোটালো : 'বেশ, তাই হোক। আমিও এক সময়ে খেলাধুলো করেছি, কিছু বকসিং জানতুম। অল রাইট, আসুন—'

একটু থতমত খেলো প্রদীপ মুস্তফি, খুব সম্ভব এতখানির জন্যে তৈরী ছিল না। তখন এগিয়ে এসে গলা বাড়ালেন প্রিয়গোপাল।

'আ প্রদীপ, কী হচ্ছে এ-সব ছেলেমানুষি! রাস্তা থেকে লোক উঠে আসছে যে!' প্রিয়গোপাল নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে তাকালেন: 'আপনিও স্যার ওর সঙ্গে ও ব্যবহার না করলেই পারতেন।'

'কী ব্যবহার করেছি?' বিকাশ দাঁতে দাঁত ঘষল: 'কাজ করবেন না, আর সে-কথা বললে ওঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে যাবে?'

প্রদীপ মুস্তফি কী বলতে যাচ্ছিল, হাত নেড়ে প্রিয়গোপাল থামিয়ে দিলেন তাকে।

'কিন্তু কথা বলবার তো একটা ধরন আছে।'

'সে ধরন আপনাদের কাছে শেখবার দরকার দেখছি না। তা ছাড়া আপনিই বা এর মধ্যে নাক গলাতে এসেছেন কেন?' বিকাশের সমস্ত বিদ্বেষ এবার সোজা প্রিয়গোপালের ওপর গিয়ে পড়ল: 'নিজের চরকায় তেল দিন আপনি।'

'ওঃ, নিজের চরকায়?' কুঁজো নির্জীব লোকটি হঠাৎ যেন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলে উঠল তাঁর।

প্রদীপ আবার কিছু বলবার চেষ্টা করছিল, আস্তে তার কাঁধে একটা থাবড়া মারলেন প্রিয়গোপাল। তারপর শান্ত মৃদু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, পরে কথা হবে প্রদীপ। এবার নিজের কাজে যাও।'

বিকাশকে আর একটি কথাও না বলে, পেছন ফিরে নিজের টেবিলে চলে গেলেন প্রিয়গোপাল। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়লেন মোটা একটা লেজার খাতার ওপর।

ব্যাঙ্কে আবার মধ্য-রাতের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল।

আর নিজের টেবিলে বসে, একটা ক্লান্ত মোষের মতো ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে বিকাশ অনুভব করল—তার পায়ের নীচে একটা আগ্নেয়গিরি টগবগ করছে এখন।

চব্বিশ

ইলেকট্রিকের আলোগুলো শেষ হয়ে গেলে তারপরে দু পাশে কালো কালো গাছের ছায়া। এলোমেলো হাওয়ায় যেন ঝড়ের শব্দ থেকে থেকে। দূরে কাছে এক-আধটা বাড়িতে মিটমিটে কেরোসিনের আলো। গঞ্জের সমৃদ্ধি ছাড়িয়ে এখানে দুঃখ-দৈন্যের বাংলা দেশ।

বাতাসে শুকনো ধুলোর গন্ধ। শীতের শীর্ণ জলা-ডোবা থেকে পাঁকের গন্ধ। মাথার ওপর প্যাঁচা আর বাদুড়ের যাওয়া আসা। বিকাশ একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রভাকরের কাছে যাওয়ার একটা অনিশ্চিত লক্ষ্য তার ছিল, কিন্তু কখন ছাড়িয়ে এসেছে হাসপাতাল—চলেছে, চলেইছে।

উল্টো দিক থেকে চোখে আলো ফেলে একটা বাস ছুটে গেল, ঝিমুতে ঝিমুতে কয়েকটা গোরুর গাড়ি চলেছে আগে আগে। একটা গানের সুর কানে আসছে, বাংলা-দেশের গাড়োয়ানও হিন্দী ফিল্মের গান গায় এখন। চলতে চলতে গাছের ছায়াগুলো হালকা হল, তারার আলোয় ফিকে হল অন্ধকারের রঙ, মাঠ দেখা দিল দু-ধারে, খানিকটা পোড়া গন্ধ এল যেন কোথা থেকে—কারা যেন রবিশস্যের মাঠ থেকে কাঁচা ছোলা তুলে গাছসুদ্ধ পোড়াচ্ছে কোনোখানে। তখন বিকাশের হাঁটুর কাছে টনটনিয়ে উঠল, গঞ্জ থেকে মাইল আড়াই অন্তত হেঁটে এসেছে মনে হল এই রকম।

তারার আলোয় একটা কালভার্ট দেখা যায় পথের ধারে। বসা যাক—এইখানেই বসা যাক। একেবারে নিজেকে নিয়ে।

অনেকখানি ধুলো নিশ্চয় জমে আছে কালভার্টের বাঁধানো জায়গাটার ওপরে, কতদিন তো বৃষ্টি হয় না। কিন্তু জোলো কালির মতো এই হালকা অন্ধকারে সে ধুলো দেখা যায় না। বিকাশ বসে পড়ল। পায়ের তলায় মরা ঘাস আর ক্ষুদে ঝোপের মধ্য থেকে কী একটা ওদিকে পালিয়ে গেল সরসর করে—মনে হল, গিরগিটি। নীচে বোধ হয় একটু-খানি জল জমে আছে, ব্যাঙের মতো কিছু একটা লাফালো সেখানে।

বসে বসে বিকাশ খানিক জিরিয়ে নিতে চাইল, তারপর শীত আর বসন্ত জড়ানো এই সন্ধ্যার নির্জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে কিছু ভাবতে চাইল নিজের জন্য। কিন্তু কিছুই ভাবা যাচ্ছে না—সব মিলে হঠাৎ তার নিয়তিকে মানতে ইচ্ছে করল।

কলেজে পড়বার সময়—ইংরিজী অনার্সের এক ছাত্র, সাহিত্য-পাগলা তার এক বন্ধু একটা অদ্ভুত বিদেশী উপন্যাস পড়িয়েছিল তাকে। বলেছিল, এটা মডার্ন মাইণ্ডের একটা এপিক। বইটা পড়তে তার ভালো লাগেনি, কেমন একটা ক্লান্তি আর হতাশায় ছেয়ে গিয়েছিল মন। বইটার নাম তার মনে নেই, লেখকেরও না—বিকাশ তখন রোমাঞ্চ বোধ করত সমারসেট মমের রচনা পড়ে। এ বই সে জাতের নয়। কোনো এক জরিপওলা এসে পড়েছে এক অদ্ভুত গ্রামে—সেই গ্রামের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করে দূরের এক রহস্যময় দুর্গ। সেই দুর্গের কাছে পৌঁছোনো যায় না—অথচ সেখান থেকে আসে অমোঘ নির্দেশ—সে নির্দেশ নিয়তি, পরিত্রাণ মেলে না তার হাত থেকে, সব কিছু এক অর্থহীন, অসংলগ্নতা আর বিষাদের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে।

যে বই ভালো লাগে না তার লেখককে মনে থাকে না, লেখাকেও না। সাহিত্য-পাগলা বন্ধুটি বলেছিল, 'তোর মন থাকে বাজনায় আর খেলার মাঠে, এ তুই বুঝবি না।' বোঝার জন্যে মাথাও ঘামায়নি বিকাশ। আজ, এইখানে বসে, সেই উপন্যাসটার উদ্দেশ্য না বুঝেও বিকাশের মনে হল, একটা সময় আসে যখন ওই রকম রহস্যময় দূরত্ব থেকে নির্দেশ দেয় কেউ, নিজের ইচ্ছার জোর থাকে না, সেই নির্দেশকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না।

একটা অন্ধ শক্তি কিছু ঘটায়। না চাইলেও ঘটায়।

এই গল্পটাকে তার মনে হল, সেই উপন্যাসের নায়কের মতো। সে একটা কাজের দায় নিয়ে এসেছে, অথচ কোথাও নিজের জায়গা পাচ্ছে না, কোনো জিনিসের অর্থই ধরা দিচ্ছে না তার কাছে। এখানে আসবার পরেই এত বছরের হিসেব নিঃশব্দে মিটিয়ে দিয়ে সরে গেছে মনীষা, নিয়োগীবাড়ি একটা মাকড়শার জালের মতো তাকে ঘিরছে, কোথা থেকে হঠাৎ দেখা দিয়েছে সুমু, এসেছেন কানাই পাল, মেজদা তাকে বারবার কিসের মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছে, অথচ—

অথচ, এ-সব তার কিছুই দরকার ছিল না। পদোন্নতি এবং বদলি। নতুন ব্রাঞ্চটার ভবিষ্যৎ আছে। এটাকে ভালো করে গড়ে তুলতে পারলে অচিরাৎ একটা ছোটখাটো ম্যানেজার হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু—কিন্তু সেই অন্ধকারের শক্তি। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল সমস্ত!

মুস্তফির সঙ্গে সেই ঝগড়ার দিনে নয়, তারপরের দিন। অর্থাৎ পরশু।

ছোট ব্যাঙ্ক, কটিই বা কর্মচারী! অথচ এসেই সে বুঝতে পারছিল সব থমথমে। প্রত্যেকটি লোকের মুখে ছায়া।

অন্যদিকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প চলে, আড্ডা চলে, টুকরো টুকরো রসিকতায় হাসির ঢেউ ওঠে। এমন কি, নিরীহ গম্ভীর প্রিয়গোপালও বাদ যান না।

'টাকা মাটি, মাটি টাকা। ঠাকুর বলেছেন। কিন্তু তবু এই মাটি নিয়ে কেন লোকে এত মাতামাতি করে—ও প্রিয়দা?'

শুনতে শুনতে এক সময় প্রিয়গোপাল বলেন, 'ওরে মাটিও দরকার বইকি এক-আধটু। নইলে পা রেখে দাঁড়াবি কোথায়?'

'কিন্তু মাটি দিয়ে যারা পাহাড় বানিয়ে ফেলল?'

'ধ্বসে পড়ে যাবে একদিন, ভাবিসনি।'

'দাদা, এটা সোস্যালিজম, না ঠাকুরের বাণী?'

'কিছুই তো পড়িসনি। পড়লে বুঝতে পারতিস, ঠাকুরের মতো সোস্যালিস্ট কেউ ছিলেন না।'

'প্রিয়দার পাঞ্চিংটা ভালো। আধ্যাত্মিক কমিউনিজম!'

'ওই পাঞ্চিংটা করতে পারছিস না বলেই ফাঁক থেকে যাচ্ছে তোদের। চীন আর রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষকে এক ছকে মেলাতে গিয়েই থই পাচ্ছিস না তোরা।'

এরপরে হাসির কোরাস।

আজ কিছু নেই। হাসি নয়, গল্প নয়, একটা কথা নয়। প্রিয়গোপাল সেই যে ঝুঁকে রয়েছেন খাতায়, সেখান থেকে কয়েকবার দরকারে মুখ তোলা ছাড়া একবারও সীট

ছাড়েননি তিনি। বাকি সবাই কাজ করছে কাঠের পুতুলের মতো, বিকাশের কাছে কাগজপত্র নিয়ে আসছে, নিঃশব্দে সই করে চলে যাচ্ছে। প্রদীপ মুস্তফি ধ্যানীর মতো বসে আছে, যেন একটি সেকেণ্ডও সে নষ্ট করতে রাজী নয়, সব এরিয়ারগুলো মিটিয়ে না দিয়ে আজ আর সে বাড়ি ফিরবে না।

হয়তো কালকের সেই বিশ্রী ঝগড়াটার ফল। কাজ করতে এসেছি, কাজ করে যাব।

বিকাশ খুশি হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিল না। এরা বুঝে নিয়েছে সে ওদের ওপরওয়ালা, সুতরাং সবাই শুধু মেনে চলবে তাকে, চাকরি করে যাবে। কিন্তু নিজের এই আকস্মিক মর্যাদা তার ভালো লাগছিল না। কেউ কথা বলছে না, কিন্তু প্রত্যেকটি চোখে অবিশ্বাস, প্রত্যেক চোখে বিরোধিতা, প্রত্যেক দৃষ্টিতে চাপা ঘৃণা। অফিসার হওয়ার সৌভাগ্য বোধ হয় একেই বলে।

বোমাটা ফাটল পাঁচটা নাগাদ বেরুবার সময়।

জন ছয়েক এসে তার টেবিলের চার দিকে ঘিরে দাঁড়ালো। শক্ত মুখ, শীতল দৃষ্টি।

'কী ব্যাপার ? সকলে একসঙ্গে ?'

জবাব দিলেন কুঁজো কেরানী প্রিয়গোপাল। সোজা হয়ে মাথা তুলেছেন এখন।

'আমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে একটা বক্তব্য আছে আমাদের।'

'ইউনিয়ন ?'

'কথাটা নতুন শুনলেন নাকি ?' ধারালো গলায় ঠাট্টা করে উঠল প্রদীপ মুস্তফি।

মুহূর্তে স্পষ্ট হল এটা কালকের জের। এরা একটা ফয়শলা করতে এসেছে আজকে।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতরে জ্বালা করে উঠল তার। এরা যদি এইভাবে প্রসঙ্গটা না তুলত, তা হলে কাল হোক, পরশু হোক—এক সময় নিজেই হয়তো প্রদীপকে ডেকে সে বলত : 'কিছু মনে করবেন না, সেদিন মেজাজটা ভালো ছিল না—যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, অপরাধ নেবেন না।' কিন্তু—কিন্তু এ তো চ্যালেঞ্জ ! কাজ না করা, দায়িত্ব ফেলে রাখা, এবং সেজন্যে একটা কথা বলতে গেলে চোখ-রাঙানো।

বিকাশ একবার ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'না—নতুন শুনিনি। ইউনিয়নে আমিও আছি।'

'একদিন ছিলেন হয়তো। কিন্তু অফিসার হওয়ার লোভে সব ভুলে গেছেন। রেনিগেড।'

বিকাশ স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো প্রদীপের দিকে।

'কী চান আপনারা ? সবাই মিলে অপমান করতে এসেছেন ?'

'না, আমরা অপমানিত হয়েছি। সেই কথাটাই আপনার জানা দরকার—' আর একজনের জবাব এল।

'কী অপমান?'

'আপনি কাল প্রদীপকে ইনসাল্ট করেছেন, প্রিয়গোপালদাকে অপমান করেছেন।'

'ইনসাল্ট? অপমান?' হাতের মুঠোয় সীসের একটা পেপার-ওয়েটকে আঁকড়ে ধরে যেন নিজের মধ্যে জোর আনতে চাইল বিকাশ: 'আপনারা কাজ করবেন না, আর সে কথা বললে অপমান হবে আপনাদের?'

'সাধ্যমতো কাজ আমরা করি। কিন্তু আমাদের লেবারার পাননি যে সারাদিন আমাদের দিয়ে মাটি কাটাবেন।'

'ও—এইটেই তা হলে সোস্যালিজমের আদর্শ আপনাদের?' একটা বিস্বাদ হাসি ফুটে উঠল বিকাশের মুখে: 'অর্থাৎ শ্রমিকেরা ছোটলোক—তারা পরিশ্রম করবে এবং পয়সা নেবে, আর আপনারা কাজে ফাঁকি দিয়ে—বাণী ছড়িয়ে মাইনে নেবেন? কার্ল মার্ক্স এ-রকম কথা কোথায় বলেছেন দয়া করে জানাবেন আমাকে?'

কথাটা শেষ করার আগেই বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল প্রদীপ মুস্তফি।

'মুখ সামলে কথা বলবেন—দালাল কোথাকার। আপনার কাছ থেকে মার্ক্সের বাণী বুঝতে আমরা আসিনি। হোল্ড ইয়োর টাং—নইলে—'

'মারবেন নাকি?'

সবটা থেমে গেল প্রিয়গোপালের গলার আওয়াজে।

'প্রদীপ, মাথা গরম করছ কেন খামোকা? শুনুন স্যার, আপনার সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া করতে আসিনি আমরা। কলীগ হিসেবে মিলেমিশেই কাজ করতে চাই, কো-অপারেট করতে চাই। অফিস-বস হিসেবে কাজ আপনি নিশ্চয়ই চেক করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে কাউকে অপমান করতে পারেন না।'

'অপমান আমি করিনি।'

'করেছেন।'

'বেশ যদি করেই থাকি, কী হবে তা হলে?'

'আনকনডিশন্যাল অ্যাপোলোজী চাইতে হবে।'

বিকাশ প্রিয়গোপালের দিকে চেয়ে দেখল। একটা নিষ্ঠুর কঠিনতা সেখানে। সেই প্রাক্তন বিপ্লবীর মুখ। কথামৃত যাঁর আত্মিক শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে, যিনি ঠাকুরের নাম-কীর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র রাজনৈতিক দলের পত্রিকাও নিয়মিত পড়ে থাকেন। এই প্রিয়গোপাল অকালবৃদ্ধ কেরানী নন—এই মানুষটি যাকে অন্যায় বলে মনে করেন, তার সঙ্গে কখনো চুক্তি করেন না।

আস্তে আস্তে বিকাশ বললে, 'অ্যাপোলজী যদি না চাই?'

'এই টেবিলে বসে থাকতে হবে আপনাকে। উঠতে দেওয়া হবে না।'

'তার মানে ঘেরাও?'

'ইচ্ছে হলে ও-ভাবেও নিতে পারেন কথাটা।'

থাকব বসে—সমস্ত দিন, সমস্ত রাত—বিকাশ ভাবল একবার। দেখা যাক, কতক্ষণ জোর খাটাতে পারো তোমরা, কতক্ষণ আমার শরীর-স্নায়ু তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তারপরেই ব্যাপারটা যেন একটা প্রহসনের রূপ নিল তার কাছে। কাকে এরা শত্রু ভাবছে, কার সঙ্গে এদের বিরোধ? এমন কোনো অফিসার তো সে হয়ে ওঠেনি যে তার সামনে ধাপে ধাপে তৈরী হয়ে যাচ্ছে স্বর্গের সিঁড়ি, এমন কোনো বাঁকা পথ ধরে সে তো স্বার্থের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না—যাতে করে তার সহকর্মীদের বঞ্চনা করাটা তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। সেও তো এদেরই একজন—এদের দাবি, এদের সংগ্রাম—সেও তো তারই—অন্তত কলকাতার অফিস থেকে এখানে আসা পর্যন্ত, এমন কি আজকে একটু আগে পর্যন্তও—এই কথাটাই সে জানত।

কিন্তু যেহেতু তার ওপর ব্যাঙ্কের দায়িত্ব, যেহেতু কাজের দিকগুলোতে তার লক্ষ্য রাখতে হয়, দরকার হলে মনে করিয়ে দিতে হয়, সেই হেতু সে দালাল?

হয়তো তার কথার ভঙ্গিটা ভালো ছিল না। মানুষের মন-মেজাজ সব সময়ে স্বাভাবিক থাকে না, কখনো কখনো এদিক-ওদিক ঘটে। সেজন্য নিশ্চয় সে ক্ষমা চাইতে পারত। কিন্তু আর একটু সংযত হতে পারত না প্রদীপ? কথা বলতে পারত না একটু মাত্রা রেখে?

যেটা সাধারণ কথা-কাটাকাটি, সেটাকে একটা আলাদা রূপ দেওয়া হল। এল অফিসার আর কর্মচারীর সম্পর্কের কথা। জোর করে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল—বলা হল, দালাল! এই অসংযত ঔদ্ধত্যে নিজেদের মধ্যে ঐক্য আসে? কিংবা বেড়ে যেতে থাকে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান?

হঠাৎ তার ক্রুদ্ধ উত্তেজিত স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে এল। একটা নিরাশ অবসাদ ঘিরে ধরল তাকে। হয়তো এ-কথাও ঠিক—কখন একটা অফিসারের মেজাজ নিঃশব্দে সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে তার ভেতরে, কখন সে তার এত দিনের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করেছে, নিজেও টের পায়নি। তার কথায়, ব্যবহারে ফুটে বেরিয়েছে সেটা, তার গোত্রান্তরের খবর এই মানুষগুলোর চোখ এড়িয়ে যায়নি।

বেশ, প্রায়শ্চিত্তই করবে সে।

তা ছাড়া—তা ছাড়া কিসের সঙ্গে তার বিরোধিতা, কোন ছায়ার সঙ্গে লড়াই? সম্মান? কিসের সম্মান? সে এখন কোন মহামান্য সম্রাট যে এদের কাছে একবার ক্ষমা চাইলেই তার মর্যাদা একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে যাবে?

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'যদি অন্যায় করে থাকি, সর্বান্তঃকরণে দুঃখিত সেজন্যে। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।'

ছ'জন কর্মচারীর মধ্যে পাঁচজন চকিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা এ-ভাবে মিটে যাবে একথা যেন ভাবতেও পারেনি তারা। মনে হল, একটু নিরাশই হয়েছে যেন, উত্তেজনাটা আরো খানিকটা চড়লে ভালো লাগত।

শুধু প্রিয়গোপাল শান্ত স্বরে বললেন, 'ধন্যবাদ স্যার। আর আমাদের পক্ষ থেকেও বলছি ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।'

টেবিলের তিনদিক থেকে ব্যূহটা সরে গেল। পথ করে দিল বিকাশকে।

বেরিয়ে আসতে বিকাশ বলল, 'ধন্যবাদ।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল ক্লান্ত পায়ে। কিন্তু কয়েকটা ধাপ নেমেই একবারের জন্যে পা শক্ত হয়ে গেল তার। কানে আসছিল প্রদীপ মুস্তফির গলা।

'দেখলি তো? এক ধমকেই কুঁকড়ে গেল দালালটা। প্রদীপ মুস্তফিকে চেনে না।'

আবার মাথার মধ্যে খানিকটা আগুন ছুটে গেল, ইচ্ছে করল, ফিরে গিয়ে—

কিন্তু না। এই বীভৎস প্রহসনটার জের টানবার মতো আর উৎসাহ নেই তার।

পরশু সন্ধ্যার স্মৃতিটা থেকে বিকাশ ফিরে এল ফসলকাটা মাঠের ভেতরে, এই কাল-ভার্টটার ওপর। সেই উপন্যাসটা—ছাত্রজীবনে পড়েছিল, ভালো লাগেনি, বুঝতেও পারেনি সম্পূর্ণভাবে। যা সে করতে চায়নি—তাই ঘটেছে, যার সম্ভাবনা স্বপ্নেও ছিল না তাই এসে দাঁড়াচ্ছে সামনে। এ সেই অদ্ভুত গ্রামটার মতো—যেখানে বাইরে থেকে যে আসে সে এক অলক্ষ্য শক্তির হাতের পুতুল হয়ে যায়, তখন তার কোনো কিছুর অর্থ থাকে না—কোথাও সঙ্গতি মেলে না!

নইলে কে ভেবেছিল, ব্যাঙ্কে এই কাণ্ডটা ঘটে যাবে! এবং—এবং প্রিয়গোপাল তার শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন!

দূর থেকে একটা মোটর আসছিল। তার জোরালো হেডলাইটের আলো পড়ল গায়ে, চোখ জ্বালা করে উঠল, তাতে বিকাশ আবিষ্কার করল সে যা ভেবেছিল কালভার্টটা তার চাইতেও নোংরা। আর সেই সময়—হঠাৎ স্পীড কমিয়ে গাড়িটা একেবারে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

'কী ব্যাপার? এতদূরে—এখানে একা বসে যে?'

কানাই পাল। নিজের সেই ছোট গাড়িটা চালিয়ে আসছেন গঞ্জের দিকে। সেই খামারবাড়ি থেকেই ফিরছেন খুব সম্ভব। গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে কথা বলছিলেন—পরিষ্কার মদের গন্ধ পাওয়া গেল। কিন্তু কানাই পাল কখনো মাতাল হন না—তিনি কাজের লোক।

কালভার্ট থেকে নেমে পড়ল বিকাশ।

'নমস্কার। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছিলুম।'

'এখানে? এই রাস্তার ধারে কি বেড়াবার জায়গা? স্টেশন পেরিয়ে ওধারে যে পুরোনো দীঘিটা আছে ওখানে যেতে পারতেন, যেতে পারতেন স্কুলের মাঠে।'

'হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি।'

'ভালো করেননি। আর কখনো আসবেন না এ-ভাবে, বসবেন না যেখানে-সেখানে।'

'কেন বলুন তো?'

'সাপ মশাই, সাপ। কলকাতার ছেলে, পাড়াগাঁকে তো জানেন না। শীতকালে গর্তে-টর্তে থাকে, কিন্তু বসন্তের হাওয়া লাগলেই বেরুতে আরম্ভ করে। তখন রাস্তার ওপরেই পড়ে পড়ে হাওয়া খায় অনেকে। এ-সময় আবার ওদের বাচ্চা-কাচ্চাও হয় কি-না, মেজাজ থাকে ভারী তিরিক্ষি—যাকে-তাকে ছোবল বসিয়ে দেয়। নিন—উঠুন গাড়িতে।' কানাইবাবু দরজা খুলে ধরলেন।

সাপের কথায় অস্বস্তি লাগল। কিন্তু তার চাইতেও অস্বস্তি কানাইবাবুর গাড়িতে উঠতে।

'আসুন—আসুন, কথা বাড়াবেন না।' আবার ডাকলেন কানাইবাবু।

উঠতে হল অগত্যা। গাড়ি চলল।

মিনিট খানেক পরে কানাইবাবু বললেন, 'ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা আমি শুনেছি।'

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এখানকার কিছুই কানাইবাবুর কান এড়িয়ে যায় না। তা ছাড়া এতটুকু জায়গার পক্ষে খবরটা চাঞ্চল্যকর—অনায়াসেই চারদিকে চারিয়ে যাওয়ার মতো। আর বিকাশের মতো একটা দালালকে কিভাবে জব্দ করে দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চয় বিজয়গর্বে বলে বেড়াচ্ছে প্রদীপ মুস্তফিরা।

বিকাশ চুপ করে রইল।

কানাই পাল একবারের জন্যে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটের সিগারেটটা ধরালেন।

'এই হচ্ছে এখানকার নিয়ম, বুঝলেন! মিনিমাম ওয়ার্ক—ম্যাকসিমাম পে। কাজ করতে বললেই স্ট্রাইক কিংবা ঘেরাও, অযোগ্যকে সরিয়ে দিলেই গণ-আন্দোলন! আপনার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, এ অভিজ্ঞতা আমার সব সময়েই হয়ে থাকে।'

বিকাশ আস্তে আস্তে বললে, 'আমারই অন্যায় হয়ে থাকবে। আমিই হয়তো মাত্রা রেখে কথা বলতে পারিনি।'

'কিছু না মশাই, কিছু না। ওপরওলা কিংবা মালিক—যে কাউকে অপমান করবার একটা ছুতো খোঁজা হয়ে থাকে সব সময়ে। ওদের ধারণা—এইটেই রেভোল্যুশনের

শর্টকার্ট।'

বিকাশ জবাব দিল না। এ-সব আলোচনা বিরক্তিকর আর অর্থহীন।

কী ভেবে প্রসঙ্গটা বদলে ফেললেন কানাই পাল।

'আপনি সেই যে একটি মেয়ের চাকরির কথা বলেছিলেন না? একটা ব্যবস্থা করা গেছে তার। আমাদের এখানকার স্কুলেই।'

আবার মনীষা।

বিকাশ ক্লান্তভাবে বললে, 'আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু মিথ্যেই কষ্ট দিয়েছি আপনাকে। চাকরিটা তার আর দরকার হবে না।'

'আর কোথাও কাজ পেয়েছেন নাকি?'

'না, তার এখানে আসা সম্ভব নয়।'

কানাই পাল ভ্রূ কোঁচকালেন।

'আমি ভেবেছিলুম, তাঁকে এখানে নিয়ে এলে আপনি—'

'সে অনেক কথা মিস্টার পাল।' প্রসঙ্গটা থামিয়ে দেবার জন্যে হতাশ ভঙ্গিতে বিকাশ বললে, 'পরে সব বলব আপনাকে।'

'তা হলে বাসাটা—'

'সেটা আমি সামনের মাস থেকেই নেব।'

'হ্যাঁ, তাই নিন।' কানাই পাল হাসলেন: 'বেশি দেরি করা উচিত নয় আপনার।'

'কেন বলছেন একথা?' একটা কুশ্রী সন্দেহের ছায়া পড়ল মনে।

'এমনি—' সংক্ষেপে জবাব দিয়ে কানাই পাল গাড়ির হর্ন বাজালেন, সামনে একটা গরুর গাড়ি পাশ কাটিয়ে পথ ছেড়ে দিলে, গাড়ির আলোয় গরু দুটোর চোখ প্রতিফলিত হল দপদপে আগুনের মতো।

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর কানাইবাবুই কথা শুরু করলেন আবার।

'আসলে আপনার ওপরে ওদের রাগ কেন জানেন তো? ওদের ধারণা, আপনি আমার দলের লোক। আর এনি ওয়ান—সাম হাউ কানেকটেড উইথ মী—সে হল ওদের শত্রুপক্ষ, ক্যাপিটালিস্টের হাত-ধরা।' কানাইবাবু অস্পষ্ট শব্দ করে হাসলেন একটু: 'দেয়ার ইজ ইয়োর স্টিগ্‌মা।'

বিকাশ চমকে উঠল: 'কিন্তু আমি তো কোনো দলেই নই।'

'দরকার করে না। বী অনেস্ট—ভদ্র, কর্তব্যপরায়ণ রেসপনসিবল—অ্যাণ্ড—অ্যাণ্ড ইউ আর এ রিঅ্যাকশনারী।' কানাইবাবু একটু থেমে আবার বললেন, 'আপনার অপরাধ, আমি ক্যাপিটালিস্ট বলে আপনি আমাকে অচ্ছুৎ মনে করেন না, আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, বাসা চেয়েছেন, একটা চাকরির কথা বলেছেন। আমার সমস্ত ধানী

জমিগুলো—সব ধান-চালগুলো লুট করে নেওয়া উচিত—এই প্লায়াস শ্লোগান দেননি। অ্যাণ্ড দ্যাট ও'জ্ দ্যাট।'

কানাইবাবুর ধান লুট হওয়া উচিত কি অনুচিত—এ নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই বিকাশের। ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের মুখে যোগেন পালের বৃত্তান্তটা কতখানি সত্যি, এ-ও যাচাই করবার দরকার নেই তার। কানাই পাল মহামানব নন—সোজা পথ ধরে তিনি উঠে আসেননি, দলাদলি আর চক্রান্তের যে কুৎসিত একটা জাল চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে এখানে, তিনি তার একজন কুশলী নেতা, শশাঙ্ক নিয়োগীদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

'রেভোল্যুশন'কে বিদ্রূপ করে তার অনেস্টি, রেসপনসিবিলিটি আর কর্তব্যজ্ঞানকে প্রশংসা করলেন কানাইবাবু, কিন্তু প্রশংসাটা ঠিক নিতে পারল না বিকাশ। সমস্ত মনটা কুঁকড়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। মনে হল, গলার কাছে কী একটা আটকে রয়েছে তার, ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে।

গাড়ি বাজারের মধ্যে এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কানাইবাবু বললেন, 'কানাই পাল যদি কাউকে প্রোটেকশন দেয় তাঁর সম্মানও সে রাখতে পারে। আপনি ভাববেন না—দে মাস্ট পে ফর ইট।'

সাপের শিসের মতো শোনালো কানাইবাবুর গলার আওয়াজটা। বিকাশ শিউরে উঠল।

'মিস্টার পাল!'

'ইনসাল্টটা ইনডাইরেকটলি আমাকেই, বুঝতে পারছেন না?'

'আমাকে মাপ করবেন মিস্টার পাল। জিনিসটাকে ও-ভাবে নেবেন না আপনি। আমি আর এ-সব বিশ্রী ব্যাপারের জের টানতে চাই না।'

কথাটার জবাব দিলেন না কানাইবাবু। একটু পরে বললেন, 'আপনাকে নিয়োগী-পাড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিই?'

'না—ধন্যবাদ।' হঠাৎ যেন গাড়ির মধ্যে বিকাশের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল: 'আমি আপনাকে আর কষ্ট দেব না, এখানেই নেমে যেতে চাই।'

একটা জাল—একটা জাল তাকে জড়িয়ে ধরছে। এই নিয়োগীবাড়ি, ভুতুড়ে অন্ধকার, চারদিকের জংলা গাছপালা—সব মিলে এই রাত্রিবেলা নিয়োগীবাড়িটাকে কোনো অতিকায় মাকড়শার রোমশ পায়ের মতো দেখালো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিকাশ ভাবল, একটাই পথ আছে। পালানো—ঊর্ধ্বশ্বাসে এখান থেকে পালানো। ব্যাঙ্ক যদি না ছাড়ে, রিজাইন দেওয়া। তারপর যেখানে হোক একটা কিছু জুটে যাবেই। কিন্তু আর এখানে নয়, একদিনও না।

দোতলার বারান্দায় উঠতেই আর একটা ছবি।

সুস্থদের শোবার ঘরের দরজা খোলা। লণ্ঠনের আলোয় চোখে পড়ল, মেজেয় মাছর পেতে, সেতারটা কোলে নিয়ে সুস্থ প্রথম পাঠ আয়ত্ত করতে চাইছে।

কী যে হল, চকিতে যেন জুড়িয়ে গেল চোখ। একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জ্বালার ওপর। সেতারের আওয়াজ তার অনেক আগেই কানে আসা উচিত ছিল, কিন্তু নিজের ভেতরে তলিয়ে ছিল বলে শুনতে পায়নি।

সুস্থ তাকালো দরজার দিকে। লজ্জিতভাবে নামিয়ে ফেলল সেতারটা।

'আমি পারছি না, কিচ্ছু পারছি না বিকাশদা—'

'সব পারবে।' বিকাশ মৃদু গলায় বললে, 'এসো আমার ঘরে, তালিম দি তোমাকে।'

পঁচিশ

প্রভাকর আস্তে আস্তে পা দোলাচ্ছিল তার ইজি-চেয়ারটায় বসে। তারপর পিঠটা সোজা করে একটু ঝুঁয়ে পড়ল সামনের দিকে। নিকোটিনের গাঢ় বাদামী রঙধরা তর্জনী আর মধ্যমা বার করে বাজাতে চেষ্টা করল বেতের টেবিলটার ওপর।

'কী আশ্চর্য, একবার ডাক্তারও দেখাতে চাইলেন না ভদ্রমহিলা?'

'না।'

'তোকে কিছু না বলেই চলে গেলেন তিন-চারদিনের জন্যে?'

বিকাশ জবাব দিল না।

আবার নিজের মনে আঙুল বাজাতে লাগল প্রভাকর—তার ডাক্তারী বিদ্যে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটার যেন সমাধান খুঁজছে একটা। পেলো না। তারপর স্থূলভাবে বলল, 'যেতে দে। মেয়েরা ওই রকমই। দুদিন তোকে নাচালো, তারপর—'

কথাটা অশ্লীল, কথাটা মিথ্যে। কিন্তু প্রতিবাদ করারও উৎসাহ নেই। মনীষার মতো মেয়েদের প্রভাকর কখনো দেখেনি, কখনো তাদের সে বুঝবে না।

'ছ্যাখ্‌গে, আর কারুর সঙ্গে প্রেম করে—'

'প্রভাকর, থাক এ-সব।'

প্রভাকর তার নিজের মতো করে বুঝে নিল। বললে, 'হ্যাঁ, ও-সব কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। এবার মনের মতো একটা মেয়ে দেখে চটপট বিয়ে করে ফ্যাল্‌। কিন্তু আবার সাত বছর ধরে প্রেম করতে যাস নে—শেষকালে সব রঙ ফিকে হয়ে যাবে এই রকম।'

প্রভাকর হিতৈষী, কিন্তু আজ তাকে সহ্য করা যাচ্ছিল না। ক্লান্ত মাথাটার ভার দু'হাতের ওপর রেখে বিকাশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সামনের দিকে। বারান্দার হেনার ঝাড়ের তলা দিয়ে হাসপাতাল দেখা যায়, দুটো নারকেল গাছের পাতা হাওয়ায় দুলছে

তা দেখা যায়, দূরের পথ দিয়ে রিক্শ যাচ্ছে বাস যাচ্ছে তা দেখা'যায়। কিন্তু বিকাশ কিছু দেখছিল না, শুধু প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করছিল, এভাবে মনীষার চলে যাওয়ার কোন মানে হয় না, যদি একবারও আভাস দিত যে বিকাশ এতখানি অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই—

প্রভাকর আবার কথা বলল।

'তুই চলে যেতে চাস কেন এখান থেকে? এই ব্যাপারেই?'

'না।'

'ব্যাঙ্কের সেই গণ্ডগোলটা হয়েছে বলে? আরে, আজকালকার হাওয়াই ওই রকম, কাউকে যদি তুই অনেস্টলি কাজ করতে বলবি, সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ খারাপ—মৌলিক অধিকারে ঘা লাগে। কাজ কী ব্রাদার তোমার একার ডিউটিফুল হয়ে? সবাই ফাঁকি দিচ্ছে, তুই দে। চাকরি করছিস, স্রেফ তাই করে যা।'

আর একটা বিস্বাদ প্রসঙ্গ। না, ব্যাঙ্কের ঘটনায় বিকাশের কিছু আসত-যেত না। কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে যদি তার ভুল বোঝাবুঝি ঘটে থাকে, যদি মাপ চাইতে হয়ে থাকে তার জন্যে, তাতে তার মান যায়নি। কিন্তু প্রিয়গোপালও অবিচার করলেন তার ওপরে? বিপ্লবী ছিলেন একসময়, কথামৃত পড়েন আবার বামপন্থী রাজনীতি-চর্চাও করেন —কী করে তাঁর ধারণা হল যে কানাইবাবুর কাছে বাস-ভাড়া চেয়েছে বলেই সে দালাল?

আসলে, এখানে না এলেই তার ভালো হত। এখানে আসবার পরেই অকারণে জট পাকিয়ে যাচ্ছে সমস্ত।

প্রভাকর আরো কী বলছিল, বিকাশের কানে গেল না। নীচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরে বললে, 'এসব কিছু না। আমার এখানে ভালো লাগছে না।'

'তা বলতে পারিস—' প্রভাকর মাথা নাড়ল: 'কোনো ভদ্রলোকের এখানে ভালো লাগতে পারে না, লাগা উচিত নয়। তুই তো বাইরে কেবল দলাদলি দেখছিস, কিন্তু ভেতরে পচন যে কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে তা ধারণাও করতে পারবি না। বুঝলি, পুরো শহর আর পুরো গ্রামের একটা নিজস্ব চেহারা আছে, কিন্তু যা না-শহর না-গ্রাম, সেখানে দুটোর যা কিছু ভাইস একসঙ্গে এসে জড়ো হয়। একদিকে গেঁয়ো দলাদলি, আর এক-দিকে শহুরে আবর্জনা। দল পাকাবার জন্যে কাস্টিজ্‌ম্, আবার হিন্দী ফিল্মের ধরনের প্রেম। ডাক্তার হিসেবে এখানকার দু-একটা নামকরা ফ্যামিলির এমন স্ক্যাণ্ডাল তোকে শোনাতে পারি—'

'থাক।'

'হু, তুই এখনো সেইরকম পিউরিটান রয়ে গেলি। কিন্তু নামজাদা কন্‌জারভেটিভ

ফ্যামিলির বালবিধবাকেও যখন ভি-ভির ইনজেক্শন দিতে হয়—'

'প্লীজ প্রভাকর, যথেষ্ট হয়েছে।'

'ঠিক আছে, আমি থামছি। কিন্তু চোখ বুজে জীবনকে আইডিয়ালাইজ করলেই রিয়্যালিটি ক্ষমা করে না। বরং চোখ বন্ধ করে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে যে হাঁটছে, তাকেই অন্ধকার গর্তের ভেতরে আছড়ে পড়তে হয়। লুক অ্যাট্ ইয়োর মনীষা। তুই তো ভেবেছিলি সাবেকী বাংলা উপন্যাসের নায়িকার মতো সারাটা জীবন সে তোরই ধ্যান করে কাটিয়ে দেবে, কিন্তু নতুন কোনো শাঁসালো মক্কেল জোটবার সঙ্গে সঙ্গে—'

'প্রভাকর, আমার ভালো লাগছে না।'

একটু রূঢ় শোনালো কথাটা। প্রভাকর থেমে গেল।

'সরি, তোর সেন্টিমেণ্টে আমি ঘা দিয়েছি। কিন্তু আমি বলছিলুম, টেক্ এভরিথিং ঈজি।'

'এভরিথিং ঈজি!'

'এগ্‌জ্যাক্‌টলি। মনীষা গেছে, যাক। ব্যাঙ্ক এতদিন যেমন চলছিল তেমনি চলুক —তোর কি দায় পড়েছে যে দাড়িওলা একটা মূর্তিমান বিবেকের মতো সেখানে নাক গলাতে যাস? ভিলেজ পলিটিক্‌স্? মরুক না কুকুরের মতো কামড়া-কামড়ি করে। তুই গাঁট হয়ে থাক এদের ভেতরে, যেদিকে হাওয়ার জোর বেশি—সেদিকে ভেসে পড়বি। আর তক্কে-তক্কে থাকবি, যদি ফাঁক পাস কিছু জমিজমা সস্তায় কিনে ফেলবি গ্রামের দিকে। একটা দোকানও করে ফেলতে পারিস বাজারের ভেতর—অফ-টাইমে সেখানে বসবি।'

মনের ভেতর মেঘ, কিন্তু প্রভাকরের কথার ভঙ্গিতে বিকাশ হেসে ফেলল।

'এই অবস্থায় তুই ঠাট্টা করছিস?' নিজের জমি হয়েছে তোর?'

'ঠাট্টা নয়, খুব সিরীয়াসলিই বলছি। পৈতৃক কিছু অলরেডি বোধ হয় আছে এখানে। কিন্তু জ্ঞাতিরাই তো ভোগ করে থাকেন, দু-এক বস্তা ধান-চাল যে টেনে নিয়ে আসব সে যোগ্যতাও আমার নেই। আসলে ডাক্তারী করেই সময় পাই না—ও-সবে মন দেব কখন? কিন্তু তুই তো কমার্সের ছাত্র, তায় ব্যাঙ্কের চাকুরে, হিসেব-পত্তর ভালো বুঝিস, ইচ্ছে করলেই আখের গুছিয়ে নিতে পারবি।'

'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আজ উঠি।'

'আর এক পেয়ালা চা?'

'না, দরকার নেই, সাড়ে আটটা বাজে।'

বিকাশ উঠে পড়েছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রভাকরের স্ত্রী অমলা।

'বাসা ভাড়া হয়ে গেছে আপনার?'

বিকাশ একবার অমলার দিকে তাকালো। সুখী, পরিতৃপ্ত। শ্যামল মুখখানা একটা

চাপা খুশিতে ঝলমল। সেই খুশির আভাতেই সিঁথের চওড়া সিঁদুরের রেখাটাও যেন ঝকমক করছে। এখানকার মেয়েরা এমন করে সিঁদুর পরে না কেউ, কিন্তু এই মেয়েটি প্রবাসিনী বলেই বোধ হয় ষোল আনা বাঙালী ঘরের বঁউ হতে চাইছে। ডাক্তার প্রভাকরের অনেকটাই সময় বাইরে বাইরে কাটে, কিন্তু অমলার অতৃপ্তি নেই, তার রেডিয়ো আছে, তার বাংলা উপন্যাস আছে, আর বাস্তব মানুষ প্রভাকরের সহজ স্বাভাবিক ভালোবাসা আছে।

কিন্তু অমলার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা জিনিস বোঝা গেল তৎক্ষণাৎ। সে কেন বাসা ভাড়া করতে চেয়েছিল, অমলা তা জানে। প্রভাকর নিশ্চয় মনীষার কথাটা বলেছে তাকে।

একবারের জন্যে প্রভাকরকে হিংসে করতে ইচ্ছে হল তার। তারপর বললে, 'না, বাসা ভাড়া করার কথা আর ভাবছি না আপাতত।'

অমলা যেন আশ্চর্য হল একটু।

'কিন্তু—লেকিন—'

'লেকিন কিচ্ছু নেই ভাবীজী।' জোর করে হাসল বিকাশ: 'বাসা ভাড়া করতে চাইলেই কি পাওয়া যায়, না ভাড়া পেলেই তা নেওয়া যায় সব সময়?'

অমলার চোখের তারা দুটো বড় হয়ে উঠল।

'যাঃ, আপনি দিল্লাগী করছেন।'

'দিল্লাগী-টিল্লাগী বুঝি না। বাসা ভাড়া নিচ্ছি না—ব্যাস।'

অমলা সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে রইল। বিকাশ হাসতে চেষ্টা করল আবার।

'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বাসার দরকারটা যদি খুব বেশি হয়ই, তা হলে আপনার এখানেই তো এসে ওঠা যাবে। নেমন্তন্ন তো আপনি দিয়েই রেখেছেন।'

'সে তো নিশ্চয়। কিন্তু—'

'হাঁ, একটা কিন্তু আছে। তার আগে বাংলাটা আরো একটু ভালো করে রপ্ত করে নিন। অত লেকিন আর দিল্লাগী চলবে না। আসি তবে—নমস্তে জী।'

প্রভাকর শব্দ করে হেসে উঠল। অপ্রতিভ হাসিমুখে অমলা বললে, 'নমস্কার।'

বিকাশ পথ চলল, নিজের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে। ভাবনারও বিশেষ কিছু নেই, কেবল নীরস অবসাদ খানিকটা। এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া নিষ্কৃতি নেই তার। কিন্তু দু মাসের মধ্যেই বদলি হওয়া যাবে? গিয়ে তদ্বির করা দরকার। বলা দরকার, প্রমোশন চাই না, অফিসার হয়ে দরকার নেই, হেড অফিসে যেমন ছিলুম, তাতেই আমার সুখে কেটে যাবে।

এখান থেকে চলে গেলে, এই সব বিস্বাদ দিনগুলোও হারিয়ে যাবে আস্তে আস্তে।

মিলিয়ে যাবে কানাই পাল, শশাঙ্ক নিয়োগীদের কথা—দশ বছর পরে সব কিছুকে মনে হবে কতগুলো স্বপ্নের টুকরোর মতো। শুধু স্বপ্ন-সোনালি-স্বর্ণা—

'এই যে—'

বিকাশ চেয়ে দেখল। হেডমাস্টার কুমুদ সেনগুপ্ত। তাঁর বাসার সামনে নামছেন রিক্‌শ থেকে।

'তোমাকে নাকি ঘেরাও করেছিল সব ?'

আবার সেই অরুচিকর প্রসঙ্গটা।

'আজ্ঞে না—সেরকম কিছু নয়।'

'এই হয়েছে আজকাল—ঘেরাও। টেস্টে তিন সাবজেক্টে ফেল করেছে—অ্যালাউ করা হয়নি, অমনি হেডমাস্টার ঘেরাও।' বিরক্ত হতাশ মুখে কুমুদবাবু বললেন, 'বদমাস বেয়াড়া ছেলেকে স্কুল থেকে টি-সি নিতে বলা হল, সঙ্গে সঙ্গে ঘেরাও। এ-সব পোলিটি-ক্যাল পার্টিগুলো দেশের জন্যে কী করছে জানি না। কিন্তু ছেলেগুলো তো এমনিতেই গোল্লায় যাচ্ছিল—আরো শর্টকাট দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের।'

রাজনীতির আলোচনায় বিকাশের উৎসাহ ছিল না। সে দেখছিল, রিক্‌শ বোঝাই একরাশ পুরোনো বই। রিক্‌শওলা তার কিছু কিছু করে এক একবারে দিয়ে আসছিল হেডমাস্টারের বাইরের ঘরে। বইগুলো থেকে ধুলোর গন্ধ, পুরোনো চামড়ার গন্ধ।

তার চেয়েও বড় কথা এ-সব বই মাত্র এক জায়গায় থাকতে পারে, সেই একটি ঘরে। সেখানকার মানুষটা আজ এ-সব বই পড়তে ভুলে গেছে—মধ্যে মধ্যে পাতাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে, অথচ বইগুলো সম্পর্কে যার অদ্ভুত মমতা। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছিল না, তবু বিকাশ নিশ্চয় জানে মোটা মোটা বাঁধানো বইগুলোর পেছনে সোনার জলে লেখা আছে পি. কে. নিয়োগী—প্রদ্যোতকুমার নিয়োগী।

হেডমাস্টার বলছিলেন, 'যদি প্রদীপ মুস্তফির কথা বলো, আমার স্কুলেই তো ছাত্র ছিল সে। বুঝলে, আগে বেশ বিনীত আর ভক্তিমান ছিল, লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না। কিন্তু কলকাতায় পড়তে গিয়েই—'

'এই বইগুলো শশাঙ্ক কাকার মেজদার—না ?'

সেদিন এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো সম্পর্কে হেডমাস্টারের কোনো সংকোচ ছিল না, কিন্তু আজ এই আকস্মিক প্রশ্নটায় প্রায় চমকে উঠলেন তিনি।

'এই মানে—'

'নিজেই দিলেন ?'

'তা কি আর দেয় ? পাগলের খেয়াল—আমাকে তো দেখলেই তেড়ে আসে। তাই অন্যভাবে যোগাড় করে আনতে হল। কী করা যায় বলো, এক একটা বই এমন রেয়ার

যে হাজার টাকা দিলেও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নিজেও তো হিস্ট্রির লোক—বুঝি এ-সবের কদর।'

'আনলেন কী করে?'

'শশাঙ্কবাবু হেলপ্ করেন। উনি—মানে—' একটা বিরূপ মন্তব্য সামলে নিয়ে হেড-মাস্টার বললেন, 'যদিও একটু বৈষয়িক লোক, তা হলেও এ-সব ব্যাপারে বেশ রিজনেবল।'

নিঃসন্দেহে রিজনেবল শশাঙ্ক কাকা—বিকাশ ভাবল। আরো টাকার গন্ধ আছে যেখানে।

অপ্রতিভভাবে হেডমাস্টার বললেন, 'লোকটা ভালো ছাত্র ছিল একসময়, পড়াশোনা করত, কিন্তু এখন তো মগজে গাঁজার ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু নেই। দিনের পর দিন কেবল ধ্বংস হচ্ছে বইগুলো। এভাবে ছাড়া এগুলো বাঁচাবার রাস্তা নেই কোনো, সে তো বুঝতেই পারছ।'

'আজ্ঞে হাঁ তা বটে।'

হেডমাস্টারের যুক্তির প্রতিবাদ করার কিছু নেই। বইগুলোর দুর্গতি তো নিজের চোখেই দেখেছে সে।

বিকাশ বললে, 'আচ্ছা স্যার, আসি।'

'ভালো কথা। আমার সায়ান্স টীচারের কোনো খবর পেলে?'

কলকাতায় গিয়ে দিনগুলো কিভাবে যে তার কেটেছে কুমুদবাবুকে সে-সব বলা যায় না। ও-কথাটা তার মনেই ছিল না।

'আমি খোঁজ করছি স্যার।'

'কোরো কোরো। আমি হয়রান হয়ে যাচ্ছি।'

'আমি দেখব স্যার।'

বিকাশ এগিয়ে চলল। তবু ভালো যে হেডমাস্টার মনীষার চাকরির কথাটা আর তোলেননি।

মনীষার কথা মনে হলেই যন্ত্রণা। জোর করে ভাবনাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে বিকাশ। তার জায়গায় মেজদা এসে দাঁড়ালো।

ওই পাগলকে দেখলে বিকাশের যে খুব একটা আনন্দ জাগে, তা নয়। এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওই মেজদাই তার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর যেভাবে সেদিন গলা টিপে ধরতে এসেছিল, তাতেও মেজদাকে ভালো লাগবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। কাকিমার মমতা আছে মেজদার জন্যে। সুস্থর চোখেও জল আসে, কিন্তু ও লোকটা ওই বাড়িতে না থাকলেই বিকাশ খুশি হত।

তবু—তবু ওর বইগুলো—

দামী দামী দুর্লভ বইকে পাগলের খেয়ালে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না, খুব খাঁটি কথা। শশাঙ্ক কাকা বইগুলো বিক্রি করে যা পান তাই লাভ। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের তো অন্তত কতগুলো প্রিন্সিপ্‌ল্‌ আছে। তিনি তো জানেন, নিজের জিনিস রাখবার কিংবা নষ্ট করে ফেলবার যে-কোনো লোকের অধিকার আছে, অন্যে যে উদ্দেশ্যেই তার জিনিসে হাত দিক, তাকে চুরি ছাড়া আর কিছুই বলে না। পরীক্ষার হলে মাত্র দুটো অঙ্ক টুকতে পারলেই একটি ছাত্র তরে যেতে পারে—একটা বছর তার নষ্ট হয় না—কিন্তু এই যুক্তিতে হেডমাস্টার কি অঙ্ক দুটো নকল করতে দেবেন ?

আসল কথা—কাউকে শ্রদ্ধা করা যাচ্ছে না এখানে, কাউকেই না। কানাই পাল, শশাঙ্ক নিয়োগীদের সম্পর্কে কেউ কিছু আশা করে না, কিন্তু বুড়ো হেডমাস্টারও এই ভাবে চুরি করবেন ? কোনো ছাত্র যদি বলে আধভাঙা এই বেঞ্চিটা স্কুলের কোনো কাজে লাগছে না, কাঁধে বয়ে বাড়ি নিয়ে যাই—রাজী হবেন হেডমাস্টার ? না, কাউকে শ্রদ্ধা করা যায় না। আর প্রিয়গোপাল—যিনি এত আদরে তাকে কীর্তন শোনাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, যাকে তার এখানে একমাত্র হিতৈষী বলে মনে হয়েছিল, তিনিও—

কলকাতা নিষ্ঠুর, কলকাতা স্বার্থপর, কলকাতা কুটিল। তবু সেই সব নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতা-নীচতার একটা স্পষ্ট চেহারা আছে, তাকে চেনা যায়। এখানে আশ্চর্য—বাইরে থেকে মসৃণ সবুজ ঘাসের মতো মনে হয়, কিন্তু ভেতরে বোড়া সাপের গর্ত—ছোবল দিয়ে লুকিয়ে যায়, টেরও পাওয়া যায় না।

বাড়ির সামনে, পুকুরের ধারে, সেই নারকেল গাছগুলোর তলায় আজ অন্ধকার। কিন্তু একটু দূর থেকেই বিকাশ দেখতে পেলো। একটা গাছের তলায় জটাবাঁধা চুল আর জংলা দাড়ি নিয়ে মেজদা পা ছড়িয়ে বসে আছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল একবারের জন্যে, চমকে উঠল বুকটা। আজ আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি কাঁধের ওপর ? কিন্তু সেই ভয়ে কাপুরুষের মতো পিছিয়ে যাওয়া যায় না, কিংবা ভীতু বাচ্চার মতো চেঁচিয়ে ডাকা যায় না ? 'কাকা বেরিয়ে আসুন একবার, এখানে মেজদা বসে রয়েছে।'

সাহসে ভর করে এগোল কয়েক পা। আর তখন কানে এল চাপা কান্নার শব্দ। মেজদা কাঁদছে।

বিকাশ আস্তে আস্তে এসে পাশে দাঁড়ালো। অন্ধকারে জলেভরা দুটো জলজলে চোখ তুলে মেজদা তাকালো তার দিকে।

ফোঁপানো গলায় মেজদা বললে, 'তুই চোর।'

বিকাশ জবাব দিল না।

ভাঙা গোঙানির মতো আওয়াজ করে মেজদা বলতে লাগল : 'তোরা সবাই চোর—সবাই ডাকাত। আমার সমস্ত বই তোরা চুরি করে নিয়েছিস। তোদের সকলকে আমি খুন করব।'

খুন করার লক্ষণ অবশ্য দেখা গেল না। আবার কান্না আরম্ভ করল। হাতের তেলোয় চোখ মুছতে লাগল ছোট ছেলের মতো।

লোকটা পাগল? না, তার চাইতেও করুণ। একটা শিশুর হাত থেকে খেলনা ছিনিয়ে নেবার নিষ্ঠুরতা অনুভব করল বিকাশ, আরো একবার তার বিজ্ঞ-বিচক্ষণ হেড-মাস্টারকে অত্যন্ত খারাপ লাগল।

'আর তুই?' জলভরা চোখ দুটো এবার দপদপ করে উঠল : 'তুই তো এসেছিস সুমুকে খুন করতে।'

বিকাশ আর দাঁড়ালো না—প্রায় ছিটকে সরে গেল মেজদার কাছ থেকে। পাগলের সেই ফিক্‌সেশন।

সামনের উঠোনেই পায়চারী করছিলেন শশাঙ্ক কাকা। গুনগুন করে রামপ্রসাদী সুর ভাঁজছিলেন : 'আয় মন—বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি—'

মেজাজ প্রসন্ন। হেডমাস্টার কিছু বেশি টাকা দিয়েছেন নিঃসন্দেহ। আর টাকা পেলে কে না খুশি হয়? কিন্তু মেজদার কান্না কানে বাজছে তখনো; কাকাকে অত্যন্ত বীভৎস লাগল বিকাশের।

কাকা বললেন, 'বিকাশ বাবাজী নাকি?'

মেজদা ওদিকে তারস্বরে ডুকরে উঠল হঠাৎ। কাকা ভুরু কোঁচকালেন।

'নুইসেন্স একটা। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে করে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিই, কিন্তু আত্মীয় হাজার হোক। লোকে কী বলবে তাই বলো।'

ইচ্ছে করলেও যে মেজদাকে তাড়ানো যায় না, বাড়িঘর জমিজমায় তারও যে অংশ আছে, এই অপ্রীতিকর কথাটা বলতে গিয়েও বিকাশ সামলে নিলে।

শশাঙ্ক কাকা আবার বললেন, 'পাগলটা আজ কোনো অসভ্যতা করেনি তো তোমার সঙ্গে? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব তাহলে।'

বিকাশ কাকার মুখের দিকে চাইল। আরো বীভৎস দেখাচ্ছে এখন। আর সব উড়িয়ে দেওয়া যায়, সব কথা ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু একথা কিছুতেই ভোলা যায় না এই লোকটা স্ত্রীকে মারে।

যেন একটা পিত্ত ওঠার স্বাদ তার জিভটাকে একেবারে তেতো করে দিল। শুকনো স্বরে বিকাশ বললে, 'উনি ওঁর বইগুলোর জন্যে কাঁদছিলেন।'

'পাগলের কাণ্ড।' কাঁধে একটা গামছা ছিল, তাই দিয়ে মশা তাড়ালেন : 'নিজে সব ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে এখন—'

'সব নিজে ছেঁড়েননি—' সেই পিত্ত-ওঠা স্বাদটা আরো কদর্য হয়ে উঠল বিকাশের মুখে : 'একটু আগেই তো ওঁর এক রিক্‌শা বই নিয়ে গেলেন স্কুলের হেডমাস্টার মশাই।'

একটু চমকালেন শশাঙ্ক কাকা।

'তো-তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। তিনিই বললেন।'

শশাঙ্ক কাকা চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন, 'হ্যাঁ—মানে কিছু বই আমি স্কুলকে দান করেই দিলুম। ভালো ভালো বইগুলো এখানে পড়ে তো পাগলের হাতে নষ্টই হচ্ছে, হেডমাস্টারেরও খুব আগ্রহ দেখলুম, বললুম – নিয়ে যান কিছু, বরং সৎকাজে লাগবে।'

কোনো দরকার ছিল না বলবার, কিন্তু মুখের সেই তেতো আস্বাদটার জন্যেই বিকাশ কথাটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

'কিন্তু হেডমাস্টার মশাই বললেন, বইগুলো উনি টাকা দিয়ে আপনার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন।'

যেন বাজ পড়ল, এইভাবে কিছুক্ষণ থ হয়ে রইলেন শশাঙ্ক কাকা। এবং তারও পরে, সেই আবছা অন্ধকারে তাঁর বীভৎস মুখটা একেবারে জন্তুর মতো বিকৃত হয়ে গেল!

উৎকট গলায় শশাঙ্ক কাকা বললেন, 'হেডমাস্টার বলেছে আমি বই বিক্রী করেছি? আচ্ছা বদলোক তো! আমি ভালো বুঝে বইগুলো সৎকাজে দান করলুম, আর এখন এ-সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমার নামে? লেখাপড়াজানা লোক, বুড়োমানুষ, কিন্তু কী স্কাউনড্রেল বলো দেখি একবার। বুঝেছ—ওই হেডমাস্টারটাও কানাই পালের দলের লোক, আমার নামে স্ক্যাণ্ডাল রটিয়ে আমার পজিসন নষ্ট করে দিতে চায়।'

বিকাশ আবার বলে ফেলল : 'ওঁর ঘরে আমি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সেটও দেখেছি।'

'এন্‌সাইক্লো—' অসহ্য ক্রোধে শশাঙ্ক নিয়োগী পুরো নামটাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। ফেটে পড়লেন তার বদলে।

'তোমারই বা এত কৌতূহল কেন বাবাজী? সব ব্যাপারে কেন তুমি মাথা গলাতে যাও? এখানে চাকরি করতে এসেছ তাই করো। কিন্তু তার বদলে তোমায় গোয়েন্দা-গিরি করতে কে বলেছে?'

বিকাশ এক পা পিছিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে স্নেহ-সৌজন্য মিষ্টি কথার খোলসটা খসে পড়েছে কাকার মুখের ওপর থেকে। একটা মাংসাশী জন্তুর কতগুলো ধারালো দাঁত

বেরিয়ে এসেছে ক্ষিপ্তভাবে।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিলেন শশাঙ্ক কাকা।

সেই অভিনেতার সেই আশ্চর্য সংযম।

হঠাৎ বিকাশের কাঁধে একটা থাবড়া মেরে হাঁ-হাঁ করে হেসে উঠলেন সজোরে।

'কিছু মনে কোরো না বাবাজী। হেডমাস্টার তোমায় ঠাট্টা করেছে, আমিও একটু ঠাট্টা করলুম। ও-সব ছেঁড়াখোঁড়া বইয়ের আর দাম কী—পয়সা দিয়ে কেউ কেনে ও-সব? যাও যাও, বাড়ির ভেতরে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করো গে।'

ছাব্বিশ

সেতারটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখল সুমু। মুখে চাপা ভয়ের ছায়া একটা।

'কী হল? সাধা হয়ে গেল এর মধ্যে?'

'জানেন বিকাশদা, কাল রাতে একেবারে ঘুমোতে পারিনি। এত ভয় করছিল।'

'কেন? কিসের ভয় আবার?'

'স্বপ্ন দেখলুম একটা। মনে হল, বাইরে খুব ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে আর ছোট মাসিমা এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।' সুমুর গলার স্বর কাঁপতে লাগল: 'আমাকে বললে, আয় সুমু—বাগানে যাই, অনেক আম পড়েছে হাওয়ায়, দু'জনে মিলে কুড়িয়ে আনি। আমি আর ছোট মাসী অমনি করে আম কুড়োতুম কিনা। চমকে জেগে উঠলুম। এত ভয় করতে লাগল, কী বলব।'

বিকাশ হাসল: 'স্বপ্ন স্বপ্নই। কোনো মানে নেই ওর।'

'কী জানি।' সুমু শিউরে উঠল: 'দিনের বেলা কিছু হয় না, কিন্তু একটু রাত হলে, ওই ঘরটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার কেবল মনে হয়, কখন যেন দরজা খুলে ছোটমাসী বেরিয়ে আসবে। জিভটা ঝুলে পড়েছে, নাকের দু'পাশে রক্ত—' বলতে বলতে থমকে গেল সুমু: 'কোলকাতায় গিয়ে বেশ ছিলুম তিনটে দিন জেঠিমার কাছে।'

বাইরে রাত। বাগানে ঝাঁ-ঝাঁ করে ঝিঁঝির ডাক। মেজদার পোড়োমহল থেকে আবার পায়রাদের চঞ্চল পাখা-ঝটপটানির আওয়াজ ভেসে এল একটা।

একবারের জন্যে ছোট মাসিমার কথা ভুলে গেল সুমু। চমকে উঠে বললে, 'ঈস, আজকেও ভাম এসেছে। পায়রাগুলোকে খেয়ে শেষ করে দিলে। সকালে ছেঁড়া পালক আর রক্তের ফোঁটা পড়ে থাকে, এত কষ্ট লাগে যে কী বলব।'

'ভাম? ভাম কী' কলকাতার ছেলে বিকাশ নতুন নাম শুনল একটা।

'ভাম চেনেন না?' সুমু আশ্চর্য হল: 'মস্ত মস্ত বেড়াল একরকমের—বনবেড়াল।

অন্ধকারে হলদে চোখগুলো বাঘের মতো জ্বলে। দেখলেই ভয় করে।'

'আসে কোত্থেকে?'

'কেন, চারদিকেই তো জঙ্গল আর বাগান। তাতেই বাসা। জানেন, ছোটমাসীর মুখোমুখি একটা পড়েছিল একবার, ছোটমাসী একটা কাঠ কুড়িয়ে মারতে গিয়েছিল তাকে—সেটা ফ্যাঁস করে কামড়াতে এল।'

প্রসঙ্গটা সরে গিয়েছিল, কিন্তু আবার ফিরে এল ছোটমাসী। একটু চুপ করে থেকে স্বস্থ বললে, 'কী সুন্দর ছিল দেখতে ছোটমাসী—আর কী ভীষণ ভালো। জানেন, খুব ভালোবাসত আমাকে।'

কানাইবাবুর কথা, প্রভাকরের কয়েকটা টুকরো মন্তব্য আর অমলার কিছু বিবরণ—সব মিলে সেই আত্মহত্যার একটা আভাস আছে বিকাশের মনে। আজকে স্বস্থর ভয় আর বেদনায় ভরা বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা এগিয়ে এল প্রশ্নটা।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব সোনালি?'

স্বস্থ চোখ তুলে তাকালো, একটুখানি রঙের ছোঁয়া লাগল গালে। বিকাশ তাকে সোনালি বলে ডাকলেই এই রঙটা দেখা দেয়।

'তোমার ছোটমাসীমা কেন ও-ভাবে আত্মহত্যা করলেন?'

মুখের রঙটুকু মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভয় আর যন্ত্রণা দেখা দিল আবার।

'আপনি জানেন না—না?'

'ছাড়া-ছাড়া দু-একটা কথা শুনেছিলুম। তা থেকে কিছু বোঝা যায় না।'

একটু চুপ করে থেকে স্বস্থ আস্তে আস্তে বললে, 'সেদিন সন্ধ্যেবেলায় না—বাবা একটা চাবুক দিয়ে মেরেছিল ছোটমাসীকে।'

'সে-কি!' বিকাশ থাবি খেলো: 'হাত তুললেন অত বড়ো মেয়ের গায়ে!'

'সে তো বাবা প্রায়ই তুলতেন—চড়-চাপড় দিতেন। আমার দাদু-দিদিমা কেউ তো নেই, মায়েরা কেবল দুই বোন। দিদিমা মরে যাওয়ার পর খুব ছোট্টবেলা থেকে ছোট-মাসী থাকত আমাদের কাছে। বাবাই তো গার্জেন ছিল, জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি—সব বাবাই দেখত।'

'ছেলেবেলায় যা করেছেন করেছেন, তাই বলে এত বয়সে—'

'হ্যাঁ, কুড়ি-একুশ বছর বয়স হয়েছিল মাসীর। মাসী বলেছিল, রজত কাকাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না—তাই—' স্বস্থ মাথা নামালো।

'কে রজত কাকা?'

'বাবার যেন কেমন ভাই হয়। কী চাকরি করত জানি না, এখানে টুরে আসত মধ্যে মধ্যে, উঠত আমাদের বাড়িতে। আর মাসীর সঙ্গে—' আবার মাথাটা নেমে এল স্বস্থর,

গাল লাল হল : 'মাসীর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল।'

'তা বিয়েটা হল না কেন ?'

কিশোরী সুমু যেন একটু একটু করে বড়ো হয়ে উঠেছিল : 'বাবা বলল, সগোত্র। সগোত্রে কি বিয়ে হয় ?'

'বুঝেছি।' একটু চুপ করে থেকে বিকাশ বললে, 'কিন্তু সেটা তো কোনো কারণ নয়। আজকালকার আইনে তো তা আটকায় না।'

'রজত কাকাও তো তাই বলেছিল বাবাকে। বাবা মানল না। বললে, আইন বদলে কি ধর্মকেও বদলে দেওয়া যায় ? নাকি দেশটা বিলেত হয়ে গেছে যে খুড়তুতো বোনকেও বিয়ে করা চলে ? বাবা যাচ্ছেতাই গালাগাল করল রজত কাকাকে, তারপর বললে, এ বাড়িতে তুমি আর কখনো এসো না।'

'তাতে ছোটমাসীকে চাবুক মারবার দরকার হল কেন ?'

জবাব না দিয়ে সুমু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বাইরের দিকে। কিশোরী মেয়েটির মুখে এখন যৌবনের বিষণ্ণ গভীরতা। এই গভীরতাই ঝর্ণাকে নিয়ে আসে নদীতে, তারপর নদীকে নিয়ে যায় সমুদ্রে। আলোর মধ্যে ছায়া পড়তে থাকে, দোলা লাগে কান্নার অতলে।

সুমুর মুখে লজ্জার আভাটা আর নেই, সেই বিষণ্ণতাটাই থমকে রয়েছে। একটু পরে সুমু বললে, 'মাসী দিনকতক কাঁদল দরজা বন্ধ করে। তারপর একটা চিঠি লিখল রজত কাকাকে। লিখল, তুমি আমাকে নিয়ে যাও এখান থেকে, আমি তোমার সঙ্গে পালাব। আমার কুড়ি-একুশ বছর বয়েস হয়েছে, আমি যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারি। কিন্তু চিঠিটা তাকে দেবার আগে বাবার হাতে পড়ল। রেগে আগুন হয়ে গেল বাবা। বললে, তিন-দীঘির মল্লিকবাড়ির মেয়ে হয়ে তুই যার-তার সঙ্গে পালাবি, কুলে কালি দিবি! তোকে আজ—! তারপর—' সুমুর চোখে জল টলটল করতে লাগল : 'মা ঠেকাতে গিয়েছিল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে আর চাবুক দিয়ে—'

সুমু থামল। এবং এর পরে আর বিকাশের জানবার দরকার ছিল না।

মাথা নামিয়ে বসে রইল সুমু। একটা চোখের জলের ফোঁটা টপ করে পড়ল সেতারটার ওপর, সুমু ব্যস্ত হয়ে আঁচল দিয়ে সেটা মুছে ফেলতে চাইল, তীব্র একটা বেসুরো আওয়াজ উঠল তারগুলো থেকে। বিকাশ দাঁতে দাঁত চাপল। প্রভাকরের স্ত্রী অমলার কথাগুলোই মনে পড়ছিল তার। আসলে সগোত্র-টগোত্র ওগুলো সব বাজে ওজর। শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি জমি-জমা দুই বোনের নামে, শ্যালী বিয়ে করে সরে গেলেই অর্ধেক দাবি তার। রজত কেন—কারো সঙ্গেই হয়তো তিনি মেয়েটির বিয়ে দিতেন না। তা নইলে মোটামুটি শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং অবস্থাপন্ন মেয়েকে তাঁর কুড়ি-

একুশ বছর পর্যন্ত আইবুড়ো রাখবার দরকার ছিল না,—বিশেষ করে নিজের পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েটির বিয়ের কথা যখন এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছেন তিনি।

আত্মহত্যা করে মেয়েটি তার পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়ে গেল। কী চিঠি সে লিখে গিয়েছিল কেউ জানে না, শশাঙ্ক নিয়োগী আগেই সেটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

এবং—এবং—যদি সে আত্মহত্যা না করত, তাহলে শশাঙ্ক নিজেই হয়তো খুন করে বসতেন তাকে। অসম্ভব নয়, সব পারেন এই ভদ্রলোক। আর পারেন যে, সে খবর বাইরের লোকের কাছ থেকে জানতে হয় না, শত্রুপক্ষের কুৎসাতেও না—সুধাময়ী দেবীর মুখের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়। বেঁচে থেকেও মানুষ যে কিভাবে মমি হয়ে যায়, কাকিমাই তার প্রমাণ।

কিংবা—কিংবা, কে বলতে পারে, কাকাই মেয়েটিকে খুন করে, তারপর ফাঁসিতে—

হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠল বিকাশ।

তার সামনে এই মেয়েটি—সকালের আলোর মতো, সূর্যমুখীর মতো; সুনু সুবর্ণা—যার নাম সে দিয়েছে সোনালি। সোনালিকেও কি একদিন এমনিভাবে হত্যা করা হবে? তাই কি স্বপ্নে তার ছোটমাসী—

স্বেচ্ছায় নয়, আর কেউ বললো বিকাশের মুখ দিয়ে:

'সুনু, চলে যাবে এখান থেকে? এই বাড়ি ছেড়ে?'

সুনুর চোখ দুটো দেখা গেল না, যেন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে। অস্পষ্ট গলায় সুনু বললে, 'যাব। আর একদিনও থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'যদি আমি নিয়ে যাই?'

'বেশ হবে।' মেঘলা মুখে আলো ফুটতে গিয়েই আবার ছায়ায় ডুবল: 'কিন্তু বাবা কি আর যেতে দেবে? চশমার জন্যে পাঠিয়েছিল একবার, কিন্তু আর—'

'যদি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাই আমি?'

বলেই বিকাশ চমকালো, নিদারুণভাবে চমকালো। বিদ্যুতের মতো সামনে ঝলকে উঠল মনীষা। একটা ধারালো হাসির শব্দ শোনা গেল: 'জানতুম, আমি তোমার মনের চেহারাটা সব জানতুম। তাই আমি নিজেই তোমায় মুক্তি দিয়ে চলে গেছি।'

আর একবার থরথর করে কেঁপে উঠল সুনু। সিঁদুরের মতো টকটকে রাঙা হয়ে গেল মুখ, পাথর হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে, হঠাৎ দাঁড়ালো সোজা হয়ে। কোল থেকে ঝনাৎ করে সেতারটা আছড়ে পড়ল মেঝেতে, কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকালো না সুনু, একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে পালালো ঘর থেকে।

ছি-ছি-ছি! বিকাশ চোখ বুজলো। এরপরে আর সুনুর কাছে সে সহজ হতে

পারবে না, কোনোদিন না।

ব্যাঙ্কের হাওয়াটা আবার থমথমে। পা দিয়েই বুঝতে পারা গেল সেটা। আসতে আজ মিনিট কুড়ি দেরি হয়েছিল, ঘরে ঢুকতেই বোঝা গেল, কয়েক জোড়া চোখের চাউনি সাপের মতো অপলক হয়ে আছে তার দিকে।

এমন সম্ভাবনার হেতু ছিল না কিছু। ক্ষমা চাইবার পর থেকে একটা বিজয়-গর্বই দেখা যাচ্ছিল সকলের মুখে-চোখে ; শব্দ করে হাসছিল, চেঁচিয়ে কথা কইছিল প্রদীপ মুস্তফি—গালভর্তি করে পান চিবুচ্ছিল। কিন্তু আজ আবার নতুন কিছু ঘটেছে কোথাও। প্রত্যেকটা মুখ লোহার মতো শক্ত, প্রত্যেকের চোখে হিংস্র বিদ্বেষ, চকচকে ঘৃণা। ধনঞ্জয় দত্ত খাতা আনল একটা।

'আপনি কেন ? প্রিয়গোপালবাবু আসেননি ?'

প্রত্যেকটি কলম, প্রত্যেকটি হাত একসঙ্গে থেমে গেল। যেন একটা বিদ্যুৎ বইল ঘরের ভেতর।

ধনঞ্জয় দত্তর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কী বলতে চাইছিল, বলতে পারল না। তার বদলে প্রদীপ মুস্তফি উঠে এল চেয়ার ছেড়ে। সোজা দাঁড়ালো বিকাশের মুখোমুখি।

'প্রিয়গোপালবাবুর কী হয়েছে, জানেন না আপনি ?'

যেমন উদ্ধত স্বর, তেমনি শ্লেষের ভঙ্গি।

কিছুতেই ধৈর্য হারাব না, এই নিশ্চিত প্রতিজ্ঞায় বিকাশ স্থির রইল। তারপর প্রদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি কি করে জানব ? তিনি তো আমাকে কোনো খবর দেননি।'

'তাঁর তো খবর দেবার কিছু নেই। আপনি নিজেই সব ভালো জানেন।' বিন্দু বিন্দু করে বিষ ঝরে পড়তে লাগল প্রদীপের গলা দিয়ে।

'আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না ? আপনি আর আপনার মুরুব্বি কানাইবাবু কি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লেন ? আজ ভোরে এখানে ক'জনকে পি-ডি অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যে প্রিয়গোপালদাও রয়েছেন—সে খবরটা কি আপনাদের অজানা ?'

'প্রিয়গোপালবাবুকে—' বিকাশ আশ্চর্য হয়ে গেল : 'পি-ডি অ্যাক্টে ?'

'হ্যাঁ স্যার, পি-ডি অ্যাক্টে।' বিনয়ে যেন বিগলিত হল প্রদীপ : 'বুড়ো অসুস্থ মানুষ, কিছুর মধ্যে থাকেন না, কেবল অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাই তাঁকে এই বয়েসে ঠেলে জেলে পাঠানো হল।'

নির্বোধের মতো বিকাশ বলে ফেললো : 'কে পাঠিয়েছে ?'

'কানাই পাল আর তার দালালেরা। সেই দালাল আমাদের মধ্যেও রয়েছে, তাকে আমরা চিনি।' প্রদীপের চোখ দিয়ে আগুন ছিটকে পড়তে লাগল : 'ভেবেছেন পার পাবেন আপনারা? একদিন এর পূরো হিসেব নেব আমরা, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

চেয়ারের মধ্যে বিকাশ শক্ত হয়ে রইল। এত বড়ো বীভৎস মিথ্যারও কোন জবাব দেওয়া গেল না।

হঠাৎ গলা চড়িয়ে প্রদীপ চিৎকার করে উঠল : 'প্রিয়গোপালদা জিন্দাবাদ!'

কেরানী-বেয়ারা—সাত-আটটি গলা একসঙ্গে সুর মেলালো : 'জিন্দাবাদ!'

'চক্রান্তকারী আর দালালেরা—'

'নিপাত যাক—নিপাত যাক।'

'ইনকিলাব—'

'জিন্দাবাদ।'

এই ধ্বনিগুলো বিকাশও তুলেছে, আজও তোলার জন্যে সে তৈরী। কোনো রাজনৈতিক দল তার নেই, কিন্তু সব মানুষের ন্যায্য লড়াইয়ের সেও শরিক, তাদের দুঃখের সমান অংশীদার। কিন্তু আজকের এই অবস্থাটা অদ্ভুত। কোনো কারণ নেই, অথচ সে দালাল; কোনো অপরাধ নেই—তবু সে শত্রুপক্ষ। দরকারী কাজগুলো করা হয়নি বলে প্রশ্ন তুলেছিল, অতএব সে প্রতিপক্ষ; ক্যাপিটালিস্ট কানাইবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় আছে—সুতরাং তাকে নিঃসন্দেহে ছাঁটাই করতে হবে।

অকারণ প্রতিহিংসা কেবল বুর্জোয়াদেরই? অবিচার আর কোথায়ও নেই? আর এই কি সংহতিবদ্ধ সংগ্রামের রাস্তা? কেউ অফিসার হলেই সে ব্রাত্য, কাজ করতে বললেই রিঅ্যাক্শনারী?

মাথার প্রত্যেকটা কোষে কোষে তার কণায় কণায় আগুন জ্বলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটু আসছি।'

কেউ জবাব দিল না।

সে পা বাড়াতেই পেছন থেকে সেদিনের মতো আজও ভেসে এল মন্তব্য। ধনঞ্জয়ের গলা। 'মুস্তফি, তোমার পালা এবারে। খবর দিতে চললেন।'

প্রদীপ কিছু একটা জবাব দিল, কিন্তু কানে গেল না বিকাশের। মাথার ভেতরে ভেতরে সেই আগুনের যন্ত্রণা নিয়ে সে বেরিয়ে এল রাস্তায়। একটা রিক্শ নিল, সোজা রওনা হল কানাইবাবুর বাড়ির দিকে। কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু আপাতত—এই মুহূর্তে এ ছাড়া কিছু আর সে ভেবে পেল না।

কানাইবাবু স্নান করতে গিয়েছিলেন। চাকর বললে, 'বসুন, বাবু আসছেন।'

দোতলার সেই বারান্দা নয়, অন্তরঙ্গ চায়ের আসর নয়, কানাইবাবুর অফিস। ঝক-

ঝকে, ফিটফাট। র‍্যাকভর্তি সাজানো ফাইল। দেওয়ালে দেশনেতাদের ছবি। এনলার্জ করা একটা বড়ো ছবিতে শুকনো মালা-গলায় আর একজন কেউ আছেন। কে? যোগেন পাল? অথবা কানাইবাবুর বাবা?

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে দু-একটা ফাইল, পেপারওয়েট, কলমদানি, লাল-নীল পেনসিল। বিদেশী মদের নাম লেখা মস্তবড়ো অ্যাশট্রে। পেছনের রিভলভিং চেয়ারে অম্লান শুভ্র তোয়ালে। সব মিলে প্রাচুর্য, রুচি, আভিজাত্য। এই বাড়ি, এই অফিস—আধা-শহর আধা-গঞ্জের এই অসংলগ্নতায় কোথাও মানায় না।

বসে থাকতে থাকতে বিকাশের মনে হল, কোনো মানে হয় না অসময়ে এখানে আসবার, অকারণে এখন কানাইবাবুকে বিরক্ত করবার। প্রিয়গোপালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাকে দালাল বলা হয়েছে, তাতে কী করবার আছে কানাইবাবুর? ভাবছিল, চাকরটাকে একবার বলে সে এখান থেকে উঠে পড়বে, ঠিক সেই সময় জুতোর শব্দ উঠল।

গেঞ্জি গায়ে, সিল্কের লুঙ্গিপরা কানাইবাবু ঢুকলেন। একটা চাপা সুগন্ধের উচ্ছ্বাস উঠল। ভালো পাউডারের, দামী সাবানের।

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো: 'নমস্কার।'

'নমস্কার—নমস্কার।' কানাইবাবু প্রসন্নমুখে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ এ সময়ে?'

'আপনার খাওয়ার সময় বিরক্ত করলুম।'

'কিছু না, কিছু না—দুটোর আগে আমার খাওয়া হয় না। ব্যাপারটা কী বলুন দেখি? ব্যাঙ্কের কাজ ফেলে একেবারে আমার কাছে?'

জবাব দেবার আগে বিকাশ একটা ঢোক গিলল, কথাটা কোন্‌খান থেকে সে আরম্ভ করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণ হুইস্কির নাম লেখা অ্যাশট্রেটার দিকে অস্বস্তিভরে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বললে, 'শুনেছেন বোধ হয়, আমাদের ব্যাঙ্কের প্রিয়গোপালবাবুকে আজ সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পি-ডি অ্যাক্টে।'

কানাইবাবুর মুখের পেশীগুলো শক্ত হল একটু।

'শুনেছি, শুধু প্রিয়গোপাল নয়, আরো তিন-চারজনকে সেই সঙ্গে।'

'কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু তো ভালো মানুষ। একসময় দেশের কাজে আন্দামান পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন, কিন্তু আজ তো তিনি এ-সবের বাইরে।'

'তাই নাকি?' বাঁকা একটুকরো হাসির রেখা দেখা দিল কানাইবাবুর ঠোঁটে: 'আপনিও সে-কথা মনে করেন? ব্যাঙ্কে ঘেরাও হবার সেই অভিজ্ঞতার পরেও?'

'ওটা ছেড়ে দিন—' ম্লানভাবে বিকাশ বললে, 'ও একটা মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এর ব্যাপার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন ওঁকে পি-ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হল!'

'আপনার সব কথা বোঝবার দরকার নেই, আপনি বাইরে থেকে এসেছেন। স্ত পোলিশ নো দেয়ার জব।'

আবার একটা ঢোক গিলল বিকাশ।

'কিন্তু অফিসে ওরা কী বলেছে জানেন ? আপনার-আমার যোগসাজসে—'

স্পিভলভিং চেয়ারে কড়াং কড়াং শব্দ উঠল একটা। একটু পাশ দিয়ে বসেছিলেন কানাই পাল, এবার সোজা ঘুরে গেলেন বিকাশের দিকে।

'দে সে—লেট দেম সে!' বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বাণীটি উচ্চারণ করলেন তিনি: 'কিন্তু বিকাশবাবু, পুলিস চোখ বন্ধ করে ঘুমোয় না, দেশটা এখনো কমিউনিস্টদের রাজত্ব হয়ে যায়নি। জানেন আপনি কী চলছে গ্রামের ভেতর ? জানেন, পরশুই একটা ধানের গোলা লুট হয়ে গেছে আবার ?'

'প্রিয়গোপালবাবু নিশ্চয়ই সে ধানের গোলা লুট করতে যাননি।'

কানাই পালের দৃষ্টিতে উগ্রতা ফুটে বেরুল।

'যাননি, কিন্তু উস্কানি দিতে বাধা নেই। আপনি কিছু জানেন না এখানকার, কিছু বোঝেন না।'

'কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু—'

'লেট মি স্পীক—' অসহিষ্ণু হলেন কানাই পাল: 'দ্যাট প্রিয়গোপাল ইজ মাই সোর্ন এনিমি। আয়্যাম হ্যাপী যে, এতদিনে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, অ্যাট লাস্ট দে হ্যাভ ডান সামথিং র‍্যাশনাল, দো ইট'স্ এ বিট লেট!'

বিকাশ আবার কথা খুঁজতে লাগল।

'ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। বাড়িতে বুড়ো মা। তাঁকে উনিই দেখাশোনা করেন।'

'বয়েস যদি হয়ে থাকে তাহলে এটাও বোঝা উচিত ছিল যে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে।'

'আপনি ওঁর জন্যে কিছু করতে পারেন না—না?'

'আমি কী করতে পারি ? বীয়িং অ্যান এডুকেটেড ম্যান—' স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে বেরুল কানাইবাবুর মুখে: 'একথা আপনি কী করে বলছেন ? পুলিস কেন শুনতে যাবে আমার কথা ? আর তাছাড়া কী ইন্টারেস্ট আমার ?' কড়াগলায় কানাইবাবু বললেন, 'প্রতিদিন আমার নিন্দে করবে, কুৎসা করবে, আমার শত্রুদের উস্কানি দেবে, আর আমি তাকে সাহায্য করতে যাব—মাপ করবেন মশাই, অতখানি ফিলানথ্রপি আমার নেই।'

'কিন্তু ব্যাঙ্কের ওরা বলছে, আমি আপনাকে নিয়ে—'

'বলছে, বলুক।' কর্কশভাবে কানাইবাবু বললেন, 'এত টাচি কেন আপনি ?'

'আমি অপমানিত বোধ করছি।'

'এত সূক্ষ্ম অপমানবোধ নিয়ে আপনি এসব জায়গায় থাকতে পারবেন না মশাই।' স্পষ্ট নয় গলায় কানাইবাবু বললেন, 'আয়্যাম সরি, আই কাণ্ট হেলপ্ ইউ।'

রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে কানাইবাবু বললেন, 'আচ্ছা আসুন, নমস্কার।'

সে গলা বাগানবাড়ির কানাই পালের নয়। বিকাশ একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালো, বুঝে নিলে অপমানের আসল চেহারাটা, তারপর উঠে পড়ে বললে, 'নমস্কার।'

সাতাশ

সন্ধ্যার পরে ঠাণ্ডা, কিন্তু দিনটা ধারালো হয়ে উঠছে ক্রমশ। সূর্যের তাপ গায়ে লাগে, অফিসে গিয়ে কোট খুলে ফেলতে হয়, কিছুক্ষণ পাখা চালাতে হয়, বন্ধ রাখতে হয় কিছুক্ষণ। পথে ধুলো ওড়ে, হাওয়ায় শুকনো পাতা পাক খেতে থাকে, চারদিক থেকে আমের মুকুলের গন্ধ বয়ে এনে দুপুরের বাতাস নেশা ধরায়। এদিকে-ওদিকে কয়েকটা শিমূল রাঙা হয়ে ওঠে। সন্ধ্যেবেলায় নিয়োগীপাড়ায় পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে বুনো লতাপাতার সঙ্গে ভাঁটফুলের গন্ধ মেশে, দিনে নাগকেশরের পরাগ ওড়ে। এই সব ফুল-গুলো বিকাশের চেনা, ছেলেবেলায় শান্তিপুরে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কোকিলের ডাক শোনা যায়—এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যেতে দেখা যায় তাদের।

কলকাতায় ভাঁটফুল নেই, নাগকেশরের কেশর ঝরে না, আম-গোলাপজামের মুকুল তীব্র-মধুর গন্ধ ভাসে না ; গেরস্তবাড়ির কোকিল থেকে থেকে ডুকরে ওঠে খাঁচার ভেতরে। দক্ষিণ সাগরের হাওয়া টবের ফুল থেকে গন্ধ ছড়ায়। অথবা কোথাও কৃপণ মাটিতে উতরোল হয় হেনার ঝাড়। কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে গায়ের ওপর টুপটাপ করে ঝরে-পড়া দু-একটা বকুল চমক লাগায়—কলেজ স্কোয়ারেও যে শিমূল ফোটে, এই খবরটা হঠাৎ জেনে নিয়ে কেমন ধাঁধা লাগে। কিংবা পুরোনো বালিগঞ্জের কোনো প্রাচীর ঘেরা বাগানে লালে লাল হয় একটুকরো ছোট অরণ্য—দেখে ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না।

আর কলকাতার ময়দান আলো হয়ে যায় গুলমোহরে, এক-আধটা আকাসিয়ায় রঙ ফোটে। দক্ষিণের হাওয়ায় পায়ের তলার বিমর্ষ নির্জীব ঘাসগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে—যেন আরব্য উপন্যাসের যাদু-করা গালিচার মতো উড়ে যেতে চায়। হাতের এক ঠোঙা আঙুর কিংবা মুঠোভরা চীনে বাদামের কথা আর মনে থাকে না—চোখে ঘোর লাগে, ভাবনা-গুলো আবছা হয়ে আসে।

'জানো, কাল চম্পার বিয়ে।'

'কে চম্পা ?'

'বা-রে, আমার বন্ধু। কতবার তো দেখেছ আমাদের বাড়িতে। সেই ফর্সা লম্বা চেহারা, খুব ভালো নাচতে পারে।'

'তা হবে, তার নাচ আমি কখনো দেখিনি।'

'নিজে পছন্দ করে বিয়ে করছে। ওর বর আর্টিস্ট। চম্পা বলে, কালি-ঝুলি মাখিয়ে এমন অদ্ভুত সব ছবি আঁকে, ভাই! একদিন দুটো গোলমতন কী এঁকে, তার একটাতে দুটো লম্বা লম্বা শিঙের মতো চোখ বসিয়ে বললে তোমার পোর্ট্রেট। আমি শাসিয়ে দিয়ে বললুম, এ-যাত্রা ক্ষমা করছি, কিন্তু বিয়ের পর যদি ও-রকম পোর্ট্রেট আঁকো আমার, তা হলে পরদিনই ডিভোর্সের মামলা করব আমি।' যেন ঘুমে-জড়ানো একটুকরো হাসি শোনা যায় মনীষার: 'রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হচ্ছে। ওরা বদ্যি তো, ছেলেটি আবার সিডিউলড কাস্টের। চম্পার বাবা খুব রেগে রয়েছেন।'

'চম্পা যা খুশি করুক। কিন্তু আমি আর একটি মেয়ের কথা ভাবছি। তার পাত্রটি পাশেই বসে রয়েছে। কাস্টের কোনো গোলমাল নেই, রীতিমত সানাই বাজিয়ে মন্ত্র পড়ে বিয়ে হতে পারে। আর পাত্রটি এই মর্মে কথা দিচ্ছে যে ছেলেবেলায় স্কুলের রাফ খাতায় মাস্টারমশাইদের ছাড়া আর কারুর ছবি সে কখনো আঁকেনি, ভবিষ্যতেও আঁকবে না।'

ঘোর কেটে যায়। মনীষা চুপ। এই গঙ্গা, ময়দান, পশ্চিমের আকাশে চাঁদের ফালি, হাওয়ায় গুলমোহরের উড়ন্ত পাপড়ি—বড়ো বড়ো অফিসের ছায়া ঝুলে আছে তার তিন দিকে। নিউ সেক্রেটারিয়েটের মাথার ওপর আলোটা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা রক্তনেত্রের মতো। মনে হয়, চোখ রাঙানো আলোটা যেন ধমক দিয়ে উঠবে।

'মণি—'

'আর একটু সময় দাও আমাকে।'

সে সময় কখনো এল না। বাংলা দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে অনেক ভাঁট ফুটল, নাগকেশরের পরাগ ঝরল, শিমুল রাঙা হল; কলকাতার ময়দানে শুরু হল গুলমোহরের উৎসব—দক্ষিণের হাওয়ায় পায়ের তলার ঘাস রূপকথার ম্যাজিক-কার্পেটের মতো উড়ে যেতে চাইল, পুরোনো বালিগঞ্জের বাগানে অশোক কিংশুক মোহ ছড়ালো, কত চম্পা-নীলিমা-ডলি-ডালিয়ার বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু মনীষারই আর সময় হল না।

'নমস্কার স্যার—'

ব্যাঙ্কের বাড়িটায় ঢুকতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল বিকাশ। মনীষা কোথাও নেই। সামনে দাঁড়িয়ে সেই কানাই পালের সেই সরকার।

'নমস্কার।'

'একটা কথা ছিল।'

'বেশ তো, চলুন ওপরে। ওখানে বলা যাবে।'

'না, ওপরে নয়।' সরকার একটু কিন্তু-কিন্তু করতে লাগলেন: 'এখানে বললেই ভালো হয়।'

বিকাশ ভুরু কোঁচকালো। এখানকার কোনো লোক একান্তে কোনো কথা বলতে চাইলেই তার খারাপ লাগে এখন। কেমন সন্দেহ হয়, নিশ্চয় বিস্বাদ বিরক্তিকর কিছু বলবে।

'বেশ, বলুন।'

সরকার একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলে।

'যদি কিছু মনে না করেন—'

অর্থাৎ মনে করতেই হবে এমন অরুচিকর প্রসঙ্গ কোনো। বলতে ইচ্ছে করল, 'আমার এখন সময় নেই, কিছু মনে করতে হবে এমন কথা শোনবারও একবিন্দু উৎসাহ নেই আমার—' কিন্তু সর্বশক্তিমান কানাই পালের লোককে চটানো যায় না। এবং—সেই দিনই কানাইবাবু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে প্রশ্রয় তিনি দিতে পারেন নিজের ইচ্ছেমতো, আবার রাশও টেনে নিতে পারেন যখন খুশি। তখন অনায়াসেই তিনি বলতে পারেন— আপনি অপমানিত হচ্ছেন সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, কিন্তু সেজন্যে কী করতে পারি। আমি কাজের লোক, এ সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত করবেন না।

বিরস গলায় বিকাশ বললে, 'বলুন না।'

'বাবু একটু রাগ করেছেন আপনার ওপর।'

অর্থাৎ প্রিয়গোপালের কথাটা, নিজের অসম্মানের কথাটা জানাতে গিয়ে মহামহিম কানাই পালকে অপমানিত করা হয়েছে। ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত রাগে জ্বালা করে উঠল বিকাশের।

'কেন, আমি তাঁর কী করেছি?'

কথার ভঙ্গিতে সরকার একটু চমকালেন।

'না, আপনি কিছু করেননি। কিন্তু একটা কথা রটেছে।'

এখানে সব সময় সব কিছু রটতে পারে, না রটাই অস্বাভাবিক। বিকাশ কুটিল ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল: 'কী রটেছে? মানুষ খুন করেছি আমি?'

আরো বেশি চমক লাগল সরকারের। তিনি জিভ কাটলেন।

'আরে রাম রাম, ও-সব বাজে কথা কে বলছে! মানে—বাবু শুনেছেন যে আপনি বলে বেড়াচ্ছেন—'

'কী বলে বেড়াচ্ছি?'

সরকারবাবু থতমত খেলেন একবার।

'ইয়ে, মানে কথাটা ভালো নয়। আপনি নাকি নিয়োগীমশাইকে—'

'নিয়োগীমশাই?'

'মানে আপনার কাকাকে বলেছেন যে আমাদের বাবুই পুলিসের কর্তাদের বলে প্রিয়গোপালবাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন—কারণ পুলিস, এস-ডি-ও'র সঙ্গে বাবুর খুব দহরম-মহরম, তাঁর ওখেনেই এঁদের মুর্গী আর ব্র্যাণ্ডির খানাপিনা চলে। আর নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে বাবু সব আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।'

বিকাশ হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। এমন একটা কথাও যে রটতে পারে, সব চাইতে উদ্ভট কল্পনাতেও তা ভাবা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখানে সব সম্ভব।

'আমি বলেছি এ-কথা?'

বিকাশের চোখের দিকে তাকিয়ে সরকার পিছু হটতে লাগলেন: 'মানে—আপনি স্যার নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্রলোক, এ-সবের মধ্যে আপনি থাকবেন এ হতেই পারে না। কিন্তু শশাঙ্কবাবুই বলছেন এ-সব।'

'আপনি শুনেছেন নিজের কানে?'

'আজ্ঞে স্বয়ং বাবুই শুনেছেন।'

বিকাশের ভয় হতে লাগল, সরকারকে পাছে একটা চড় মেরে বসে সে।

'কোথায় শুনলেন?'

'পঞ্চায়েতের মীটিঙে। সেখানে নানা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছিল, গাঁয়ে দু-দুটো দল আছে জানেন তো। আর নিয়োগীপাড়ার ওরা—ওরা তো বাবুদের জাত-শত্রু। সেখানেই ফস করে নিয়োগীমশাই একেবারে বাবুর মুখের ওপর—'

বিকাশ শক্ত হয়ে রইল। পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নেই।

'একথা বলেছেন শশাঙ্ক কাকা?'

'আজ্ঞে বলেছেন বইকি। বাবু নিজের কানে শুনেছেন।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা একবার চেপে ধরল বিকাশ। তারপর বললে, 'কেউ যদি বানিয়ে বানিয়ে যা খুশি বলে বেড়ায়, তার জন্যে আমি কী করব। আমি তো দুনিয়া-সুদ্ধ লোকের মুখ চেপে বন্ধ করতে পারি না।'

'আজ্ঞে তা তো বটেই, তা তো বটেই—' গোটা-দুই খাবি খেলেন সরকার: 'কিন্তু আপনি শশাঙ্কবাবুর আত্মীয় বলেই—'

'বাজে কথা। আমি ওঁর আত্মীয় নই। বাড়িতে থাকি এই পর্যন্ত। আচ্ছা চলি—' বিকাশ হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো: 'আমার দেরি হয়ে গেছে।'

'একটু দাঁড়ান—' সরকার ডাকলেন: 'একটা কথা শুনবেন আমার?'

দাঁতে দাঁত চেপে বিকাশ বললে, 'বলুন।'

'আপনি যদি একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করেন—'

তার মানে, গিয়ে চাটুকারিতা করতে হবে এখন! করযোড়ে বলতে হবে: 'হে এই গ্রামের মুকুটহীন অধীশ্বর জগদীশ্বরো বা—আমি আপনার একান্তই বশম্বদ অনুগত প্রজা। আপনার পবিত্র নামে কলঙ্কলেপন করতে পারি—এত বড়ো ধৃষ্টতা আমি পাব কোথায়! অতএব বিশ্বাস করুন।'

মুখে এসেছিল, আমি কোনো কানাই পালের খাস জমির প্রজা নই, তার হুইস্কি-বরদার নই অথবা অফিসের কর্মচারী নই যে, কথায় কথায় সেলাম বাজাতে হবে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সব কথা বলা যায় না। বিকাশ বললে, 'যদি সময় পাই দেখা করা যাবে দু-চারদিন পরে। আচ্ছা আসুন তা হলে, নমস্কার। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল সরকার তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে। আর যে কথা তার মনে ছিল, মুখে বলা হয়নি, তার সবটাই সরকারমশাই পৌঁছে দেবেন কানাই পালের কাছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিজের মনেই সাপের মতো গর্জন করল বিকাশ: চুলোয় যাক—চুলোয় যাক।

অফিসের কাজ চলল যন্ত্রের মতো। একটা নিঃশব্দ প্রতিরোধের প্রাচীর চারদিকে। অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, বিরূপতা। আসবার পর ক'দিনের মধ্যে এই মানুষগুলো কত ঘনিষ্ঠ কত অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়গোপাল অভিভাবকের মতো উপদেশ দিতেন তাঁকে, প্রদীপ মুস্তফি এসে বলত: 'কাজের আজ বড্ড প্রেশার আছে স্যার, আমাকে কিছু খাওয়াতে হবে।'

কিন্তু কী আশ্চর্যভাবে দেখতে দেখতে সকলের শত্রু হয়ে গেল সে।

অফিসে সে একটা প্রতিপক্ষ, একজন বুর্জোয়া টাইর‍্যান্ট। মেজদার বইগুলোর কথা বলতে না বলতে শশাঙ্ক কাকার কয়েকটা শ্বাপদ-দন্ত বেরিয়ে এসেছে: 'তুমি বাইরে থেকে এসেছ, সব ব্যাপারে নাক গলানোর দরকারটা তোমার কিসের হে।' আশা করা যাচ্ছে, এতক্ষণ কানাই পালের চোখেও হিংস্র নীল আলো জ্বলে উঠেছে।

চমৎকার।

দু হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বিকাশ ভাবতে লাগল, চমৎকার। এখানে কারো নির্বিবাদে দাঁড়িয়ে থাকার জো নেই, নোংরা-দলাদলিতে যে-কোনো একটা দিক বেছে নিতেই হবে। নইলে কারোরই নিস্তার নেই, হয় রামবাণ, নইলে রাবণের হাতের শক্তি-শেল। ক্ষুরের ওপর বসতি আর কাকে বলে!

গ্রাম দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজে'র শুধু বাইরেটাই বদলায়।

নইলে ভেতরে ভেতরে সেই এক কদর্যতা, এক আবর্জনা।

বদলাবে কারা? প্রদীপ মুস্তফিরা? কিন্তু এত অসহিষ্ণু—এত অসংযত হয়ে?

এই সময় মনীষা কাছে থাকলে—

কিন্তু মনীষা কোথাও নেই, সে হারিয়ে গেছে।

বাড়িতে যখন ফিরল, তখন কোথায় বেরুচ্ছিলেন শশাঙ্ক কাকা। শার্টের ওপর ভাঁজ-করা র‍্যাপার, সন্ধ্যের পর গায়ে চড়াবেন।

'এই যে বাবাজী।'

বিকাশ চট করে জবাব দিতে পারল না। ভদ্রলোককে দেখবামাত্র যেন একরাশ রক্ত ছুটে গেল তার মাথায়।

'সব ভালো চলছে?'

'আজ্ঞে।'

'ব্যাঙ্কে আর কোনো গোলমাল নেই?'

'আজ্ঞে না।'

কাকা যেন নিরাশই হলেন একটু। আরো খানিকটা গোলমাল পাকিয়ে উঠলে যেন খুশি হতেন তিনি। বিকাশের মনে পড়ে গেল, কাকা অন্যের মামলা-মোকর্দমায় তদ্বির করে বেড়ান, মিথ্যে সাক্ষী জোটান, উকিলের টাউটগিরিও করে থাকেন। এ তাঁর পেশাও বটে নেশাও। শশাঙ্ক আবার বললেন, 'মেয়েটা তা হলে সেতার শিখছে তোমার কাছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হবে কিছু মেয়েটার? মগজে পদার্থ আছে?'

'ভালোই হবে। সুরের কান আছে, চট করে বুঝতে পারে।'

'তুমিই জানো বাবাজী—' শশাঙ্ক হঠাৎ উদাস হয়ে গেলেন: 'আমার আর কী! বয়েস তো হচ্ছে, আমরা আর ক'দিন। তখন সব ভাবনা তো তোমারই।'

মনে মনে একটা হোঁচট খেল বিকাশ। কথাটার অর্থ যেন ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যাচ্ছে না। এত লোক থাকতে তাকেই সুনুর সব ভাবনা ভাবতে হবে কেন, এটা ঠিক স্পষ্ট হল না তার কাছে।

অন্য সময়, অন্য দিন হলে এই কথাটা একটা সুর তুলত তার মনে, বুকের তারে ঝিন-ঝিন করে উঠত একবার, চকিতের জন্যে সে মনীষার কথা ভুলে যেত, একটা অস্পষ্ট সম্ভাবনার দিগন্ত দেখা দিত কোথাও, একটা নতুন গান যেন গুনগুন করত রক্তের ভেতরে। কিন্তু আজ সুর ছিল না, কিছু ছিল না—কেবল কানাই পালের সরকার এসে দাঁড়াচ্ছিল তার সামনে।

আর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন কাকিমা আর স্বস্তু। কান্না উঠেছে কাকিমার গলায়।

'ওগো—কী করছ, কী সর্বনাশ করছ!'

শশাঙ্ককে টেনে তোলা যায় না—এমন অবস্থা।

মেজদা হাঁপাতে হাঁপাতে যখন দৌড়ে পালিয়ে গেল, তখনো বিকাশের হাত ছাড়িয়ে খ্যাপা মোষের মতো তার দিকে ছুটে যেতে চাইছেন শশাঙ্ক। রুদ্ধশ্বাসে বলে চলেছেন, 'শেষ করব—ও শালাকে আজ খুন করব—'

প্রভাকর বলেছিল, 'চলে আয়।'

বিকাশ বলেছিল, 'হ্যাঁ, কাল সকালেই চলে আসব। আর একদিনও ওখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব আমি।'

অমলা বলেছিল, 'কিছু ভাববেন না, কোনো অসুবিস্তা হবে না আপনার।'

হিন্দী 'অসুবিস্তা' শব্দটা নিয়েও আজ আর ঠাট্টা করা যায়নি অমলাকে। বিকাশ সব ঠিক করেই উঠে পড়েছিল। আর কিছু ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই। স্বস্তু? সোনালি? স্বর্ণা? কিন্তু তার নিয়তিকে ঠেকাবার সাধ্য নেই বিকাশের—সে তো বিধাতা-পুরুষ নয়।

তবুও দুঃখ। সে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি নেই কিছুতেই। কেন সে এল এখানে? কী দরকার ছিল?

এই ভাবনার মধ্য দিয়েই সে আসছিল। রাত দশটা বাজে—অন্ধকারে আর নির্জনতায় থমথম করছে নিয়োগীপাড়ার পথ। আসতে আসতে এক জায়গায় শিউরে থেমে গেল তার টর্চের আলোটা।

পথের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে রক্তমাখা একজন মানুষ।

হৃৎপিণ্ড থমকে গেল বিকাশের। মেজদা?

না—লোকটি শশাঙ্ক নিয়োগী।

আটাশ

রাতটা যেন দুঃস্বপ্ন।

চিৎকার, ডাকাডাকি, লোকজন। ধরাধরি করে রক্তমাখা শশাঙ্ককে বাড়ি নিয়ে যাওয়া। কাকিমা নিঃশব্দে পড়ে গেলেন সিঁড়ির ওপর, ডুকরে কেঁদে উঠল স্বস্তু, ছাইয়ের মতো মুখে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল ছোট ছেলেমেয়ে দুটো।

শুধু মেজদারই কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; হয়তো কোথাও বসেছিল জংলা আম-

বাগানের ভেতরে, মুখ গুঁজে ছিল ভাঙা বাড়িতে তার ধ্বংসশেষ লাইব্রেরীর মধ্যে ; কিংবা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল সেই অন্ধকার সিঁড়িটার তলায়। আর চারদিকের নিয়োগীপাড়া থেকে —অন্য সময়ে যে-পাড়া প্রায় নির্জন মনে হয়—দলে দলে লোক এসে জুটে গিয়েছিল শশাঙ্কর বাড়িতে, গোটা পঁচিশেক লণ্ঠনের আলোয় উঠোন, সিঁড়ি, দোতলা, নীচের দালান আলো হয়ে গিয়েছিল। সেই আলোয় আর কোলাহলে পোড়ো মহলের পায়রা-গুলো জেগে উঠেছিল আঁতকে—ইতস্তত ওড়াউড়ি করছিল তারা।

নিয়োগীপাড়া তোলপাড়। শশাঙ্কর মাথায় লাঠি পড়া মানেই পাড়ার ইজ্জতে ঘা পড়া। উঠোনে দাঁড়িয়ে বাঁকাবাবু বক্তৃতা করছিলেন: 'আমি জানি—অনেকদিন থেকেই পালপাড়ার ছোঁড়াগুলো তাক করছে। সেই পঞ্চায়েতের মীটিঙের পর কানাই পাল—'

কলারওলা গেঞ্জী আর চোঙা প্যান্টপরা রোগামতন তেইশ-চব্বিশ বছরের একটা ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল: 'দেখে নেবো শালা পালপাড়াকে!'

বিকাশের এ-সব শোনবার সময় ছিল না, উৎসাহও না। একটা সাইকেল নিয়ে সে ছুটল প্রভাকরকে ডাকতে।

আর একজন ডাক্তারও এসে পড়েছিলেন নিয়োগীপাড়া থেকে। ব্যাপারটা যতখানি গুরুতর ভাবা গিয়েছিল তা নয়। মাথাটা একটু ফেটেছে, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। যারা মেরেছে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শশাঙ্ককে বেশ করে উত্তম-মধ্যম দেবার। ঠিক সেই কাজটিই তারা করেছে।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার সময়েই শশাঙ্কর জ্ঞান এল। প্রথমে উঃ করে উঠলেন, তারপর বেশ স্পষ্ট গলায় বললেন, 'শালা!'

প্রভাকর বললে, 'কেমন আছেন এখন?'

শশাঙ্ক চোখ মেললেন। চেয়ে দেখলেন চারদিকে। চোখ মিটমিট করলেন বার-কতক, যেন সবটা অনুধাবন করে নিতে চাইলেন। কিন্তু মাথা তাঁর পরিষ্কার, নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছাড়াও পরের মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করে বেড়ানো তাঁর পেশা, অতএব মগজের ভেতরে ধোঁয়াটা তাঁর বেশিক্ষণ রইল না।

বিকট মুখ করলেন একবার। তারপর আবার স্বগতোক্তি।

'ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল শালারা। পাঁচ-ছ'টা একসঙ্গে। যদি মুরোদ থাকত, সামনাসামনি এসে—উঃ, ডান হাতটা যেন ভেঙে দিয়েছে একেবারে!'

ভাঙেনি বিশেষ কিছুই। কিন্তু মাথার ঘা শুকোতে আর গায়ের ব্যথা সারতে দিন পনেরো সময় লাগবে অন্তত।

'ওই কানাই পাল—' এবার কয়েকটা অকথ্য গালাগালি বেরিয়ে এল: 'যদি ওকে

আমি বাস্তুহারা না করি—'

ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়েছিল প্রভাকর। বিকাশের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাইরে। বারান্দায় তখনো উত্তেজিত নিয়োগীদের জটলা। প্রভাকর বিকাশকে নিয়ে একেবারে চলে এল বাইরের উঠোনে।

'স্ট্যামিনা দেখেছিস একবার লোকটার? এমন ঠ্যাঙানি খেয়েছেন, কোথায় ঝিম মেরে পড়ে থাকবেন—তা নয়, জ্ঞান হতে না হতেই খিস্তির বান ডাকিয়েছেন। একেই বলে গ্রাম্য এনার্জি—বুঝেছিস? এ তোদের শহুরে ব্যাপার নয় যে, এক ঘা খেতে না খেতেই বাপ্‌রে বলে চিৎ হয়ে পড়া, তারপরেই হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা! এখানকার মানুষের—' একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বাঁকা হাসি হেসে প্রভাকর বললে, 'এখানকার মানুষের গলাটা কেটে নে—তারপর সেই মুখ থেকে যে শেষ কথাটা শুনতে পাবি, সেটিও একটি মোক্ষম খিস্তি!'

'এ অবস্থায় তুই ঠাট্টা করছিস প্রভাকর?'

'ভুলে যাচ্ছিস কেন বিকাশ, দেশছাড়া হলেও এই নিয়োগীদেরই ছেলে আমি। আর এদের হাড়ে হাড়েই চেনা আছে আমার। কিচ্ছু ভাবিসনি—এরকম এক-আধটু বীররস, দুটো-একটা পতন ও মূর্ছা না হলে এখানকার নাটক ঠিক জমে ওঠে না। যতদূর মনে হচ্ছে, শ্রাদ্ধ এরপরে আরো গড়াবে।'

গড়াবে যে, তাতে বিকাশেরও সন্দেহ নেই কোনো। বাঁকাবাবু বারান্দার কোণায় ক'জন ভীষণ-মুখ ভদ্রলোককে নিয়ে কী সব শলা-পরামর্শ করে চলেছেন। একটু আগেই চোঙা প্যান্ট পরা ছেলেটি হাত তুলে প্রায় স্লোগান দিচ্ছিল: 'সালা পালপাড়াকে দেখে নেব।'

বিস্বাদ ক্লান্ত গলায় বিকাশ বললে, 'এ সব প্রভাকর আমার ভালো লাগছে না। এখানকার কোনো নাটকেই কোনো উৎসাহ নেই আমার। চল্ তোর সঙ্গে যাই। কিছু ওষুধপত্র দিবি তো দে।'

'ওষুধের দরকার হবে না। একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি, তাই যথেষ্ট আপাতত। যদি জ্বর-টর কিছু হয়, তা হলে দেখা যাবে কাল। কিন্তু তুই কী ডিসাইড করলি?'

'কিসের?'

'ভুলে গেলি? কাল সকালে তো আমার কোয়ার্টারে তোর চলে আসবার কথা। অমলা তোর সব গুছিয়ে রেখেছে এর মধ্যেই।'

ঠিক কথা। এই ডামাডোলের ভেতরে মনেই ছিল না। বিকেলবেলা শশাঙ্ক যখন তাঁর সব নখ-দাঁত বের করে মেজদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখনই বিকাশ বুঝে-ছিল এখানে আর এক সেকেণ্ডও থাকা চলে না, এর চাইতে সুন্দরবনের জঙ্গলও

ভালো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পটার শেষ কয়েকটা লাইনই মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

এখানে থাকা যায় না, কোনো স্বাভাবিক মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না এর ভেতরে। তবু কি চলে যাওয়া যায় এই সময়—এই বিপদের মধ্যে? প্রভাকরের দৃষ্টিতে এটা নাটক ছাড়া কিছুই নয়, পতন এবং মূর্ছা থেকে আর একটু ধাতস্থ হলে শশাঙ্ক কাকা গদা হাতে আবার আসরে নেমে পড়বেন তাও ঠিক, কিন্তু সারা জীবন ধরে যে সুধাময়ী দেবী এই সংসারের পেছনে ছায়ার মতো বেঁচে রয়েছেন—তিনি? তাঁর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলা যাবে এ-কথা—আমি চলে যাচ্ছি? যে বাচ্চা দুটো ঘরের কোণায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের ফেলে যাওয়া যাবে? যে খুকুর চোখ দুটো অতলান্ত ভয়ের মধ্যে ডুবে আছে এখন, বলা যাবে তাকে এ-কথা?

প্রভাকর বললে, 'কী ভাবছিস?'

'দু-একটা দিন থেকে যাই বরং। কাকা একটু সুস্থ হলে—'

'সুস্থ হয়েই রয়েছেন উনি—' প্রভাকর আবার বাঁকা হাসি হাসল: 'এখন বিছানায় শুয়েও ওঁর পলিটিক্স্ চলতে থাকবে, বরং আরো উৎসাহের সঙ্গেই চলতে থাকবে। বাইরের অ্যাক্‌টিভিটি তো রইল না, ভালো প্ল্যানিং করতে পারবেন এখন। গালাগালের নমুনাটা দেখিসনি?'

'তুই সিনিক্ হয়ে গেছিস প্রভাকর।'

'সিনিক নয় ভাই, বাস্তববাদী। তোকে ওঁর জন্যে কিছু ভাবতে হবে না বিকাশ, নিজের ভার নিজেই নিতে পারবেন উনি। সেই গেঁয়ো গল্পটা শুনেছিস?' প্রভাকর সিগারেটের ধোঁয়া ছড়ালো: 'হরিনাম শুনতে শুনতে—মরবার ঠিক আগে বুড়ো কর্তা চোখ মেলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বললেন, আমাকে কোথায় দাহ করবি, জানিস তো? ঠিক রাস্তার ধারে—বাঁশ ঝাড়ের পাশে। ওখানেই ভূত হয়ে থাকব। রাত-বিরেতে অন্য শরিকের লোকজন যখন ওখান দিয়ে যাবে, তখন ঘাড় মটকে দেবো এক-একটাকে ধরে। মামলায় হেরে গেছি, মরে গিয়ে উশুল করে নেব সব।'

অন্য সময় হলে হেসে ওঠা যেত, কিন্তু হাসির অবস্থা ছিল না এখন। বিকাশ ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইল।

প্রভাকর বললে, 'কোনো ভাবনা নেই তোর। চলে আয় এই পাঁক থেকে।'

'সেটা ঠিক হবে না প্রভাকর!'

'আমি ডাক্তার, আমি বলছি এমন কিছু নয়। আছাড় খেয়ে পড়েও এর চাইতে বেশি ইন্‌জুরি হতে পারে মানুষের। তাছাড়া তুই যা ভাবছিস তা নয়। দেখার লোক এখন বিস্তর জুটে যাবে নিয়োগী পাড়া থেকে।'

'সবই হতে পারে, প্রভাকর। কিন্তু আমার একটা কৃতজ্ঞতা আছে।'

'অল রাইট—অল রাইট, স্টে অন—' একটু গম্ভীর হল প্রভাকর: 'তবে এখন এ-সবের বাইরে থাকলেই বোধ হয় ভালো করতিস। সে যাক—যখন সুবিধে হয়, আমার ওখানে চলে আসিস তুই। আমার দরজা সব সময়েই খোলা রইল তোর জন্যে।'

প্রভাকরের একটা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বিকাশ বললে, 'জানি।'

সাইকেলে উঠে প্রভাকর চলে গেল। পুকুরটার পাড় থেকে ডাক দিয়ে বললে, 'ভদ্রলোক কেমন থাকেন কাল খবর দিস আমাকে।'

'নিশ্চয় দেব।'

প্রভাকর যাই বলুক, গায়ের ব্যথায় রাত্রে ভালো ঘুমুতে পারছিলেন না শশাঙ্ক। মধ্যে মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ছিলেন, আবার পাশ ফেরবার চেষ্টা করতে গিয়ে কাতরে উঠছিলেন তিনি।

'উঃ—ডান হাতটা ভেঙে দিয়েছে একেবারে। মাথাটা গেল।' তার পরেই এক-একটা বিশ্রী গাল বেরিয়ে আসছিল তাঁর মুখ দিয়ে। কাকিমা অনেক বার বলেছিলেন, 'তুমি শুতে যাও বাবা, আমরা তো আছি!'

'সময় হলে শুতে যাব কাকিমা, আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

তারপর একসময় ঘরের টাইমপীসটাতে দুটো বাজল। নীচে যে বড়ো ওয়ালক্লকটা রয়েছে প্রায় মাস দুয়েক এ বাড়িতে থেকেও যে ঘড়িটাকে বিকাশ কখনো দেখেনি অথচ যার গম্ভীর জড়ানো গলার আওয়াজ সন্ধ্যায় কিংবা মাঝরাতে কোনো রহস্যময় পাতাল-কুঠির ধ্বনির মতো মনে হয়েছে তার, সেই ঘড়িটা থেকেও দুটো শব্দ যেন অনেক নীচের একটা কুয়ো থেকে উঠে এল। তখন কাকার পায়ের কাছে বসে থাকতে থাকতে এক-সময় সারাদিনের ক্লান্ত শরীরটাকে ঘুমের মধ্যে এলিয়ে দিলেন কাকিমা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেও টের পেলেন না।

মেঝেতে—বিনি আর বুড়ো এলোমেলোভাবে ঘুমিয়ে, কোনোমতে তাদের খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপরে আর তাদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখেনি। অন্যদিন তারা বড়ো খাটটাতেই একসঙ্গে শোয়—আজ শশাঙ্ককে বিরক্ত করা হবে মনে করে মেঝেতে যেমন-তেমন করে বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে একটা। বুড়োর মাথা থেকে বালিশ সরে গেছে, সুমু উঠে গিয়ে সেটা ঠিক করে দিয়ে এল।

শশাঙ্ক একটু শান্ত হয়েছেন এতক্ষণে—তাঁরও বড় বড় ঘুমন্ত নিশ্বাস পড়ছে। শুধু সুমুর চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। সন্ধ্যাবেলার চোখের জলের দাগ এখনো গালের পাশে চকচক করছে তার, আর হাত দুটো একটা যন্ত্রের মতো পাখাটা নেড়ে চলেছে একটানা।

'সুমু, এবার তুমি রেস্ট্ নাও একটু। হাত-পাখাটা দাও আমাকে।'

পাখা নামিয়ে রেখে সুস্থ বললে, 'আর দরকার নেই বিকাশদা। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এখন। আপনি বরং যান, শুয়ে পড়ুন এবার।'

'তুমি বসে থাকবে একা?'

'আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি যান।'

বিকাশ একটু হাসল: 'রাত জেগে নার্স করবার অভ্যেস আমার আছে, তোমার চাইতে বেশিই আছে। আমার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

'আমার ভারী খারাপ লাগছে বিকাশদা।'

'তা লাগুক—' কথাটা বলবার মতো সময় এ নয়, তবু বিকাশ বলে ফেলল: 'আরো ভালো লাগছে এই কথা ভেবে যে সবাই যখন ঘুমিয়ে, তখন তুমি আর আমি দুজনেই কেবল জেগে আছি।'

সহজভাবে কথাটা এল না, সহজভাবে বাজলও না। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল সুস্থর মুখের রঙ।

আর তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হল বিকাশ।

'তুমি বোসো, আমি জল খেয়ে আসি একটু।'

নিজেকে সামলে নিয়ে, ব্যস্ত হয়ে উঠল সুস্থ।

'জল তো এ ঘরেই রয়েছে। দিই আমি।'

'তোমাকে দিতে হবে না, আমার ঘরের কুঁজো থেকে খেয়ে আসছি।'

'না না, আমিই—'

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'তুমি বোসো, আমি আসছি।'

জল খাওয়ার দরকার ছিল না, এক বিন্দু তেষ্টা ছিল না তার। বিকাশ বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

এতক্ষণে বোঝা গেল, নিদারুণভাবে ধরেছে মাথাটা। দপ-দপ করছে কপালের দু পাশ, মাথা আর ঘাড়ের সন্ধিতে একটা বোবা যন্ত্রণা স্তম্ভিত হয়ে আছে। রেলিঙে কনুই রেখে, কপাল টিপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে।

পোড়ো মহল নিঃসাড়। পাহারারা ঘুমন্ত। আজ অনেক রাত পর্যন্ত বহু লোকের ভিড় ছিল বলে, বারান্দার দুদিকে প্রহরীর মতো দুটো লণ্ঠন জ্বলছে বলে হয়তো ভাম এসে হানা দেয়নি, অথবা এর মধ্যে কখন এসে সে নিঃশব্দে তার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে গেছে— চারদিকের এই সব গোলমালের মধ্যে তা টেরও পাওয়া যায়নি।

বিকাশ মাথা তুলল। সামনে পশ্চিমের আকাশে নেমে আসছে চাঁদটা। বিকট রকমের লালচে দেখাচ্ছে চাঁদের রঙ—যেন রক্তমাখা। সেই রাঙা বীভৎস আলোতে

পোড়ো বাড়ির একটা অপার্থিব চেহারা—ছন্নছাড়া গাছপালার ভূতুড়ে রূপ—সব হিংস্র আর দন্তুর হয়ে উঠেছে। চাঁদকে, রাতকে, ভাঙা বাড়ির স্তূপকে, জংলা বাগানকে—একটা আকাশজোড়া ঘাতকের মতো মনে হল তার।

বিকাশ চমকে উঠল।

যে ভামটা পায়রা চুরি করে খেয়ে যায়, তাকে বিকাশ কোনোদিন দেখেনি। কিন্তু আর একটা—আর একটা ভয়ঙ্কর ভাম এগিয়ে আসছে সে টের পাচ্ছিল। তার দুটো জলন্ত কপিশ চোখ দেখা যায়, অথচ কোথাও দেখা যায় না; তার পায়ের শব্দ কোথাও নেই, অথচ তো শোনা যায়; তার ধারালো দাঁতগুলো কোথাও ছিল না, অথচ তারা আরক্তিম জ্যোৎস্নার রক্ত মেখে ঝিকঝিক করছিল।

সে ভামটা ঝাঁপ দিয়ে পড়তে যাচ্ছে স্বস্নুর ওপর।

'বিকাশদা!'

বিকাশ কেঁপে উঠল একবারের জন্যে। ঠিক এই সময় স্বস্নুর জন্যে সে তৈরী ছিল না।

স্বস্নু পাশে এসে দাঁড়ালো। লাল জ্যোৎস্না তার মুখে। আকাশের হিংস্র রক্তটার রঙ হঠাৎ বদলে গেছে ম্যাজিকের মতো। স্বস্নুর গালে কপালে এখন কে যেন মুঠো মুঠো করে আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে, তার সরু কুমারী সিঁথিতে যেন সিঁদুরের দাগ পড়েছে একটা। যেন আবির্ভাবের মতো মনে হল, চারদিকের সমস্ত কুটিল নিষ্ঠুরতাকে দু হাতে সরিয়ে দিয়ে আনন্দের মতো, দূরের আকাশের কোনো পবিত্র নবজাত নক্ষত্রের আলোর মতো, এসে দাঁড়ালো মেয়েটি।

স্বর রিণ-রিণ করে উঠল স্বস্নুর চাপা গলায়।

'খুব মাথা ধরেছে না বিকাশদা?'

'টের পেলে কী করে? ইনস্টিংক্ট?'

'বা রে, তা কেন? আমি যে ঘর থেকে দেখছিলুম, কপালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি।'

খেয়াল হল, পেছনের দরজাটা খোলা রয়েছে এবং স্বস্নু সেখানে বসেছিল, সেখান থেকে এই বারান্দাটা দেখা যায়।

'না, ঠিক মাথা ধরেনি—' একটু অপ্রতিভ হয়ে জবাব দিল: 'এই এমনিই—'

'মাথা ধরার তো দোষ নেই, যে-ভাবে কাটল এতক্ষণ। আপনি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন এবারে।' স্বস্নুর স্বরে কৈশোরের কোমল মমতা: 'ভারী ইচ্ছে করছে—আপনার মাথা টিপে কপালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আসি, কিন্তু বাবাকে—'

বলতে বলতে স্বস্নু থেমে গেল—বাজনার রেশটা একটু একটু করে যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনিভাবে হারিয়ে গেল কথাগুলো। আর দপ দপ করতে লাগল বিকাশের কপালের

শিরা দুটো, রক্তের ভেতর দিয়ে কাঁপন বয়ে চলল।

মুঠো করে রেলিংটা চেপে ধরল বিকাশ। এখন কিছু বলা যায় না। বলা উচিত নয়।

সুমু দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে একেবারে পাশটিতে—হাতটা একটু বাড়িয়ে দিলেই ছোঁয়া যায় ওকে। এই মুহূর্তে ওকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নেওয়া যায়, কেড়ে নেওয়া যায় ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এই পিশাচে পাওয়া বাড়িটার গ্রাস থেকে। বিকাশ জানে, সুমু প্রতিবাদ করবে না, করতে পারবে না—এত ভীরু, এত ছোট, এত নিষ্পাপ যে সঙ্গে সঙ্গেই সেই আকর্ষণের মধ্যে হারিয়ে যাবে, একেবারে তলিয়ে যাবে সে।

রেলিঙের ওপর বিকাশের হাতটা থাবা হয়ে উঠল। নিজের সঙ্গেই এখন লড়তে হচ্ছে তাকে। একটু আগেই যে ভামটার কথা সে ভাবছিল, সেটা কি তার নিজের মধ্যেই নখে শান দিচ্ছে এখন ?

সুমু বলল, 'আমার কলকাতার কথা মনে পড়ছে বিকাশদা। ভীষণ ভালো লেগেছিল।'

কথাটা আগেও বলেছে সে। কিন্তু আজ আরো কিছু থেকে গিয়েছিল কথার ভেতরে।

তারপর—হঠাৎ :

'বিকাশদা, আমি মরে যাব।'

'সে কি !'

'আমি জানি, বিকাশদা। ছোটমাসী আমায় ডেকে গেছে। সবাই বলে, মরা মানুষের ডাক ভীষণ খারাপ। যাকে ডাকে তাকে ঠিক নিয়ে যায়। আমি জানি, ছোট-মাসী এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি।' সুমুর স্বর কাঁপতে লাগল : 'আমাকে ভীষণ ভালোবাসত, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

একটু আগেকার উচ্ছৃঙ্খল ভাবনাটার রেশ একটা রূঢ় ধাক্কায় মিলিয়ে গেল।

বিকাশ বললে, 'ছিঃ সুমু, এ-সব আবোল-তাবোল ভাবতে নেই। মরবার পরে মানুষের আর কিছুই থাকে না। ওগুলো সব বাজে কুসংস্কার।'

'না, বিকাশদা, আপনি জানেন না। আপনি তো ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বাবা ঘুমোচ্ছে, মা ঘুমোচ্ছে ; আমারও বুঝি একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল—' তেমনি কাঁপতে লাগল সুমুর গলা : 'হঠাৎ শুনতে পেলুম, পেছনের বন্ধ জানলাটার খড়খড়ির ওপার থেকে ফিসফিস করে ছোটমাসী আমায় ডাকছে : 'এই সুমু, বাগানে যাবি ? ঝড়ে অনেক আম পড়েছে রে।'

এমনভাবে বলল যে একবারের জন্যে বিকাশও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। চাঁদটা আবার কুটিল হয়ে উঠছে—আবার আরক্তিম আলোয় ভাঙা বাড়ি, গাছের মাথা সব দন্তুর। সুমুর মুখ থেকে সরে গেছে আবীরের রঙ—মুছে গেছে কুমারী সিঁথের সিঁদুর,

আবির্ভাবের দৈবী আলোটা হারিয়ে গিয়ে আবার রাক্ষসী মায়া ছড়িয়েছে, সুমুর গায়ে পড়েছে রক্তের ছোপ।

তখন, খুব স্বাভাবিকভাবেই, সামনের একটা গাছে ঝপাৎ করে বাদুড় পড়ল। নিদারুণভাবে চমকে উঠল সুমু, নিজের ভয়ের কুহকেই চাপা চিৎকার করল একটা—দু-হাতে, প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল বিকাশকে।

সেই শরীর—ছোঁয়া—কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সব হারিয়ে দিল। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে চিরকালের অনুভূতিতে অবগাহন করল বিকাশ, তারপর একটা হাত নামাল সুমুর মাথায়। চুলের ভেতরে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে নিঃশব্দতম গলায় বললে, 'ভয় নেই সোনালি, আছি—আমি আছি।'

ঘরের ভেতর কাতরে উঠলেন শশাঙ্ক।

চকিতে নিজেকে সরিয়ে নিলে সুমু, ছুটে গেল ঘরের ভেতর। বিকাশও প্রায় টলতে টলতে চলল তার পেছনে।

কাকিমা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

'ছি—ছি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম? আমাকে ওঠাসনি কেন সুমু? যাও বাবা বিকাশ, তুমি শুতে যাও।'

এবার শুতে যেতেই হবে। কাকিমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার তার আর সাহস নেই এখন।...

...দুদিন পরে, অফিসে আসবার সময় ভারী একটা অস্বস্তিতে মন ছটফট করছিল তার।

এ-সব ব্যাপারে—যেমন নিয়ম— অবধারিতভাবে পুলিস এসেছিল। বিকাশ বাড়িতে ছিল না, সেই ফাঁকে শশাঙ্ক কাকা বলে দিয়েছেন, যারা শশাঙ্ককে মেরেছে—বিকাশ তাদের দৌড়ে পালাতে দেখেছে। তাদের অন্তত তিনজনকে সে চেনে। তারা পালপাড়ার চিরঞ্জীব, কেতু আর নীলু।

বিকাশ আকাশ থেকে পড়ল।

'সে কি কাকা! আমি তো কাউকেই দেখিনি।'

শশাঙ্ক বিছানায় উঠে বসেছিলেন। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথার তলায় চোখ দুটো প্রায় ঢাকা, তবু তারই মধ্যে দিয়ে বিশেষ একটি তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

'তুমি দেখোনি, আমি দেখেছি। তা হলেই হল।'

'কিন্তু মিথ্যে কথা বলব কী করে?' আঁতকে উঠল বিকাশ।

'মিথ্যে কথা মানে?' শশাঙ্ক ভ্রূকুটি করলেন: 'আমাকে মেরেছে সেটাও মিথ্যে

নাকি বাবাজী ?'

'না না—তা, মিথ্যে হবে কেন ? ওরাই হয়তো মেরেছে। কিন্তু—' বিকাশ গোটা ছুই খাবি খেলো : 'আমি তো ওদের দেখিনি। তা ছাড়া ওদের কাউকে আমি চিনিই না।'

'তোমায় চিনতে হবে না, সে আমি ম্যানেজ করব এখন। বুঝেছ, ওই চিরঞ্জীব আর কেতুটাকেই আমার আগে ফাঁসানো দরকার। ও দুটো কানাই পালের দু হাত।'

'কিন্তু আমাকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে। কেস হলে কোর্টে যেতে হবে। আমি কি তখন সামলাতে পারব ? ধরা পড়ে, একটা কেলেঙ্কারী হয়ে—'

'কিস্সু হবে না, কিস্সু হবে না, একটা শিক্ষিত ইয়ং ম্যান না তুমি ?' মাথার ব্যাণ্ডেজ আর মুখের খোঁচা-খোঁচা দু-রঙা দাড়িতে শশাঙ্ক কাকাকে বিকট দেখালো : 'এত মামলা চরিয়ে বেড়াই, বললাম না সব আমি ম্যানেজ করে নেব! দারোগা আজ বিকেলে পাঁচটা নাগাদ একবার তোমায় থানায় যেতে বলেছে—স্টেটমেণ্ট নেবে। অফিস থেকে সেখানে যেয়ো। কিচ্ছু ভাবনা নেই বাবাজী—আমি আছি।'

এ লোকের সঙ্গে তর্ক চলে না, কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গেছে। সুস্থর ভাবনা নয়, কারো ভাবনা নয়—এবার তাকে পালাতেই হবে। এ যে একটু একটু করে শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়ছে সে! এ-ও সম্ভব!

অফিসে গিয়ে—নিজের বিভ্রান্ত শরীর-মনটাকে চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিতে গিয়েই সামনে একটা চিঠি। ব্যাঙ্কের ঠিকানায় লেখা।

প্রত্যেকটা অক্ষর তীরের ফলার মতো জ্বলে উঠল। মনীষার চিঠি।

ঊনত্রিশ

হাসপাতাল থেকে কেবল একটা অপারেশন শেষ করে ফিরেছে প্রভাকর। তোয়ালে কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছিল, বিকাশের আসবার খবরে দ্রুত পায়ে ছুটে এল সে।

'কী ব্যাপার রে! এখন—'

বলা শেষ হল না। দেখল বিকাশের চোখমুখ শাদা হয়ে গেছে, চশমার আড়ালে দুটো ঘোলাটে চোখ সম্পূর্ণ নিবে গেছে তার।

'বোস বোস—টলছিস যে ? শশাঙ্কবাবু ঠিক আছেন ?'

'তিনি ভালোই আছেন।'

'তা হলে ? তোর শরীর খারাপ ?'

'না, শরীর খারাপ নয়—' বেতের টেবিলের একটা কোণ শক্ত করে চেপে ধরে—কয়েকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিকাশ উচ্চারণ করল : 'এই চিঠিটা একটু পড়্। মনীষার চিঠি।'

বাঁ হাতে চিঠিটা কাঁপছিল।

'কী হয়েছে বিকাশ, কিসের চিঠি?'

'পড়লেই বুঝবি।'

'আমি পড়ছি, তুই বোস আগে।'

অন্ধের মতো বিকাশ বসে পড়ল চেয়ারে। চোখ দুটো প্রায় দেখা যায় না। হাত থেকে চিঠিখানা আপনিই টেবিলের ওপরে খসে পড়ল।

কয়েক সেকেণ্ড প্রভাকর দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তাকিয়ে দেখল বিকাশের দিকে। একবার ভাবতে চেষ্টা করল মনীষার চিঠিটা তার পড়া উচিত কিনা।

প্রাণপণে মুখে একটা হাসির ভঙ্গি ফোটাতে চেষ্টা করল বিকাশ।

'কিছু ভাবিসনি, প্রাইভেট-পার্সোন্যাল বলে আমার আর কিছু নেই। চিঠিটা তোরই পড়া উচিত।'

আর একটু দ্বিধা করে খামটা খুলল প্রভাকর। প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফে তার দেখবার কিছুই ছিল না—সেখানে মনীষার যন্ত্রণা, বিকাশকে সে কিছু দিতে পারল না, তারই জন্যে চোখের জল। প্রভাকরের জানবার কথাগুলো এসেছে তারপর।

'কিড্‌নিতে হয়তো স্টোন আছে, হয়তো নেই। কিন্তু আমার আসল রোগটা আমি জানতুম—অনেকদিন থেকেই জানতুম। ডাক্তারই আমাকে বলে দিয়েছিলেন।

আমার রক্তে ক্যানসার। লিউকোমিয়া।

যা ঝড়ের মতো আসে, সঙ্গে সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সে জাতের নয়। ডাক্তার বলেছিলেন, প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে বিন্দু বিন্দু করে শেষ করে আনবে, দিন যাবে, মাস যাবে, দুটো-একটা বছর যাবে, তারপর একেবারেই আমি হারিয়ে যাব। আমার সময়ের সীমা বাঁধা হয়ে গেছে।

ডাক্তার কয়েকটা ওষুধপত্র খেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনিও জানতেন, আমিও জানতুম—কী হবে খেয়ে?

মৃত্যু দু-দিন পিছিয়ে যেতে পারে, না-ও যেতে পারে। দু'দিন—দু'মাস কিংবা বড়ো জোর এক বছর বেঁচে কী লাভ, যদি জীবন শুরু করবার আগেই আমায় ফুরিয়ে যেতে হয়?

কতদিন, কতবার তোমাকে বলতে চেয়েও বলিনি, দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিয়েছি। তুমি দুঃখ পাবে, যন্ত্রণা পাবে—ডাক্তার ডাকাডাকি করবে, পয়সা খরচ করবে—অথচ কোনো অর্থ নেই,—কিছুই হবে না। আমি তো যাবই, আমার যন্ত্রণা আমারই থাক—তোমাকে আর তার মধ্যে টেনে আনতে চাইনি।

কলকাতার বাইরে যখন তুমি ট্রান্সফার নিয়ে এলে, তখন আমায় বলেছিলে, 'মণি,

তুমি যদি বলো, তা হলে থেকে যাই হেড অফিসেই।' আমি বলেছি, 'না না, উন্নতি হবে, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।' উন্নতি হোক, তার জন্মে শুধু নয়। আমি ভেবেছি —আর অভিনয় করতে পারি না, তুমি কাছে এলে আর নিজেকে ধরে থাকতে পারি না— আমার জন্যেই তোমার সরে যাওয়া দরকার।

শেষবার যখন তুমি কলকাতায় এলে, তখন মনে হল, আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারব না। আমার দিনগুলো আঙুলে গোনা হয়ে গেছে এখন। লোভ হল, দারুণ লোভ হল। কিছুই পাব না, যাওয়ার আগে একেবারে কিছুই নিয়ে যাব না তোমার কাছ থেকে? ভাবলুম—অন্তত একটিবার সিঁদুর পরে নিই তোমার আঙুল থেকে, অন্তত ক'টা দিন তোমার কাছ থেকে যতটুকু পারি জীবনটাকে ভরে নিই।

কিন্তু সে তো আমারই স্বার্থপরতা। তাতে কেবল তোমাকেই দুঃখ দেওয়া হত।

হ্যাঁ, আমি বর্ধমানে চলে গিয়েছিলুম। কোনো দরকার ছিল না, কোনোই কাজ ছিল না—সারাটা দিন ঘুরেছি এখানে-ওখানে, বসে থেকেছি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে, শেষ ট্রেনে ফিরে এসেছি কলকাতায়। এ না হলে সেদিন আর আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না আমার।

আমার অন্যায়ের কোনো শেষ নেই—তবু একটা অনুরোধ রেখো। তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা কোরো না। তাতে আমার দুঃখই বাড়বে। কাল আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম আর একবার। আর কতদিন বাঁচব সে-কথা জানবার জন্যে নয়, আর ক'টা দিন আমায় থাকতে হবে সেই খবরটাই দরকার ছিল। ডাক্তার দেখে চমকে গেলেন। বললেন, এক ফোঁটাও যে ভাইটালিটি আর অবশিষ্ট নেই, বেঁচে আছো কী করে? ইমিডিয়েট্‌লি—আজই হস্‌পিট্যালে যাওয়া দরকার।

হস্‌পিট্যাল! তার মানে, ডাক্তারদের কখনো আশা ছাড়তে নেই। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে পর্যন্তও না।

এখন চলাফেরা করতেও কষ্ট হয়। এইবার বিছানা নেব। ছুটি নিচ্ছি আজ থেকে। লিখতে ইচ্ছে করছিল, 'ডেথ্‌ লীভ'—কিন্তু ওরকম কোনো ছুটি লীভ-রুলসে আছে কিনা জানি না।

দোহাই, তুমি দেখা কোরো না, লোভ দেখিয়ো না—দুঃখ বাড়িয়ো না। নিজের মনকে আমি বশে এনেছি—এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দাও আমাকে। সংসারের ভাবনা আর ভাবছি না—ভেবে কী করব? কিছুই তো আটকে থাকে না, হয়তো একরকম করে চলে যাবে। তাছাড়া সামান্য ইন্‌সিয়োরেন্স আছে আমার—প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ক'টা টাকা—'

ডাক্তার বলেই প্রভাকর এই পর্যন্ত পড়ল; তারপর চিঠিটা আস্তে আস্তে নামিয়ে

রাখল টেবিলে।

বিকাশ তেমনি বসেছিল চেয়ারটার ভেতরে। তার দিকে চাইতে পারল না প্রভাকর। দৃষ্টিটা মেলে দিলে সামনের দিকে—নারকেল গাছগুলোর মাথা দুলছে, দুপুরের রোদ ঝকঝক করছে মরা ঘাসের জমির ওপর—দূরের রাস্তায় একটা কালো-সবুজ লরী পোড়া গ্যাসোলিনের ঘূর্ণি তৈরী করতে এগিয়ে যাচ্ছে।

সম্পূর্ণ অকারণ জেনেও বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'কিছু করবার নেই—না?'

প্রভাকর নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরল একবার। একটু সময় নিল জবাব দিতে।

'নাঃ। অন্তত মেডিক্যাল সায়ান্সে নেই। মানুষ যে কত হেল্‌পলেস্‌!'

আবার মিনিটখানেক দূরের দিকে চেয়ে রইল প্রভাকর। বসন্তের হাওয়ার একটা ঝলক উঠে এল মাঠ থেকে, মনীষার চিঠির তিনটে পাতলা কাগজ খস খস করে উঠল, বিকাশ শুনতে লাগল একটা অস্পষ্ট ফিসফিসানি—কলকাতা থেকে—মোহনলাল স্ট্রীট থেকে—আরো অনেক দূরের আকাশ থেকে, না-দেখা সমুদ্র, না-চেনা বনের ওপাশ থেকে মনীষা বলে চলেছে: দোহাই তোমার, দেখা কোরো না, দুঃখ বাড়িয়ো না—লোভ দেখিয়ো না।

বিকাশ চোখ বুজল। ঠোঁট নড়তে লাগল তার। নিঃশব্দে বলতে লাগল: 'না মণি, দেখা করব না, লোভ বাড়াব না—আর দুঃখ দেব না।'

কিছু একটা বলা দরকার—প্রভাকর ভাবল কিন্তু কী বলা যায়?

'এখানে চলে আসবি বিকাশ?'

বিকাশ চোখ ফেলল।

'কী হবে?'

অন্তত শশাঙ্কর জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে সে। অন্তত বীভৎস একটা মিথ্যে সাক্ষী দেবার জন্যে তাকে চাপ দিতে পারবেন না শশাঙ্ক। কিন্তু বিকাশ এখন শশাঙ্কের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। এই মুহূর্তে ওই আলোচনাটার অর্থ নেই কোনো।

'বিকাশ?'

'উঁ?'

'কলকাতায় যাবি একবার?'

'কোনো দরকার নেই—' বিকাশ মনীষার চিঠিটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে সেগুলোকে মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে ফেলল।

তারপর এতক্ষণ পরে—খুব সহজভাবে, প্রায় নিরাসক্ত দার্শনিকের মতো জিজ্ঞেস করল, 'একালে মনীষাদের এইভাবেই মরে যেতে হয়—না ডাক্তার?'

ডাক্তার প্রভাকর এতক্ষণ স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিকাশের কথার ভঙ্গিতে চোখে জল

এসে গেল তার। মুখ ফিরিয়ে নিলে সে।

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'চলি!'

'তোর খাওয়া হয়েছে বিকাশ?'

'ব্যাঙ্কে এসেই চিঠিটা পেয়েছি।' তারপর আর একবার—স্বগতোক্তির মতো তার গলা শোনা গেল:

'কিছুই আর করা যায় না—না প্রভাকর?'

প্রভাকর জবাব দিল না।

বিকাশ পা বাড়ালো সিঁড়িতে। পেছন ফিরে হাসতে চেষ্টা করল একটু।

'যাক, ভাবনা মিটল একটা। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যাঙ্কে ফেরা যায়। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

প্রভাকরের সাড়া এল না। বিকাশের রিক্‌শা দাঁড়িয়েই ছিল, কোনোদিকে না তাকিয়ে উঠে পড়ল সেটায়, রিক্‌শা বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রভাকর দাঁড়িয়ে রইল এক ভাবে।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল অমলা।

'বিকাশবাবু চলে গেলেন?'

'হুঁ।'

'আমার আন্দাজ করে বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেল। আমি যে ওঁর জন্যে নেবুর শরবৎ—'

নীচের ঠোঁটটা আবার দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বিরস গলায় প্রভাকর বললে, 'নেবুর শরবৎ আর একদিন হবে। কিন্তু অমলা, মানুষ কী হেল্‌প্‌লেস্!'

কিছু না—কিছু না—ভুলতে পারলেই ভালো। শুধু মনীষা মরছে না—বাংলাদেশে অসংখ্য মনীষা মরে যাচ্ছে, তুমি তো তা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাওনি। মৃত্যুর রোল উঠেছে ঘরে ঘরে, হাসপাতালের একটা বেড খালি হয়ে গেলে পরদিন পরম নিরাসক্তিতে আর একজনকে জায়গা দিচ্ছে সে, শ্মশানের একটা চুলো খালি হতে না হতে আর একটা চিতার কাঠ সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে—নতুন কবরের পাশে কোনো পুরোনো কবরের মাটি থেকে কান্না উঠতে শোনা যায় না।

কিছু না—কিছু না। মাটি ভুলছে, নদী ভুলছে, জীবন ভুলছে। মৃত্যুকে ভোলবার দিন-রাত্রির চেষ্টাই তো জীবন। সেই জীবনকে প্রতিদিন চালিয়ে নিয়ে চলে কাজ—অসংখ্য কাজ।

মনে পড়ছে এক সহকর্মীর কথা—বছর তিনেক আগে। মেসে থাকত, হঠাৎ চলে

গেল। ইনটেনস্টাইন্যাল অবস্ট্রাকশনে। কলকাতায় এক কাকা থাকতেন, খবর পেয়ে এসে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন, ভাইপোকে যে কত ভালোবাসতেন, তাঁর উদ্দাম শোক দেখেই বোঝা গিয়েছিল সেটা। কিন্তু যত দেরি হচ্ছিল মড়া পুড়তে, ততই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন, ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন হাতের ঘড়ির দিকে—স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন, আজ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় একটা পার্টির সঙ্গে হেভি ইন্‌সিয়োরেন্সের ব্যাপারটা ফাইন্যালাইজ্‌ড্‌ হওয়ার কথা।

সেই মুহূর্তে বিশ্রী লেগেছিল বিকাশের, মনে হয়েছিল শোকটা একেবারে নকল, একটু কান্নাকাটি না করলে ভালো দেখায় না—তাই নিতান্তই ভদ্রতা করছিলেন খানিকটা। কিন্তু এখন নতুন করে মনে হল, মৃত্যুকে ভোলবার জন্যেই কাজকে দরকার, অফুরন্ত—অসংখ্য কাজ। নইলে মানুষ পাগল হয়ে যেত, আত্মহত্যা করতে থাকত—যে জীবনে এত বেশি হয়ে—এত অপরিহার্য হয়ে—এতখানি জায়গা জুড়ে নিয়ে এতকাল ছিল, সে কোথাও নেই—তাকে আর কখনো পাওয়া যাবে না—এই শূন্যতার বোধ কিছুতেই সহ্য করা যেত না, কেউ বাঁচতে পারত না, কেউ না। তাই একমাত্র ছেলেকে হারাবার পরেও—বিধবা মাকে উঠে দাঁড়াতে হয়, দেখতে হয় থানপরা ছেলেমানুষ পুত্রবধূকে, তার সিঁথের যে সিঁদুরের আভাটুকু অনেক চেষ্টাতেও মুছে যায়নি—তাকিয়ে দেখতে হয় সেদিকে, তার জন্যে হবিষ্যের ব্যবস্থাও করতে হয়!

সেই মারও কাজ। অনেক কাজ।

তিন-চারটে দিন প্রায় পাগলের মতো ডুবে রইল কাজের ভেতর। যেটা একবার দেখলে হয়, তিনবার করে দেখল সেটা। বেলা দশটায় এসে ব্যাঙ্কে বসল, কাজ করতে লাগল সাতটা-আটটা অবধি। সবাই কখন উঠে চলে গেল, একা বসে রইল বিকাশ আর দারোয়ান দেওয়ালে বন্দুক ঠেসান দিয়ে টুলে বসে বিরক্ত হয়ে ঝিমুতে লাগল।

বাড়ি ফিরতে লাগল আরো দেরি করে—ন'টায়, সাড়ে ন'টায়। কোনো লক্ষ্য নেই—কোনো উদ্দেশ্য নেই—সব ভাবনাগুলো যেন তার ভোঁতা হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের সেই ব্যাপারটা নয়, শশাঙ্ক নিয়োগী নয়, কানাই পাল নয়—কিছু নেই, কোথাও নেই। শুধু হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া—স্কুলের খেলার মাঠটা—যেখানে আসবার পরেই স্পোর্টসে সে ট্র্যাক্‌জাজ হয়ে গিয়েছিল—সন্ধ্যার পরে সেটা নির্জন হয়ে গেলে কখনো তার মাঝখানে চুপ করে বসে থাকা, আকাশের তারাগুলো কিংবা এক-আধটা উল্কাকে ছুটে যেতে দেখা। কিংবা আরো দূরে হেঁটে গেলে যে-কোনো একটা ক্যালভার্ট, বাতাসে বসন্তের গন্ধ, শুকনো ঘাস-পাতা-মাটির গন্ধ, জলের গন্ধ, ব্যাঙ-ঝিঁঝি—পোকামাকড়ের ডাক।

তার মধ্যে মনীষা এসে দাঁড়ায়।

'আসতে দেরি হল বলে রাগ করেছ? বাবার ক'টা ওষুধ কিনতে হল বলে—'

'কিছু করা যায় না—না প্রভাকর ?'

'নাঃ, অন্তত মেডিক্যাল সায়েন্সে নেই।'

কলকাতা নয়, মোহনলাল স্ট্রীট নয়—বর্ধমান নয়, আরো অনেক দূরে সরে যায় মনীষা। পার হয় রাত্রির মাঠের পর মাঠ, ছাড়িয়ে যায় অচেনা বনের পর বন, যে সমুদ্রের ওপার থেকে কেউ ফিরে আসেনি—যে আকাশে একবার চলে গেলে আর ফেরা যায় না—সেখান থেকে পাতা ঝরবার শব্দের মতো, কয়েক টুকরো কাগজের খসখসানির মতো মনীষার স্বর শোনা যায়: 'আমাকে দেখতে চেয়ো না—লোভ জাগিয়ো না আর—আর দুঃখ দিয়ো না—'

শীর্ণ, ক্লান্ত মুখ। চোখ দুটোতে আলোর চিহ্ন নেই কোথাও। আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে টেনে নিলে কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা বলে মনে হয়! এই মনীষা তো কোনোদিন কিছুই চায়নি—শুধু দিয়েছে, দু' হাতেই দিয়েছে। মনীষার কোনো লোভ ছিল ? জীবনের কাছে এতটুকুও দাবি ছিল তার ? বিশ্বাস হয় না—কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

কিছু ভাবতে চায় না—অথচ এই ভাবনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে ফেরে—বুকের ভেতরে ছিঁড়ে খেতে থাকে। বাড়ি ফিরে এলে সব আরো নির্জন, নিয়োগীপাড়ার জীর্ণ পথটায় পুরোনো গাছগুলোর ছায়া, প্যাঁচার শব্দ, শেয়ালের পালানো, কুকুরের ডাক—সব আরো বেশি করে মৃত্যুময় হয়ে যেতে থাকে।

তারপর বাড়ি। সিঁড়ি। অন্ধকারে লণ্ঠনের ম্লান আলোর ভ্যাংচানি। নিজের ঘর। জামা-কাপড় ছেড়ে বিছানায় বিমূঢ় হয়ে বসে থাকা। তারপরে কাকিমার ডাক, 'বিকাশ, খেতে এসো বাবা।'

অসুস্থ শশাঙ্কর ঘর বন্ধ। আগেই খেয়ে শুয়ে পড়েন। হয়তো বিকাশ দেরি করে ফিরে আসে বলেই সাক্ষীর কথাটা মনে করিয়ে দিতে পারেন না। কিংবা—কিংবা ভেবেছেন, মিথ্যে সাক্ষী দিতে রাজী হবে না, বরং উলটো ফল হবে তাতে, তার চাইতে তাকে না ঘাঁটানোই ভালো।

আর সুনু—

সুনুকে মার পাশে দেখা যায়, খাবার এগিয়ে দিতে দেখা যায়, অথচ ভালো করে দেখা যায় না। সেই রাতটার পর। বিকাশের বুকের ভেতরে ধরা দেবার পর থেকে সে অনেকখানি দূরে সরে গেছে। বুঝেছে, অনেকখানিই বুঝেছে। যে-কিশোরী মনে তার এতটুকু ছায়াও কোথাও ছিল না, সেখানে পাশের একটা ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে সে।

তখন বিকাশের গলায় ভাতগুলো আটকে যেতে থাকে। খিদে আজকাল টেরই পাওয়া যায় না বলতে গেলে, খেতে হয় সেইজন্যেই খাওয়া, কিন্তু এক-একটা সময় সব যেন তেতো হয়ে যায়।

মনীষা মরছে—বিন্দু বিন্দু করে মরছে। আর সেই মৃত্যুকে এই বিশ্বাসের সুখ দিয়েই সে ভরে রেখেছে যে বিকাশ তাকে ভালোবাসে, শুধু তাকেই ভালোবাসে। কিন্তু বিকাশ সেদিন থেকেই ঠকাতে শুরু করেছে তাকে—যেদিন সম্পূর্ণ অকারণে সে সুবর্ণার নাম দিয়েছে সোনালি, তারপর—তারপর তার মন চোরের মতো একটু একটু করে মনীষার বিশ্বাসে সিঁদ কেটেছে, দিনের পর দিন সুনুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে, মেজদার পাগলামিকে একান্ত লোভের সঙ্গে প্রশ্রয় দিয়েছে নিজের স্বপ্নে, আর—

'উঠে পড়লে যে বাবা, আজ তো কিছুই খেলে না।'

'অনেক খেয়েছি কাকিমা, আর পারছি না।'

'না বাবা, আজ পাঁচ-ছদিন ধরে তুমি একেবারে খাচ্ছ না। এমন করে শরীর টেঁকে?' কাকিমার গলায় আন্তরিক মমতা, এই নিষ্ঠুর বাড়িটার ভেতরে কয়েক বিন্দু অবিশ্বাস্য করুণার মতো ঝরতে থাকে: 'কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি তো তোমার?'

'না কাকিমা, আমার কিছু হয়নি।'

কাকিমার পেছনে ছায়ার মতো সুনুকে দেখা যায়। নীল শাড়ির নীচে দু'টুকরো শাদা পা, দুটি ছোট হাতে দু'গাছা সোনার চুড়ির ঝলক, তাইতেই চোখ যেন জ্বালা করতে থাকে। প্রায় অন্ধের মতো বিকাশ দোতলায় উঠে যায়, সেই না-দেখা ঘড়িটার অদ্ভুত আওয়াজ আসে, আচমকা রাত্রির স্তব্ধতা ছিঁড়ে গাঁজাখোর পাগল মেজদা গেয়ে ওঠে:

'ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে—
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুব দাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে—কালী-কালী।'

আবার ঘর। কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে পড়ে থাকা। আবার ভাবনা, আবার যন্ত্রণা। বেহালাটা মনে পড়ে—ইচ্ছে করে বাজাতে, একদিন তো ওর মধ্যেই তার মুক্তি ছিল। কিন্তু হাতে তুলেই আর বাজাতে ইচ্ছে করে না, একবার ছড় টানতেই মনে হয়, যেন কার হৃৎপিণ্ড ছেঁড়া তার থেকে একটা চিৎকার বেজে উঠল ওর ভেতর থেকে। সেই পাগানিনির অদ্ভুত গল্পটা বুকের ভেতরে বিদ্যুৎ ছড়ায়। কার হৃৎপিণ্ডের কান্না? মনীষার? সুনুর?

'বিকাশদা!'

সুনু। একেবারে বিছানার পাশে।

কয়েক সেকেণ্ড বিকাশ শক্ত হয়ে রইল।

'এত রাতে কী চাই সুনু?'

সুনু পিছিয়ে গেল হঠাৎ। বিকাশের এই গলাটা তার অচেনা ঠেকল।

ভয় পেয়ে স্মৃ বললে, 'আমি দেখতে এসেছিলুম মশারিটা—'

বিকাশ জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখল। জোর করে নিজের ভেতরে জাগাতে চাইল অন্ধ, যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতাকে। তারপর কেটে কেটে কঠোরভাবে বললে, 'দরকার হলে মশারি নিজেই ফেলে নেব আমি, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো গে, আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।'

চোখ বুজেই বিকাশ ঘরময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে পাথরের স্তব্ধতা অনুভব করল। তারপর যেন কোথাও একটা চাপা কান্নার ঢেউয়ের মতো ভাঙল, কে যেন ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

বর্বর—বর্বর! কখন ঠোঁটটা নির্মমভাবে কামড়ে ধরেছিল, নোনা রক্তের স্বাদ লাগল জিভে। তোমরা এই পারো। নিজেকে চাবুক মারতে পারো না,—নিজেকে দণ্ড দিতে পারো না, তাই সবচেয়ে যে নিরীহ, যে নিরুপায়—আঘাত করতে পারো তাকে, বুনো জন্তুর নখ দিয়ে তাকে ছিন্ন-ছিন্ন করে দিতে পারো! মনীষার কাছে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারো স্মৃকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে!

কে খুন করে? আত্মহত্যা করতে যে ভয় পায়, সেই-ই।

পোড়ো মহলের বারান্দায় আবার পায়রার ঝটপটানি। ভাম এসেছে তার দৈনন্দিন হত্যাকাণ্ডে। এমনি মৃত্যুযন্ত্রণা হয়তো স্মৃরও শুরু হয়েছে। কাটা ঠোঁট থেকে এখনো জিভে নোনা রক্তের স্বাদ লাগছিল তার, মনে হল ওটা পায়রার রক্ত।

ত্রিশ

সাতটা দিন। সাতটা দিন যে কিভাবে কেটে গেল, বিকাশ টেরও পেল না। মনের এইরকম একটা অবস্থা কখনো কখনো আসে, স্নায়ুগুলো নিঃসাড় হয়ে যায়—একটা বোবা নির্বেদ মস্তিষ্ককে স্তব্ধ করে দেয় একেবারে। কিছু ভাববার থাকে না—করবারও নয়। চোখের সামনে সব কিছু ছায়ার মিছিল হয়ে এগিয়ে যায়, তাদের দেখা যায় না, তারা সুদূর—তারা অনাবশ্যক জীবনে, কোথাও কোনো যোগ নেই তাদের সঙ্গে।

ঠিক সাতটা দিন ধরে এই ছায়া-মিছিল বয়ে গেছে বিকাশের সামনে দিয়ে। সেই মিছিলে স্মৃ আছে—যে বিকাশের সামনে আর কখনো আসে না, এই জীর্ণ গন্ধভরা বিকট বাড়িটার কোনায় কোথায় লুকিয়ে বসে থাকে, জীবনের প্রথম বঞ্চনা চোখের জলের নোনা স্বাদ বয়ে আনে তার ঠোঁটে, সেই মিছিলে দেখা যায় শশাঙ্ককাকাকে—মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খাটে হেলান দিয়ে বসে—তাঁর সঙ্গে গভীর আলাপে মগ্ন বাঁকাবাবু এবং নিয়োগী-পাড়ার আরো ক'জন। কাকীমার একটা রক্তহীন মুখ আসে যায়—চোখ দুটো যেন তাঁর কোথাও নেই, একেবারে অন্ধকারে ঢাকা। নারকেল গাছের নীচে বসে মেজদা রুটি

ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাখীদের খাওয়ায়, থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে : 'কালী—কালী।' অফিসে ধনঞ্জয় দত্ত আসে, প্রদীপ মুস্তফি আসে—কাজ সেরে চলে যায় নিজের জায়গায়। এদের কারো সঙ্গেই তার যোগ নেই—এরা তার কেউ নয়।

এই নির্বেদের ভেতরেও যন্ত্রণার একটা কেন্দ্র আছে তার। থেকে থেকে সেখানে যেন বিদ্যুৎ চমকায়। তখন একটা কিছু ভাঙচুর করতে ইচ্ছে হয় তার—কাচের গ্লাসটা—কুঁজোটা—ঘরের লণ্ঠনটা—এমন কি বেহালাটাও। আশ্চর্য, কেন সে ওই বেহালাটাকে সঙ্গে করে এনেছিল? এখানে আসবার পরে তিনটে দিনও ওটাতে সে হাত দিয়েছে কিনা সন্দেহ।

বেহালা নয়, সুর নয়, সুস্থ নয়—কিছু সে চায় না, কিছুরই দরকার নেই তার। মনীষা। মনীষা তার সব কিছুকে ফাঁকা করে দিয়েছে—কোনো মানে হয় না, কোনো জিনিসেরই মানে হয় না এখন।

'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো না, তা হলে—'

তাহলে বাঁচবার জন্যে লোভ আসবে? দুঃখ আসবে, কান্না আসবে? কিন্তু মনীষার কোনো লোভ ছিল কখনো? এমন কি ভালোবাসারও? বিকাশের সন্দেহ জাগত কতদিন।

'কিছুই করা যায় না—না প্রভাকর?'

'না, অন্তত মেডিক্যাল সায়েন্সে—'

যন্ত্রণার বিদ্যুৎটা ছড়িয়ে পড়ে মাথার প্রত্যেক প্রান্তে, প্রতিটি কোষ যেন জ্বলে যেতে থাকে। নিজের ক্লীব অক্ষমতা নিজেকে আঘাত করে; যা হোক একটা কিছু আছড়ে ভেঙে ফেলবার দানবীয় আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ঝনঝন একটা ভয়ঙ্কর শব্দে অন্তত তার প্রতিবাদটাও বেজে উঠুক।

'দেখা কোরো না—দেখা কোরো না আমার সঙ্গে—'

'প্রভাকর, কিছুই করবার নেই?'

কিছুই করবার নেই। মহাকর্ষ ছাড়িয়ে অনন্ত আকাশে ডানা মেলবার প্রচণ্ডতম শক্তিতেও না। পৃথিবীতে আজও ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি।

স্কুলের মাঠ—সন্ধ্যার ক্যালভার্ট—শনিবারের একদিন হাঁটতে হাঁটতে—সেই অনেক দূরে কানাই পাল যেখানে মন্দিরটা দেখিয়েছিলেন, সেখানে চলে যাওয়া। কাঁটা বনে ভরা সে মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই, কোন্ কালাপাহাড় হাতুড়ির ঘায়ে কবে তাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে, পোড়ো ইটের পাঁজায় তার শ্যাওলা, বিছুটি আর বুনো ওলের জঙ্গল। কিন্তু সামনে দীঘিটায় এখনো অনেকখানি লালচে জল, কলমী, পদ্মপাতা, শালুক-পদ্মের শুকনো নাল, ফড়িং, জলপিপি—জলের ভেতর মোটা মোটা ঢোঁড়া সাপের সাঁতার; সেই-

খানে—ভাঙা ঘাটের বড়ো বড়ো পাথরের যে-কোনো একটায় বসে পড়ে—মরা চোর-কাঁটার মধ্যে পা ডুবিয়ে বিকাশের ভাবা : এইখানে—এই নির্জনতায় অনায়াসেই একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যেতে পারে, ভাঙা মন্দিরের দেবতা দেখা দিতে পারেন হঠাৎ, আসতে পারেন জটাধারী কোনো আকস্মিক সন্ন্যাসী—একটা ওষুধ কিংবা শিকড় তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতে পারেন : 'এইটে খাইয়ে দাও, কালই ভালো হয়ে যাবে তোমার মনীষা।'

ননসেন্স—বিশুদ্ধ ননসেন্স।

না—এই সব পোড়ো মন্দিরের দেবতা কিংবা সন্ন্যাসীরা কখনো আসেন না। গাড়ি নিয়ে কানাই পাল আসতে পারেন, তাঁর মনে কাব্য জাগতে পারে—সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন নিদেনপক্ষে একটা বীয়ারের বোতল। বিকাশেরা এখানে এলে কেবল আরো হিংস্র হয়ে ওঠে—এই নির্জনতা কেবল আত্মহত্যার প্রেরণা দেয়, জীবনটাকে আরো বেশি দেউলিয়া করে তোলে।

তার চেয়ে ব্যাঙ্কই ভালো। তার চেয়ে কাজ ভালো। একটা জন্তুর মতো প্রত্যেকটা দিনের বোঝা টেনে টেনে পরের দিনটার দিকে এগিয়ে যাওয়া ঢের ভালো।

কিন্তু কাজের বোঝাটাও একদিন ভার হয়ে উঠল।

ব্যাঙ্কের আবহাওয়া গরম। আলোচনা ভয়ানক রকমের উত্তেজিত। বিকাশ এসে নিজের চেয়ারে বসতেই চঞ্চলভাবে তার দিকে এগিয়ে এল প্রদীপ মুস্তফি।

এতদিন প্রায় তার সঙ্গে অসহযোগ চলছিল এদের। কিন্তু আজ প্রদীপ মুখ খুলল উৎসাহিতভাবেই।

'জানেন স্যার, কী হয়েছে ?'

'কী ?'

'এই একটু আগেই—বাজারের ভেতর দিয়ে কানাই পাল যখন গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর গাড়িতে একটা মাঝারি সাইজের ক্র্যাকার—'

নিজের মনের ঘোর থেকে বিকাশ চমকে উঠল : 'ক্র্যাকার ! এখানেও ক্র্যাকার !'

'কোথায় নেই ?' প্রদীপ হাসল : 'ওটা কি কলকাতারই একচেটিয়া বলে মনে করেন আপনি ? কিন্তু কানাইবাবুর গাড়িতে লাগেনি, পাশে পড়ে ফেটেছে। লাগলেই ভালো হত।'

বিকাশ চুপ করে রইল। এখানে এমন কিছু আর ঘটবে না, যার জন্যে নতুন করে আশ্চর্য হওয়া চলে।

প্রদীপ বললে, 'নিয়োগীপাড়া আর পালপাড়া। তাদেরই রেষারেষির ফল। এর পরে দু-একটা ছোরাছুরিও চলবে হয়তো—কানাই পালই কি আর ছেড়ে কথা বলবে ?

দরকার হলে কলকাতা থেকে ভাড়াটে লোক নিয়ে আসবে। এই ছুটো পাড়াই হল রি-অ্যাক্‌শনারীদের ঘাঁটি। একদল ফিউড্যাল, আর একদল ক্যাপিটালিস্ট। শুধু মানুষের রক্তই শুষে খেতে জানে। এরাই দেশসুদ্ধ ছেলেগুলোকে গুণ্ডা তৈরী করে নিজেদের স্বার্থে, খেনো মদের পয়সা জুটিয়ে দেয়—খুন-জখম-দাঙ্গার উস্কানি দেয়।' প্রদীপের চোখ জ্বলতে লাগল: 'এদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ শেষ না হলে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের কোথাও নিয়ে যাবে না।'

এ-কথাগুলো বিকাশও জানে, নতুন করে কিছু শোনবার নেই তার। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা বিরস কৌতুক এগিয়ে এল তার ঠোঁটের কোনায়। বলতে ইচ্ছে করল: 'আমাকে এ-সব শোনানো কেন, আমি তো ওই রি-অ্যাক্‌শনারীদেরই একজন, তাদের এজেণ্ট।'

বক্তৃতার ভঙ্গিতে প্রদীপ আরো কিছু বলছিল কিন্তু বিকাশের মনের সামনে আবার সেই শূন্যতাটা ঘনিয়ে আসছে। প্রদীপের কথাগুলো ক্রমে অবোধ্য হয়ে যাচ্ছে—সে শুনতে পাচ্ছে, অথচ মানে বুঝতে পারছে না। আর এই সময় চিঠিটা এল। হেড অফিসের চিঠি। চিঠি তার নামে, ওপরে ছাপ-বসানো: ইম্পর্ট্যাণ্ট।

'একটু সাবধান হয়ে চলা-ফেরা করবেন স্যার—' বলে নিজের টেবিলে ফিরে গেল প্রদীপ। বিকাশ চিঠিটা খুলল।

এক বার পড়ল, দু-বার পড়ল। কপালে হাত রেখে বসে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর ডাকল: 'প্রদীপবাবু!'

গলার স্বরটা অন্যরকম। প্রদীপ আশ্চর্য হল।

'কিছু বলছেন?'

'একটু আসুন এদিকে।' বিকাশ হাসতে চেষ্টা করল: 'আমার নামে হেড অফিসে সিরিয়াস কম্‌প্লেন পৌঁছেছে। আমি এফিশিয়েণ্ট নই, অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদা ঝগড়া করি, ব্যাঙ্কে কন্‌স্ট্যাণ্ট ট্রাবল, লোক্যাল পলিটিক্‌স নিয়ে হবনবিং করি, রেসপক্‌টেবল পেট্রনদের অপমান করে থাকি। হেড অফিস জানাচ্ছে আমার সম্পর্কে তাদের অত্যন্ত ভালো ধারণা ছিল, কিন্তু একটা নতুন ব্রাঞ্চ থেকে অত্যন্ত রেস্‌পন্‌সিবল সোর্সে কেন এ ধরনের কম্‌প্লেন যায়, সেটা ব্যাখ্যা করবার জন্যে ইমিডিয়েট্‌লি গিয়ে একবার দেখা করতে হবে।'

প্রদীপ থমকে গেল। গলার শিরা কাঁপতে লাগল তার।

চিঠিটা তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বিকাশ বললে, 'পড়ুন।'

প্রদীপ মুস্তফি চেয়েও দেখল না চিঠিটা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'স্যার, আপনি কি মনে করেন, এ চিঠি আমরা লিখেছি?'

নিঃশব্দে বিকাশ চেয়ে রইল প্রদীপের মুখের দিকে। প্রদীপের মুখে রঙ বদলাতে বদলাতে লাল হয়ে উঠল ক্রমশ।

'আমরা যদি লড়াই করি কখনো—' বলতে বলতে গলা বুজে এল তার : 'খোলাখুলিই করব। আমাদের দাবি সোজা, ভাষাও সোজা। এমন সাপের মতো লুকিয়ে আমরা ছোবল দিই না। এ চিঠি এখানে লিখতে পারে মাত্র দু'জন। একজন শশাঙ্ক নিয়োগী, আর একজন কানাই পাল!'

ছোট ব্যাঙ্ক, অল্প জায়গা—প্রত্যেক কথা প্রত্যেকের কানে যাচ্ছিল। কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। প্রদীপের পাশে এসে দাঁড়ালো ধনঞ্জয় দত্ত, চিঠিখানা তুলে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল তার ওপরে।

ধনঞ্জয় বললে, 'না—শশাঙ্ক নিয়োগী নয়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁর একটা উড়ো চিঠিকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। এই ব্যাঙ্কে সব চাইতে বেশি ডিপোজিট কানাই পালের, কলকাতার হেড অফিসে তাঁর মস্ত অ্যাকাউণ্ট, বলতে গেলে তাঁরই জন্যে এখানে ব্রাঞ্চ খোলা। সেই সম্রাটের চিঠিতেই হেড অফিস টলমল করে উঠেছে, জরুরি তলব পড়েছে আপনার।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না কেউ।

বিকাশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

'আচ্ছা নমস্কার, আপনারা কাজ করুন।'

'আপনি চললেন নাকি স্যার?'

'হ্যাঁ, জরুরি তলব। আজই যেতে হবে কলকাতায়।'

'কিন্তু এখন যাবেন কোথায়?' প্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ট্রেন তো রাত আটটার আগে আর নেই।'

'জানি। কিন্তু বোধ হয় এ ব্রাঞ্চে আর আমাকে ফেরত পাঠাবে না, ফেরত পাঠালেও আমি রিজাইন করব।' বলতে বলতে বিকাশ আবার বসে পড়ল : 'কিন্তু চার্জটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আসুন সতীনাথবাবু—' মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোককে বিকাশ ডাকল : 'অফিশিয়্যালী আপনিই নেক্সট্ম্যান—বুঝে নিন।'

রিক্‌শ করে নিয়োগীপাড়ায় ফিরতে ফিরতে ধনঞ্জয় দত্তর শেষ কথাগুলো মনে পড়ছিল।

'আমরা আপনাকে ঠিক বুঝিনি স্যার, অনেক অন্যায় করেছি, অকারণ অসম্মান করেছি। পারেন তো সেজন্যে আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলব। এখানে এসে আপনি কোনো দলে যোগ দেননি, নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন।

তাই সব দলের কাছ থেকে আপনি মার খেয়েছেন। এ যুগে কোথাও নিরপেক্ষের জায়গা নেই, বাঁচতে হলে একটা দল তাকে বেছে নিতেই হবে।'

'জানি না। কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু ফিরে এলে একটা কথা বলবেন তাঁকে। আপনাদের কারো চাইতে আমি 'তাঁকে কম শ্রদ্ধা করতুম না, আমি তাঁর কোনো ক্ষতি করিনি।'

'ছি ছি ছি, ও-কথা মনে করিয়ে আর লজ্জা দেবেন না।'

কিন্তু নিরপেক্ষ? কেউ থাকতে পারে না? কেউ বলতে পারে না, আমি নির্ভর করব আমার বুদ্ধি আর বিচারের ওপর, আমি যাকে সত্য বলে জানব যুক্তি দিয়ে—হৃদয় দিয়ে—তাই আমার পথ? দরকার হলে তাতে আমি একাই চলব? তার নাম দেওয়া হবে বিচ্ছিন্নতা? কিন্তু আমি তো সেভাবে সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে কূপমণ্ডুকের মতো বাঁচতে চাই না। আমি সব সত্যিকারের দাবিতে অংশ নেবো, সব সত্যিকারের সংগ্রামে শরিক হবো। কিন্তু আমার বুদ্ধি, আমার মন, আমার হৃদয়কে যদি আমি প্রভাবিত করে না রাখি, যদি কোনো দলকে আমি মাত্র আনুগত্যেই অনুসরণ না করে যাই, তা হলে কোথাও আমার জায়গা হবে না?

হয়তো তাই। হয়তো জায়গা হওয়া উচিত নয়। তোমার নিজের বুদ্ধি-যুক্তিই যে শেষ কথা—তা কে বলেছে তোমাকে? তুমি কি নিশ্চিত জানো যে পথ দেখাবার দিশারী না থাকলে নিজের পথ নিজেই চিনতে পারো তুমি? কোথায় পেলে তুমি এত আত্ম-বিশ্বাস, কোথা থেকে এল তোমার এতবড়ো অহমিকা?

ঠিক হয়েছে। নিজের পাওনাই তুমি পেয়েছ।

তাই তোমার কেউ রইল না। তুমি নির্বোধ, নিঃসঙ্গ, বিতাড়িত। যেখানে তোমার শেষ জোরটুকু ছিল, যে ভালোবাসার মাটিতে ছিল তোমার অবলম্বন, সেই মনীষাকেও তুমি হারালে।

আড়ষ্ট পায়ে বিকাশ উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু ফিরে গিয়ে আরো অসহ্য হবে কলকাতা, দিনগুলো আরো ভারী হয়ে উঠবে, ক্লান্তির সীমা থাকবে না। মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়িতে অথবা হয়তো শেষের দিকে কোনো হাসপাতালে ধীরে ধীরে মনীষার চোখ থেকে আলো নিবে যাবে, অথচ বিকাশ একবারও তাকে দেখতে যাবে না। তা হলে দুঃখ বাড়বে মনীষার, বাঁচবার সাধ জাগবে তার, অথচ তাকে বাঁচানো যাবে না, বিজ্ঞান আজও সে সঞ্জীবনী আবিষ্কার করতে পারেনি।

তার মৃত্যুটা তারপরে নেমে আসবে তার নিজের ভেতরে। কয়েক বছর ধরে মনীষার মধ্যে যেমন দেখেছে, তেমনি করে তারও কোনো লক্ষ্য থাকবে না, আনন্দ থাকবে না; শুধু কাজের জন্যে কাজ, শুধু একটা দিনের পর আর একটা দিনের পুনরাবৃত্তি। আর

তাকে ঘিরে ঘিরে শ্রান্ত স্থবির কলকাতা আরো শ্রান্ত হতে থাকবে, গড়ের মাঠে গুল-মোহরের পাপড়ি আর শুকনো শালপাতা একসঙ্গে উড়তে থাকবে হাওয়ায়।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা নিয়ে—আধ ঢাকা চোখে শশাঙ্ক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিকাশকে ঢুকতে দেখে মিটমিট করে তাকালেন। একটা উজ্জ্বল আভা দেখা দিল তাঁর মুখে।

'ওহে, শুনেছ একটা খবর? কানাই পালের গাড়িতে একটু আগেই নাকি কারা বোমা মেরে দিয়েছে। তবে লোকটার কপাল ভালো, লাগেনি।'

শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'শুনেছি।'

'যা পাজী লোক, শত্রু ওর চারদিকে। কিছু শিক্ষা ওর হওয়া উচিত। তবে কি জানো—' শশাঙ্ক একটু উদার হতে চেষ্টা করলেন: 'বোমা-টোমা ছোড়া কোনো কাজের কথা নয়। এ-সব বোমবাজি খুব খারাপ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কানাই পালের ব্যাপারে মশগুল ছিলেন বলে এতক্ষণ খেয়াল হয়নি শশাঙ্কর। এই বারে মনে পড়ল তাঁর।

'তা বাবাজী, এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে? ব্যাঙ্ক বন্ধ নাকি আজকে?'

'আজ্ঞে না, বন্ধ নয়। আমাকে চলে আসতে হল।' তেমনি শুকনোভাবে বিকাশ বললে, 'আপনার সঙ্গে কথা ছিল একটু।'

ব্যাণ্ডেজের আড়ালে ডান দিকের পিটপিটে চোখ দুটো কুঁকড়ে প্রায় অদৃশ্য হল, বাঁ চোখে ফুটে বেরুল খরধার সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে অফিস থেকে অসময়ে চলে এসেছে বিকাশ? কাগজটা সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন শশাঙ্ক।

'বোসো বোসো বাবাজী, দাঁড়িয়ে কেন?'

বিছানার পাশে চেয়ারটায় বসে পড়ল বিকাশ।

একটু পাশে ঝুঁকে পড়ে, শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা হে?'

'আমি আজ চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'বাসা বদলাচ্ছ? কেন বাবাজী, এখানে তোমার—'

'আজ্ঞে না, বাসা বদলানো নয়। আমি কলকাতায় চলে যাব।'

'ছুটি নিচ্ছ?'

'না—ছুটি নয়। হেড অফিস থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। মনে হচ্ছে, আর কোথাও ট্রান্সফার করে দেবে আমাকে। খুব সম্ভব আর আমি ফিরে আসব না।'

আরো সংকীর্ণ হল শশাঙ্কর চোখ। কয়েকটা রেখা পড়ল কপালে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। এই তো সেদিন মাত্তর এলে এখানে। এর মধ্যেই বদলী?

উঁহু বাবাজী, কিছু একটা ব্যাপার আছে এর ভেতরে।'

ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। আর সেটা জানতেও বেশি সময় লাগবে না শশাঙ্কর। তাই সে আলোচনাটা তোলবার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি অনুভব করল না বিকাশ।

'ওদের মর্জি।'

'না হে, মর্জি নয়। গোলমাল আছে কোথাও।'

ক্লান্তভাবে বিকাশ বললে, 'জানি না। কিন্তু কাকা, আমি একটা রিক্‌শা নিয়েই এসেছি। এখনই জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাব এখান থেকে। তাই আপনাকে আর কাকিমাকে প্রণাম করতে এলুম।'

'এখনি যাবে কি হে!' শশাঙ্ক উচ্চকিত হলেন: 'কলকাতার গাড়ি তো সেই রাত আটটায়। তাছাড়া মেয়ে দুটো স্কুলে, তাদের সঙ্গেও তো দেখা হবে না।'

এতক্ষণে বিকাশ বুঝতে পারল, তার মনের আড়ালে এত তাড়াতাড়ি এই বাড়ি ছেড়ে যাবার প্রেরণাটা এসেছে কোথা থেকে। যাওয়ার আগে সুনুকে সে এড়িয়ে যেতে চায়, তার দিকে বিকাশ আর চাইতে পারবে না।

শশাঙ্কর কথার জবাব দিল না সে। বললে, 'আমি এখন চলে যাব প্রভাকরের বাসায়, কিছু কাজ আছে ওর সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলায় সেখান থেকেই রওনা হবো স্টেশনে।'

কাকিমা ঘরে এসে পড়েছিলেন। শশাঙ্ক বললেন, 'ওগো শুনছ, বিকাশ বাবাজী বদলী হয়ে গেল। আজ রাত্রেই চলে যাবে এখান থেকে। জিনিসপত্র নিয়ে এখুনি যাচ্ছে প্রভাকরের বাসায়।'

সুধাময়ীর বিবর্ণ হলদে মুখ আরো বিবর্ণ হল একটু।

'এখুনি চলে যাবে বাবা?'

বিকাশের মাথা নেমে এল: 'আমাকে যেতেই হবে কাকিমা।'

শশাঙ্ক বললেন, 'হাঁ হাঁ, যেতেই হবে বইকি। কাজ থাকলে নিশ্চয়ই যেতে হবে। তা বাবাজী—' শশাঙ্ক একটু কাশলেন: 'মেয়েটার ব্যবস্থা কী করে যাবে?'

বিকাশ চমকালো, কাকিমা চমকালেন।

বেশ প্রসন্নভাবে হাসলেন শশাঙ্ক।

'ফাল্গুন তো সবে পড়েছে। এ মাসের শেষের দিকেই দিন-টিন একটা ঠিক করা যায় বোধ হয়।'

'কিসের দিন?' কাকিমাই বলে উঠলেন আগে: 'কী বলছ তুমি?'

'আহা গিন্নী—' শশাঙ্ক সেই হাসিটা টেনে রাখলেন মুখের ওপর: 'মেয়েমানুষ হয়েও চোখে ঠুলি এঁটে বসে থাকো নাকি তুমি? বাবাজীর সুনুকে মনে ধরেছে, সুনু তো বিকাশদার নামে অজ্ঞান। বয়সে অবিশ্যি ন'-দশ বছরের তফাত হবে, কিন্তু তাতে কিছু

আটকায় না, বেশ ভালো মানাবে। তাছাড়া আমার মেয়ে ঘরে নিয়ে তুমি ঠকবে না বাবাজী—রূপে-গুণে লক্ষ্মী মেয়ে।'

এ কথা বিকাশ নিজেও বলতে পারে, এই অন্ধকার—মৃত বীভৎস বাড়িটার ভেতরে ঝুমুর চোখেই সে সূর্যমুখীর আভাস দেখেছিল, দেখেছিল এই মেয়েটিই আলোর পর্ণ মেলবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তারও চোখে ঘোর লেগেছিল, মনীষার ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কতদিন এই মেয়েটিকে নিয়ে নেশায় ভোর হয়ে থেকেছে, কতদিন ভেবেছে এই বন্দিনী আলোর রেখাটুকুকে এখানকার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে কি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে না?

কিন্তু এখন—এই মুহূর্তে যখন জীবনের সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে, মনীষার জন্যে যন্ত্রণায় যখন তার সমস্ত মস্তিষ্ক শরবিদ্ধ, তখন সমস্ত জিনিসটা যেন একটা কুৎসিত চক্রান্তের রূপ নিল তার কাছে।

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'আমাকে মাপ করবেন কাকা। বিয়ের কথা এখন আমি ভাবতে পারছি না।'

'পারছ না বুঝি?' হঠাৎ ফণা তুললেন শশাঙ্ক: 'প্রেম করবার কথা তো বেশ ভেবেছিলে। এখন বুঝি লীলে শেষ করে পালানোর চেষ্টা?'

একটা অস্পষ্ট শব্দ করল বিকাশ, কাকিমা চিৎকার করে উঠলেন।

'কী বলছ তুমি এ-সব? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?'

'চুপ কর্ হারামজাদী!' শশাঙ্কর হুঙ্কারে গলা ডুবে গেল কাকিমার: 'এত আদর, এত মাথামাখি, বিনি পয়সায় সেতার, বাজনা শেখানো, মাঝ-রাত্তিরে জড়াজড়ি—'

কাকিমা পড়ে যাচ্ছিলেন, বিকাশের চোখের সামনে গোল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল ঘরটা। পাপ। বাইরে বেশি ছিল না, কিন্তু মনের ভেতরে যা জমে উঠেছিল তাকে তো লুকিয়ে রাখা যায়নি। কোনো অন্যায় কথা বলেননি শশাঙ্ককাকা, একটি অভিযোগও তাঁর মিথ্যে নয়, সত্যিই সে ঝুমুকে অশুচি করে দিয়েছে। এই অপমানের তার প্রয়োজন ছিল।

খাটের কোনা ধরে নিজেকে সামলে নিলেন কাকিমা। বিকাশকে বললেন, 'তুমি আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়িয়ো না বাবা। এরা তোমায় মেরে ফেলবে—তুমি পালাও—পালাও এখান থেকে।'

'চুপ করে থাক শা—' অভব্যতম গাল দিয়ে শশাঙ্ক আবার ঘর ফাটিয়ে দিলেন: শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল! পালাবে—কোথায় পালাবে! আমার মেয়েকে কলঙ্কিনী করে—আমার মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে পালাবে! যদি ঘাড়ে ধরে আমি এই বদমাস লোচ্চাকে—'

কানে আঙুল দেবারও সময় পেলো না বিকাশ, তার আগেই খাট থেকে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন শশাঙ্ক। হয়তো ঝাঁপিয়েই পড়তেন বিকাশের ওপর, কিন্তু মাথার চোট শুকোয়নি—হুড়মুড় করে মেজেয় উল্টে পড়ে গেলেন।

তটস্থ হয়ে বিকাশ এগিয়ে আসতে চাইল সেদিকে, কিন্তু দু হাতে কাকিমা ঠেলে ঘর থেকে বার করে দিলেন তাকে। তাঁর রোগা হাড়ে যেন দানবের শক্তি দেখা দিয়েছে হঠাৎ। তারপর বিকাশের মুখের সামনে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, 'ওঁর জন্যে কিছু ভেবো না বাবা, কিছু হয়নি ওঁর—আমি ওঁকে দেখব। তুমি পালাও, এ বাড়ি থেকে এখুনি পালাও—'

সশব্দে হুড়কো পড়ল দরজায়।

কিন্তু সত্যিই কিছু হয়নি শশাঙ্কর। বন্ধ ঘর থেকেও অশ্রাব্য গালাগালির তরঙ্গ আসছিল তখন।

কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। নিজের মাথায় বার-কয়েক ঝাঁকুনি দিতে চাইল, যেন পাথরের মতো জমে আছে সেটা। তারপর এগিয়ে গেল ঘরে, অনুভূতি-হীন দেহ-মন নিয়ে। বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিলে, রিক্‌শাওলাকে ডেকে আনল ওপরে, জিনিসগুলো নামিয়ে দিলে সব।

কাকার ঘরের হুড়কো বন্ধ। সব স্তব্ধ। কে জানে, অসুস্থ শরীর নিয়েও কাকা এখন ঘাতকের নিপুণতায় কাকিমার গলা টিপে খুন করছে কিনা।

পা দুটো একবারের জন্যে অসাড় হয়ে গেল, তারপর জুতোর তলায় হাওয়ায় উড়ে আসা পায়রার একটা রক্তমাখা পালক মাড়িয়ে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। চোখে পড়ল, রেলিংয়ের এক কোণায়, জড়োসড়ো হয়ে, দুটো বড়ো বড়ো কাতর চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিগান্তকুমার নিয়োগী।

তার ছোট্ট মাথায় একবার আঙুল ছুঁইয়ে বিকাশ বলল, 'চললুম বুড়ো।'

বুড়ো জবাব দিল না।

রিক্‌শায় উঠতে যাচ্ছে, তখন কোথায়—কোন অচেনা অন্ধকার কোণা থেকে অদ্ভুত জড়ানো গলায় দুটো বাজালো সেই অলক্ষ্য ঘড়িটা। আর বাগানের কোথায় লুকিয়ে থেকে মেজদা সমানে চিৎকার করে বলতে লাগল: 'পালাচ্ছিস? সুনুকে মেরে ফেলে, তার বুকের শিরা দিয়ে বেহালা বেঁধে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস? কোথায় পালাচ্ছিস—এই রাস্কেল, কোথায় পালাচ্ছিস?'

বিকাশ রিক্‌শাওলাকে বললে, 'একটু তাড়াতাড়ি চলো, জরুরি কাজ আছে আমার।'

এখন মাথাটা জমাট একটা কংক্রীটের পিণ্ড। কিছু ভাববারও অবস্থা নেই আর।

প্রভাকর বলেছিল, 'সেই ভালো—চলেই যা। মুক্তি হোক তোর।'

কিন্তু মুক্তি? যে ঋণ সে রেখে গেল মুন্নুর কাছে, তার কাছ থেকে তার মুক্তি মিলবে কোনোদিন?

আর জল এসেছিল অমলার চোখে।

'আদমি নেই এখানে। এখানকার সব বড়লোকগুলো জানবর।'

কিন্তু দুঃখ যত দারুণই হোক—এতবড়ো নালিশ কি বিকাশ করতে পারে কখনো?

এখানে তো প্রিয়গোপালকে সে দেখল। হয়তো বিকাশের ওপর তিনি খানিকটা অবিচার করেছেন, কিন্তু ওই শীর্ণ কুঁজো মানুষটিও তো মাথা সোজা করে দাঁড়াতে জানেন। প্রদীপ মুস্তফি, ধনঞ্জয় দত্ত অসহিষ্ণু হতে পারে—কিন্তু ওরা নিছক ব্যাঙ্কের কেরানীই নয়, তার বেশি আরো কিছু।

এবং—আর একটি ছবি। একদিন প্রভাকরের এখানেই।

কোন্ দূর গ্রাম থেকে একটি মানুষ এক ভাঁড় দুধ আর একছড়া কলা এনেছে প্রভাকরের জন্যে। নিতান্তই দীন দরিদ্র, ছেঁড়া গেঞ্জী, ময়লা লুঙ্গি তার পরনে।

'এগুলো আপনাকে নিতেই হবে ডাক্তারবাবু।'

'কী পাগলামি করছ রমজান! তোমার তো নিজেরই খাওয়া চলে না। ওগুলো বাজারে বেচলে তুমি পয়সা পাবে।'

'না ডাক্তারবাবু, আমার পয়সার দরকার নেই। আপনি এগুলো রেখে দিন। আমার গাইটা এই প্রথম দুধ দিয়েছে। এ কলা আমার গাছের। আপনি না নিলে ভারী কষ্ট পাব।'

'দাম নিতে হবে তা হলে।'

লোকটি জিভ কাটল।

'সে পয়সা আমার হারাম হবে ডাক্তারবাবু। পারব না।'

জোর করে রেখে, আদাব জানিয়ে চলে গেল।

প্রভাকর বললে, 'কৃতজ্ঞতা। গ্রামের গরীবের এই চেহারাটা তুই দেখিসনি। ডাক্তার হিসেবে সামান্য কর্তব্য হয়তো করেছি, কিন্তু মানুষগুলো যে সেই ঋণের জালে কিভাবে জড়িয়ে যায়, তুই ভাবতেও পারবি না। কত দোয়া, কত আশীর্বাদ, কত চোখের জল। সত্যি বলছি বিকাশ—' প্রায়-সিনিক প্রভাকরের গলাও আবেগে ভরে উঠেছিল: 'গঞ্জের এই সব নোংরামিতে মানুষ সম্পর্কেই যখন ঘেন্না ধরে যায়, তখন এই সব চাষাভূষো গরীবের দিকে তাকালে বুক ভরে ওঠে আমার। তখন মনে হয় মানুষ কী আশ্চর্য সুন্দর—কত সহজ, কী তার ভালোবাসা। গঞ্জের এইসব মুরুব্বিদের আমার ডিসেক্‌শন টেবিলে ফেলে কাটতে ইচ্ছে হয়, আর এদের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবি জীবনকে শ্রদ্ধা করা—

তার সেবা করা—দিস ইজ্ মাই ডক্টর্‌স্ ডিউটি। নট ইয়োর কানাই পাল অ্যাণ্ড নিয়োগী কোম্পানি—একবার দূরের গ্রামে যাবি বিকাশ? চিরকালের বাংলা দেশে চাষার কুঁড়ে দেখতে যাবি? অর্থাৎ কানাই পালদের সয়েল অব্ এক্‌সপ্লয়টেশন—জোতদারদের রক্ত শোষার জায়গায়?'

'যাব দেখতে।'

কিন্তু যাওয়া হয়নি। নিজের সমস্যা আর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার বৃত্তে সে কাতর থেকেছে—সে জাল ছিঁড়ে সে আর বেরুতে পারল না।

'এখানকার বড়লোকগুলো সব জানুবর।' হয়তো অমলার এ-কথা সত্যি। কিন্তু এখানে 'আদমি নেই?' এতবড়ো নালিশ সে করবে কেমন করে, কিসের জোরে?

না, ঠিক কথা, এতবড়ো ধিক্কার বিকাশ দিতে পারে না। সে নিজেই বা কোন্ দৃষ্টান্ত রেখে গেল এখানে? সেও তো নিজের সঙ্গে কাউকে মিলিয়ে নিতে পারল না। তার চেনা এই সব মানুষের বাইরে আরো বড়ো বাংলা দেশ ছিল, আরো অনেক হৃদয় ছিল, তাদের সুখ-দুঃখের সহজ ছন্দ ছিল; সে কানাই পাল আর শশাঙ্কর বাইরে কাউকে দেখল না, নিজের মন নিয়ে ছটফট করল, তারপর মুমুর জীবনে অকারণে কান্না জাগিয়ে দিয়ে, তাড়া খেয়ে পালালো এখান থেকে।

এই-ই হওয়া উচিত ছিল। এর বেশি তার আর পাওনা ছিল না।

এবার আর এক রিক্‌শা। স্টেশনের পথে। গঞ্জ-বাজার থেকে স্টেশন একটু দূরে, মাঝখানে একদিকে মাঠ আর একদিকে গাছের সার। পথে আলো-আঁধারি। বসন্তর হাওয়া। আমের মুকুল, সজনে ফুলের গন্ধ। দিনের আলো থাকলে শিমুলেরও রঙ দেখা যেত এখন। শীতে সে এসেছিল, বিদায় নিল বসন্তে।

আর কিছু ভাববার নেই। নির্ভাবনায় বসে থাকাই ভালো।

কিন্তু নির্ভাবনায় থাকা গেল না। একটু নির্জন জায়গায় পাঁচ-সাতজন ছোকরার একটা দল সিগ্রেট টানছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রিক্‌শাটা সেখানে আসতেই একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'এই রিক্‌শা—থাম শীগ্‌গির।'

থামবারও তর সইল না। তার আগেই তারা টেনে নামালো বিকাশকে।

একজন শক্ত হাতে ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দিলে তার।

'একটা মেয়ের সব্বোনাশ করে কোথায় পালাচ্ছিস শা—?'

'বাবুরা কী করছেন—' রিক্‌শাওলা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু একজন সশব্দ থাপ্পড় বসিয়ে দিলে তার গালে। আর একজন রিক্‌শাটাকে ঠেলে বাক্স-বিছানাসুদ্ধ নামিয়ে দিলে পথের ঢালে, হুড়মুড় করে সেটা নীচের নালায় গিয়ে পড়ল। 'হায় হায়' করে সেদিকে

ছুটল রিক্‌শাওলা।

'স্লা, পরের মেয়েকে নষ্ট করতে ভারী মজা লাগে না?' একটা তাক-করা ঘুষি এসে পড়ল মুখের ওপর।

'দে স্লার সব কলকাত্তাই চালকে আচ্ছামতো ধোলাই করে—' এবার পেটে একটা লাথি।

নিয়োগীপাড়ার ছেলেরা বদলা নিচ্ছিল। কানাই পালের গাড়িতে বোমাটা লাগেনি, তার শোধ তোলা হচ্ছিল বিকাশের ওপর দিয়ে।

হয়তো কিছু লড়তে পারত বিকাশ, একদা-স্পোর্টসম্যান কিছুক্ষণ রুখতে পারত এই আক্রমণকে। কিন্তু নিজের বিপর্যস্ত স্নায়ু নিয়ে, অপরাধের বোঝা বয়ে, নিঃশব্দে মার খেতে লাগল। আর বিকাশের চোখের সামনে কয়েক হাজার তারা ঝলকে উঠেই অতল অন্ধকারে নিবে গেল সমস্ত। মস্তিষ্কটা কংক্রীটের মতো জমাট বেঁধে ছিলই—সেটা এখন টুপ করে ডুবে গেল সেই অন্ধকারের ভেতরে।

সেই তখন—উল্টো দিক থেকে একটা লরীর জোরালো আলো এসে পড়ল তাদের ওপর।

একত্রিশ

বিকাশের ভাগ্য ভালো, সেই সময় লরীটা আসছিল। না হলে আরো অনেক কিছুই ঘটে যেত।

নিয়োগীপাড়ার বীরেরা আর দাঁড়ালো না—যেদিকে গাছপালার ছায়া, তীরবেগে তারা অদৃশ্য হল সেদিকে। আর লরীটা এসে থমকে গেল সেখানে।

'কেয়া হুয়া—কেয়া হুয়া?'

গলা বাড়িয়ে লরীর ড্রাইভার প্রশ্ন করল।

সব ধোঁয়া ধোঁয়া, সব স্বপ্নের মতো। মুখে রক্তের স্বাদ। নাকের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। লরীর ড্রাইভার আর ক্লীনার মাটি থেকে টেনে তুলল তাকে। একটু একটু করে মাথাটা স্বচ্ছ হতে লাগল বিকাশের।

'কেয়া হুয়া বাবু?'

'কিছু না—কিছু না, কিছু হয়নি।'

রাস্তার তলা থেকে রিক্‌শাওলার চিৎকার উঠছিল: 'গুণ্ডা—গুণ্ডা—গুণ্ডার দল ধরেছিল বাবুকে। আমার রিক্‌শ ভেঙে দিয়েছে—ছুটে পালিয়েছে ওদিকে।'

'গুণ্ডা! বাবু—চলিয়ে থানে মে।'

'কী হবে?'

'ডাইরি কর্ দিজিয়ে। দেখা উ লোগোঁকো?'

কী হবে? না, কিছুই হবে না, কোনো দরকার নেই ডায়েরী করবার।

মনীষাকে ঠকিয়েছে সে, স্বনুকে কালো করে দিয়েছে। এখানে এসে একটা লোকের সঙ্গেও সে মিশতে পারল না। তারই দাম দিতে হয়েছে তাকে। ধনঞ্জয় দত্তই ঠিক বলেছিল।

এ তার সামান্য পাওনা। আরো পেতে পারত।

তবু আর একটা উল্টোমুখী খালি রিক্শা পেয়েছিল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ট্রেনটা আর মিস করতে হয়নি। স্টেশনে এসে নাক-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হওয়ারও সময় পাওয়া গেছে একটু।

মুখটা ফুলেছে, নাকে অসহ্য ব্যথা, কষের দুটো দাঁতেও যন্ত্রণা। কপালে কালশিরে পড়েছে নিশ্চয়। ট্রেনে ওঠবার একটু পরেই প্রশ্ন করেছিলেন এক ভদ্রলোক।

'কী হয়েছে মশাই! ঠোঁট ফেটে গেছে, মুখ ফোলা, কপালে—ঈস্!'

'একটা সামান্য অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল।'

'পড়ে-টড়ে গিয়েছিলেন বুঝি?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল বিকাশ। কথা দিয়ে মিথ্যের জের টানতে আর উৎসাহ পাচ্ছিল না সে। মিথ্যে বলবার অভ্যাস তার নেই।

তবু বরাত যে, চশমায় ঘুষি লাগেনি, তা হলে চোখটাই যেত। নিয়োগীপাড়ার বীরেরা হয়তো দয়া করেই ওটুকু রেয়াৎ করেছে তার। অথবা চোখটা তাক করবার সময় পায়নি, লরীটা এসে গিয়েছিল তার আগেই।

আজ আর শীতের আমেজ নেই, বরং অসহ্য একটা উত্তাপ যেন উঠছে গাড়ির কামরায়। বিকাশ জানলার দিকে মাথা রাখল। হাওয়া—কতদূর থেকে দক্ষিণ সাগরের হাওয়ার ঝড়। এই হাওয়া তার এই কয়েকটা দিনের স্মৃতিকে দূর-দূরান্তে উড়িয়ে নিয়ে যাক; ঘুম ভাঙার পর সারা রাতের স্বপ্নেরা যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি হারিয়ে যাক সব; ভুলিয়ে দিক সেখানকার সমস্ত মানুষকে—সব ঘটনাকে—যেখানে সে আর কখনো ফিরে আসবে না।

সব ভোলা যায়। শুধু একজনকে ভোলা যায় না। স্বনু—স্বর্ণা—সোনালি।

তাকে ঘিরে আছে অন্ধকারেরর দুর্গ—জীর্ণ চুন-বালি—পুরোনো মাটির গন্ধ; সেখানে অদ্ভুত আওয়াজ করে একটা অলক্ষ্য ঘড়ি বাজতে থাকে—যেন কালপুরুষের ঘণ্টা; গাঁজা খেয়ে পাগল হয়ে গেছে ইতিহাসের ছাত্র যে প্রদ্যোতকুমার নিয়োগী, সেখানে নরবলির বিভীষিকা দেখতে পায় সে; সেখানে জানলার বাইরে এখনো গলায়-দড়ি-দেওয়া ছোট মাসীমা এসে নিশির ডাক দেয়; বড়ো মেয়েকে কোন্ ডাকাতের ঘরে দিয়েছেন শশাঙ্ক

নিয়োগী—তার না-জানা ইতিহাস যন্ত্রণায় থমকে থাকে অন্ধকারের আড়ালে—কালিমার বুকের ভেতর। আর মৃন্ময়—তারই ভেতরে, আলোর দিকে পাপড়ি মেলতে গিয়ে—চারদিকের বিষে, বিকাশের অশুচিতায়, একটু একটু করে কুঁকড়ে ঝরে যেতে থাকে।

না, বিকাশের দোষ নেই। নিয়োগীবাড়ির ছোঁয়াচ তারও লেগেছিল। কাউকে বাঁচতে দেব না—সব একসঙ্গে টেনে নিয়ে যাব সহমরণে। শশাঙ্ক তার মুখ দেখেই বুঝেছিলেন সে তাঁর দলে। তাই অত আদর করে টেনে রেখেছিলেন নিজের কাছে।

'এ বাড়ি থেকে কোথায় যাবে বাবাজী? তুমি তো ঘরের লোক।'

নিঃসন্দেহ। শশাঙ্কর একেবারে আত্মজন। তাই শশাঙ্কর চরিত্রের ছোঁয়া তাকেও লেগেছিল। শশাঙ্কই তাকে চিনেছিলেন।

মুছে যাক—সমস্ত মুছে যাক! এসব কিছুই সত্যি নয়। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। রাত ভোর হলে কাল কলকাতায়।

তখন আবার পুরোনো জীবন, চেনা কলকাতা!

কিন্তু সেই কলকাতা? কোন্ কলকাতা?

বদলে গেছে, এই দুঃস্বপ্নটাই বদলে দিয়েছে কলকাতাকে। তার ক্লান্তি, তার ভীড়, তার দমবন্ধ করা উদ্‌ভ্রান্ত। তবু তার মধ্যে গঙ্গার ধার ছিল, যেখানে গাছের পাতায় পাতায় কাঁপত আলো-আঁধারি; ছিল গড়ের মাঠ—হাওয়ায় দুলত প্রথম বৃষ্টির নতুন ঘাসেরা, রাধাচূড়োর ফুল ঝরত; এক-আধটা সিনেমা, এক-একদিন একসঙ্গে চা খাওয়া, আর মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়িটা।

সেই বাড়িটা—মনীষাকে যে শুষে খেলো।

'মণি, গান গাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলে?'

'কী করব?'

'মানে?'

'সময় পাই না যে।'

'কী অন্যায়? এত ভালো গলা ছিল তোমার।'

'ভালো না ছাই—হাঁড়িচাচার মতো।'

'না, ঠাট্টা নয়। গান তুমি ছাড়তে পারবে না।'

'শরীর ভালো নেই, দম রাখতে পারি না।'

'শোনাও। পরীক্ষা করে দেখব।'

'বিশ্বাস করো, আমি পারব না।'

'মণি, এ কোনো কাজের কথাই নয়। নিজের ওপর তোমার আর একটু কেয়ার নেওয়া

উচিত।'

'হুঁ, তুলোর বাক্সে শুয়ে থাকি আর কি।'

'তুমি সিরিয়াসলি নিচ্ছ না। অথচ আমি দেখছি দিনের পর দিন কী বিশ্রীভাবে পেল হয়ে যাচ্ছ তুমি। মণি, ডাক্তার দেখাও।'

'তোমার মাথা খারাপ। মেয়েরা সহজে মরে না।'

'মণি, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, পাড়াগেঁয়ে ঠান্‌দির লজিক তোমার মুখে মানায় না। একটু কন্‌সাল্ট কোরো কোনো ডাক্তারকে।'

'সত্যি বলছি, আমার কিছু হবে না। অফিসে দুজন ছুটি নিয়েছে, একটু বেশি পড়েছে কাজের চাপ, তাই—। কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কথায়, মেয়েরা সহজে মরে না।'

কী আত্মবিশ্বাস!

আর সেই জন্যেই যে পথ দিয়ে মৃত্যু এল, সেখানে কোনো প্রতিরোধ নেই। মাথা নীচু করে সরে দাঁড়ালো মানুষের সব চাইতে বড়ো অহঙ্কার মেডিক্যাল সায়েন্স।

'কিছু করবার নেই—না প্রভাকর?'

কখনো আশা ছাড়বে না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও না—ডাক্তারের মন্ত্রবাণী। তবু কোনো আশ্বাস দিতে পারল না প্রভাকর। বলতে পারল না, আমরা কখনো আশা ছাড়ি না।

ট্রেন একবার দোলানি খেলো কোনো জোড়ের মুখে। আচমকা একটা ধাক্কা লাগল গালে। একটা যন্ত্রণা। মাথার শিরা থেকে পায়ের ডগা পর্যন্ত লিকলিকে বিদ্যুতের মতো একটা যন্ত্রণা। ঠোঁট ফসকে অস্পষ্ট কাতরোক্তি বেরিয়ে পড়ল একটা।

পাশের ভদ্রলোকের ঝিমুনি ধরেছিল। চমকে উঠলেন তিনি।

'কিছু বলছিলেন আমাকে?'

'না। কিছু না।'

ভদ্রলোক আবার ঝিমুতে লাগলেন।

যন্ত্রণা। শুধু মুখে নয়, নাকে নয়, সমস্ত শরীরে। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু কোন্ কলকাতায়? সেখানে গঙ্গার ধারে গাছের ডাল আর আলো-আঁধারির জাফরি কাটবে না, আর গুলমোহরের পাপড়ি উড়বে না হাওয়ায়, নীল আকাশের দিকে খুশি হয়ে উঠবে না উদগুলি আকাশিয়ার মঞ্জরী, সিনেমা আরো অনেকবার দেখা হবে, কিন্তু পাশে আর মনীষা থাকবে না; আবার অনেক দিন রেস্তোরাঁয় ঢুকতে হবে, কিন্তু কেবিনের পর্দা টেনে দিয়ে হাতে হাত মেলাবার জন্যে আর কেউ থাকবে না, শুধু পেটের খিদে মেটাতে হবে কখনো, কখনো বা এক পেয়ালা চা সামনে নিয়ে নিছক সময় কাটাতে হবে।

কোন্ কলকাতা। সেই দেশবন্ধু পার্কের সামনে। একটা জরতী সন্ধ্যার আবির্ভাব। নিবে যাওয়া অঙ্গারের রংধরা আকাশ। দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বেয়াড়া গর্তে আছড়ে পড়ে পুরোনো লরীর আর্তনাদ; চীনেবাদামের খোলা জুতোর নীচে গুঁড়িয়ে যাওয়ার একটা দস্তুর শব্দ, পাশ থেকে একটা তোলা উনুনের উত্তাপ; হাওয়ায় উড়তে উড়তে একটা কাগজ এসে পায়ে জড়িয়ে ধরা—যেন সাপের খোলস একটা।

এই সন্ধ্যা—এই কলকাতায় মনীষা মরবে। চিতার রংধরা আকাশের আর অর্থ নেই কোনো; পুরোনো লরীর আর্তনাদে একটা কর্কশ কান্নার দমকা; চীনেবাদামের গুঁড়িয়ে যাওয়া খোলায় কে যেন দাঁতে দাঁত কড়কড় করে হিংস্র রব তুলছে—তার আভাস; পায়ে জড়িয়ে যাওয়া কাগজটায় সেই শেকলের টান—যা বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটাকে উপড়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

ট্রেন কোথায় যেন থেমেছিল, কারা উঠল, কারা নামল। ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখল বিকাশ। মানুষগুলোর মুখ দেখা যায়—অথচ দেখা যায় না। কতগুলো ছায়া নড়ছে, দুর্বোধ্য শব্দ উঠছে কয়েকটা।

আবার চলল গাড়িটা। আচমকা ঝাঁকুনি। আবার জানলার শিক থেকে আহত মুখের ওপর যন্ত্রণার ঢেউ। বাইরে আলোরা সরছে। গাড়ির গতি বাড়ছে—সব আলো-গুলো—একসঙ্গে মিশে কাঁপছে কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখায়। কিন্তু তাদের রং নীল বলে মনে হল বিকাশের। যন্ত্রণায় নীল।

'দোহাই তোমার, এ সময়ে তুমি আমার কাছে এসো না। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। তুমি এলেই আমার যন্ত্রণা বাড়বে—বাঁচবার লোভ জাগবে—'

তাহলে মনীষারও লোভ ছিল। ভাবতেই পারা যায়নি কোনোদিন।

কলকাতা মনীষাকে গ্রাস করছে। দেশবন্ধু পার্কের আকাশে নিবন্ত চিতার রং। অথচ, এই কলকাতায় এসেই সোনালি আলো হয়ে উঠেছিল।

জোর করেও ভোলা গেল না—সরিয়ে দেওয়া গেল না মন থেকে। সেই শিকের ওপর মাথা রেখে, দূর সাগরের হাওয়ায় স্নান করতে করতে, বিকাশের চোখ বুজে গেল। মনীষার মৃত্যুর ছায়া থেকে পাপড়ি মেলতে লাগল আলোকপর্ণা।

এত সহজেই ছেড়ে দেবেন শশাঙ্ককাকা? নিয়োগীপাড়ার ছেলেদের কয়েকটা লাথি-ঘুষির ওপর দিয়েই নিষ্কৃতি আছে বিকাশের?

কালই হয়তো একটা চিঠি লিখবেন মাকে। হয়তো আজই লিখছেন। সে চিঠি না দেখলেও জানা যায়, কী আছে তাতে। বিকাশকে তিনি বিশ্বাস করে—আপনজন ভেবে ঘরে জায়গা দিয়েছিলেন। তারই সুযোগ নিয়ে—

তারপর কতগুলো কুৎসিত অভিযোগ। মিথ্যা সেখানে সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে

যাবে, নিজের মেয়ের গায়ে কালি ছড়াতে শশাঙ্কর বাধবে না—যেমন বাধেনি সুধাময়ী দেবীকে দিয়ে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত অব্যর্থ মাদুলীর ব্যবসা করানোতে। শশাঙ্ক পরের মামলার তদ্বির করেন, মিথ্যে সাক্ষী সাজান—নিজের মামলায় জিততে গেলে সেই মিথ্যেকে কতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, শশাঙ্কর চাইতে ভালো করে তা কেউই জানে না।

মা স্তব্ধ হয়ে যাবেন। তারপর ডাকবেন। বিকাশ দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকাতে পারবে না মার দিকে।

'আমি এর একটা বর্ণও বিশ্বাস করি না, বুবু। আমার ছেলেকে আমি চিনি।'

বলা যাবে, মা, ছেলেকে সম্পূর্ণ তুমি চেনো না? বলা যাবে, আমি সুমুর মনে অশুচি ছায়া ফেলেছি?

মা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবেন।

'এ যত বড়ো মিথ্যেই হোক, মেয়েটিকে আমি দেখেছি বুবু। মণি তো বিয়ে করবে না—সে আমি তোকে আগেই বলেছি। শশাঙ্ক ঠাকুরপো যে এত ভয়ঙ্কর তা আমি ভাবতেও পারিনি। তবু—' মা একটু থামবেন: 'পাঁকে পদ্মও ফোটে। ওই মেয়েটিকে তুই উদ্ধার করে আন্ বাবা—আমি ওকেই ছেলের বউ করব।'—মা আবার থামবেন: 'এ কথাটা তো সোজাসুজি বললেই হত, এ রকম নোংরা রাস্তা নেবার দরকার ছিল না কোনো।'

মা বলবেন এ কথা? হয়তো বলবেন; হয়তো রাগ করবেন।

'ছি ছি, ওই ছোটলোকের মেয়ে? মিথ্যে অপবাদ দিয়ে বিয়ে দেবে? কক্ষনো না।'

তবু মার চোখের দিকে চাইলে অন্য রকম মনে হয়। মা তো নিজেই আভাস দিয়েছিলেন—

আবার ঝাঁকুনি, আবার যন্ত্রণা, ঘোর ভেঙে যাওয়া। ছুটন্ত ট্রেনের বাইরে এক আকাশ তারা। তারাগুলোর রঙ নীল—যন্ত্রণায় নীল।

না, এখন নয়—এখন নয়। এখন মনীষা মরছে একটু একটু করে। এখন অন্ধকারে ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে যন্ত্রণা—বুকের শিরগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে। এখন কিছুই ভাবা যায় না।

শশাঙ্কর লজ্জা নেই। দরকার হলে কলকাতায় এসেই হয়তো হানা দেবেন তিনি।

আর সেই কুশ্রী কদর্যতায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আলোকপর্ণার পাপড়িগুলো। বিকাশ কী করবে তখন?

এখনো ভাবা যাচ্ছে না। এখনো না। মনীষা মরছে।

অন্ধকার—যন্ত্রণার অন্ধকার। তবু একটা আলোর পাপড়ি থেকে থেকে ভেসে উঠতে লাগল তার ওপর।

'সুবর্ণা।'

শুভক্ষণ

অগ্রজ কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রিবনবাঁধা ভালুক

ট্রেন এখানে থামবার কথা নয়, তবু থামল। হাতের বইটা থেকে চোখ তুলে অলস কৌতূহলে আমি একবার বাইরের দিকে তাকালুম।

লাইনের ডান পাশে ঝাঁকড়াচুলো রাক্ষসের মাথার মতো পাহাড়টার ওপর সূর্যটা কেবল নেমে গেছে তখন ; আকাশের কোণায় কোণায় জড়িয়ে থাকা মেঘের গায়ে লাল-নীল-হলুদ-কমলা রঙের মাখামাখি। সেই রঙ মেখে তিন-চারটে শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে—যেন নিজেদের চওড়া চওড়া কালো ডানায় রাত্রিকে বয়ে আনছে তারা। মনে হল, আকাশটা এখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি হয়ে উঠেছে।

ছবিটাই দেখছিলুম, হঠাৎ দুটো কুকুর ঝগড়া করে উঠল বাঁ দিকে, অর্থাৎ স্টেশনের ধারটায়। একটা আসন্ন দীর্ঘছায়ার ওপর পাঁচমিশালী রঙের ছোঁয়া লেগে ছোট্ট স্টেশনটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। শাদা জিনের পোশাক-পরা জন-দুই রেলের কর্মচারী দাঁড়িয়েছিল দুটো ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো, একজন কুলি সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে যাচ্ছিল শাঁ-শাঁ করে শ্বাস টানতে থাকা এঞ্জিনের দিকে, আর পাশের কামরায় কারা যেন মোটা গলায় ইংরেজিতে তর্ক করছিল।

নির্জন স্টেশনে হঠাৎ থেমে পড়া মেল ট্রেনের সেই আশ্চর্য নিঃসঙ্গতার ভেতরে, একা একটি 'কুপে'তে বসে বসে, সেই ছায়ার সঙ্গে শেষ আলোর খেয়ালীপনার মধ্যে, স্টেশনের নামটা আমি দেখতে পেলুম। দুই যুগেরও পরে আমি আবার নতুন করে নামটাকে পড়লুম—হিন্দীতে, ইংরেজিতে। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল, এখুনি আমি আরতিদিকে দেখতে পাব কল্কে ফুল গাছটার তলায়—সেই বাঁধানো বেঞ্চিটার ওপর বসে কোঁচড় থেকে একটার পর একটা বাদাম খেয়ে চলেছে!

ছবিটা ভালো করে ফোটবার আগেই মেল ট্রেন ছাড়ল। পার হল সেই ছোট কালভার্টটা, যেখানে দু'পাশে তালিমারা তাঁবু ফেলে কুলি গ্যাং লাইন সারাচ্ছে আর যার জন্যে এই অকুলীন স্টেশনে মেল ট্রেনকেও পাঁচ মিনিটের জন্যে দাঁড়াতে হয়েছিল। আস্তে আস্তে ট্রেনের স্পীড বাড়তে লাগল, আবার শুরু হল চাকার-রঙে-চেনে সেই শব্দের ঝড়, দীর্ঘ ছায়াটা আরো ঘন হল আর তার মধ্যে ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার রঙেরা, কখন যে একটা শাদা ঝলক দেখিয়ে হারিয়ে গেল সুবর্ণরেখা—অসংখ্য কালো কালো গাছ-পালার ভেতরে এক হয়ে রইল সেই মহুয়ার বনটা—আমি টেরও পেলুম না।

এখন অন্ধকারের বুক চিরে একটানা চলতে থাকুক মেল ট্রেনটা। এখন সব একাকার—এখন সব রাত্রির আড়াল দিয়ে ঢাকা। শুধু সেই পেছনে ফেলে আসা এক

চিলতে স্টেশনে—যা আমার চোখের সামনে অবনীন্দ্রনাথের ছবি হয়ে আছে—তার ওপর একখানা মুখ ফুটে উঠুক।

আরতিদির মুখ।

এই পথ দিয়ে আরো অনেকবার আমি গেছি। দিনের জাগরণে বই-কাগজ পড়তে পড়তে, রাতের অন্ধকারে কখনো স্বপ্নজড়ানো, কখনো স্বপ্নহীন ঘুমের অবসরে। দুই যুগের সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই স্টেশনটার অস্তিত্ব আমি ভুলে গিয়েছিলুম—মেল ট্রেনের গতিতে শাদা কালো ধোঁয়ার মতো এর নামটা দু-তিন সেকেণ্ডের ভেতরে পাক খেয়ে মিলিয়ে যেত। কিন্তু আজ হঠাৎ গাড়িটা থামল। আর বেলাশেষের আকাশটা লাল-নীল-হলুদ-কমলা রঙের খেলায় অবনীন্দ্রনাথের ছবি হয়ে গেল। আমার চশমার লেন্সের ভেতর দিয়ে রঙিন ফোটোগ্রাফের মতো চিন্তায় এসে স্থির হল, আর তার ওপর ফুটে উঠল আরতিদির মুখ।

না—কেবল আরতিদি নয়। একটা ভালুক। আকাশের কোণায় যে কালো মেঘের টুকরোটা গুঁড়ি মেরে বসেছিল, সেটাও আমার মনে হল, সেই পঁচিশ বছর আগেকার ছবিটা ফুটে উঠবে বলেই এমনি করে আজ শেষ বিকেলের রঙ ছড়িয়েছিল, এমনিভাবে মেল ট্রেনটা এখানে থেমে গিয়েছিল আর দুটো কুকুরের ঝগড়ায় আমি স্টেশনের দিকটাতে মুখ ফিরিয়ে ছিলুম। সময়ের হাতে যে ছবির পটটা একভাবে গুটিয়ে চলেছে কখন তার মাঝখান থেকে একটা অংশ হঠাৎ খসে পড়েছিল, কয়েক মিনিটের জন্যে আমি তাকে দেখে নিলুম আর একবার। যেদিন ওই ছবির এক কোণায় একটি ছোট বিন্দুর মতো আমারও জায়গা ছিল—সেদিন ছবিটা যে ঠিক কী দাঁড়াচ্ছে তা বোঝাবার শক্তি আমার ছিল না। আজ নিজের ভেতরে—অথচ নিজে আড়াল করে নিয়ে, সেই রঙিন ফটো-গ্রাফটাকে আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি।

বয়েস কত আর তখন? বারোর বেশি নয়। ক্লাস সেভেনের ছাত্র।

উত্তর বাংলার শহরটায় তখন থাকি, সে জায়গাটা ম্যালেরিয়ার জন্যে স্বনামধন্য। বছরে অন্তত চার মাস ম্যালেরিয়ায় ভোগা প্রায় স্বাভাবিক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। খেলতে খেলতে জ্বর আসত, ক্লাসের পড়া বলতে দাঁড়িয়ে অনুভব করতুম আমার সমস্ত শরীরটা যেন উত্তর মেরুর তরল বরফের ভেতর অসহ্য শীতার্ততায় তলিয়ে যাচ্ছে। পাঁচদিন জ্বরে ভুগে যেদিন ভাত খাওয়ার আশায় সকাল থেকে ধর্ণা দিয়ে বসে আছি আর মা আমার জন্যে কই মাছের ঝোল চাপিয়েছেন—কখন একটা আচমকা কাঁপুনি উঠত সারা গায়ে, উঠোনের পুরোনো চৌকিটায় গিয়ে বসতুম রোদের ভিতরে, ধীরে ধীরে জ্বরের ঘোরে তলিয়ে যেত চেতনা, আমার কপালের ওপর হাত রেখে মার চোখের জল টপটপ করে

ঝরে পড়ত। দু হাতে আমার ইন্‌জেকশনের অগণিত সূচীবেধ—সমস্ত পেটটা পিলে এবং কুইনিনে আচ্ছন্ন—যেন পাহাড়ের টিলার ওপর মূর্তিমান সিনকোনা প্ল্যাণ্টেশন।

তখন একদিন ছোট মামা এসে বললেন, দিদি, এ হচ্ছে কী, মেরে ফেলবি নাকি ছেলেটাকে? আমি কালই ওকে নিয়ে যাব আমার সঙ্গে। খাসা জায়গা, দিব্যি জলহাওয়া—এক মাসে ভালো হয়ে যাবে।

মা বললেন, হাফ-ইয়ার্লি হোক, পুজোর ছুটি হয়ে যাক—তবে তো।

ছোট মামা গোঁয়ার মানুষ। তিনবারের বার থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। কিন্তু ফুটবল মাঠে তাঁর পায়ে বল পড়লে ও-পক্ষের গোলে বিপর্যয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই রেলের সাহেবদের বিপক্ষে ফাইন্যাল খেলতে গিয়ে কেবল শীল্ড্ই নিয়ে আসেননি—রেলের চাকরিও এনেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

রেগে ছোট মামা বললেন, দুত্তোর হাফ-ইয়ার্লি। রোগা টিকটিকির মতো ছেলে—পরীক্ষা নিয়ে ধুয়ে খাবে? দুদিন পরে পরীক্ষা আর প্রাইজই থাকবে, ছেলে আর থাকবে না। আমি একে নিয়ে চললুম—দেখি তুই আর তোর কর্তা কেমন করে ঠেকাস!

যা বললেন তাই করলেন। আর জীবনে সেই প্রথম আমি এতটা পথ একসঙ্গে রেল গাড়িতে চড়লুম। টেলিগ্রাফের তারে কত পাখি, রেলের নয়ানজুলিতে সাপ আর শাপলা কত পাহাড় আর নদী দেখতে দেখতে, কত স্টেশনে পুরী-মিঠাই-আলুর তরকারী খেতে খেতে এইখানে এসে আমি পৌঁছলুম।

ডান দিকের জংলা পাহাড়টা সকালের আলোয় তখন সবুজ আর সুন্দর হয়ে ছিল। হলদে কল্‌কে ফুল ঝরে পড়েছিল বাঁধানো বেঞ্চি আর প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরের ওপর। ট্রেন থেকে নামবার পরে নীল উর্দিপরা কুলিটা একটা লাইন-ক্লিয়ার হাতে নিয়ে সেলাম করেছিল। আর গেটে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি টিকেট চাননি আমাদের কাছে, কেবল বলেছিলেন, ভালো ছিলে তো অমল? সঙ্গে এটি কে?

—আমার ছোট ভাগ্নে, পরেশদা।

—ভাগ্নে?—পরেশদা—পরে জেনেছিলুম স্টেশনের বড়োবাবু—হেসে বলেছিলেন, স্পোর্টস্‌ম্যান মামার একি ভাগ্নে—অ্যাঁ! এ যে বেজায় রোগা দেখছি। কী খোকা—বাবা-মা বুঝি তোমায় কিছু খেতে দেন না?

কাঁচা-পাকা গোঁফ, হাসিতে চকচকে মুখ, গোলগাল চেহারার মানুষ। বেশ লেগেছিল। ছোট মামা বলেছিলেন, খেতে দেবে না কেন? প্রচুর খাচ্ছে—কুইনিন, কালমেঘ, পাইরেক্স, ডি গুপ্ত। ম্যালেরিয়ায় ভুগে সারা হয়ে গেল। তাই জোর করে নিয়ে এসেছি এখানে।

—ভালো করেছো, খুব ভালো। এখানকার জলে হাওয়ায় তিনদিনেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

তখনো আমার মামাতো ভাই লোটনের জন্ম হয়নি—মামাতো বোন টুটুলেরও না। ছোট্ট রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকেন ছোট মামা আর ছোট মামী। পাশের কোয়ার্টারে থাকেন স্টেশন মাস্টার পরেশবাবু, তাঁর স্ত্রী—যাঁকে আমি বলতুম বড় মামীমা আর তাঁদের মেয়ে আরতিদি।

আরতিদি আমার চাইতে তিন-চার বছরের বড়ো ছিল খুব সম্ভব। শামলা রঙ, একটু রোগা আর লম্বাটে, পিঠ ছাপিয়ে পড়া অনেক চুল আর বড়ো বড়ো টানা টানা চোখ। পরেশবাবুর বদলির চাকরির জন্যে লেখাপড়া বেশি করতে পারেনি, ক্লাস সিক্সে উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। আমি সেভেনে পড়ছি জেনে ভারী লজ্জা পেয়েছিল মনে আছে—তিন-চারদিন আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেনি। কিন্তু লেখাপড়া না-ই হোক, হার্মোনিয়াম বাজিয়ে বেশ গান গাইতে পারত। রোজ সন্ধ্যেবেলায় হার্মোনিয়াম নিয়ে বসত, কখনো গাইত : 'কৃষ্ণ মুরারি শ্যাম গিরিধারী', কখনো বা গাইত : 'বাদল বাউল বাজায়-বাজায়-বাজায় রে বাজায় রে একতারা।' পরের গানটা শুনতে বেশ ভালো লাগত আমার।

তারপর আস্তে আস্তে কখন যে আরতিদির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল, মনেও পড়ে না। আর ভাব না হয়েই বা উপায় কী? আরতিদির তো কোনো সঙ্গী-সাথী ছিল না। স্টেশনের একটু পেছনে মোটে তিনটে দোকান। একটাতে হরিয়ার মা জাঁতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছাতু পিষত আর কী একটা গান গাইত : কাঁহা রহিল হো রামা। আর একটা দোকান ছিল লছমনপরসাদ হালুয়াইয়ের—সে পুরী আর বোঁদে ভাজত, লাড্ডু বানাত আর কুঁদরুর তরকারী তৈরী করত। আর মোতিলালের দোকানে পান-সিগারেট চাল-ডাল সাবান এই সব বিক্রি হত। মোতিলালের মেয়ে রামরতিয়া মধ্যে মধ্যে ঝুঁটি বেঁধে আর একটা লাল টুকটুকে শাড়ি পরে আরতিদির কাছে আসত। কিন্তু বেশিক্ষণ সে-ও থাকত পারত না—বাপের দোকানে যোগান দিতে হত তাকে।

কাজেই আমি আর আরতিদি।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে—নীল আর নীল আকাশ। স্টেশনের বাঁ পাশে বুড়ো রাক্ষসের মতো পাহাড়টা ঘন সবুজ। দূরে দূরে লাল মাটির ওপর পায়ে-চলা পথের রেখার শেষে শাল-মহুয়া-নিম-পলাশ-আমের ছায়ায় সাঁওতালী বস্তি। স্টেশন থেকে খানিকটা মাঠের দিকে এগোলে উঁচু পাড়ওয়ালা একটা পুরোনো পুকুর—তাতে অনেক পদ্ম ফুটেছে আর পদ্মপাতার ওপর বাঁকা বাঁকা নোখের দাগ ফেলে চলে বেড়াচ্ছে জলপিপির দল, টুকটুক করে পোকা ধরে খাচ্ছে। পুকুরের ওপারে একটা ভাঙা মন্দির—তাকে ঘিরে ঘিরে কাশফুল ফুটেছে।

হরিয়ার মা খালি ছাতুই তৈরী করত না—চীনেবাদাম আর চানাভাজাও বিক্রি

করত। আমি আর আরতিদি কখনো দু পয়সার বাদাম আর কখনো চানাভাজা কিনে নিয়ে খেতে খেতে দূরে চলে যেতুম। কোনোদিন গিয়ে বসতুম মন্দিরটার পাশে, আমি জলপিপিদের ঢিল মারতুম—আরতিদি কাঁচপোকা খুঁজত। কোনোদিন রেললাইন ধরে যেতে যেতে তার পাশে পাশে দেখতুম কোথায় আছে লাটা, গিলে আর কুঁচ ফল। মাঝে মাঝে বাঁদর-লাঠির গাছ থেকে মোটা গলায় ময়না ডেকে উঠত, টেলিগ্রাফের তার জুড়ে বসে টিয়ার দল মাথা নেড়ে আর পাখা ঝেড়ে কিসের যেন কমিটি করত, কখনো দেখতুম কাঁটা গাছে পতাকার মতো উড়ছে সাপের ছেঁড়া খোলস, কখনো বা চোখে পড়ত রেল-লাইনে কাটা-পড়া গোখরো সাপ শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে আছে।

আরতিদি গলা ছেড়ে গান গাইত: 'বাঁধ না তরীখানি আমারি এ নদীকূলে।' শুনে চমকে উঠে শিমূল গাছের ডাল থেকে একটা শঙ্খচিল আকাশে ডানা মেলত।

নদীর কথায় আমার মনে পড়ত। বলতুম, চলো না আরতিদি—একদিন সুবর্ণরেখা নদী দেখে আসি।

—না না, সে অনেক দূর।

—হোক অনেক দূর। এমনি রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব।

—না, যেতে নেই সেখানে।—আরতিদি ভয় পেতো: বাবা বারণ করে দিয়েছে। সেখানে জঙ্গল। তার ওপর আমি যে বড়ো হয়ে গেছি—আসছে ফাল্গুন মাসেই যে আমার বিয়ে হবে।

একটু ফাঁক পেলেই আরতিদি নিজের বিয়ের গল্প চুপি চুপি বলত আমাকে। আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি, বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা হত মনে, প্রথম দিন তো ভারী অসভ্যই মনে হয়েছিল আরতিদিকে। তারপর শুনতে শুনতে ক্রমে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—আরতিদি কেমন ঘুম-ঘুম চোখে বলে যেত আর আমি কান পেতে রূপকথার গল্পের মতো শুনে যেতুম।

আরতিদির যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার নাম মণীশ সেন। আরতিদি বলত: এই যাঃ—বরের নাম করে ফেললুম। কিন্তু এখনো তো বিয়ে হয়নি—নাম করতে দোষ নেই—না রে?

আমার জানা ছিল না। তবু মাথা নেড়ে বলতুম, না, দোষ নেই।

—আমার দাদার সঙ্গে কলকাতার কলেজে বি এ. পড়ে, জানিস? ওর কাকা আবার জংশন স্টেশনের বড়বাবু, খুব মোটা আর ভীষণ গম্ভীর। সেই তো এসে আমায় দেখে গেছে। বাবা বলছিল মণীশ নাকি মোটেই ওর কাকার মতো নয়—খুব সুন্দর আর মিষ্টি চেহারা। কি রকম চেহারা হতে পারে তুই-ই বল্ তো অঞ্জু?

শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়তুম। রেললাইনের তারের বেড়ার লোহার খুঁটিতে যে

মোটা একটা বহুরূপী আমাদের দেখে রেগে গিয়ে বার বার রঙ বদলাচ্ছে, তাকে দেখতে দেখতে আমি মণীশের চেহারাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করতুম।

আরতিদি ব্যস্ত হয়ে বলত: এই, এই—বুকে একটুখানি থুতু দে! নইলে ওরা রক্ত চুষে খায়—তা জানিস?

বহুরূপীর হাত থেকে রক্ত বাঁচাবার ব্যবস্থা হয়ে গেলে আরতিদি আমায় আবার জিজ্ঞেস করত: কই, আমার বরের চেহারা কেমন হবে বললি না তো?

আমার ঠাকুরমার ঝুলির রাজপুত্রদের ছবি মনে পড়ত। সেই যাত্রীর মতোই পোশাক, কোমরে তলোয়ার, মাথার উষ্ণীষে জলজল করছে গজমোতি। কিন্তু রাজপুত্রেরা একালে গল্পেই থাকে, বর হয়ে কখনো তারা বিয়ে করতে আসে না। আমি ভেবেচিন্তে একটি মাত্র আদর্শ মানুষকেই দেখতে পেতুম চোখের সামনে।

—আমার ছোট মামার মতো।

—ধেৎ, তোর কোনো বুদ্ধি নেই—আরতিদি মুখ বাঁকাতো।

এইবার আমার রাগ হয়ে যেত। বলতুম, কেন—আমার ছোট মামা কি দেখতে খারাপ?

—না না, অমল কাকা দেখতে খুব খারাপ নয়। কিন্তু ভারী কাঠখোট্টা আর চোয়াড়ে। আমার পছন্দ হয় না।

—তোমার পছন্দ না হয় তো বয়েই গেল।

আরতিদি একটুখানি হাসত—জবাব দিত না। আবার টেলিগ্রাফের তারে পাখি দেখতে দেখতে, কুঁচ আর গিলে কুড়োতে কুড়োতে, কাটা-পড়া শুকনো সাপ পেরিয়ে স্লিপার গুনে গুনে আমরা স্টেশনে ফিরে আসতুম। তারপর কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতুম সেই বাঁধানো বেঞ্চিটার ওপর আর দুটো-একটা গাঢ় হলুদ রঙের কল্কে ফুল আমাদের গায়ে ঝরে পড়ত।

সামনে রোদে ঝকঝক করত রেলের লাইন। পাহাড়টার গায়ে শাদা শাদা কয়েকটা ধ্বসের দাগ চকচক করত। সাঁওতাল বস্তির নিম-মহুয়া-আম-পলাশের ওপর দিয়ে, মাঠের ঘাস দুলিয়ে গন্ধ ভরা বাতাস এসে মুখে চোখে আছড়ে পড়ত।

ঠুন-ঠুন-ঠুনাৎ করে একটা মালগাড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে কুলি হাজারী এসে আরতি-দিকে বলত: দিদিমণি—বহুৎ বেলা হোয়ে গেল। মাইজী গোঁসা করছে—বুলাচ্ছে তোমাকে।

বুড়ো হাজারীকে জিভ বের করে ভেংচি কাটত আরতিদি: বুলাচ্ছে তো বেশ করেছে—তোমার কি! আমি যাব না।

তবু আরতিদি উঠে দাঁড়াত। এক মাথা চুল উড়িয়ে ছুটত বাড়ির দিকে। আর

ছুটতে ছুটতে মুখ ফিরিয়ে আমাকে বলে যেত : যাচ্ছি-ই-ই—

মাঝে মাঝে ও বাড়ির পাঁচিল পেরিয়ে বড় মামীমার গলা কানে আসত : এত বড় মেয়ে—রাত দিন টো-টো! সংসারের কুটোখানা ভেঙেও দুখানা করতে পারো না—না?

—বা রে, আমি কি করব? অঞ্জুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলুম তো!

—হুঁ, যত দোষ এখন ওই একরত্তি ঠাণ্ডা ছেলেটার ঘাড়ে। তোমাকে তো আমি আর চিনি নে। হোক বিয়ে, যাও শ্বশুরবাড়ি—কী হবে দেখে নিও তখন। শাশুড়ী লম্বা লম্বা ঠ্যাং দুখানা ভেঙে দেবে একেবারে।

আরতিদি কি জবাব দিত আর শুনতে পেতুম না।

কিন্তু বড় মামীমা মুখে যা-ই বলুন—আরতিদির এই ঘুরে ঘুরে বেড়ানোতে বিশেষ বাধা কোথাও ছিল না। পরেশবাবু তো হেসেই জিজ্ঞেস করতেন: কি হে জোড়া কলম্বাস, নতুন আবিষ্কার-টাবিষ্কার কিছু হল? বড় মামীমা একমাত্র মেয়ের ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতেন না—তা ছাড়া হয়তো ভাবতেন দুদিন বাদেই তো বিয়ে হয়ে যাবে।

বেশ কাটছিল দিনগুলো। মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো তো ছিলই, তা ছাড়াও অবাধ গতি ছিল বড় মামীমার ঘরে। সব সময়েই কিছু না কিছু খাবার তৈরী থাকত আমার জন্য। কখনো লুচি দিয়ে গরম পায়েস, কখনো বা কচুরি আর আলুর দম। বড় মামীমার ঘরে আরো একটা সুন্দর জিনিস ছিল। কাচের আলমারিতে সারি সারি পুতুল।

কৃষ্ণনগরের মূর্তি, নকল কলা-আম, সেলুলয়েডের ছোট বড় ডল, সমুদ্রের রঙিন কড়ি আর—আর একটা ভালুক।

আমার তখন বারো বছর বয়েস। ক্লাস সেভেনে পড়ি। এমন কি একটা এয়ারগান পর্যন্ত আছে—তার ছর্‌রা দিয়ে চড়ুই পাখিকে চমকে দেওয়া যায়। আমি তখন জানি পুতুল মেয়েদের খেলার জিনিস—পুরুষমানুষের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আলমারির সেই ভালুকটার দিকে তাকিয়ে মন আমার মুগ্ধ হয়ে যেত।

গলায় লাল একটি সিল্কের রিবন বাঁধা কুচকুচে কালো রঙের ভালুক। গায়ের লোমগুলো পর্যন্ত চিকচিক করত। পুঁতির চোখ দুটো যেন জলজ্বল করে চেয়ে দেখত আমাদের।

আরতিদি বলত : ওটা বিলিতী পুতুল। মা শখ করে কলকাতার সায়েবী দোকান থেকে কিনে এনেছে।

একদিন বলেছিলুম, একটু বের করো না আরতিদি। গায়ে হাত দিয়ে দেখি।

আরতিদি জবাব দিয়েছিল, বের করলে ময়লা লাগবে। মা ভারী রাগ করবে তা হলে।

কাচের ভেতর দিয়ে সেই আশ্চর্য সুন্দর ভালুকটাকে আমরা একমনে দেখতুম দুজনে।

—ভালুকটা খুব মিষ্টি—না রে ?

—হুঁ—খুব মিষ্টি।

—ওটা কী ভালুক বল তো ?

আমি একদিন ভেবে-চিন্তে বলেছিলুম বোধ হয় গোল্ডিক্সের তিন ভালুকদের একজন।

—গোল্ডিক্স্‌ ?—আরতিদি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল : সে আবার কি রে ?

আরতিদির অজ্ঞতায় আর নিজের জ্ঞানের গৌরবে গল্পটা বলতে আমার খুব ভালো লেগেছিল সেদিন। চোখ খুব বড়ো বড়ো করে আরতিদি শুনেছিল প্রথমটা। শেষে বিরক্ত হয়ে গেল।

—দূৎ, বাজে গল্প। ও ভালুকটা ওদের কেউ নয়।

—তবে কে ও ?

আরতিদি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিল বড় মামীমা কত দূরে আছেন। তারপর আমার কানে কানে বলেছিল, তুই কিছু বুঝতে পারিসনি। কী সুন্দর দেখছিস না ? ও নিশ্চয় বর ভালুক—বিয়ে করতে যাবে।

তারপর আমরা হয়তো স্টেশনে চলে এসেছি। সামনে দিয়ে একটা মেল-ট্রেন হয়তো ছুটে যেত ঝড় জাগিয়ে—আমাদের ছোট স্টেশনটাকে দেখেও যেন দেখতে পেতো না। ট্রেনের শব্দটা অনেক দূরে চলে গেলে, আর না-দেখা সুবর্ণরেখা ব্রীজের ওপর থেকে তার গুম গুম আওয়াজ ভেসে এলে, আর দু-একটা হলদে রঙের কলকে ফুল আমাদের গায়ে মাথায় ঝরে পড়লে তখন আরতিদি বলত : জানিস, রাতের বেলা ঘরে যখন মিটমিট করে লণ্ঠন জ্বলে আর আমার ঘুম আসে না—তখন মশারির ফাঁক দিয়ে আমি ভালুকটাকে দেখি।

—দেখতে পাও ?

—পাই বইকি !—আরতিদির চোখ ঘোরঘোর হয়ে আসত : ঠিক দেখি, কাচের আলমারি থেকে কখন টুক্‌ করে ওটা বাইরে এল। পরনে জড়িপাড় কাপড়—হাতে দর্পণ—

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করতুম, দর্পণ কী ? আয়না ?

—চুপ কর্‌, বিরক্ত করিসনি—আরতিদি আবার স্বপ্নটাকে গুছিয়ে আনত : পায়ে শাদা নাগ্‌রা জুতো—মাথায় ময়ূর দেওয়া টোপর। টপ করে বিছানার উপর লাফিয়ে উঠে যেন বললে, কেমন দেখছ আমায় ? পছন্দ হয় ?

—যাঃ, মিথ্যে কথা।—আমি প্রতিবাদ করতুম।

—মিথ্যে কথা বইকি!—আরতিদি খামোকা চটে যেত: তুই ভীষণ বোকা। কিছু বুঝতে পারিস না।

আমি অভিমানে চুপ করে যেতুম, একটা কল্কে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে তার হলদে রস দিয়ে ছবি আঁকছি তখন। বলতুম, না।

—রাগ হল? বোকা বলেছি সেই জন্যে?

জবাব দিতুম না।

—তুই যে ভারী ছেলেমানুষ! একদম কিছু বুঝতে পারিস নে। আচ্ছা আচ্ছা—আমার ঘাট হয়েছে, আর কোনোদিন বোকা বলব না তোকে—চল্ হরিয়ার মার দোকান থেকে ছোলাভাজা কিনে খাই গে।

এরপরে আর রাগ থাকে?

শেষ পর্যন্ত সেই ঘটনাটা ঘটল।

রেললাইন ধরে সকালের নরম রোদে তেমনি চলেছি দুজনে। দুধারে তেমনি পাখি, তেমনি করে কুল গাছের গায়ে জড়ানো স্বর্ণলতার জাল, তেমনি করে একটা কাটা গোখরো সাপ রোদ্দুরে দড়ি পাকিয়ে আছে লাইনের ওপর। আরতিদি বেশি কথা বলছে না, কেবল গুনগুন করে গান গাইছে: 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর, নমো নম, নমো নম—'

আমি পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে চকমকি ঠুকছিলুম। শাদা পাথরেই আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরোয় সে আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি। এই দিনের বেলায় আগুন বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঠোকার পরে মধ্যে মধ্যে পাথর শুঁকে দেখছিলুম বেশ মিষ্টি একটা গন্ধকের মতো গন্ধ বেরুচ্ছে। ওইটেই পরীক্ষা। ওই গন্ধ থাকলেই সন্ধ্যের পরে চমৎকার ফুল্‌কি ছুটবে বোঝা যায়।

আরতিদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

—এই, জানিস?

—কী হয়েছে?

—কাল সন্ধ্যেবেলা যখন চিঠি এল, তখন তার ভেতর দাদা একটা ফোটো পাঠিয়েছে।

আমি পাথর ঠুকতে ঠুকতে বললুম, কার ফোটো?

আরতিদি পাথর দুটো কেড়ে নিলে আমার হাত থেকে। বললে, যাঃ—এই জন্যেই তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। কিচ্ছু শুনছিস না, এক নাগাড়ে সমানে পাথর ঘট্‌ঘট্ করছিস।

কাতর হয়ে বললুম, পাথর ফেলে দিয়ো না, অনেক কষ্টে দুটো বড়ো বড়ো চকমকি

পেয়েছি। কার ফোটোর কথা যেন বলছিলে—বলো না? আমি তো শুনছিই।

আরতিদির টানাটানা চোখ দুটোকে খুব সুন্দর দেখালো তখন। কারু শোনবার সম্ভাবনা ছিল না, তবু নরম গলায় চুপি চুপি বললে, মণীশ সেনের ফোটো।

—সত্যি?

চকমকির কথা আমি ভুলে গেলুম। মণীশ সেনের সম্বন্ধে এতদিন টুকরো-টুকরো কথা শুনতে পেতুম, বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মনের ভেতর যে লজ্জাটা ছিল কখন কেটে গিয়েছিল সেটা, আধখানা শোনা রূপকথার মতো একটা অতৃপ্ত কৌতুহল কখন যে জেগে উঠেছিল নিজেই তা জানতে পারিনি। আমি আবার বললুম, সত্যি?

—সত্যি রে, সত্যি। ওরা সবাই দল বেঁধে শিবপুরের বাগানে পিকনিক করতে গিয়েছিল, পাঁচ-সাতজন মিলে ফোটো তুলেছে সেখানে। দাদা তাই পাঠিয়েছে একটা। লিখেছে, আমার বাঁ ধারে মণীশ।

—কেমন দেখতে?

—খুব মিষ্টি। গলায় চাদর জড়ানো, মাথায় কোঁকড়া চুল। অত ছোট ছবি তো —তবুও কেমন চকচক করছে চোখ দুটো। এত ছেলের ভেতরেও ও-ই সব চাইতে সুন্দর দেখতে।

আরতিদির চোখ ঘুম-ঘুম হয়ে এল।

—আমাকে দেখাবে না ছবিটা?

—দেখাব। মার বাক্সে তোলা আছে, চুরি করে এনে তোকে দেখাব একসময়।—তারপর হঠাৎ আরতিদি বললে, এই অঞ্জু, যাবি?

—ফিরে যাব বলছ?

আরতিদির ঘুম চোখের ওপর কিসের যে আলো পড়ল জানি না। বললে, না, ফিরে যাওয়ার কথা বলছি না। সুবর্ণরেখা দেখতে যাবি?

—সে কি! সেখানে যেতে যে তোমার বারণ আছে!

—থাকগে বারণ। ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে আজ—ভারী ভালো লাগছে যেতে। কেউ তো জানতে পারবে না—চল্ না।

আমার ভয় কাটল না, কিন্তু নিষেধ ভেঙে খুশিতে খুশিতে অনেক দূর বেড়িয়ে আসার উত্তেজনা ভয়ের চাইতেও বড়ো হয়ে উঠল। বললুম, বেশ তো চলো। কিন্তু দেরি হয়ে গেলে বকবে না?

—বকুক না। প্রায়ই তো বকে।

—চলো তবে।

সেই রেললাইন ধরে আমরা চললুম। শরতের রোদ একটু একটু করে ধারালো হয়ে

উঠতে লাগল, দেখলুম আকাশে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ছে, সেই দীঘিটার ধারে ভাঙা মন্দিরটাকে ঘিরে ক'টাই বা কাশফুল—এদিকে মাঠের পর মাঠ একেবারে বুড়ীর চুলের মতো শাদা হয়ে রয়েছে। একটা বটগাছের মাথায় লাল মতো কী যেন হাওয়ায় উড়ছে, প্রথমে ভাবলুম ঘুড়ি, পরে দেখি কারা যেন একটা লাল নিশান বেঁধে দিয়ে গেছে। একটা শেয়ালও দেখলুম লাইনের ধারে, ঘোড়ার মতো মোটা ল্যাজ পেছনের দু পায়ের মধ্যে গুঁজে নিয়ে দৌড়ে পালালো—ঠিক মনে হল একটা গেরুয়া রঙের কাপড় কাছা দিয়ে পরেছে।

ভারি হাসি পাচ্ছিল। আরতিদিকে শেয়ালটার কথা বলতে যাচ্ছি, আরতিদি তখন বললে, ওই ভাখ্, সুবর্ণরেখা!

সত্যি তো—সুবর্ণরেখাই তো বটে। দু পাশে উঁচু উঁচু লোহার ত্রিভুজ দেওয়া (আমি তখন জ্যামিতির চার-পাঁচটা থিয়োরেম পড়েছি) একটা লাল রঙের পুল। তার নিচে অনেকটা শুকনো আর খানিকটা ভিজে ভিজে লাল রঙের বালি। সেই বালি পার হয়ে কুলকুল করে সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে। ছোট্ট নদীটা—তবু ভরা আশ্বিনে কেমন দুলে দুলে উঠছে, ব্রীজের থামের গায়ে ঘা দিয়ে তৈরী করছে শাদা শাদা ফেনার ঘূর্ণি—সোঁ সোঁ করে একটানা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে জলের।

কী নির্জন চারদিক—কী হাওয়া! খানিকক্ষণ একমনে জল দেখলাম আমরা। তারপর আরতিদি বললে, আয়, নেমে বেড়িয়ে আসি।

ব্রীজের পাশ দিয়ে ঢালু পথ ছিল, তাই দিয়ে আমরা নিচে নামলুম। কী হাওয়া—কী হাওয়া! আরতিদির খোঁপা বাঁধা ছিল, নইলে ওর চুল নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠে ওকে আকাশে উড়িয়ে নিত—এমনি মনে হ'ল আমার। আমরা জলের কাছে গেলুম, ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে দেখলুম, কয়েকটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিলুম, আঁজলা আঁজলা করে বালি উড়িয়ে দিলুম বাতাসে। তিনটে হুটিটি পাখি নদীর ধারে বোধ হয় গল্প করছিল, বিরক্ত হয়ে উড়ে গেল তারা।

পেছনের মস্ত একটা মহুয়া বন মাতলামি করছিল ডাল নাচিয়ে, পাতা কাঁপিয়ে। নদীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কখন বনটাকে আমরা দেখছিলুম জানি না। আরতিদি গান গাইছিল: 'বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায় রে বাজায় রে একতারা।' আচমকা গান থামিয়ে হাততালি দিয়ে বললে, খরগোস—খরগোস!

—কই—কই—কোথায় খরগোস?

—ওই যে লম্বা লম্বা কান খাড়া করে, হাত জুড়ে ভালো মানুষের মতো তাকিয়ে আছে? ওই তো ঝোপের পাশে—সাদা ফুটফুটে, দেখছিস না?

দেখলুম। আর সঙ্গে সঙ্গেই খরগোস ছুটল। দুটো তিনটে বড়ো বড়ো লাফ দিয়ে

সোজা মহুয়া বনের দিকে।

—পালালো—পালালো! শীগগির চল্—ধরি ওটাকে—

নদীর ধার ছেড়ে, শরতের হাওয়ায় উড়ে যাওয়া বুনো হাঁসের দুটো পালকের মতো আমরা মহুয়া বনের ভেতর ছুটে গেলুম। পরিষ্কার বন, ঢেউ-খেলানো লাল মাটি, ঝোপ-ঝাড় নেই বললেই চলে। পাতায় পাতায় কী আশ্চর্য শব্দ, আর কী নির্জন—কী নির্জন ঠাণ্ডা ছায়া। ছুটতে ছুটতে কতদূর এগিয়েছি জানি না, খরগোসটা কতদূরে চলে যেতে আবার দু পা জুড়ে আমাদের দেখছে, আমি আর আরতিদি হাসছি আর হাঁপাচ্ছি, তখন—

তখন যেখানে দু-তিনটি গাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে, তার পেছন থেকে কালোমতন কী একটা বেরিয়ে এল। প্রথমে মনে হয়েছিল বড়ো একটা কালো কুকুর, কিন্তু হঠাৎ সেটা দু পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর এক মুখ শাদা ধারালো দাঁত বের করে বলল, গরর্—

আরতিদি বোবার মতো বিকৃত চিৎকার করে উঠল একটা। তারপর বললে, 'অঞ্জু, পালা পালা! ভালুক!

ভালুক!

আমরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলুম। এক মুহূর্তেই একরাশ বিশ্রী দাঁতে, গায়ের কালো কালো ধোঁয়ায়, থাবার বড়ো বড়ো বাঁকা নোখে মৃত্যুর বিভীষিকাকে চিনতে পেরেছি আমরা। ঢেউ-খেলানো লাল মাটির ওপর দিয়ে পড়তে পড়তে সামনে নিয়ে পাগলের মতো ছুটেছি দুজনে, ফেনা উঠছে মুখ দিয়ে। আরতিদি সমানে চিৎকার করছে : ভালুক—ভালুক! আর পেছনে শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত দ্রুত পায়ের শব্দ—এসে পড়ছে, ক্রমশই কাছে আসছে! আর শক্ত মাটিতে বাঁকা বাঁকা নোখে কড়ি বাজানোর মতো আওয়াজ উঠছে : কড়্কড়্—ঝম্—ঝম্—কড়্কড়্—

—হৈ-হৈ-হৈ—কী হৈছে ইথানে?

কোত্থেকে সামনে দেখা দিল একদল শিকারী সাঁওতাল। কাঁধে তীর ধনুক—হাতে রক্তমাখা খরগোস। তারা আরো কী বললে আমি শুনতে পেলুম না। একজন লোহার মতো শক্ত বুকের ভেতর আমাকে টেনে নিলে, আর আরতিদি সোজা লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর।

মেল ট্রেন ছুটেছে। বিকেলের পাঁচরঙা আলোয় অবনীন্দ্রনাথের ছবিটা মনের মধ্যে দেখছি এখনো। তার ওপর একখানা মুখ ফুটে আছে। আরতিদির মুখ।

বাড়িতে ফিরে তাড়সে জ্বর হয়েছিল আরতিদির। তিনদিন ধরে চমকে চমকে উঠে

বারবার প্রলাপ বকেছিল : ওই যে ভালুকটা আসছে ! না না—আমি মণীশ সেনকে বিয়ে করব না, কক্ষণো বিয়ে করব না।

সেই হঠাৎ-থামা স্টেশনে, সেই হঠাৎ আলোয় এইটুকু মাত্র ছবিই ফুটে আছে। তারপর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কবে আমি ওখান থেকে চলে এসেছিলুম তা আর দেখতে পাচ্ছি না। ছাব্বিশ বছরের অমাবস্যা দৃষ্টিরোধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

কাচের আলমারিতে লাল রিবনবাঁধা ভালুক আর ছোট একটা গ্রুপ ফোটোতে গলায় চাদর জড়ানো মণীশ সেন। রাত্রির বুক চিরে ছুটন্ত ট্রেনের চেনে-রডে-চাকায় ঝঙ্কার উঠছে। বাইরের একাকার নিশীথস্রোতে চোখ মেলে দিয়ে, একা কামরায় বসে বসে ভাবছি, আলমারির ভালুকটা মহুয়া বনে যে মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তেমনি করেই কি আরতিদির জীবনে ফোটো থেকে নেমে এসেছিল মণীশ সেন ? দুটো কি এক হতে পারে ? দুটো কি এক হতে পারে না ?"

কিন্তু হঠাৎ-ফোটা সেই রঙিন ছবিটার চার পাশে অনন্ত অন্ধকার। ছাব্বিশ বছরের অন্ধকার।

কেয়া

বয়সে বড় হলেও সিগারেটটা আর সামনাসামনি ধরায় না। 'একটু আসছি' বলে বেরিয়ে যায় বাইরের গোল বারান্দায়। থেকে থেকে দক্ষিণের হাওয়ায় গন্ধটা ঠিকই পায় জয়ন্ত।

সে-গন্ধটা আরও খারাপ লাগে যখন তারপরে একেবারে মুখের সামনে এসে বসে রামপদ। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ তত বিশ্রী লাগে না, কিন্তু ঠোঁটের পোড়া তামাকের গন্ধে কেমন গা বমি-বমি করতে থাকে।

খটাস করে মস্ত একটা পানের ডিবে খুলে তা থেকে রামপদ একসঙ্গে একেবারে গোটা দুই পান মুখে পুরে দেয়। এমন হাঁ করে যে জয়ন্ত ভাবে ওর আলজিভটা পর্যন্ত বুঝি দেখা যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর অস্বস্তি লাগে। খামোখা চিড়িয়াখানার হিপোটাকে তার মনে পড়ে।

তার অর্থ এই নয় যে, আকারে-প্রকারে রামপদ হিপোর মতো অতিকায়। বরং জয়ন্তর মতোই তার লম্বা রোগাটে চেহারা। আসলে অতিকায় হচ্ছে তার বাপ তারাপদ মল্লিকের ব্যবসা। হাওড়ার গোটা তিনেক মেসিন টুলস কোম্পানির তিনি মালিক। অতএব সঙ্গত কারণেই ক্লাস সেভেনে বার তিনেক ফেল করে পাড়ার স্কুল-কলেজযাত্রিণী মেয়েদের ছবি তোলবার জন্যে ক্যামেরা কিনেছিল রামপদ। কিছুদিন চলেছিল ভালোই। তারপর হঠাৎ একদিন একটি রুক্ষ মেজাজের মেয়ে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে। তা থেকে নারীজাতি সম্পর্কে একটা নিদারুণ বৈরাগ্যে তার মন ভরে গেল। যোগাভ্যাস

করার জন্যে হাতিবাগানের এক তান্ত্রিকের আড্ডায় সে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করল। বাপ তারাপদ মল্লিক আফিঙের নেশায় আধবোজা চোখে কিছুদিন সেটা লক্ষ্য করলেন। সাধনার পথে রামপদ যখন অনেকখানি এগিয়েছে তখন প্রায় বিনা নোটিশেই একটা বিকট চেহারার ময়ূরপঙ্খী মোটরে চাপিয়ে বিয়ে দিতে নিয়ে গেলেন ছেলেকে।

সে আজ দশ বছরের কথা। এর মধ্যে একেবারে নিরীহ ভালমানুষ হয়ে গিয়েছে রামপদ। দু-তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, নিজের স্ত্রী সম্পর্কে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে এবং বাপের ব্যবসা দেখাশোনা আরম্ভ করেছে। সেই সঙ্গে তার আরও মনে হয়েছে, ছেলেবেলার একটা মারাত্মক ভুল অন্তত তার সংশোধন করা দরকার। নেহাতপক্ষে স্কুল-ফাইন্যালটা পাস না করলে ভদ্রসমাজে বাস করা যায় না।

অতএব জয়ন্তকে আসতে হয়েছে।

বি-কম্ পাস করে বেকার। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে লাইন দিয়েছে, দুটো কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু এখনও কিছু সুবিধে হয়নি। ছ মাস ধরে একটা স্কুল-মাস্টারি হব-হব করছে, কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি নাকি এখনও মতিস্থির করতে পারেনি। অথচ এভাবে আর কতদিন চলে?

মা-বাবা পড়ে আছেন পাকিস্তানে, তাঁদের আনা দরকার। বেলেঘাটায় গ্রাম-সুবাদে যে কাকা আছেন তাঁর বাসায় আর এমন করে মুখ থুবড়ে থাকা চলে না। আত্মসম্মানটা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি বলে মধ্যে মধ্যে অসহ্য হয়ে ওঠে। টিউশান থেকে কিছু কিছু টাকা কাকিমার হাতে তুলে দেয়, কিন্তু তাতে তাঁর মুখের মেঘ কাটে না।

কাকা অবশ্য কিছু বলে না। নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ—সংসারকে যথাসাধ্য পাশ কাটিয়েই চলতে চান। তা ছাড়া সময় কোথায় তাঁর? লোডিং-ক্লিয়ারিং-এর সামান্য চাকরি—সারাটা দিনই কাটে কয়লায় আর ধুলোয় বিষাক্ত চিৎপুরের রেলওয়ে ইয়ার্ডে। সন্ধ্যাবেলায় কাশতে কাশতে বাসায় ফিরে আসেন।

কাকিমা বলেন, 'একলা মানুষ—খাটতে খাটতে সারা হয়ে গেল! অথচ সবাই নিজের কথাই ভাবে—ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।'

বাপের জন্য রুটি করতে করতে বিব্রত হয়ে ওঠে আঠার বছরের মেয়ে কেয়া। বলে, 'আঃ, কী করছ মা! শুনলে জয়ন্তদার কষ্ট হবে যে!'

কিন্তু জয়ন্তর এখন আর কষ্ট হয় না। নিজের কাছেই সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। টিউশানের সামান্য টাকার উপর নির্ভর করেই যে-কোনো একটা ছোটখাটো মেসে [illegible] উঠবে, সে-কথাও ভেবেছে কয়েকবার। কিন্তু সেখানেও নিজেকে জড়িয়েছে জয়ন্ত [illegible] কেয়া।

কেয়া। কী করে যে হঠাৎ একদিন ধরা পড়ল মনের কাছে!

সকালে চা দিতে এসে কেয়া একবার তাকাল এদিক ওদিক। না, মা কোথাও কাছাকাছি নেই।

'জান জয়ন্তদা, সুখবর আছে।'

'কিসের সুখবর?' জয়ন্ত চোখ তুলল।

খুশির ভঙ্গিতে কেয়া বললে, 'কাল বিকেলে আমাকে দেখতে আসবে।'

জয়ন্ত চমকে উঠল। একটু হলেই খানিকটা চা ছলকে পড়ত: 'কে দেখতে আসবে?'

শব্দ করে হেসে উঠল কেয়া। বললে, 'আকাশ থেকে পড়লে? আমাকে যারা ঘরের বউ করে নিতে চায়—তারাই আসবে। বন্ধু সেজে বর নিজেও আসতে পারে সঙ্গে। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি থাকবে না আশা করা যায়।'

জয়ন্ত অনুভব করল, জিনিসটাকে খুব সহজভাবে সে নিতে পারছে না।

'তোমাকে পছন্দ হবে না, দেখে নিয়ো।'

'আমি কালো বলে?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু আমার চোখ-মুখ ভাল, গড়ন ভাল, চেহারায় লক্ষ্মীশ্রী আছে।' কেয়া আবার হেসে উঠল।

'নিজেকেই সার্টিফিকেট দিচ্ছ নাকি?'

'যাচাই হতে চলেছি। জড়পদার্থ তো নই। বাবার যদি মুখে আটকায়, নিজের গুণ নিজেই কীর্তন করব।'

কী ভেবে জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে কেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কেয়া হাসছে—কিন্তু সে-হাসি তার চোখে নেই। একরাশ গভীর কালো জলের মতো ছলছল করছে তারা দুটো।

'তবু তোমার আশা নেই।' খুব আস্তে আস্তে বললে জয়ন্ত।

চোখ থেকে জল ঝরল না বটে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল কেয়া। বর্ষা নামল না—তার ছায়া নামল।

কেয়া বললে, 'নিজে তো কখনো তাকিয়েও দেখলে না। আর কারও পছন্দ হয়—তাও বুঝি চাও না?'

আর তৎক্ষণাৎ নিজেকে চিনল জয়ন্ত। একটা দমকা হাওয়ায় পর্দাটা সরে গেল সামনে থেকে। এইজন্যেই তো এতদিন এ-বাড়ি ছেড়ে সে কিছুতেই চলে যেতে পারেনি। কেয়া একদিনে ঝড়ের মতো এসে দেখা দেয়নি তার কাছে। তিলে তিলে নিজেকে সঞ্চার করেছে জয়ন্তর মনে—নিঃশব্দে কখন সবখানি জায়গা জুড়ে বসেছে। কেয়াকে হারাবার

একটুখানি সম্ভাবনাতেই সম্পূর্ণ জেগে উঠল জয়ন্ত। যন্ত্রণায় টনটন করে উঠল বুক।

তাকিয়ে দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কেয়া।

পরের দিনের ফাঁড়াটা অবশ্য কেটে গেল। কেয়ার কালো রঙ জয়ন্তকে রক্ষা করেছে এ-যাত্রা। তা ছাড়া কাকার বাসার চেহারা দেখেই পাত্রপক্ষের নাক যে সিঁটকে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত সে-নাক আর সোজা হয়নি। কেয়া বাতিল।

কিন্তু বার বার তো এমনভাবে চলবে না। কালো মেয়ের ভিতরেই হঠাৎ কেউ কৃষ্ণকলিকে আবিষ্কার করতে পারে একদিন—হঠাৎ জেদ চেপে গিয়ে কেউ বলে বসতে পারে, 'বাঙালী তো আর সায়েব নয়! কালো মেয়ে বলে কি তার বিয়ে হবে না? তা ছাড়া ছেলে বেচে আমি টাকা নিতে চাই নে মশাই, আপনি শাঁখা-সিঁদুর দিয়েই সম্প্রদানের ব্যবস্থা করুন।'

আতঙ্কে পর পর কয়েক রাত জয়ন্তর ঘুম এল না।

কেয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তোমার যদি একটা চাকরি-বাকরি থাকত, তা হলেই—'

তা হলেই। কিন্তু ওই সামান্য বাধাটুকুই সমুদ্রদুস্তর। প্রায় ছ মাস চেষ্টা করেও কোন কিনারা এখন পর্যন্ত চোখে পড়ল না। শুধু রামপদর মুখের দিকে তাকিয়েই কখনও কখনও বুকের ভিতরে দুরদুর করতে থাকে দুরাশা। তিন-তিনটে মেসিন-টুল্‌স কারখানার মালিক। কোনমতে যদি একবার স্কুল-ফাইন্যাল তরিয়ে দিতে পারে, তবে কৃতজ্ঞতার খাতিরেও হয়ত তার একটা গতি করে দিতে পারে রামপদ। ইচ্ছে করলেই।

কিন্তু পরীক্ষা পাস করার যতটা শখ আছে—ততটা উদ্যম রামপদর নেই। দু লাইন ইংরেজী লিখতেই তাকে দুবার গোল বারান্দা ঘুরে আসতে হয়—সে-ইংরেজীতেও চারটে ভুল, দুটো বানান, দুটো কন্‌স্ট্রাকশন। ঘাড় চুলকে রামপদ বলে, 'হেঁ-হেঁ, কি জানেন, বুড়ো বয়সে আর—'

'কিন্তু পরীক্ষাটা তো আপনাকেই দিতে হবে।'

'সে তো বটেই।' রামপদ সায় দেয়, 'চেষ্টা তো সাধ্যমতোই করছি।'

সে-চেষ্টার খুব বেশী লক্ষণ অবশ্য দেখা যায় না। এই তো প্রায় এক ঘণ্টা হল জয়ন্ত এসেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত রামপদর দেখা নেই। চা আর খাবার যথানিয়মেই এসেছে—সেগুলো শেষ করে চুপচাপ বসে আছে জয়ন্ত। সামনে উঠোনে একটা বিরাট কাকাতুয়া দাঁড়ের উপর বসে সমানে চিৎকার করছে। অমন একটা কর্কশকণ্ঠ বীভৎস পাখি পুষে কি লাভ হয়, জয়ন্ত দার্শনিকের মতো সেই কথাটাই ভাবতে লাগল। উঠোনের আর একদিকে দুটো প্রকাণ্ড গোরু একমনে জাবনা খাচ্ছে—অনেকটা করে দুধ দেয় নিশ্চয়।

কানের কাছে হঠাৎ একটা দানবিক আর্তনাদ। জয়ন্ত প্রায় আঁতকে উঠল।

জাবনা-খাওয়া গোরু ছুটোর মতোই পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে পান চিবোতে-চিবোতে ঘরে ঢুকেছে রামপদ। তার কোলে বছর খানেকের প্রায়-গোলাকার একটি শিশু। আকাশজোড়া হাঁ মেলে সে চিৎকার জুড়েছে।

রামপদ অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'কী করা যায় স্যার, আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না। তাই সঙ্গে করেই নিয়ে এলুম। নে বাপু—থাম্ এখন, মাথা ধরে গেল।'

বলেই রামপদ তাকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিলে। আর বসানোর সঙ্গেসঙ্গেই রামপদর বংশধর দ্বিগুণ জোরে প্রতিবাদ করে উঠল। জয়ন্ত হাঁ-হাঁ করে পাঠ-সংকলনটা সরিয়ে নিলে ছেলেটার আক্রোশধরা মুঠো থেকে।

'আপনি বরং ওকে শান্ত করেই আসুন।'

'হ্যাঁ স্যার, তাই যাচ্ছি—' রামপদ আবার ছেলেটাকে তুলে নিলে টেবিল থেকে, 'পড়াশুনা করব কি স্যার, এই হারাম—' বলেই জিভ কেটে সামলে নিলে, 'এই এদের জ্বালায় কি মাথা ঠাণ্ডা রাখবার জো আছে। পাগল করে দিলে। এই চুপ চুপ! দেখছিস কেমন সুন্দর কাকাতুয়া? উঃ—গলার আওয়াজ তো নয়, যেন কামান দাগছে! লালু—লালু—লক্ষ্মী ছেলে—দ্যাখো কেমন এরোপ্লেন যাচ্ছে—দ্যাখো—ওই যে—'

কল্পিত একটা এরোপ্লেন দেখাতে দেখাতে রামপদ সপুত্র অন্তর্হিত হল। দূর থেকে ছেলেটার সিংহনাদ ভেসে আসতে লাগল একটানা।

জয়ন্ত আবার বসে রইল চুপ করে। কেয়ার কথা মনে পড়ছিল।

'বাবা আর খরচ চালাতে পারল না। নইলে আমি এবারে বি. এ. পড়তুম। তুমি যদি আমাকে একটু সময় করে পড়াতে জয়ন্তদা, তাহলে ঠিক এক বছর খেটে আমি স্কুল-ফাইন্যাল পাস করে যেতুম।'

কিন্তু সময় কই জয়ন্তর? দু বেলা টিউশান না করলে কাকিমার মুখের মেঘ কাটে না। পাকিস্তানে বাবা-মা পড়ে আছেন—তাঁদের কলকাতায় আনা দরকার। কেয়াকে পড়ানোর মতো বাড়তি সময় সে পাবে কোথায়?

কাকাতুয়াটা আবার উৎকট চিৎকার ছাড়ছে আর দাঁড়টায় নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলছে সার্কাসের ক্লাউনের মতো। কার গলায় জোর বেশী? ছেলেটার—না ওই পাখিটার?

'লেখাপড়ায় আমি খারাপ ছিলুম না জয়ন্তদা। ঠিক ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করতে পারতুম।' কেয়া বলেছিল।

জয়ন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সব হতে পারে। রামপদ একটু ইচ্ছে করলেই হয়। কিন্তু তার আগে পরীক্ষায় তাকে তরিয়ে দেওয়া দরকার। সে কাজটা আপাতত

এভারেস্ট ডিঙোনোর চাইতে সহজ বলে মনে হচ্ছে না। জয়ন্ত তাকিয়ে দেখল গোরু দুটো নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে! রামপদও। কেবল পৃথিবীর যা কিছু দুশ্চিন্তার ভার তারই মাথার উপরে চেপে বসে আছে যেন।

জয়ন্ত আবার নিঃশ্বাস ফেলল। রামপদর ইংরেজী কম্পোজিশনের খাতাটা খোলা আছে চোখের সামনেই। বেশ বড বড় অক্ষরে পড়া যাচ্ছে—'হি ইজ থটিং।'

থটিং। মোটা টাকার মায়া এর পরে আর জয়ন্তকে এখানে বাঁধতে পারত না—চাকরির আশা ছেড়েই সে উর্ধ্বশ্বাসে রাস্তায় ছুটে বেরুত—যেচে সে পাগল হতে চায় না। কিন্তু যেদিন থেকে কেয়াকে দেখতে আসা শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই জয়ন্ত মরিয়া হয়ে কোমর বেঁধেছে। কোনো বিভীষিকাকেই আর তার ভয় নেই।

রামপদ ফিরে এল। মুখে সেই পোড়া সিগারেটের গন্ধ। গা গুলিয়ে উঠল জয়ন্তর।

'বিয়ে-থা করেননি—খাসা আছেন স্যার। সংসার করা কী যে ঝামেলা!' রামপদকে আধ্যাত্মিক মনে হল: 'আমারও স্যার এ-সব জালে জড়ানোর ইচ্ছে ছিল না। কেবল বাবার জন্যেই—'

উদাস দৃষ্টিতে রামপদ গোরু দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল।

অধৈর্য হয়ে জয়ন্ত বললে, 'ইতিহাসের যে দুটো কোশ্চেন লিখতে বলেছিলুম—লিখেছেন?'

রামপদ বিমর্ষ হয়ে বললে, 'সময় আর পেলুম কই। কাল আবার সকলকে নিয়ে থিয়েটারে—' বলতে বলতে আবার জিভ কাটল: 'মানে এমন কাজ পড়ে গেল যে কী বলব—'

ঠিক কথা। বলবার কিছুই নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে জয়ন্ত বললে, 'আপনার পরীক্ষার কিন্তু এক মাস বাকী।'

'সে-সব ভুলিনি স্যার—ওদিকে ঠিক আছে। কালীঘাটে পুজো দিচ্ছি প্রত্যেক শনিবার।' রামপদ একটা হাই তুলল: 'কিন্তু শরীরটা আবার সব সময় ভালও যায় না। এই দেখুন না, কাল রাতে ঘুমটা সুবিধে হয়নি, গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে।'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। রামপদর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

'তা হলে আজ থাক।'

রামপদ ক্ষুণ্নভাবে মাথা নাড়ল: 'হ্যাঁ স্যার, আজ থাক। শরীরটা বেচাল হলে পড়ায়ও মন বসবে না। কাল সময়মতোই আসছেন তো?'

দরজার গোড়ায় মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্ত। বললে, 'আসব।'

পথে বেরিয়ে অসহ্য তিক্ততায় জয়ন্তর মনে হল, কালও তাকে এ-বাড়িতে আসতে হবে। লাল পেনসিল দিয়ে সংশোধন করতে হবে অবিশ্বাস্য ইংরেজী, রামপদর ঘোলাঘোলা

অর্থহীন চোখের দিকে না তাকিয়েও সমানে অঙ্ক কষতে হবে একটার পর একটা, পোড়া সিগারেটের কটু গন্ধে বমি আসতে চাইলেও সে-কথা কোনোমতেই বলা যাবে না। আর দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হবে বুকের নাড়ী ছিঁড়ে যাওয়া প্রত্যাশায়। অথচ রামপদ কোনদিন পাস করতে পারবে না!

কেয়াকে পড়ানো যেত। কিন্তু মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউটার রাখবার শক্তি নেই কেয়ার। অন্তত এইখানেই জয়ন্ত যা কিছু দুর্লভ।

বিকেল থেকে বৃষ্টি নেমেছে একটানা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনও থামবার লক্ষণ নেই। আজ রবিবার, জয়ন্তরও তাড়া নেই কিছু। একটা কাঠের টুল নিয়ে জানলার কাছে চুপ করে বসেছিল।

গ্যাস জ্বলেছে রাস্তায়। সামনের খানিকটা বৃষ্টির ঝাপটায়, আবছা আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে—বড় বড় মোষগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো মনে হচ্ছে এখন। পথের উপর দিয়ে খালের মতো হয়ে ঘোলা জলের স্রোত বইছে—তা থেকে চারদিকে ছড়াচ্ছে খাটালের দুর্গন্ধ। মশা তাড়াবার জন্যে মোষের ল্যাজ উঠছে-পড়ছে, আলো-অন্ধকারে এক-একটা সাপের ফণা দুলে উঠছে যেন।

রামপদর সেই নধর-নিটোল গোরু দুটোকে মনে পড়ল। রামপদকেও। বাইরের এই কদর্য বৃষ্টির দিকে চোখ মেলে কী অসম্ভব দুরাশার স্বপ্ন দেখছে জয়ন্ত। এই একতলা বাড়িতে ক্লিয়ারিং এজেন্টের এই দীন-কর্মচারীর দীনতম সংসারে সম্মুখের খাটালটার ওই উগ্র দুর্গন্ধের মধ্যেও স্বপ্ন দেখছে জয়ন্ত। দেশে লাখুটিয়ার খালের ধারে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে এখন এমনিভাবেই বৃষ্টি পড়ছে, কালো-কাজল ছায়ার আড়ালে কেয়াফুল ফুটেছে, বুকের ভিতরে কেয়াকাঁটার বিষাক্ত যন্ত্রণা সহ্য করেও কালকেউটে জড়িয়ে আছে গাছের সঙ্গে, কেয়া-গন্ধের নেশায় তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ল জয়ন্তর কপালে।

স্বপ্নভঙ্গ। একটু বেশী বৃষ্টি হলেই এই পুরনো বাড়ির ছাত দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে। জয়ন্ত শিথিল ক্লান্তিতে উঠে দাঁড়াল, টুলটাকে একটুখানি সরিয়ে নিলে একপাশে।

একরাশ তীব্র উচ্ছ্বসিত আলো এসে আঘাত করল চোখে। কেয়া চা নিয়ে এসেছে ঘরে। লাইটটা জ্বেলে দিয়েছে।

'অন্ধকারে চুপ করে বসে আছ জয়ন্তদা?'

চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে জয়ন্ত হাসল। বললে, 'দেশের কথা ভাবছিলুম।'

কেয়া এসে জানলার রেলিং ধরে দাঁড়াল। পথের উপর ঘোলা জলের স্রোতটা লক্ষ্য করল খানিকক্ষণ, তারপর দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিলে আকাশের দিকে। সেখানে ঘন কালো

মেঘের উপর রেলওয়ে সাইডিঙের উপর ধোঁয়া কতগুলো ভৌতিক ছায়ামূর্তির মতো কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কেয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'সত্যি। দেশে আর ফেরা যাবে না—না?'

জয়ন্ত জবাব দিল না। জবাব তার জানা নেই।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আর একটু পরে জয়ন্ত বললে, 'ভাবছিলুম, দেশে এখন কেয়াফুল ফুটেছে।' বলে জয়ন্ত আবার হাসল। তার মনে হল, কথাটা খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে, কেয়ার ভাল লাগবে।

দুটো নিবিড় বিষণ্ণ চোখ জয়ন্তর-দিকে ঘুরে এল।

'কেয়াফুল এবার ঝরে যাবে জয়ন্তদা। এত বৃষ্টি তার সইবে না।'

জয়ন্তর মনের লঘুতা মিলিয়ে গেল।

'কী হয়েছে কেয়া?'

'একটা কোন গোলমাল হবে জয়ন্তদা। বাবা বাড়িতে বিপদ ডেকে আনছে।'

চকিত হয়ে জয়ন্ত বললে, 'তার মানে?'

'কালকে রাত্রে কাগজ পোড়ার গন্ধে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।' কেয়ার স্বর ভারী হয়ে এল: 'ভাবলুম, রান্নাঘরে কি কোথাও আগুন-টাগুন ধরেছে। এসে দেখি, বাবা চোরের মতো বসে বসে কি সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলছে। বললুম, 'এত রাতে তুমি এ কী করছ? কী পোড়াচ্ছ ও সমস্ত?'

বাবা ধমক দিয়ে বললে, 'অত খবরে কী হবে? তুই যা—ঘুমো গে।'

জয়ন্ত চা-টা শেষ করল। আশ্চর্য, তবু তার মনে হচ্ছিল, গলার ভিতর শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

কেয়া বললে, 'বাবার চোখ দুটো জলছিল জয়ন্তদা। আর কাগজের আগুনে কী যে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল মুখখানা! বাবার অমন বিশ্রী চেহারা এর আগে আমি কখনও দেখিনি।'

'তুমি যা ভাবছ হয়ত তেমন কিছু নয়।' জয়ন্ত নিরুদ্যমভাবে কেয়াকে উৎসাহ দিতে চাইল।

'আমার আঠারো বছর বয়েস হয়েছে জয়ন্তদা, ছেলেমানুষ নই।' কেয়া আবার আকাশের ছায়মূর্তির শোভাযাত্রার দিকে তাকাল: 'এখন আমার মনে হচ্ছে, কিছুদিন থেকেই বাবার হালচাল একটু অন্যরকম। থেকে থেকে কেমন করে চেয়ে থাকে, অনেক রাতে বাড়ি ফিরে খুব সাবধানে কড়া নাড়ে, মার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে। বাবা নিশ্চয় কোন অন্যায় করছে জয়ন্তদা।'

এইমাত্র চা খেয়েও গলা মুখ সমস্ত শুকিয়ে আছে। জয়ন্ত ঠোঁট চেটে বললে, 'কিন্তু কাকাবাবু তো যেমনি নিরীহ, তেমনি ভীরু। কোন অন্যায় কি তিনি করতে পারেন? তাঁর কি সে-সাহস আছে কেয়া?'

ছাত চুঁইয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়েছে কেয়ার মাথায়—চিকমিক করছে একরাশ রেণুর মতো। সেই রেণুগুলো এবার কেয়ার চোখে এসেও জমেছে মনে হল।

'বাবা কী করবে। মা-ই টাকা টাকা করে বাবাকে পাগল করে তুলেছে।' কেয়া চোখ মুছে বললে, 'জান জয়ন্তদা, মার জন্যেই বাবা জীবনে শান্তি পেল না কোনদিন।'

এবারেও জয়ন্তর কিছু বলবার ছিল না। কেবল কোথা থেকে একটা শীতল আতঙ্ক তার বুকের মধ্যে ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

'মা বরাবরই লোভী আর স্বার্থপর। অভাবে আরও নীচে নেমেছে। কিন্তু কেবল নিজেই নামেনি, সেই সঙ্গে বাবাকেও টেনে নামাচ্ছে। আমার কী মনে হয় জান? আমারও বোধ হয় খুব দেরি নেই। কাগজে দেখেছি, মেয়েরাও আজকাল অভাবের তাড়ায় ট্রামেবাসে পকেট কাটতে আরম্ভ করেছে। হয়ত আমিও একদিন—'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল জয়ন্তর—একটা বিষক্রিয়া যেন বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল রক্তে। পরক্ষণেই কেয়ার শীর্ণ অথচ আশ্চর্য সুকুমার একখানা হাত চলে এল জয়ন্তর হাতে। এর জন্যে কেউ তৈরী ছিল না। কেয়া নয়—জয়ন্তও না।

কোন ভরসা নেই, কোন জোর নেই, তবু গভীর প্রত্যয়ে জয়ন্ত বললে, 'কিছু ভেবো না কেয়া, কিছু ভেবো না। আমি আছি।'

আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেয়া। কাকিমা ডাকছিলেন রান্নাঘর থেকে।

জয়ন্ত চেয়ে রইল বাইরের দিকে। দুর্গন্ধ ঘোলাজলের স্রোত বয়ে চলেছে। কোন একটা জীবনের সঙ্কেত। খাটালের আলো-অন্ধকারে মোষগুলোকে দেখাচ্ছে কয়েকটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো। আর-একটা দুর্বোধ্য প্রতীক। কোন অর্থ কোথাও আছে, অথচ স্পষ্ট করে ধরা যায় না।

আসল কথাটা রামপদ ভাঙল পরীক্ষার দুদিন আগে। বার তিনেক গোল বারান্দায় ঘুরে আসবার পর। পোড়া সিগারেটের গন্ধে জয়ন্তর স্নায়ুগুলো যখন প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে এসেছে—সেই সময়।

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। এমন কি, সামনে রামপদ দাঁড়িয়ে আছে কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারল না। তার মনে হল, উঠোন থেকে একটা গোরু জাবর কাটতে কাটতে এই দোতলার বারান্দায় উঠে এল কী করে?

রামপদ পান চিবুচ্ছিল। আর ভরসা পেয়ে বলে যাচ্ছিল : 'আইডেন্‌টিটির ব্যাপার-টাও ম্যানেজ—'

এইবার নড়ে উঠল জয়ন্ত।

'অ্যা ?' একটা আচমকা ধাক্কা লেগে থমকে গেল রামপদ, চোয়াল ঝুলে পড়ল তার।

'পরীক্ষার ভাবনায় কি মাথা খারাপ হয়েছে আপনার ?' আবার তীক্ষ্ণ গলায় জয়ন্ত প্রশ্ন করল।

রামপদ বুঝতে পারল, পাথরে এসে ঠেকেছে। এখান থেকে আর এক পাও এগোতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য কৌশলে রামপদ বদলে ফেলল মুখের চেহারা। তারাপদ মল্লিকের ছেলে। রক্তে নির্ভুল উত্তরাধিকার। এখনও ইংরেজীতে সে 'থটিং' লেখে, কিন্তু তিন-চারটে মেশিন টুল্‌স কারখানার সে মালিক।

অকৃত্রিম কৌতুকে রামপদ হেসে ফেলল।

'আপনি কি সত্যি ভাবছিলেন স্যার ? আমি কিন্তু ঠাট্টা করছিলুম।'

ঠাট্টা ? জয়ন্ত স্থির দৃষ্টিতে রামপদর মুখের দিকে চাইল। রামপদ এখনও হাসছে। অস্বাভাবিক চেষ্টায় মুখের পেশীগুলোকে টেনে হাসিটা ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। জয়ন্ত তিন মাস পরে এই প্রথম দেখল, রামপদর গোঁফজোড়া অদ্ভুতভাবে পাকানো। ঠিক কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মতো দেখতে।

জয়ন্ত বললে, 'পরশু আপনার পরীক্ষা আরম্ভ। এ-সময় এ-ধরনের হিউমার বন্ধ রাখলেই ভাল হয়।'

'সে তো বটেই স্যার, সে তো বটেই।' রামপদ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল : 'এখন খুব সিরিয়স্‌লি পড়া দরকার।' তারপরে বইটা খুলে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এই কবিতাটা স্যার এখনও বুঝতে পারছি না। যদি একটুখানি—'

জয়ন্ত বাসায় ফিরল অনেক দেরিতে।

ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল গড়ের মাঠে। ময়দানের ভিতরে অনেক-খানি এগিয়ে, প্রথম বৃষ্টিতে রোমাঞ্চিত একরাশ ঘন ঘাসের উপর বসেছিল অনেকক্ষণ। আকাশে ছায়া-রৌদ্র দুলছিল, সামনের গাছগুলোতে কাকেরা বর্ষার নীড় বাঁধছিল, গঙ্গার হাওয়া আর জাহাজের গম্ভীর ডাক আসছিল। চৌরঙ্গীর ট্রাফিক থেকে অনেক দূরে বসে জয়ন্ত স্বপ্ন দেখছিল লাখুটিয়ার খালের উপর শোলা আর বেতের বন নুয়ে পড়েছে, বুনো গাছের কচি পাতা খেয়ে চলেছে প্রজাপতির শুঁয়া আর ভিজে মাটির নীল-কাজল ছায়ার ভিতরে কেয়ার গুচ্ছ গন্ধের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

রামপদর মুখটা মনের উপর ভেসে উঠল তারপর। কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মতো তার

গোঁফজোড়া, দু পাশে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পাকানো। জয়ন্ত চকিতে নিজের ভিতরে খানিকটা বিষাক্ত যন্ত্রণা অনুভব করল। ছটফট করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল, হাতের ঘড়িতে সাড়ে এগারটা বেজেছে।

ফিরল, যখন বারটা পেরিয়ে গিয়েছে।

বাসার সামনে একটা ছোট জটলা। ভিতর থেকে কাকিমার আর্তনাদ ভেসে আসছে। হৃৎপিণ্ডে ঘা পড়ল জয়ন্তর।

দেওয়ালে মাথা ঠুকতে চেষ্টা করছেন কাকিমা—দু-তিনজন প্রতিবেশিনী তাঁকে ঠেকিয়ে রাখছে জোর করে। বারান্দার কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে কেয়া।

জয়ন্তকে দেখে কাকিমার স্বর আকাশে গিয়ে উঠল।

'দাঁড়িয়ে কি দেখছিস রে জয়ন্ত। ওরে—আমার সর্বনাশ হয়েছে রে—ওরে ওঁকে ছাড়িয়ে আন্ রে—নইলে আমি দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরব রে—'

মাথা যে অনেকক্ষণ ধরেই ঠুকছেন তাতে সন্দেহ নেই। কপালের অনেকখানি ফুলে আছে বলের মতো গোল হয়ে। তাতে চুনের আর রক্তের দাগ। রক্ষাচণ্ডীর মতো চুলগুলো খুলে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে কাকিমাকে।

কেয়া তীক্ষ্ণ হাসি হাসল। কেয়াকাঁটার যন্ত্রণা জ্বলছিল তার হাসিতে।

'বাবাকে পুলিসে নিয়ে গেছে জয়ন্তদা। বাবা চুরি করেছিল।'

রামপদর কথা শুনে যেমন হয়েছিল, এখনও ঠিক সেইরকম মনে হল। সামনে কেয়া কোথাও নেই। একটা সাপের ফণা দুলছে। লাখুটিয়ার খালের ধারে কেয়াবনের ভিতরে যে কালকেউটেরা জড়িয়ে পড়ে থাকে।

কেয়া আবার বললে, 'উকিলের কাছে গিয়েছিলুম। নগদ শ পাঁচেক টাকা ছাড়া কেউ জামিন হতে চায় না। ক্লিয়ারিং এজেন্টের একজন সামান্য কেরানীকে কেউ বিশ্বাস করে না জয়ন্তদা।'

কাকিমা সমানে কেঁদে চলেছেন। বিচিত্র সুরে, ইনিয়ে বিনিয়ে। জয়ন্তর ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে নড়ে উঠল কয়েকবার।

'বাবাকে বাঁচাতে গেলে এখন আমাকেও কোথাও চুরি করতে বেরুতে হয় জয়ন্তদা। অথবা আরও কোন অধঃপাতের পথ খুঁজতে হয়!'

জয়ন্তর মুখের সামনে কালকেউটে দুলতে লাগল, চাপা হাসির আওয়াজটা শোনাল সাপের শিসের মতো: 'তোমার অভিশাপেই আমার বিয়ে হল না। এখন কোন্ দাম দিয়ে বাবাকে আমি জেল থেকে ফিরিয়ে আনব?'

আর দাঁড়ানো চলে না। এরপরে কেয়াকে আঘাত করে বসতে পারে জয়ন্ত।

'আমি আসছি—' বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল এই নরক থেকে। মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে তার আগুন জ্বলছিল।

বেপরোয়া হয়ে রামপদ তখন একটা সংস্কৃত ট্র্যানস্লেশন করবার চেষ্টা করছিল। চমকে উঠে দাঁড়াল। হাতের সিগারেটটা টুপ করে খসে পড়ল কার্পেটের উপর।

সেই অবস্থাতেও জয়ন্ত দেখল, অপরিচ্ছন্ন বড় বড় অক্ষরে রামপদ লিখেছে: ঈশ্বরস্য লীলা ক্ষুদ্রঃ নরং কি উপায়ে জানিষ্যতি—

তটস্থ হয়ে রামপদ বললে, 'এই অসময়ে কী মনে করে স্যার? বসুন—বসুন—'

জয়ন্ত বসল না। রামপদর খাতার দিকে চোখ রেখে প্রায় বোবা গলায় বলল, 'তখন ও কথাটা কি সত্যিই ঠাট্টা করে বলেছিলেন আপনি?'

তারাপদ মল্লিকের ছেলে রামপদ মল্লিক হাসল। মুখের পেশীর সঙ্গে সঙ্গে গোঁফের প্রান্ত দুটোও দুলে গেল তার। রামপদ বললে, 'বসুন স্যার, স্থির হয়ে বসুন। ওরে, স্যারের জন্যে বরফ দিয়ে এক গ্লাস ঘোলের সরবত নিয়ে আয়—'

তারপর দুটো টেলিফোন। একটা উকিলকে—একটা ক্লিয়ারিং এজেন্টের অফিসে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি রামপদ মল্লিক বলছি। আমি ইণ্টারেস্টেড।

টাকা নিয়ে মিটিয়ে ফেলুন। ধন্যবাদ। তারও পরে একটা মোটা অঙ্কের টাকার চেক। রামপদর হাতের লেখা যতই খারাপ হোক, চেকের সই তার দেখবার মতো।

পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই ইনভিজিলেটর একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রথম থেকেই আশেপাশে ঘুরঘুর করছিলেন ভদ্রলোক।

'একটু উঠতে হচ্ছে আপনাকে।'

স্প্রীং-টেপা পুতুলের মতো উঠে পড়ল রামপদ মল্লিক। তৎক্ষণাৎ। যেন এর জন্যে সে অপেক্ষা করছিল।

ইনভিজিলেটরের স্বরে সকৌতুক সহানুভূতি: 'কেন আর কষ্ট পাচ্ছেন? না, আর কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই।'

কাগজে কলম থেমে গিয়েছে ছেলেদের। পরীক্ষার 'হল' নিশিরাত্রের কবরখানার মতো নিস্তব্ধ। কারও একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না।

'এবার তা হলে আপনাকে অফিসে আসতে হচ্ছে।' অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন ইন্‌ভিজিলেটর। শক্ত হাতের চাপ পড়ল জয়ন্তর কাঁধে।

হল থেকে বেরিয়ে চলল জয়ন্ত। আর পঞ্চাশ জোড়া চোখ বোবা আতঙ্কে অনুসরণ করতে লাগল তাকে। তারা যেন কোন হত্যাকারীকে দেখছে।

জয়ন্ত জানে। অফিস থেকে তাকে পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করা হবে। সেখান থেকে থানার হাজতে। কাঁধের উপর কয়েকটা কঠিন আঙুলের নিষ্ঠুর চাপ অনুভব করতে করতে জয়ন্ত ভাবল : 'তার জামিনের ব্যবস্থা করবে কে ? রামপদ, না কেয়া ?'

ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি নেমে এসেছে। এমনি বর্ষাতেই, লাখুটিয়ার খালের ধারে, নীল-কাজল ছায়ার আড়ালে কেয়াফুল ফোটে।

সঞ্চার

এই ভোরের বেলাটাই বিশ্রী লাগে। বস্তির কলে মেয়েদের বীভৎস ঝগড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়, অথচ দু চোখ থেকে ঘুমের অবসাদ কিছুতেই আর কাটতে চায় না। বাঁ দিকের কপালে কেমন একটা যন্ত্রণা থমকে আছে মনে হয়, চোখটাকে কচলে কচলে ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে, শুকনো গলার ভেতরে মার্বেলের গুলির মতো কী আটকে রয়েছে এমনি বোধ হয়। কালকের সমস্ত দিনটার সব ক্লান্তি, সব অবসাদ যেন স্নায়ুর ওপর চেপে বসে আছে।

কার উদ্দেশে জানে না—একটা কুৎসিত গালাগাল বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। তার-পর বিদ্বেষভরা ক্রূর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত শঙ্করীর দিকে। শঙ্করী তার চতুর্থ নম্বরের স্ত্রী—মাস তিনেকের মধ্যেই মা হবে।

ভোরের আবছা আলোয়, সোঁদা গন্ধভরা এই টালীর ঘরে, ঘামে ভেজা ময়লা বিছানার ওপরে শঙ্করীর অশোভন শরীরটাকে তার বীভৎস মনে হয়। মনে হয়, আর নয়—এবার এখানকার পাট ওঠাতে হবে। কলকাতা বড় বেশি গরম হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। পুলিস আবার খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেছে। চারটে কেস্ ঝুলছে, এবার ধরতে পারলে ঠেলে দেবে পুরো ছ' মাসের জন্যে। এখন দিন কয়েক গা ঢাকা না দিলেই নয়।

এর আগে পুরোনো জুতোর মতো তিনটি স্ত্রীকে সে অবলীলায় ছেড়ে চলে এসেছে। একটি পাটনায়, একটি ব্যারাকপুরে, একটি বনগাঁয়। প্রথম দুটির জন্যে ভাবনা নেই, তারা তারই দলের—দু নম্বরেরটি তো তার মতো লোককেও এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আসতে পারত। বনগাঁর স্ত্রীটির জন্যে একটু দুঃখ হয় শুধু—ভারী সুন্দরী ছিল মেয়েটা ; এক-আধবার ফিরে যাওয়ার লোভ না জেগেছে তার নয়, কিন্তু বাজারের সেই মোটা মাড়োয়ারীটা সাতশো টাকার শোক এত সহজে ভোলেনি।

বছর খানেক হল এসেছে শঙ্করী। এমন বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা এর আগে তার কখনো হয়নি।

কিল-চড় খেলে কাঁদে না—গোরুর মতো দুটো শান্ত বড় বড় চোখ মেলে কী

ভাবেই যে তাকিয়ে থাকে। গায়ে একশো তিন জর নিয়েও কাঁপতে কাঁপতে উঠে রান্না করতে যায়। ক্লান্তিতে বিরক্তিতে যেদিন রাত্রে ভালো ঘুম আসে না, সেদিন টের পায় আস্তে আস্তে শঙ্করী তার কপাল টিপে দিচ্ছে। ভিজে ভিজে নরম হাতের ছোঁয়া এক এক সময় অসহ্য ক্লেদাক্ত লাগে, হাতটা ছুঁড়ে ফেলে গাল দিয়ে ওঠে। শঙ্করী রাগ করে না—অভিমান করে না—শ্রান্ত পশুর মতো কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা ছেড়ে উঠে যায়—জানলার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একরাশ ঠাণ্ডা বরফের মতো মেয়েটা। শরীর জুড়িয়ে দেয় না—সমস্ত অসাড় করে আনে। পুলিসের ভয়ে না হোক—এরই জন্যে এখন তার কলকাতা ছাড়া দরকার।

আজও ভোরের অস্পষ্ট আলোয় কিছুক্ষণ হিংস্রভাবে তাকিয়ে রইল শঙ্করীর দিকে। একটা মানুষ যে এত নির্জীব, এমন নিরুত্তাপ হতে পারে কল্পনাই করা যায় না। আর মাস তিনেকের মধ্যেই মা হবে শঙ্করী, সন্দেহ হয় ওর চোখের সামনেই যদি সন্তানের গলা টিপে মেরে ফেলে, তা হলেও একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করবে না, তেমনি গোরুর মতো শান্ত বড় বড় চোখ মেলে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকবে।

বিছানা ছেড়ে ঘরের একটিমাত্র জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বস্তির কলে হিন্দুস্থানী মেয়েদের ভিড়, চিরকালের ঝগড়া। সারাদিন ধরে অবিশ্রান্ত চেঁচামেচি করবে, এখন থেকেই গলা সেধে নিচ্ছে। ওদের মতো একবারও যদি গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠত শঙ্করী, তা হলেও বোঝা যেত ও খানিকটা মানুষ—একটা নিটোল বরফের পিণ্ডই নয়।

কিন্তু শঙ্করী চিৎকার করতে পারে না। চিৎকার তার থেমে গেছে ন'বছর আগেই।

সেই দাঙ্গা, সেই দেশ-ছাড়ার হিড়িক। মা-বাপের সঙ্গে শঙ্করীও আসছিল গ্রামের মায়া কাটিয়ে। পথে একদল লোক চড়াও হল গোরুর গাড়ির উপরে। কে একজন হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ছুঁড়ে দিলে কাঁটাবনের মধ্যে। জ্ঞান হলে শঙ্করী দেখেছিল বাবা রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—মার চিহ্ন কোনোখানে নেই।

সেই থেকে শঙ্করী প্রায় বোবা হয়ে গেছে। সেই থেকে অমনিভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

টেবিলের ওপর থেকে টুথব্রাশটা তুলে নিতে নিতে মনে পড়ল যেদিন রিফিউজী ক্যাম্প থেকে শঙ্করীকে সে বিয়ে করে এনেছিল। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বলেছিল সে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কেরানী, বলেছিল, বর্ধমান শহরে তার পৈতৃক বাড়ি আছে। সম্প্রদানের সময় যখন তার হাতের ওপর শঙ্করীর গোলগাল ভিজে হাতখানা এসে পড়ল, তখন তার দাদুর চোখ আর গালের কোঁচকানো চামড়ার খাঁজে খাঁজে জল চিকচিক করছিল।

'ওকে তুমি রক্ষা করলে বাবা, অনাথা মেয়েটাকে পায়ে ঠাঁই দিলে। ভগবান ভালো করবেন তোমায়।'

ভগবান! ভালো করবেন! একটা বরফের চাঙার বুকের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলা হল, ভগবান ভালো করবেন। এখন এ ভার কোনোমতে নামিয়ে ফেলতে পারলেই রক্ষা। অবশ্য অন্তঃসত্ত্বা শঙ্করী এর পরে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এ-কথা ভেবে কিছুক্ষণ শৌখিন মন খারাপ করা চলে। কিন্তু ও কাজ তার নয়, তার সময় নেই।

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার বালতির তোলা জলে হাত-মুখ ধুয়ে এল, তারপর রাত্রিবাসের লুঙ্গিটা ছেড়ে পরে নিলে দড়ির ওপর সময়ে পাট করে রাখা ট্রাউজারটা। ততক্ষণে শঙ্করী জেগেছে ঘুম থেকে।

'তুমি কখন উঠলে?'

'অনেকক্ষণ।'

'এখুনি জামা-কাপড় পরছ যে?'

'বেরুব। কাজ আছে।'

'তা হলে তোমার চা এনে দিই এক্ষুণি।'

শঙ্করী চা করতে গেল। ঝোলানো ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে চুলটাকে পাট করতে করতে ভাবতে লাগল: এই আরম্ভ হল সারা দিনের মতো শঙ্করীর কাজ। মালটানা গাড়ির গোরুর মতো নির্বিকারভাবে বেরিয়ে পড়ল সকাল ছটা থেকে রাত দশটার জোয়ালটানা পথ বেয়ে। ওই ভারমন্থন শরীর নিয়ে এখন সংসারের সব করতে হবে, কলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আনতে হবে রান্না-খাওয়ার জল—এমন কি স্বামীর স্নানের জন্যেও তুলে রাখবে এক বালতি। যদি অসুস্থ শরীরে কিছুক্ষণের জন্যে মাথা ঘুরে পড়ে যায়, যদি বমি করে, তবুও এক মুহূর্ত ওর চুপ করে থাকবার উপায় নেই। কী দুঃখই সইতে পারে—কী নিঃশব্দে বইতে পারে ভার, একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে জানে না! হয়তো মানুষের কাছে—ভগবানের কাছে ওর সব প্রতিবাদ শেষ হয়ে গেছে—যেদিন শেষ রাত্রির চাঁদের আলোয় দেখেছিল পথের ধুলোর ভেতর ওর বাবা নিজের জমাট রক্তের মধ্যে নিশ্চল হয়ে আছে; হয়তো সেদিন থেকেই ভাগ্যকে নালিশ জানাতে ভুলে গেছে—যেদিন জেনেছে ওর মার শেয়ালে-শকুনে অর্ধেক ছিঁড়ে খাওয়া শরীরটাকে পাওয়া গেছে একটা ধান ক্ষেতের ভেতরে।

চিন্তাটা এই পর্যন্ত আসতেই চমকে উঠল। কী এসব—এ কিসের দুর্লক্ষণ। সে—মানব চক্রবর্তী—নামজাদা জুয়াচোর, এ ধরনের ভাবনা তার কেন আসে—কোথা থেকেই বা আসে? সতেরো বছর বয়েসে বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর (মা বলতে তার অত্যন্ত আপত্তি আছে—যা বিশ্রী ব্যবহার করত!) গয়নার বাক্স হাতিয়ে যেদিন সে পথে নেমেছিল, সেদিন থেকেই মানুষ সম্বন্ধে এতটুকু দুর্বলতার রেশও তার মনে কোথাও নেই। ঠকানোর ব্যবসায় দিনের পর দিন যতই সিদ্ধিলাভ করেছে ততই বেশি করে ঘৃণা জন্মেছে

মানুষ নামে পোকা জাতীয় এই জীবগুলোর ওপরে। কী যে লোভী—কী নির্বোধ! সস্তায় বড়লোক হতে চায়, পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ঘুষ দিয়ে চাকরি বাগাতে চায়, চোরাই সোনা কিনতে বিবেকে বাধে না, কী করে দাঁও মারবে তারই ফিকির খোঁজে। সব—সব এক দলের। অথচ বাইরে পাক্কা ভদ্রলোক, মুখে ভালো ভালো কথার ফুলঝুরি ঝরছে। একটুখানি লোভের ছোঁয়া লাগাও—আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে। দুটো সাজানো কথা শুনেই লোভে অন্ধ হয়ে ছুটে আসবে ফাঁদে পা দিতে। এদের না ঠকানোই অন্যায়, ফাঁকি দিয়ে এরা পেতে চায় বলে ফাঁকিটাই এদের আসল পাওনা।

আবার গ্রহের ফের, এদের হাতেই সে ধরা পড়ে গেছে কখনো কখনো। অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়েছে (বস্তির চাইতেও খারাপ ভাষায় ভদ্রলোকদের দখল আছে), ঘুষি-লাথির নির্বিচার নিষ্ঠুরতা ভেঙে পড়েছে তার ওপর—একজন তো একটা ঘুষিতে সামনের দুটো দাঁত উঠিয়েই দিলে একবার। কিন্তু যারা গাল দিয়েছে, নির্দয়ভাবে মেরেছে—তাদের ওপর যতখানি রাগ হয়েছে—নিজের ওপর হয়েছে তার চাইতেও বেশি। এই অধম নির্বোধ জীবগুলোর কাছেও সে ধরা পড়ে গেল, এই লজ্জাতেই যেন মরমে মরে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে মার খেয়েছে আর মনে মনে আউড়ে গেছে : 'হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙ লাথি মেরেই থাকে—এ-ই হল দুনিয়ার নিয়ম।'

মানুষকে এমন করে যে জেনেছে—সংসারের চেহারাটা এমন করে ধরা পড়ে গেছে যার কাছে—সেই মানব চক্রবর্তীর মনও আজ নরম হয়ে আসছে নাকি? সে ভাবতে শুরু করেছে শঙ্করী সম্পর্কে? নাকে ফুলপরা একটা গোলগাল কালো মেয়ে—মা হতে গিয়ে যাকে আরো কুৎসিত দেখাচ্ছে, যার কাছে পাঁচ মিনিট বসে থাকলে মনে হয় গোয়ালন্দঘাটের বরফের গুদামে বসে আছে, ঘুমের ভেতর মাথায় যার ভিজে ভিজে হাত-টার ছোঁয়া লাগলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, তার জন্যে কোমল হয়ে উঠছে তার মন?

চুলের মধ্যে চিরুনিটা আটকে দাঁড়ালো। মানব চক্রবর্তীর মাথা খারাপ হচ্ছে। বনগাঁর অমন সুন্দরী মেয়েটা—দুধে-আলতায় রঙ—ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল, তার মায়া পর্যন্ত কাটাতে পারল আর কোথাকার কে এক শঙ্করী এসে মনটাকে এলোমেলো করে দেবে? উঁহু, অসম্ভব। বয়েস বাড়ছে নাকি—বুড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে? না—আর দেরি করা যায় না, এবার তাকে নোঙর তুলতে হবে। তা ছাড়া পুলিসও বড় বেশি পেছনে লেগেছে—কলকাতাতেও আর বেশিদিন থাকা চলবে না।

শঙ্করী চা নিয়ে এল। সেই সঙ্গে রাত্রির একখানা বাসি হাত-রুটি, একটু চিনি।

ওদিকের তেতলা-চারতলা বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে সূর্য উঠেছে এতক্ষণে। এইবারে গলির খোলার চালে চালে রোদ পড়েছে, এই ঘরের ভেতরটা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে

অনেকখানি। সেই আলোয় শঙ্করীর কালো মুখখানাও কেমন আলো হয়ে উঠেছে—মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকেই।

সে জানে। জানে, সে সুপুরুষ। উজ্জ্বল রঙ, চমৎকার ওল্টানো চুল, ধারালো নাক, ঝকঝকে চোখের দৃষ্টি। ধোপভাঙা বুশ-শার্টে, অম্লানবর্ণ ট্রাউজারে, চোখের পাওয়ারহীন চশমার রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমে আর হাতের নীল চামড়ার ফাইল-কেসে তাকে যেমন বিশিষ্ট, তেমনি দীপ্তমান বলে মনে হচ্ছে এখন। এই মুহূর্তে কে বলবে, মাত্র ক্লাস টেন পর্যন্ত তার বিদ্যার দৌড়, কে বলবে পেনাল কোডের চারশো কুড়ি ধারার একজন নামজাদা গুণী লোক সে—কে অনুমান করবে, এর আগে অন্তত ছ'বার সে জেল খেটেছে? এই বেশবাসে, এই উজ্জ্বলতায় সে আর স্রোতের শ্যাওলা নয়—পুলিসের ফোটোতে একজন মার্কামারা জুয়োচোর নয়—এই খোলার বস্তির ঘরে যারা কোনোমতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে—তাদের দলেরও কেউ নয়।

তার যে-ধরনের কাজ, তাতে এ পোশাক নইলে তার চলে না। আর চেহারাটা বাড়তি লাভ—এই ভদ্রতাটুকু ভগবান করেছেন তার সঙ্গে।

চা দিয়ে রুটির টুকরোগুলো গিলতে গিলতে টের পেলো, এখনো শঙ্করী একভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। একবার মনে হল, আচ্ছা—এই পোশাকে যেমন তাকে ঝকঝকে তকতকে একটি সহজ মানুষের মতো দেখায়, তেমনি হওয়া কি খুব অসম্ভব তার পক্ষে? শঙ্করী যা চায়, তা কি কোনোমতেই হওয়া যায় না? যে পথ দিয়ে চলেছে—এ ছাড়া অন্য পথ কি কোথাও নেই?

শঙ্করী—আবার সেই শঙ্করী। এ-সব কি সর্বনাশা ভাবনা পেয়ে বসল? একটুকরো: আধ-চিবোনো রুটি চা দিয়ে জোর করে গিলতে গিয়ে, বিষম খেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল তক্তপোশ থেকে। তারপর কাবলী-চটিটা পায়ে গলিয়ে, শঙ্করীর মুখের দিকে আর না তাকিয়ে, ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, 'আমার ফিরতে দেরি হবে।'

রাস্তার মোড় থেকে পান কিনে খেতে আরও মিনিট পাঁচেক গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে, সাজানো প্ল্যানটাকে আর একবার এঁচে নিতে আরো দশ মিনিট কাটল। তারপর খালি দেখে একটা ডবল-ডেকারে লাফিয়ে উঠল, দোতলায় গিয়ে বসে পড়ল একেবারে সামনের সীটে।

মাছটা টোপ গিলেছে। এখন কেবল খেলিয়ে তোলাই বাকী।

সাধারণতঃ এ-সব স্কুল-মাস্টার জাতীয় জীবে তার রুচি নেই। নিজেকে ভয়ানক খেলো বলে মনে হয়। কিন্তু নেভি কিংবা ফোর্ট উইলিয়মে চাকরি দেওয়া—পেছনের দরজা দিয়ে দমদমে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিঙে ঢোকানো, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের ইনস্পেক্টর সাজা—এগুলো লোকের এত জানাশুনো হয়ে গেছে যে যখন-তখন ধরা পড়বার সম্ভাবনা।

সন্ত পাস-করা ছেলে-ছোকরাদের কাছেও খুব সাবধানে এগোতে হয়, কার বন্ধু—কার ভাইকে এর মধ্যেই ঠকিয়ে বসে আছে নিজেরই তা খেয়াল নেই।

তাই একটু নিরীহ, সরল লোকের কাছেই এখন চেষ্টা করা দরকার। আর স্কুল-মাস্টাররা এদিক থেকে আদর্শ। বুড়ো বয়সেও একশো টাকা মাইনের চাকরি করতে করতে যারা রাস্তার ভিখিরিকে পয়সা দেয় আর তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলের মুখে সিগারেট জলন্ত দেখলে এখনো যাদের ভুরু কুঁচকে ওঠে, তারা আজও নিরাপদ।

অবশ্য এই লোকগুলো রাতারাতি বড়লোক হতে চায় না। ফাঁকি দিয়ে সুবিধে চাইতে এদের অনেকেরই বিবেক আর্তনাদ করে। এদের বিদ্যার অহমিকাকে একটু সুড়-সুড়ি দেওয়া—অভাবের সংসারকে কিছু সচ্ছলতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। বারো আনা কাজ তাতেই এগিয়ে যায়।

এই সুযোগ নিয়েই, সামান্য খোঁজখবর করে সে প্রকাশ্য রাস্তাতেই করুণাময়বাবুকে একটা প্রণাম করেছিল।

'ভালো আছেন স্যার?'

'দীর্ঘজীবী হও'—অভ্যাসে আশীর্বাদ করেছিল করুণাময়। তারপর ঘষা কাচের মতো পুরু চশমার ভেতর দিয়ে ক্ষীণদৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমাকে তো—'

'চিনতে পারছেন না? আমার নাম তারাপদ দাস—নাইনটিন ফরটিতে ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম আপনার স্কুল থেকে।'

'তা হবে, তা হবে—সকলকে তো মনে থাকে না।' অপ্রতিভ হয়েছিলেন করুণাময়।

মনে না থাকারই কথা—কারণ মানব চক্রবর্তী কোনোদিনই তারাপদ দাস হয়ে করুণাময়ের স্কুলে পড়েনি; আর তারাপদ দাস নামটা এত সহজ, এতই সাধারণ যে উনিশ বছরের ব্যবধানে তা মন থেকে মুছে যাওয়ার কথা।

করুণাময় বলেছিলেন, 'তারাপ্রসাদ সেনগুপ্তকে অবশ্য মনে আছে। ইংরাজিতে লেটার পেয়েছিল নাইনটিন থার্টিফাইভে, স্টারও পেয়েছিল। সে তো শুনেছি বিলেতের পি. এইচ. ডি. হয়ে এখন মাদ্রাজের কোন্ কলেজে চাকরি করছে।'

'আমরা তো অত ভালো ছাত্র নই স্যার—পেছনের বেঞ্চে বসতুম। টেনেটুনে পেয়েছিলুম ফার্স্ট ডিভিশন। তবে আপনার আশীর্বাদে এখন মোটামুটি ভালোই আছি।'

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে চলেছিল ভবানীপুরের পথ দিয়ে। না থেমেই পুরনো অভ্যাসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন করুণাময়, 'তা কী করছ এখন?'

'একটা আমেরিকান ফার্মে কাজ করছি স্যার। দিল্লীতে।'

'মাইনে?'

'আটশো টাকার মতো পাচ্ছি।'

একবার থেমে দাঁড়িয়েছিলেন করুণাময়। ঘষা কাচের মতো পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন আর একটি কৃতী ছাত্রের দিকে। ঝকঝকে চেহারা চকচকে বেশবাস—চোখ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। নাঃ—নাইনটিন ফরটির এই ছেলেটিকে কিছুতেই চিনতে পারলেন না। একসময় নিজের স্মৃতিশক্তির জন্যে গর্ববোধ করতেন—কিন্তু বয়েস বেড়ে সব অন্য রকম হয়ে গেছে।

'বেশ বেশ, ভারী খুশী হলুম।'

'আপনি তো এখনো চক্রবেড়েতেই আছেন স্যার ?'

'হ্যাঁ—কোথায় যাব আর ?' চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল করুণাময়ের।

'আপনাদের জন্যে ভারী দুঃখ হয় স্যার।' তারাপদ দাসও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল: 'আপনারাই দেশ গড়ছেন—অথচ আপনারাই হচ্ছেন সব'চাইতে এক্সপ্লয়টেড।'

করুণাময় জবাব দেননি। অল্প একটু হেসেছিলেন কেবল। সে-হাসির অনেক রকম অর্থ হয়।

'ওহো—ভালো কথা। ভাগ্যিস মনে পড়ল। একটা টিউশন করবেন স্যার ? সময় আছে আপনার ?'

'কি রকম টিউশন ?'

'মন্দ নয় স্যার! আড়াইশো টাকা করে দেবে। সপ্তাহে দু দিন।'

'আড়াইশো টাকা ? সপ্তাহে দু দিন!' করুণাময়ের পা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল: 'বলো কি!'

'তা ছাড়া ইচ্ছে হলে দু-এক মাস আমেরিকাতেও ঘুরে আসতে পারেন স্যার। ওদেরই পয়সায়।'

কথা বলবার আগে বার তিনেক থাবি খেয়েছিলেন করুণাময়।

'ব্যাপারটা খুলে বলো।'

'একটু সময় লাগবে স্যার। তা ছাড়া আপনিও এখন ব্যস্ত রয়েছেন—'

'না না, কিছু ব্যস্ত নয়। এই তো কাছেই আমার বাসা—এসো না।'

মানব চক্রবর্তী—আপাতত যার নাম তারাপদ দাস—একবার তাকিয়ে দেখল বাইরের দিকে। বাস চৌরঙ্গীতে এসে থেমেছে। বর্ষার নতুন ঘাসে ময়দান ছেয়ে গেছে, গাছের ঘন সবুজ নতুন পাতারা খুশীতে স্নান করছে সূর্যের আলোয়। একটি মাঝারী বয়সের মেমসাহেব পেরাম্বুলেটার ঠেলে নিয়ে চলেছে—তার নিজেরই বাচ্চা খুব সম্ভব—ছোট ছোট হাত-পা নেড়ে খেলা করছে, যেন শ্বেত পদ্মের পাপড়ি কাঁপছে হাওয়ায়। আর কিছুদিন পরে শঙ্করীও মা হবে কিন্তু তার বাচ্চার জন্য পেরাম্বুলেটার জুটবে না; হয়তো জন্মের পরেই উপোসী মার বুকে এক ফোঁটা দুধ না পেয়ে—

আবার শঙ্করী! দুদিন পরে যাকে ধুলোর মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যেতে হবে তার জন্যে এই সব ভাবনা তার কেন আসছে। কার বাচ্চা বাঁচল মরল তাতে তার কী আসে যায়। এই কলকাতা শহরেই কত শিশু প্রত্যেকদিন ফুটপাথে মরে, কতজন মুখ থুবড়ে থাকে ডাস্টবিনের ভেতর—তা নিয়ে তার মাথাব্যথার কী আছে। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সে পথও বন্ধ, আইনে দণ্ডনীয়। দেশসুদ্ধ লোক ভেজাল খাচ্ছে—যক্ষ্মায় ভুগছে—উপোস করছে—আর ট্রামে-বাসে একটা বিড়ি-সিগারেট ধরালেই একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল। যত সব!

বাস আবার চলতে আরম্ভ করেছে। হাঁ, টোপ গিলেছেন করুণাময়।

'কাজটা আর কিছু নয় স্যার—আমেরিকান কনস্যুলেটের দুজন অফিসার বাংলা শিখতে চায়। মানে—ওরিজিন্যাল ট্যাগোর পোয়েট্রি পড়বে—এই ওদের সখ। আড়াইশো করে টাকা তো দেবেই, আর যে দুদিন পড়বে, খুব ভালো ডিনারও খাওয়াবে। তা ছাড়া ওই যে বলছিলুম—খুশি হলে চাই কি তিন মাস আমেরিকায় ঘুরিয়ে আনল। জানেনই তো স্যার—টাকা ওদের কাছে খোলামকুচি।'

'হুঁ, শুনেছি বটে।' ঝাপসা গলায় করুণাময় বলেছিলেন, 'যুদ্ধের সময় ওরা নাকি দশ টাকার নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাত। কিন্তু আমি ভাবছি—'

'আপনার কি সময় হবে না স্যার! তা হলে আমি বরং আর কাউকে—'

'না—না—' ব্যতিব্যস্ত হয়ে করুণাময় বলেছিলেন, 'সময় আমার খুব হবে, দরকার পড়লে ত্রিশ টাকার দুটো টিউশন নয় ছেড়েই দেব। কিন্তু আমি বলছিলুম, এত টাকা যদি দেবেই তা হলে স্কুল-টীচার চাইছে কেন? কলেজের প্রফেসারই তো পেতে পারে।'

'সে তো পারেই স্যার—দু-একজন প্রফেসার ঘোরাঘুরিও করছে। কিন্তু ওদের মেজাজই আলাদা। ওরা বলে, প্রফেসাররা ফাঁকি দেবে—স্কুল-টীচারেরাই সত্যিকারের সিরিয়াসনেস নিয়ে পড়ায়।'

'তা ঠিক!' অহমিকার সঙ্গে চাপা ক্ষোভ দোল খেয়ে উঠেছিল করুণাময়ের গলায়: 'প্রফেসাররা তো দূর থেকে বক্তৃতা ছুঁড়ে দিয়ে খালাস—ছাত্রদের হাতে করে গড়তে হয় আমাদেরই।'

'ওরাও তাই বলে স্যার। আর ওদের দেশে স্কুল-টীচারের অবস্থা তো আমাদের মতো নয়। স্ট্যাটাসই আলাদা। ওরা ভাবতেই পারে না যে, এদেশের টীচারদের গরু-গাধার চাইতেও বেশি খাটিয়ে আধপেটার মতোও খেতে দেওয়া হয় না।'

করুণাময় কিছুক্ষণ বসেছিলেন অভিভূত হয়ে। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'তাইতো—এখন প্রায় দশটা বাজে—স্কুলে যাওয়ার সময় হল। তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দাও—আমি বরং আজ বিকেলে—'

'আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন স্যার? আমি উঠেছি চৌরঙ্গীর একটা বিলাতী হোটেলে—সেখানে গিয়ে আপনি স্বস্তি পাবেন না। আমিই আসব এখন কাল সকালে। সাড়ে আটটার ভেতর।'

বাস যদুবাবুর বাজার পার হচ্ছে। মাথার ওলটানো চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিলে মানব চক্রবর্তী। এইবার তাকে নামতে হবে—চক্রবেড়ে আর দূরে নেই।

করুণাময় আকুল হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

'তোমার একটু দেরিই হল। আমি তো ভেবেছিলুম আর কেউ বুঝি—'

'ব্যাপারটা প্রাকটিক্যালি ওরা আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে স্যার। আর আমি আপনার কাছে পড়েছি—আমি তো জানি কলকাতার স্কুলের কোনো টীচারই আপনার মতো গ্রামার পড়াতে পারেন না।'

ক্লিষ্টভাবে করুণাময় বললেন, 'তোমরাই বলবে। অথচ ছাখো—দু-একটা মাইনর মিসটেকের জন্যে একটা ছোকরা হেড-এগজামিনার রিপোর্ট করে আমার এগজামিনারশিপ কেটে দিলে। প্রফেসারেরা নিজেদের কী যে ভাবে।'

'প্রফেসারদের কথা ছেড়ে দিন স্যার। আমারই তো পাঁচ-সাতজন প্রফেসার বন্ধু রয়েছে। খালি বড় বড় কথা—কেবল পলিটিক্স্ আর সাহিত্য নিয়ে তর্ক। পড়াশুনো তো করতে দেখি না কখনো।'

'আর আমরা—' করুণাময় একখানা মোটা ইংরেজী বই বের করলেন: 'এই ছাখো, কাল মাইনে পেয়েই এটা কিনে আনলুম 'থ্যাকার স্পিংক' থেকে। আঠারো টাকা নিলে। ফরেনারদের কী সাস্টেমে পড়াতে হয়—তার খুব ভালো ইন্স্ট্রাকশন দেওয়া আছে। জানো, কাল রাত দুটো পর্যন্ত পড়েছি—দাগিয়েছি লাল পেনসিল দিয়ে।'

'আপনাকে তো জানি স্যার। জীবনে কখনো ফাঁকি দিলেন না, অথচ বরাবর ফাঁকি পড়লেন। তবে আমেরিকানরা গুণীর কদর বোঝে, ওরা খুশী হলে হয়তো আপনাকে আর স্কুলমাস্টারিই করতে হবে না।'

পুরু কাচের চশমার আড়ালে করুণাময়ের আচ্ছন্ন চোখ দুটো জলে উঠল, থর থর করে কাঁপতে লাগল হাতের আঙুল: 'দেখি এখন। তোমার হাতযশ আর আমার বরাত। আজই যাচ্ছ তা হলে?'

'হ্যাঁ, বেলা দুটো নাগাদ। আপনি বেরুতে পারবেন স্যার স্কুল থেকে?'

'দেড়টায় টিফিন। আমি ছুটি নিয়ে রাখব সেই সময়।'

'তা হলে ওই কথাই রইল স্যার। ঠিক একটা চল্লিশে আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসব স্কুলের সামনে। আপনি রেডি থাকবেন।' হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো একবার

তারাপদ দাস: 'নটা বাজল। আমি একবার যাচ্ছি এয়ারওয়েজে। পরশু দিল্লী যেতে হবে—আজই প্যাসেজটা বুক করা দরকার।'

'একটু চা—'

'আপনার কাজটা করে দিই স্যার—তারপরে ভালো করে বাড়ির রান্না ঝোল-ভাত খেয়ে যাব একদিন। দিল্লীর হোটেলে রুটি আর মাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেল।'

'সে তো নিশ্চয়ই—খাবে বইকি। তোমরাই তো এখন আমার ছেলের মতো। নিজের ছেলেটা আই. এস-সি. পড়তে পড়তে টি-বিতে মরে গেল, সে থাকলে—'

করুণাময় আর বলতে পারলেন না—কথা হারিয়ে গেল, হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললেন।

কী যে হল মানব চক্রবর্তীর—ওই চোখের জল দেখে সারা গা তার শিরশির করে উঠল। চট করে করুণাময়কে একটা প্রণাম করে বললে, 'এখন আসি স্যার—ঠিক একটা চল্লিশে স্কুলে আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসব।'

এখন আর বিশেষ কোনো কাজ হাতে নেই। করুণাময়ের ব্যাপারটা একেবারে চুকিয়ে দিয়ে তিনটে নাগাদ সেই বাসায় ফেরা। শঙ্করী অবশ্য রান্না করে না খেয়ে বসে থাকবে—শরীরটাও ওর ভালো নেই—

আবার শঙ্করী! চুলোয় যাক! একটা চাপা গর্জন বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

ট্রামে যে ভদ্রলোক পাশে বসেছিলেন, চমকে উঠলেন তিনি।

'কী বলছিলেন?'

'না—না—আপনাকে কিছু নয়।'

নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ট্রামের অন্যান্য মানুষগুলোর ওপর দিয়ে সে চোখটা বুলিয়ে নিতে লাগল। এ-ও তার অভ্যাসের একটা অংশ। উদ্দেশ্য দুটো। এমনি করেই তার চোখ ঠিক চিনে নেয়—কে বেকার, কে লোভী, কার মন দুর্বল—একটু চেষ্টা করলেই কে ফাঁদের দিকে পা বাড়িয়ে দেবে। কিংবা এমন কেউ ট্রামে আছে কিনা যাকে এর আগেই ঠকানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার আগেই টুপ করে নেমে পড়তে হবে গাড়ি থেকে।

কিন্তু মানুষের দিকে দৃষ্টি পড়বার আগে নজরে পড়ল একজনের হাতের বাজারের থলির দিকে। এক আঁটি সতেজ সবুজ কুমড়োর ডগা। আর মনে পড়ল, শঙ্করী একদিন যেন কুচো চিংড়ি আর কুমড়ো শাক আনতে বলেছিল বাজার থেকে। কোনো জিনিসে শঙ্করীর কোনো দাবি নেই—দাবি জানাতে সে ভুলে গেছে। কিন্তু মা হওয়ার আগে মেয়েদের নাকি এটা ওটা খেতে ইচ্ছে করে। তাই একদিন বলেছিল—

ধেৎ! বিশ্রী ভাষায় অশ্লীল গাল দিতে চাইল আবার, কিন্তু পাশের ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে থমকে গেল। বাইরে পাঠিয়ে দিল চোখ। গাড়ি—মানুষ—বাড়ি—সিনেমার বিজ্ঞাপন। আজকে রাত্রে একবার সিনেমায় গেলে হয়—একটা হিন্দি ছবির খুব রংদার বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই।

ট্রাম থেমেছে। সামনের একটা লম্বা দেওয়ালের মাথায় লোহার ফ্রেমে বেবিফুডের বিজ্ঞাপন। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মায়ের কোলে নধর একটি শিশু। স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্ম নেবে। কিন্তু এর পরে তো পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবে শঙ্করী। বেবিফুড দূরে থাক—হয়তো মায়ের শুকনো বুক থেকে এক ফোঁটা দুধও তার—

'অসম্ভব—উঃ—অসম্ভব!'

পাশের ভদ্রলোক আবার চকিত হয়ে উঠলেন।

'কী হল মশাই—ব্যাপার কী আপনার?'

'শরীরটা ভালো নেই—বড্ড মাথা ধরেছে।' বলেই উঠে পড়ল, তারপর লাফিয়ে নেমে গেল চলন্ত ট্রাম থেকে।...

বেলা একটা চল্লিশে যখন ট্যাক্সি নিয়ে স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ালো—তখন মনটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে। টোপ-গেলা মাছটাকে সারাদিন ধরে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলবার সময় যেমন স্থির নিশ্চিন্ত হয়ে যায় মেছুড়ে, ঠিক সেই রকম। না—স্কুলমাস্টার করুণাময়ের জন্যে কোনো করুণাই তার নেই। চারদিকে মানুষ নামে যে অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে তারা সব এক দলের—কে শয়তান আর কে শয়তান নয়—তা নিয়ে মাথা ঘামানো নিছক বিড়ম্বনা।

তা ছাড়া জেলের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেও গুণী লোক—চক্ষের পলকে রাস্তার ধারের মোটর থেকে ব্যাক লাইট খুলে নিতে, টুকরো-টাকরা পার্টস সরাতে তার জুড়ি নেই। সম্প্রতি খান-দুই আস্ত মোটর উধাও করে বেশ কিছু হাতে পেয়েছে। আমিনিয়া হোটেলে টেনে নিয়ে গিয়ে ভরপেট বিরিয়ানী পোলাও খাইয়েছে সে। মেজাজটা খুশি আছে—শরীরটাও বলাই বাহুল্য। ঘণ্টা দুই আড্ডা দিয়ে বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন। ভাবছে, দিনকয়েক এ রাস্তা ছেড়ে সেও মোটর পার্টসের কারবারেই নেমে পড়বে কিনা।

করুণাময়কে বেরিয়ে আসতে দেখে হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। 'আসুন স্যার।'

করুণাময় কাঁপা গলায় বললেন, 'তুমি এসে গেছ তা হলে? আমি ভেবেছিলুম—'

'আপনাকে কথা দিয়েছি স্যার—তা ছাড়া আমি আপনার ছাত্র। আপনার

জন্যে কিছু যদি করতে পারি—সে তো আমার যৎসামান্য গুরুদক্ষিণা। উঠুন স্যার গাড়িতে—'

ট্যাক্সি চলল।

একটা চাপা উত্তেজনা থর থর করছে করুণাময়ের ভেতর—পুরু কাচের চশমার আড়ালে ওঁর চোখ দুটো আশায়, আনন্দে জলজল করছে। মায়া হয়? না—হয় না। হওয়া উচিত নয়।

'ওরা যদি আপনাকে আমেরিকায় পাঠাতে চায়—'

'অ্যাঁ?' যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন করুণাময়।

'ওরা যদি পাঠাতে চায়—যাবেন?'

'যাব না কেন?' করুণাময়ের ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল, এতদিনের সংযমী স্কুল-টীচার যেন নিজের ওপর থেকে সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন: 'এমন সুযোগ পেলে কি কেউ ছাড়ে?'

'তা হলে আজই আমি একটু বলে রাখব সে-কথা।'

'রেখো।' করুণাময় হৃৎপিণ্ড ভরে যেন মস্ত একটা শ্বাস টানতে চাইলেন: 'তোমাকে আর কী বলব—তুমি—'

বলতে পারলেনও না। আশ্চর্য ভাগ্যের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত অনুভূতি একটা অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে গিয়ে সংহত হয়েছে। আই. এ. ফেল যে বেকার ছেলেটিকে ফোর্ট উইলিয়মে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল, এই উত্তেজনার কাঁপন তার চোখে-মুখেও দেখেছিল সেদিন।

ট্যাক্সিটাকে থামালো পার্ক স্ট্রীটের একটা বিশাল বাড়ির সামনে। তিনটে বেরুবার পথ আছে এখান থেকে।

'স্যার, এসে গেছি।'

'এই বাড়ি?'

'হ্যাঁ স্যার—এরই চারতলায় অফিস। আপনি নিচে একটু দাঁড়ান, আমি ওপরে গিয়ে গোড়ায় একটা ফর্ম ফিলআপ করে দিয়ে আসি। তারপর কথাবার্তা হবে। আমেরিকানদের তো জানেন স্যার, নানারকম ফর্ম্যালিটিজ আছে ওদের।'

ট্যাক্সি থেকে নামলেন করুণাময়। শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে, ভালো করে হাত-পা পর্যন্ত নাড়তে পারছেন না।

'ট্যাক্সি ছেড়ে দেব?'

'একটু থাক। দরকার হলে পার্কসার্কাসে ওদের বড়কর্তার কাছেও যেতে হবে একবার। আর এখানেই যদি হয়ে যায়, তবে তো কথাই নেই। আমি ওপর থেকে

নেমেই ওর ভাড়াটা মিটিয়ে দেব।' ব্যস্ত হয়ে একবার ফাইল কেসটা খুঁজল মানব চক্রবর্তী। 'এই যা, কলম ফেলে এসেছি! আপনার পেন আছে স্যার? ফর্মটা লিখে দিতে হবে।'

'এই নাও—' করুণাময় কলম বের করে দিলেন।

'বাঃ, বেশ কলমটা তো।'

'হ্যাঁ, আমার বড় আদরের কলম। এত দামী কলম কি আর কিনতে পারি আমি—তোমারই মতো একটি ছাত্র আমাকে জার্মানী থেকে এনে দিয়েছিল।'

'দেওয়াই তো উচিত স্যার—আপনাদের জন্যে কী আর করতে পারি আমরা।' কলমটা পকেটে গুঁজে মানব মানি ব্যাগ বের করল: 'দেখি এখন, ত্রিশটা টাকা আবার আছে কিনা।'

'ত্রিশ টাকা! কেন?' করুণাময় চকিত হলেন।

'ও কিছু নয় স্যার—এদের এখানে ওটা ফর্ম ফী হিসেবে জমা দিতে হয়। যাক—সামান্য কটা টাকা, আমিই দিয়ে দেব এখন।'

'না না—তা কেন?' করুণাময়ের মাস্টারী বিবেক আর্তনাদ করে উঠল: 'তুমি এত করছ, এ টাকা আবার দিতে যাবে কেন? আমি তো কাল মাইনে পেয়েছি—টাকা চল্লিশেক সঙ্গেই আছে আমার।'

'থাক স্যার—আপনার কাছ থেকে টাকাটা আর—'

'না না, সে হয় না। টাকা তোমায় নিতেই হবে—' শার্টের তলার ফতুয়া থেকে তিনখানা নোট বের করে মানবের হাতে জোর করে গুঁজে দিলেন করুণাময়।

'ভারী লজ্জা দিলেন স্যার।'

'কিছু না বাবা—কিছু না। আর কত জুলুম করব তোমার ওপর?'

'তা হলে স্যার—পাঁচ মিনিট আপনি দাঁড়ান। আমি এক্ষুনি এসে যাচ্ছি।'

করুণাময় চশমাটা খুলে কোঁচা দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন—হয়তো আবার জল এসে গিয়েছিল। আর দ্রুত সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো মানব। শিকার উঠে গেল ডাঙায়। নগদ ত্রিশ টাকা—তার চাইতেও বড় লাভ এই জার্মান কলমটা। সেকেণ্ড হ্যাণ্ডেও পঞ্চাশটা টাকা দাম পাওয়া যাবে।

সবে সিঁড়ির তিন-চারটে ধাপ উঠেছে, ঠিক এমন সময় পেছন থেকে এল আর্ত চিৎকারটা। একেবারে তীরের মতো কানে এসে বিঁধল।

'তারাপদ—তারাপদ!'

হৃৎপিণ্ড থমকে গেল—মনে হল, বুঝি ধরা পড়ে গেছে। প্রাণপণে ছুটে পালাবে কিনা ঠিক করতে পারার আগেই আবার আর্তস্বর কানে এল: 'আমার চশমাটা যে

হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল তারাপদ—চশমাটা না থাকলে আমি যে একেবারে অন্ধ।'

মানব চক্রবর্তী বলতে পারত : 'একটু অপেক্ষা করুন স্যার—আমি এলুম বলে।' অপেক্ষা করতেন অসহায়—অন্ধ করুণাময়, যেমন করে প্রতিকারহীন চরম দুর্ভাগ্যের শেষ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করে মানুষ। বলতেও যাচ্ছিল : 'আমি এলুম স্যার—' কিন্তু তার আগেই করুণাময় আবার বললেন, 'চশমা না থাকলে আমি যে এক পাও চলতে পারি না।'

নিজের ওপর অসহ্য ক্রোধে—একটা দুর্বোধ্য নিরুপায়তায় মানব চক্রবর্তী ধীরে ধীরে ফিরে এল করুণাময়ের কাছে। কলম আর টাকাগুলো তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'তা হলে এগুলো রাখুন স্যার—'

প্রায় হাহাকার করে উঠলেন করুণাময়।

'সে কি তারাপদ—হল না?'

'হবে বইকি স্যার—নিশ্চয় হবে।' একটা অন্ধ অমানুষিক হিংসার দাঁতে দাঁত ঘষে মানব বললে, 'আমি তো আছিই—আপনার চাকরি মারে কে? কিন্তু ওই অন্ধ চোখ দিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা কী ভাববে বলুন দেখি? চশমাটা করিয়ে নিন—কালই বরং আসা যাবে।'

বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন করুণাময়।

'গরিবের বরাতই এই রকম। একেবারে ঘাটে এসে—'

'হ্যাঁ—একেবারে ঘাটে এসে।' অসীম হিংস্রতায় মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করল মানব। তবে বরাতটা যে কার সেইটেই বুঝতে পারেননি করুণাময়।

'কাল ঠিক হয়ে যাবে স্যার। এখন চলুন, ট্যাক্সিতে ওঠা যাক। মিথ্যে মীটার বাড়িয়ে কী লাভ?'

করুণাময়কে খুন করতে পারলে ভালো হত এখন। কিন্তু খুন না করে হাত ধরে তুলে দিতে হচ্ছে ট্যাক্সিতে! আর এই ট্যাক্সি ভাড়াটাও নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে।

আশ্চর্য!

আবার সেই বস্তির ঘর। সেই গুমোট, দুর্গন্ধ রাত। সেই ছারপোকা-ভরা তক্ত-পোশের কণ্টক শয্যা।

'খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি মাথায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে শঙ্করী, তার ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা রাখল কপালের ওপর।

তীব্রভাবে হাতটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও মানব পারল না। সেই মুহূর্তে শঙ্করীর

ওই হাতের ছোঁয়ায় সে বুঝতে পারল, করুণাময়ের আর্তনাদ শুনে সিঁড়ি থেকে সে নেমে এসেছিল কেন!

এই শঙ্করী। এই এক বছর ধরে তার বোবা চোখ, তার ভয়, তার করুণা, দুর্বলতা দিয়ে ওকে পাকে পাকে জড়িয়েছে। নিজের মনের কাছে মানব চক্রবর্তী যত বেশি হারতে শুরু করেছে—তত বেশি করে জায়গা জুড়ে নিয়েছে শঙ্করীর বেদনা, তার আসন্ন সন্তান, চশমা ভেঙে ফেলে অন্ধ করুণাময়ের হাহাকার!

মুখে পিত্ত ওঠার মতো তেতো স্বাদ একটা। পরাজয়ের-গ্লানিতে কিছুক্ষণ দুর্গন্ধ অন্ধকারে সে চুপ করে পড়ে রইল। শঙ্করীর ঠাণ্ডা হাত থেকে বরফের মতো একটা শীতল স্পর্শ ধীরে ধীরে তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল।

একটু পরে স্বগতোক্তির মতো বললে, 'গোটা পনেরো টাকা আছে বোধ হয়। কাল থেকে লোক্যাল ট্রেনে টফি-লজেন্সই ফিরি করব ভাবছি।'

উদ্বোধন

গালের ডান দিকটা পুড়ে চিরকালের মতো বিকৃত হয়ে গেল।

ডাক্তার বললেন, 'তবু তো চোখ বেঁচে গেল মশাই—প্রাণটাও। সেইটেকেই লাভ বলে মনে করবেন।'

অল্প একটু হাসল জ্যোতির্ময়। বললে, 'সান্ত্বনার দরকার নেই ডাক্তারবাবু। রূপবান কোনোদিনই আমি ছিলুম না—কাজেই ওতে আমার মন খারাপ করবার কিছু নেই। শুধু কদিন আর হাসপাতালে থাকতে হবে তাই বলুন।'

'দিন পাঁচেক। তারপরেই ছেড়ে দেব।'

ডাক্তারের কথা শেষ না হতেই পুলিস এল।

'আপনার স্টেট্‌মেণ্ট চাই। সব খুলে বলুন।'

একটু দূরেই একখানা চেয়ারে শ্বেত-পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে জ্যোতির্ময়ের স্ত্রী। তার মুখ থেকে রক্তের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গিয়েছে বলে মনে হয়। শুধু সিঁদুরের ফোঁটাটা অস্বাভাবিক বড়, সিঁথির উপরটা যেন রক্তাক্ত হয়ে আছে। তারও বাম বাহুতে ব্যাণ্ডেজ করা, কয়েকটা অ্যাসিডের ছিটে এসে লেগেছিল সেখানে। স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল জ্যোতির্ময়, তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'স্টেটমেণ্টের কিছু নেই। সার্কুলার রোডের মুখে ট্রাফিকের ভিড়ে আটকে গেল গাড়িটা। হঠাৎ কোথা থেকে কী একটা মুখে এসে পড়ল, ঝন্ ঝন্ করে কাচ ভাঙার মতো আওয়াজ হল—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা—আর কিছু মনে নেই।'

স্টেট্‌মেন্ট নিচ্ছিলেন একজন এস. আই.। পেনসিল থামিয়ে বললেন, 'কাউকে দেখেননি?'

'না।'

'কাউকে সন্দেহ করেন?'

'না।'

ভদ্রলোকের অভিজ্ঞ মুখের উপর সংশয়ের ছায়া দুলে গেল একটা। পেনসিলের গোড়াটা চিবিয়ে নিলেন বার দুই। 'নিরাপদ কাঞ্জিলালকে আপনি সন্দেহ করেন না?' তীক্ষ্ণ, পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করলেন এস. আই.। দু চোখে তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টি। এতক্ষণ ধরে এই প্রশ্নটার জন্যই তৈরি হচ্ছিল জ্যোতির্ময়। নিঃশব্দ প্রার্থনার মতো উচ্চারণ করছিল মনে মনে : আমি যেন দুর্বল না হই, যেন সংকটের মুহূর্তটিতে কিছুতেই ভেঙে না পড়ি। না—কিছুতেই না।

'না, নিরাপদ কাঞ্জিলালের উপর আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এ-কথা কি আপনি জানেন যে এই নিরাপদ কাঞ্জিলাল—' এস. আই. বলতে আরম্ভ করলেন। একটু দূরের সেই চেয়ারটায় তেমনি পাথরের মতো বসে রইল জ্যোতির্ময়ের স্ত্রী—তার নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না। আর চোখ বুজে কপালের উপর এখনও যেখানে বিয়ের শুকনো চন্দন জড়িয়ে আছে, তার উপর আঙুল বুলোতে বুলোতে নিজের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল জ্যোতির্ময় : আমি দুর্বল হয়ে পড়ব না। কিছুতেই না। না—না।...

এ হল গল্পের শেষ পর্ব। সূচনাটা ঘটেছিল আড়াই মাস আগে।

সেদিন চৈত্রের বিকেল মেঘে কালো। বাতাসটা থমকে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ। রাস্তার মোড়ের লক্ষ্মীশ্রীহীন প্রকাণ্ড বাড়িটার দগ্ধতৃণ কম্পাউণ্ডে তিনটে ছন্নছাড়া নারকেল গাছ স্তব্ধ প্রত্যাশায় আকাশমুখো। ঝাঁক বেঁধে কাক উড়ছে আশ্রয়ের সন্ধানে। একটু পরেই ধুলোর ঝড় উঠবে। সেটা থামতে না থামতে খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আছড়ে পড়বে কোত্থেকে। তারপর নেমে আসবে মুষলধারায় বৃষ্টি। আজ এক মাস ধরে ঝলসে যাওয়া হাঁফধরা কলকাতা তারই জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

ট্রাম-লাইনটা দূরে। একটু জোরে পা চালানো দরকার—ভাবছিল জ্যোতির্ময়। এই সময় তার কাঁধে হাত পড়ল।

নিরাপদ। নিরাপদ কাঞ্জিলাল।

'আরে তুই কোত্থেকে?' চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল জ্যোতির্ময়।

শুকনো গলায় নিরাপদ বললে, 'আমি এই পাড়াতেই থাকি।'

'ঠিক ঠিক, মনে ছিল না। অনেকদিন পরে দেখা হল তোর সঙ্গে। ভালো আছিস

বোধ হয়? যাক ভাই—এখন আমি চলি। কালবোশেখী আসছে—আর সময় নেই। পরে কথাবার্তা হবে একদিন।'

ভদ্রতার পালাটা শেষ করে নিজের ঝোঁকেই চলে যেতে চাইছিল জ্যোতির্ময়। কিন্তু তার কাঁধের উপর নিরাপদর আঙুল চেপে বসল লোহার আংটার মতো। কেমন রূঢ়—কেমন কর্কশ। তেমনি শুকনো গলায় নিরাপদ বললে, 'এত ছটফট করছিস কেন? তোর সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে।'

বেসুরো বাজল। একবার ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে দেখল নিরাপদর দিকে। আকাশের মেঘের চাইতেও কালো নিরাপদর মুখ—ব্রণের বড় বড় শুকনো দাগগুলো সে-মুখকে আরও জান্তব করে তুলেছে: হলদে ছোট ছোট চোখে আকাশচেরা বিদ্যুতের আলো থমকে রয়েছে খানিকটা।

দূরে একটা ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরতে আরম্ভ করেছে। একটা শালপাতা উড়ে পড়ল পায়ের উপর। জ্যোতির্ময় বললে, 'কিন্তু ভাই আজকে—এ অবস্থায়—আমি আবার অনেক দূরে—'

কাঁধের উপর লোহার আংটার চাপ আরও বেশি করে পড়ছে। খসখসে গলায় নিরাপদ কেবল বললে, 'আয়।'

নিরুপায় নিশ্বাস ফেলল জ্যোতির্ময়।

'কোথায় যেতে হবে?'

'সামনের ওই চায়ের দোকানে।'

'কিন্তু আজ—'

'আয়—'

হলদে চোখ দুটোয় আকাশের বিদ্যুৎ। বীভৎস মুখ থেকে দুটো কদাকার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। একবার তাকিয়েই জ্যোতির্ময় দৃষ্টি নামিয়ে ফেলল। মনে পড়ল, পরীক্ষার হলে নিরাপদ যেদিন গার্ডকে ছোরা দেখিয়েছিল, সেদিনও ঠিক এমনি দেখাচ্ছিল তার মুখখানা।

একটা ধুলোর ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ল চোখে। অন্ধের মতো চায়ের দোকানটাতেই ঢুকে পড়ল জ্যোতির্ময়। কাঁচপোকার আকর্ষণে আরশোলার পরিত্রাণ নেই—ক্লাস এইট থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত জ্যোতির্ময় তা জেনেছে।

দোকানের মালিক ভালো করেই চেনে নিরাপদকে। তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

তেমনি খসখসে গলায় নিরাপদ বললে, 'আপনার ওই লেডীজ লেখা কেবিনে আমরা একটু বসছি। ঘণ্টাখানেক আমাদের বিরক্ত করবেন না। আর দুটো ফাউল কাটলেট পাঠিয়ে দেবেন।'

দোকানদার কী বললে, শোনা গেল না। তার আগেই নিরাপদ প্রায় জোর করে জ্যোতির্ময়কে কেবিনে এনে ঢোকাল। বললে, 'বোস।' শব্দ করে টেনে দিলে স্ক্রীনটা।

বাইরে আকাশভাঙা বৃষ্টি নেমে এল। ভাগ্যের কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বসে পড়ল জ্যোতির্ময়। বুকের ভিতর দ্রুত স্পন্দন শুরু হয়েছে তার। দুর্বোধ একটা ভয়ঙ্কর নাটক শুরু হয়েছে কোথাও। সে-নাটকে কী তার ভূমিকা সেইটেই সে বুঝতে পারছে না এখনও। এই বৃষ্টির মধ্যেও ছুটে পালাতে পারলে সে বেঁচে যেত—কিন্তু যে-চেয়ারে নিরাপদ তাকে বসিয়ে দিয়েছে—সেখান থেকে উঠবার শক্তি পর্যন্ত তার নেই।

সুইচ টিপে মাথার উপর একটা মলিন আলো জেলে নিয়েছে নিরাপদ। কর্কশভাবে দেশলাই ঘষে সিগারেট ধরিয়েছে একটা। তারপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্যোতির্ময়ের দিকে—কী একটা বলবার জন্য তৈরী হয়ে নিচ্ছে মনে মনে। জ্যোতির্ময় ঘাড় নুইয়ে রেখেছে সামনের ময়লা টেবিলটার উপরে—চায়ের পেয়ালার গোল গোল দাগ পড়েছে, শুকিয়ে আছে মাস্টার্ড আর গ্রেভির রং—একটা পেঁয়াজের কুচি পড়ে আছে এক কোনায়।

বাইরের পৃথিবী বর্ষণমুখরিত। জুড়িয়ে যাচ্ছে ঝলসে-যাওয়া কলকাতার বুক। অসীম অস্বস্তিভরে জ্যোতির্ময় ভাবতে লাগল, একটু পরেই জল দাঁড়িয়ে যাবে ঠনঠনিয়ার মুখে। আর তাকে যেতে হবে পার্কসার্কাসে—সেই বেকবাগানের মোড়ে।

জ্যোতির্ময় একবার তাকিয়ে দেখল পাশের নীল-রঙ-করা দেয়ালটায়। পান খেয়ে চুন মোছা হয়েছে তার এখানে ওখানে। একটি ক্যালেণ্ডারে লাস্যময়ী বোম্বাই তারকা, কাঁচা হাতে কে যেন তার চোখে চশমা আর মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এঁকে দিয়েছে।

তখন কথা বললে নিরাপদ। ছোট ছোট চোখের একটা বন্ধ করে—সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে। খোলা চোখটার উপর দিয়ে সিগারেটের লাল আভাটা জ্বলে গেল।

'তোকে সাবধান করে দিতে চাই জ্যোতির্ময়।'

অকৃত্রিম বিস্ময়ে জ্যোতির্ময় চমকে উঠল।

'ব্যাপার কী? কিছু তো বুঝতে পারছি না।'

'তোকে আমি বত্রিশ নম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।'

'তাতে কী হয়েছে?' তেমনি অগাধ বিস্ময়ে জ্যোতির্ময় বললে, 'ও-বাড়িতে ভীতি-জনক কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আছে, তুই জানিস নে। সেইটে জানাবার জন্যেই পথ থেকে ডেকে আনলুম তোকে। মনে রাখিস ও-বাড়ির উপর চব্বিশ ঘণ্টা আমার চোখ থাকে। আমাকে ফাঁকি দিয়ে বুড়ো কেমন করে মেয়ের বিয়ে দেয়—আমি দেখে নেব। আর তোকেও বলে দিচ্ছি জ্যোতির্ময়, কলকাতা শহরে বিয়ে করবার মতো মেয়ের অভাব নেই। জেনেশুনে তুই সাপের

গর্তে হাত দিস নে।'

জ্যোতির্ময় খাবি খেল বারকয়েক।

'কে বুড়ো? কোন্ মেয়ের বিয়ে? কী আবোল-তাবোল বকছিস তুই?'

একবার থমকাল নিরাপদ। মুখের কঠিন ভঙ্গিটা শিথিল হয়ে এল একটুখানি।

'তুই অখিল ঘোষালের ওখানে যাস নি!'

'কে অখিল ঘোষাল? আমি তাকে চিনি না।'

সামনের আধভাঙা অ্যাশট্রের দুর্গন্ধ সবুজ জলের ভেতরে সিগারেটটা ডুবিয়ে দিলে নিরাপদ। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বারকয়েক আঙুল বাজাল টেবিলের উপর।

'তবে ও বাড়িতে গিয়েছিলি কেন?'

'কাগজে দেখেছিলুম দুখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। আমার এক মামাতো ভাইয়ের জন্য দরকার ছিল। আধঘণ্টা অপেক্ষার পর যোগেশবাবু না কে এলেন; তিনি বললেন ছ মাসের ভাড়া আগাম দিতে হবে, নিজের খরচে হোয়াইট-ওয়াশ করে নিতে হবে—।'

নিরাপদ এইবার হো হো করে হেসে উঠল।

'নাঃ, আর তোকে অবিশ্বাস করা যায় না। যখন যোগেশবাবুর নাম করেছিস, তখন তুই সত্যিই কিছু জানিস নে। কিন্তু আমার অবস্থা কী হয়েছে জানিস? ওই যে কী বলে দড়িতে সাপ দেখা—ঠিক তাই।'

'আমি কিন্তু এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।' ভয়-ভয় গলায় জ্যোতির্ময় বললে, 'এমন একটা রহস্য গড়ে তুলেছিস—'

নিরাপদ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। একটা সস্নেহ প্রশ্রয় ফুটে উঠেছে চেহারায়, দু-চোখে কৌতুক।

'তাহলে তোকে একটা মজার গল্প বলি। বাইরে বাদলা নেমেছে, সময়টাও কাটবে ভালো।'

দুটো ফাউল কাটলেট নিয়ে এল চায়ের দোকানের ছোকরাটা।

'নে, খা।'

জ্যোতির্ময় তবু সহজ হতে পারছিল না। কেমন তেতো লাগছে কাটলেটটা। ভিনিগারটাও বড় বেশি টক। স্কুলে কলেজে নিরাপদর সঙ্গে পাঁচ-ছটা বছর তার মনে পড়ছে। কী করে আলাপ হয়েছিল সে-কথা ভুলে গিয়েছে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিরাপদকে সে যে এড়াতে পারেনি, তা কোনোদিন ভোলবার নয়। নিরাপদ অশ্লীল, নিরাপদ গুণ্ডা। তার চরিত্রের আদিমতার একটা আকর্ষণ আছে, কিন্তু মাত্রাহীনতার জন্যে সেটা বিকর্ষণে পরিণত হতেও সময় লাগেনি। জ্যোতির্ময় পালাতে চেয়েছে—পারেনি।

নিরাপদর কুটিল নিষ্ঠুরতার আতঙ্কে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাকে অনুসরণ করেছে।

কলেজে পা দিয়ে আরও যেন বেড়ে উঠেছিল সে। মেয়েদের ছিল সে বিভীষিকা। ঢিল ছুঁড়ত, চিঠি ছুঁড়ত, অবলীলাক্রমে কদর্য ভাষা ব্যবহার করত, অত্যন্ত নিরীহভাবে ধাক্কা দেওয়ার আর্টটা আশ্চর্য আয়ত্ত করেছিল। কিন্তু এমন সাবধান হয়ে চলত যে, কলেজের আইনের আওতায় সে আসত না। মার্জিত ভদ্র ছেলেরা দু-চারবার প্রতিবাদ করেছে মাত্র—বেশি কিছু বলবার সাহস পায়নি। তারা জানত নিরাপদ ছোরা চালাতে পারে।

জ্যোতির্ময় লজ্জায় মরে থেকেছে। নিরাপদর সঙ্গী সে, পাশাপাশি বসে একসঙ্গে চা খায়। ভদ্র ছেলেরা চিরদিন তাকেও এড়িয়ে গিয়েছে, মেয়েদের চোখ থেকে জ্বলন্ত ঘৃণা কতবার তার মুখে এসে বিঁধেছে তীরের মতো। প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিরাপদকে তবু সে ছাড়তে পারেনি। কাঁচপোকার কাছ থেকে আরশোলার মুক্তি নেই।

তবু মনে মনে সে কাঁচপোকা হতে পারেনি। নিরীহ, শান্ত, ব্যক্তিত্বহীন মানুষ জ্যোতির্ময়। নিরাপদর নিষ্ঠুর শক্তির বাঁধনে একটা গাধাবোটের মতো চিরকাল পিছনে পিছনে থেকেছে তার। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছে ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষার হলে—ইনভিজি-লেটরকে ছোরা দেখিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়েছে নিরাপদ।

তারপর আজ এই দেখা!

বাইরে সমানে বৃষ্টি চলেছে। ঠনঠনের মোড়ে এতক্ষণে জল দাঁড়িয়ে গেল কিনা কে জানে! তাকে আবার অনেক দূরে যেতে হবে—পার্কসার্কাসে সেই বেকবাগানে—

'কি রে, সবটা খেলি নে?'

মুরগীর কচি হাড়টাকে চিবিয়ে গুঁড়ো করতে করতে নিরাপদ বললে, 'অনেকটা পড়ে রইল যে।'

জ্যোতির্ময় চমকে উঠল।

'থাক, আর ভালো লাগছে না।'

'বৃষ্টির মধ্যে আটকে দিলুম, সেইজন্যে মন খারাপ লাগছে—তাই নয়?' চিবনো হাড়ের টুকরোগুলোকে মুখ থেকে প্লেটের উপর ছেড়ে দিলে নিরাপদ—কেমন গা গুলিয়ে উঠল জ্যোতির্ময়ের। রুমাল দিয়ে পরিতৃপ্তভাবে মুখ মুছে নিরাপদ বললে, 'একটা মজার গল্প বলি তোকে—তাহলেই মন ভালো হয়ে যাবে।'

জ্যোতির্ময় নীল-রঙ-করা দেওয়ালটার দিকে চোখ ফেরাল। চশমা আর ফ্রেঞ্চকাট-পরা অভিনেত্রীটির দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওর সঙ্গে তার খুব চেনা কার যেন মিল আছে। অন্যমনস্ক দৃষ্টি সেই দিকেই মেলে রাখল কিছুক্ষণ।

"ওই বাড়ির তেতলার দুখানা ঘর নিয়ে থাকে বুড়ো অখিল ঘোষাল। সে আর তার ভাইঝি জ্যোৎস্না।"

নিরাপদর গল্প শুরু হয়েছে। জ্যোতির্ময়ের দৃষ্টি টেবিলের উপর তার আধখাওয়া কাটলেটের প্লেটে ফিরে এল।

"জ্যোৎস্নাই বটে—বুঝলি ? নামের সঙ্গে চেহারার এমন মিল আর দেখা যায় না। একটা ঠেলায় মালপত্র নিয়ে, রিকশ করে যেদিন ওরা এই বত্রিশ নম্বরে এসে নামল, সেদিনই আমি ঠিক করে নিলুম ওই মেয়েটাকে আমার চাই। কী রঙ—কী চোখ-মুখের গড়ন। আমার চোখের সামনে দিয়ে ফস করে যদি কোনদিন বেহাত হয়ে যায়—তা হলে সারাজীবন আমার হাত কামড়াতে হবে।

আলাপ করে নিলুম দু'ঘণ্টার ভেতরেই। দেখলুম বুড়ো ভারী হাবাগোবা ভালো মানুষ, সাত-পাঁচ বোঝে না। কুষ্টিয়ার ওদিকে কোথায় বাড়ি ছিল, তা সে তো এখন পাকিস্তান। বুড়োর থাকবার মধ্যে এই ভাইঝি। কী সরকারী চাকরি করত, এখন রিটায়ার করেছে। কলকাতার আশপাশে একটুখানি জমি কিনে এক টুকরো বাড়ি করবে এই তার ইচ্ছে।

বললুম, 'পাড়ায় যখন একবার এসেছেন তখন আর ভাববেন না। আমরা সবাই আছি—যা সাহায্য চান করব। আমার এক মামা জমির দালালি করে—সে সস্তায় ভালো জায়গা জুটিয়ে দেবে আপনাকে।'

বুড়ো ভারী খুশী হল। বললে, 'বোস বোস বাবা—চা খাও।'

চা করে দিলে মেয়েটিই। বলব কি ভাই সে চায়ের স্বাদ। অমন চা জীবনে কোনদিন খাইনি।

বুড়োকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার ভাইঝি স্কুলে পড়ে না ?'

বুড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বললে, 'পড়ত। ক্লাস এইটে উঠেছিল। কিন্তু আমিও রিটায়ার করলুম আর গত বছর থেকে ওর পড়াও বন্ধ হয়ে গেল। বলে, জ্যাঠামশাই, তোমার শরীর খারাপ—সারা দুপুর তোমাকে একা বাড়ি রেখে আমি থাকতে পারব না।'

বললুম, 'সে তো ঠিক কথাই, ভাবনা হতেই পারে। প্রাইভেট পড়ান না কেন ?'

বুড়ো বললে, 'জানাশোনা ভাল লোক পেলে রাখি। কি জানো, দিনকাল ভাল নয়, মেয়েটাও বড় হয়ে উঠেছে—'

মাথা নেড়ে বললুম, 'যা বলেছেন। কাউকে আর বিশ্বাস করার জো নেই আজকাল। এই তো আমিই একজন গ্র্যাজুয়েট—সন্ধ্যেয় আমার বিশেষ কোন কাজ নেই, কিন্তু আমাকেই যে আপনি বিশ্বাস করবেন—'

বুড়ো বললে, 'তোমাকে কেন বিশ্বাস করব না বাবা—দেখেই বুঝেছি তুমি বড় ভালো ছেলে।'"

নিরাপদর ছোট ছোট হলদে চোখ দুটো কৌতুকে কুটিল হয়ে উঠল: "তারপর একটু

থেমে বুড়ো বললে, 'কিন্তু টাকা পয়সা তো আমি তেমন—'

'টাকার জন্যে ভাববেন না, আপনাদের আশীর্বাদে বাবা কিছু রেখে গেছেন আমার জন্যে। তবু আমার সম্বন্ধে কিছু না জেনে—'

বুড়োর গলা কেঁপে উঠল।

'জানবার দরকার নেই বাবা। বুড়ো হয়ে গেলুম—মানুষ আমি চিনি।'"

'দারুণ হাসি পেল—বুঝলি? বুড়ো নাকি মানুষ চেনে। একেই বলে শালুক চেনা। একটা মজা দেখবি জ্যোতির্ময়—মানুষ চেনার কথা তারাই সব চাইতে বেশি করে বলে, যারা কোনদিন মানুষ চিনতে পারে না।'

নিরাপদর কথায় ছেদ পড়ল। দোকানের ছোকরাটা এসে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেল, দু পেয়ালা চা রেখে গেল সামনে।

ধীরে সুস্থে চায়ে চুমুক দিলে নিরাপদ, সিগারেট ধরাল, এক চোখ বুজে তাতে টান দিলে, খোলা চোখটার উপর লালচে আলোর ঝলক দুলে গেল।

"বুঝলি, জমিয়ে ফেললুম।

এ-সব কাজে কী করে এগোতে হয় সে আমি জানি। পুরো একটি মাস একেবারে কপি-বুক-মার্কা ভালো ছেলে হয়ে কাটালুম। এক বন্ধুকে জমির দালাল সাজিয়ে আনলুম। সে এমন সব জমির খবর দিতে লাগল যা বাংলা দেশের কোথাও নেই। ধর—কলকাতা থেকে চার মাইলের মধ্যে—সামনে গঙ্গা, উঁচু বাস্তু জমি, পাকা রাস্তার ধারে—দু মিনিটের বাস রুট, বাজার তিন মিনিট—ইলেকট্রিক আর জলের কল পাওয়া যাবে। তিনশো টাকা করে কাঠা—

বুড়ো লাফাতে লাগল।

বন্ধু বললে, 'দাঁড়ান, আরও ভালো, আরও সস্তার জমি খোঁজ করছি।'

জমির খোঁজ চলতে লাগল, আমিও জমাতে লাগলুম।

কী করে? সে-সব তোকে বোঝানো যাবে না। তুই একেবারে গবেট ভালো-মানুষ—পয়লা নম্বরের ভিতুর ডিম। শুধু একটা কথা বলে রাখি। এই পনের-ষোল বছরের মেয়েদের মনটা ভারী কাঁচা—দুর্বল। এ-সময়ে ওদের চোখে নতুন রঙ লাগে। সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে—সবচেয়ে বেশি ঠকে। তার উপর বাড়িতে মা-দিদিরা না থাকলে তো কথাই নেই। আরও দু-এক বছর পেরিয়ে গেলে হুঁশিয়ার আর শক্ত হয়ে যায়—দুনিয়াকে চিনতে পারে। তাই নরম থাকতেই ঘা দিতে হয়।"

নিরাপদ হাসল। কুৎসিত—অশ্লীল হাসি।

চায়ে চুমুক দিচ্ছিল জ্যোতির্ময়—পেয়ালা নামিয়ে রাখল। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বোধ করছে শরীরের মধ্যে। বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে—ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলেও হয়ত বাস

পাওয়া যেতে পারে এখনও—তবু সে উঠতে পারল না। নিরাপদকে অস্বীকার করবার শক্তি তার নেই।

নিরাপদ বললে, "পড়ান তো ছাই—কাই বা জানি। টুকে স্কুল-ফাইন্যাল তরেছি—আমার বিদ্যের দৌড় সবই তোর জানা। দু-চার কথার ফাঁকে ফাঁকে চালালুম ফিলিম-টিলিমের প্রেমের গল্প। মেয়েটাও দেখলুম জ্যাঠার মতোই ভালোমানুষ, দুদিন যেতে না যেতেই চোখের উপর ওর ঘোর লাগল। বুঝতে পারলুম, আমার আগে ও কোন পুরুষের এত কাছে আসেনি।

হাতে হাত রাখলুম একদিন—ছাড়িয়ে নিলে। কিন্তু আমার বুঝতে দেরি হল না, শিকার ফাঁদে পা দিয়েছে।

তারপর বললুম, 'জ্যোৎস্না, তোমাকে ভালোবাসি।'

কেঁদে অস্থির হল মেয়েটা।

বললুম, 'তোমায় বিয়ে করব।'

চোখের জল মুছে বললে, 'জ্যাঠা যদি রাজি না হন?'

'রাজী হবেন। আমাকে খুব পছন্দ করেন।'

পনের বছরের কাঁচা মন—বুঝলি? ওদের বিশ্বাস করাতে কতক্ষণ? তারপর নতুন খেলা শুরু হল আমাদের। ওর খাতার পাতায় আমি ওকে চিঠি লিখি—ও তার জবাব দেয়। দস্তুরমতো সব লভ্ লেটার।

বুড়োকে বিয়ের কথা বললে তখুনি সব কেঁচে যাবে তা জানি। অনেক কীর্তিই তো করেছি—বুড়ো একটু এগোলেই সে-সব আর চাপা থাকবে না। জানবে আই. এ. পরীক্ষার সময় আমাকে বের করে দিয়েছিল, জানবে ভগ্নীপোতের সংসারে আমি গল-গ্রহ, আমার আসল রোজগার ফ্ল্যাশ বোর্ডে আর ছেলেমেয়েদের ব্যাপারেও—কী বলে—আমার ঠিক সুনাম নেই। তাই যখন প্ল্যান আঁটছি একদিন জ্যোৎস্নাকে নিয়ে রাতারাতি কেটে পড়ব, তখন সব টের পেয়ে গেল বুড়ো। কে যে লাগালে জানি না—জানতে পেলে তার মাথাটা ফাঁক করে দিতুম।

বুড়ো পরিষ্কার বললে, 'তুমি আর এখানে এস না।'

আমিও মুখোস খুলে ফেললুম। হেসে বললুম, 'আমাকে তাড়াতে চাইলেও পারবেন না স্যার। আপনার ভাইঝি আমার লভে পড়েছে। আমাকে বিয়ে করবে।'

বুড়ো খেপে গেল। এ সব ভালোমানুষ যখন চটে, তখন সে ভারী মজা হয় দেখতে। দু চোখে আগুন জ্বলতে লাগল। টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল মাথার চুল। মনে হল একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

বললে, 'আমার ভাইঝি আমার মতোই ভুল করেছিল। কিন্তু ঘোষাল বাড়ির মেয়ে

ও—ভুল শোধরাতে ওর সময় লাগবে না। তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার আগে ওকে কেটে আমি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব।'

বললুম, 'গঙ্গায়ই ভাসাতে হবে স্যার। সাতখানা লভ-লেটার আছে আমার কাছে—দেখি কেমন করে ভাইঝির বিয়ে দেন আপনি। তা ছাড়া হাজার দিকে আমার চোখ আছে—দেখি কেমন করে আপনি পার পান।'

বুড়ো পাথর হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বললে, 'পুলিসে খবর দেব।'

'দিন। সাতখানা চিঠিও আমি দেখাব তাদের। তারা বুঝবে এক হাতে তালি বাজেনি। আমার কী স্যার—আমি তো দু-কান-কাটা—যা কিছু কেলেঙ্কারি সে আপনারই।'

পক্ষাঘাতের রোগীর মতো থরথর করে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল বুড়ো। আমি বেরিয়ে এলুম।

সে প্রায় দু বছরের কথা। তারপর থেকে শুরু হল আসল খেল্।"

নিরাপদ একবার থামল। চা-টা নিঃশেষ করেছে জ্যোতির্ময়—কিন্তু গলার ভিতরটা যেন পাথরের মতো শুকনো।

'সেই জ্যোৎস্না? সে তোকে ভালোবাসে এখনও?'

'পাগল! পনের বছরের মেয়ে—বুঝিস না। তায় যাকে বলে একেবারে শুভ-কণ্ডাকৃট মার্কা। এক ঘায়েই নিজেকে সামলে নিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরয় না পর্যন্ত —জানলায় আসাও ছেড়ে দিয়েছে। একদিন কেবল চোখে চোখ পড়েছিল—বাপরে, কী দৃষ্টি? এমনভাবে শিউরে উঠল যেন কুষ্ঠরুগী দেখেছে একটা। বটে এত ঘেন্না! আমিও বলেছি—দাঁড়াও চাঁদ, যাবে কোথায়। এই নিরাপদ কাঞ্জিলাল বেঁচে থাকতে কার গলায় তুমি মালা পরাও দেখে নেব।

হাজার চোখ মেলে রেখেছি বাড়ির উপর। মেয়ে দেখতে যারাই এসেছে তাদেরই আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছি লভ্-লেটারের কথা—বলেছি, ডেঞ্জারাস্ মেয়ে, মশাই! যারা বিশ্বাস করেনি, দু-একখানা চিঠিও দেখিয়েছি তাদের। রূপসী মেয়ে দেখে একজনের মুণ্ডু ঘুরে গিয়েছিল—কিছুতেই বশ মানে না। শেষে বলতে হল, বিয়ের রাত্তিরেই যদি বৌকে বিধবা না করতে চাও তাহলে ভালোমানুষের মতো কেটে পড়ো!'

নিরাপদ শেষ টান দিলে সিগারেটে। আবার তার এক চোখে সেই হিংস্র আলোর ছটা। জান্তব—বীভৎস। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল জ্যোতির্ময়ের।

'কিন্তু এই ভাবে তুই ওই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবি শেষ পর্যন্ত!'

'অসম্ভব নয়, কিছুতেই অসম্ভব নয়। বুড়ো বোধ হয় একটু একটু নরম হতে শুরু করেছে। দু-একজনকে নাকি বলেওছে, নিরাপদ যদি বদখেয়ালগুলো ছাড়ে—একটু ভদ্র হয়—'

জ্যোতির্ময় তাকিয়ে দেখল নিরাপদর দিকে। মূর্তিমান শয়তান বসে আছে সামনে। বড় বড় ব্রণের দাগে চিহ্নিত মুখ। হলদে চোখ ছুটোয় আদিম উল্লাস। নরখাদকের মতো ছুটো দাঁত বেরিয়ে আছে কুৎসিত ভাবে। হঠাৎ ইচ্ছে করল প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে সে নিরাপদর দাঁত ছুটোকে নামিয়ে দেয়।

কিন্তু জ্যোতির্ময় ঘুষি বসাতে পারল না। তার বদলে বললে, 'কিন্তু জ্যোৎস্না তোকে শ্রদ্ধা করতে পারবে কোনদিন?'

'বৌয়ের কাছ থেকে শ্রদ্ধা তুই লাথিতেই আদায় করে নেব।'

আর পারল না জ্যোতির্ময়। আর সহ্য করা অসম্ভব। সারা শরীরে তার আগুনের জ্বালা জ্বলছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আর বসতে পারছি না। আমার দেরি হয়ে গেছে।'

'যাবি? কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে যে।'

'পড়ুক। ট্যাক্সি ডেকে নেব একটা।' জ্যোতির্ময় বেরিয়ে পড়ল।

ট্যাক্সি নয় একরাশ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, জল ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলল। এতদিন পরে তার মনে হল কাপুরুষতারও একটা সীমা আছে। এইবার নিরাপদর ভয়টা তাকে জয় করতে হবে। এইবার একটা জবাব দিতে হবে তার। যদি না পারে, তবে তার মতো অপদার্থ ক্লীবের আত্মহত্যা করা উচিত।

খুব ছেলেবেলার স্মৃতি মনে এল একটা। তাদের পাড়ার ডোমেরা বাঁশ ডলে ডলে শুয়োর মারছে! তিলে তিলে আশ্চর্য নিষ্ঠুর সেই হত্যা। আকাশ বাতাস জন্তুটার দুঃসহ আর্তনাদে আবিল হয়ে গিয়েছে।

পরদিন সকালেই অখিল ঘোষালকে বত্রিশ নম্বরের ঠিকানায় চিঠি লিখেছিল জ্যোতির্ময়। সব খুলে লিখেছিল—একটি কথারও আড়াল রাখেনি।

হাসপাতালের কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়েছে পুলিস। ডাক্তারও। আর কেউ নেই। কেবল জ্যোতির্ময়ের পায়ের উপর মুখ লুকিয়ে কাঁদছে জ্যোৎস্না। সে-কান্নায় যন্ত্রণা—লজ্জা—কৃতজ্ঞতা।

না, নিরাপদর নাম সে করেনি। ও সাতখানা চিঠিকে সে কিছুতেই আদালতে আসতে দেবে না। নিরপরাধ ভুলের ওই লজ্জাটুকু অন্ধকারেই লুকিয়ে থাক।

আর নিরাপদ? সে আজ জেনেছে—তাকে তুচ্ছ করবার শক্তি এসেছে জ্যোতির্ময়ের। জেনেছে—তার শেষ অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। একবার অ্যাসিড ছুঁড়েছে—কিন্তু দ্বিতীয়বার সামনে এসে দাঁড়াবার শক্তি নেই তার। এদের সীমা ওই পর্যন্তই। জ্যোতির্ময় সস্নেহে হাত নামাল জ্যোৎস্নার মাথার উপর।

উত্তম পুরুষ

সামনে আরো পুরো ছ ক্রোশ রাস্তা।

মানিক সর্দারের পা আর চলতে চাইছিল না। ক্রমাগত মনে হচ্ছিল, পেছন থেকে কে একটা শক্ত চাপ দিয়ে তার মেরুদণ্ডটাকে বাঁকিয়ে দিতে চাইছে ধনুকের মতো, হাঁটুর তলা থেকে পা দুটো আলগা হয়ে খসে পড়তে চাইছে। তৃষ্ণায় একরাশ কাঁকর থর থর করছে গলার ভেতরে।

পেছনে আসছে পনেরো বছরের ছেলে বলাই। তার দিক থেকে খুশির অন্ত নেই। জীবনে এই প্রথম সে বাপের সঙ্গে কুসুমডাঙার হাটে এসেছে। এই ছ মাইল পথ—অনেকখানি আকাশ—শাল-পলাশের বন—সীমান্তরেখায় একটা বিশাল বন্য মহিষের মতো শুশুনিয়া পাহাড়—সব তার কাছে নতুন। আর এক পৃথিবীর সংবাদ।

পথে আসতে আসতে একটা গাছ থেকে কয়েক ছড়া পাকা তেঁতুল সংগ্রহ করেছিল বলাই। হাটের সওদা থেকে খানিকটা নুন বের করে নিয়ে তাই দিয়ে মনের খুশিতে সে তেঁতুল খাচ্ছিল আর বিচিগুলো দিয়ে কখনো একটা গিরগিটি, কখনো বা একটা শালিক পাখিকে তাক করবার চেষ্টা করছিল।

হাতের বল্লমটার উপর ভর দিয়ে মানিক সর্দার দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কী হল বাবা?'

'একটু জল খাব। তেষ্টায় বুকটা যেন পাথর হয়ে গেছে।'

নদী পাশেই। কচ্ছপের পিঠের মতো বড় বড় পাথর চারিদিকে ছড়ানো আর মোটা মোটা দানার একরাশ বালি কোনো পদ্মগোখরোর খোলসের মতো আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে অন্তহীন মাঠের মধ্যে এলিয়ে রয়েছে। ওই বালির রেখাটাই নদী। কিন্তু এক বিন্দু জল কোথাও নেই—শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বিকেলের সোনাঝুরি আলোয় নদীটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল মানিক সর্দার। মাঝখানটায় খানিক জায়গা যেন ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে—খুঁড়লে হয়তো জল পাওয়া যাবে।

বলাই এদিক ওদিক তাকালো।

'জল কই বাবা।'

'পাওয়া যাবে বোধহয় ওখানে। আয় খুঁজে দেখি।'

দুজনে নদীর ভেতরে নেমে এল। হ্যাঁ, জল এখনো আছে। পায়ের চাপে চাপে ভিজে বালি থেকে জল বেরিয়ে আসতে লাগল। বল্লমের দরকার হল না—হাত দিয়ে খানিক খুঁড়তেই বালি মেশানো জলে ভরে উঠল গর্তটা।

বালি খানিক খিতিয়ে এলে আঁজলা আঁজলা করে খানিকটা জল খেল মানিক। বাপের দেখাদেখি বলাইও খেল।

বড় দেখে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে মানিক বললে, 'পা আর চলছে না—একটু-খানি জিরিয়ে যাই।'

বিকেলের সোনাঝুরি রোদে ঝিকমিক ঝিলমিল করছিল চারদিক। হাওয়াটা এখনও সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়নি—নিভে আসা হাপরের বাতাসের মতো গরম। ওপারে সারবাঁধা কয়েকটা পলাশ গাছ—কালো কালো কুঁড়ি ধরেছে তাতে, দিন কয়েক বাদেই ফুলের আগুন জ্বলবে। একটা পাপিয়া ডাকছে কোথাও! বসন্ত আসছে।

কিন্তু বসন্তের রঙ কোথাও নেই মানিক সর্দারের মনে। ওই বিশাল বন্য মহিষের মতো শুশুনিয়া পাহাড়ের কালো ছায়াটা ভাসছে চোখের সামনে। আধি চাষের ধান ফুরিয়ে গেছে—আজ কুসুমডাঙার হাটে একটা বলদ বেচে দিয়ে আসতে হল। বাকিটাও বেশিদিন থাকবে না—নতুন ফসল এখনো অনেক দূরে। তারপরে উপোস। তারও পরে—

মানিক সর্দার বসে রইল ভিজে বালির দিকে তাকিয়ে। খোঁড়া গর্তটা বুজে আসছে একটু করে। আরো এক মাস—কিংবা দু মাস বড়জোর। তারপরেই এ জল পালিয়ে যাবে পাতালে। কোদাল দিয়ে সাত হাত কোপালেও এক আঁজলা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, শুধু মুঠো মুঠো নুড়ি আর কাঁকর উঠে আসবে।

একটা বলদ গেল! পরেরটাও যাবে। তারপরে নুড়ি আর কাঁকড়।

এবারে আর আশা নেই। কিছুই করবার উপায় নেই। না—একটা উপায় এখনো আছে। গত বছর খাদেম আলি মোল্লা যা করেছিল তাই। তারও হালের বলদ ছিল না—কিন্তু বলদের দড়িটা ছিল। গোয়ালঘরের আড়ায় সেই দড়ি বেঁধে নিজের গলায় দিয়ে ঝুলে পড়েছিল।

পায়ের নিচের দিকটা খসে পড়ে যাচ্ছে হাঁটু থেকে—পেছন থেকে কে যেন সমানে চাপ দিচ্ছে কাঁধের ওপর: যেন যেমন করে হোক তার মেরুদণ্ডটাকে মটকে ভেঙে ফেলবে। তৃষ্ণায় আবার জ্বালা করে উঠছে গলার ভেতর। কিন্তু নতুন করে উঠে গিয়ে আবার খানিকটা জল খাওয়ার মতো শক্তি, কিংবা উদ্যম কিছুই খুঁজে পেলো না মানিক সর্দার।

ঘোলা ঘোলা চোখে চেয়ে দেখল চঞ্চল বলাই একটু দূরেই একটা লাটা বনে গিয়ে লাটা কুড়োচ্ছে—বোধহয় কুঁচেরও সন্ধান পেয়েছে ওখানে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গত বছর এমনি কোনো একটা জায়গাতেই একটা শঙ্খচূড় সাপ দেখেছিল সে: বসন্তের হাওয়া দিয়েছে এখন—এই হাওয়াতেই সাপেরা শীতের ঘুম থেকে জেগে ওঠে, ক্ষিদেয় রুক্ষ হয়ে

থাকে মেজাজ—অকারণে আক্রমণ করতে চায়। একবার মনে হল বলাইকে সে ডাক দেয়—কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরুতে চাইল না।

লড়তে পারত মানিক সর্দার—এ অবস্থাতে লড়তে পারত। চাষের সময় না আসা পর্যন্ত মজুর খাটতে পারত গ্রামে গ্রামে ঘুরে, না হয় আট মাইল দূরের স্টেশনে গিয়ে কুলিগিরি করেও কয়েকটা পেট চালিয়ে নিত। কিন্তু গত বছর সেই যে সান্নিপাতিক জ্বর গেল—তা থেকে কোনোমতে বেঁচে উঠলেও শরীরে আর কোনো বস্তু রেখে যায়নি। কী ভাবে এ বছরে চাষ করেছে তা কেবল ভগবানই জানেন আর সে জানে।

তবু তখন কিছু চাল দিয়েছিল মহাজন—পেট তখন ভরা থাকত। কিন্তু এখন? আধপেটা—না খেয়ে?

শুধু যদি আর একটু দাঁড়াতে পারত বলাই। আরও একটু বড় হত। আর খানিকটা চওড়া-চিতেন হত বুক, আর একটু জোর থাকত হাতে। যদি আর একটু বুঝতে পারত যে, আগ বাড়িয়ে ছুনিয়ার টুটি চেপে ধরতে না পারলে ছুনিয়াই মানুষের গলা টিপে ধরে।

কিন্তু পনেরো বছর বয়সেও ছেলেটা একেবারে ছেলেমানুষ। মাইতিদের বাড়িতে কলের গান শুনেছে—সেই গান গুন গুন করে রাতদিন। একটা কাজ করতে বললে সাতবার ভুলে যায়—এখনো বনে-বাদাড়ে কুড়িয়ে বেড়ায় নীলকণ্ঠ পাখির পালক—এখনো কোঁচড় ভরে নিয়ে আসে লাটা আর কুঁচফল! বলাই এখনো লড়তে শিখল না।

পলাশ গাছের ওপর সোনাঝুরি রোদ লাল হয়ে এল। নদীর মাঝখানে গর্তটা একেবারে বুজে গেছে—একটুখানি বালিজল তির তির করছে সেখানে। গরম হাওয়ায় কোত্থেকে একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে মানিক সর্দারের গায়ে পড়ল—মনে হল কার একটা খরখরে কর্কশ হাতের ছোঁয়া এসে লেগেছে। চমকে উঠল মানিক সর্দার—বল্লমে ভর করে উঠে দাঁড়াল।

'বলাই!'

'আসছি বাবা।'

বলাই ফিরে এল। শুধু লাটা নয়—গিলেও পেয়েছে গোটা কয়েক।

'চল্ বাপ্, দু'কোশ রাস্তা আছে এখনো।'

দু ক্রোশ রাস্তা। লাঠি নিয়ে তিন লাফে পেরিয়ে যেত একসময়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গোটা শুশুনিয়া পাহাড়টাই যেন ডিঙিয়ে যেতে হবে তাকে। বুকে হাত চেপে কখন যে পথের মাঝখানে বসে পড়বে সে-কথা সে নিজেই জানে না।

তার ওপর সামনে জঙ্গলটা আছে। জায়গা ভালো নয়। চোর ডাকাতের ভয় মানিক সর্দারের নেই—তার কাছে তারা আসবে না। কিন্তু ওই জঙ্গলে প্রায়ই বুনো

জানোয়ার বেরোয়। ভালুক আসে, লক্কড় ঘোরে, দু-একটা চিতা বাঘেরও খবর মেলে। লোকের মুখে শুনেছিল, কাছাকাছি কোথায় একটা চিতা নাকি মানুষখেকো হয়ে উঠেছে।

সেই জন্যেই বল্লমটা আনা। কিন্তু কতখানি কাজে লাগবে? পিঠের ওপর সেই প্রকাণ্ড একটা নিষ্ঠুর চাপ—হাঁটু দুটো নড়বড় করছে ক্রমাগত। এই বল্লম নিয়ে কী করবে মানিক সর্দার? বাঘ যদি সত্যিই আসে—সে কি এ দিয়ে ঠেকাতে পারবে তাকে?

কোঁচরের ভেতরে লাটা আর গিলেগুলোকে ঝমঝম করতে করতে বলাই আসছিল। হঠাৎ তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলায় কলের গান থেকে শেখা গুনগুনানিকে সে হাওয়ায় ছড়িয়ে দিলে।

বিরক্ত হয়ে একটা ধমক দিতে গিয়েও থমকে গেল মানিক সর্দার। বেশ তো গায় ছেলেটা—সুন্দর সুরেলা গলা। একেবারে নিখুঁতভাবে তুলেছে কলের গান থেকে। যদি পৃথিবীটা এমন কঠিন জায়গা না হত—যদি বাঁচবার জন্যে এমন করে ফোঁটায় ফোঁটায় বুকের রক্ত শুকিয়ে না যেত, তাহলে—

'ও বন্ধু রে—
সোনার খাটে বসো তুমি রূপার
খাটে পাও—'

সোনার খাট—রূপোর খাট! আর একবার গানটাকে থামিয়ে দিতে চাইল মানিক সর্দার, কিন্তু পারল না। একটু একটু করে-সন্ধ্যে-নেমে-আসা মাঠের ওপর দিয়ে বলাইয়ের গান দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে যেতে লাগল, আর হাতের বল্লমটার ওপর ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলতে লাগল মানিক সর্দার।

এখনো দু ক্রোশ পথ পড়ে আছে সামনে। শুশুনিয়া পাহাড় ডিঙোনোর চাইতেও দুর্গম।

পুরনো পেতলের মতো জ্যোৎস্নার রঙ। দু পাশের গাছের পাতার ছায়া তার ভেতরে কলঙ্কের দাগের মতো কাঁপছে। হাওয়ায় হাওয়ায় কিশলয়ের গন্ধ। ভারী সুন্দর লাগছে জঙ্গলটাকে।

কিন্তু জঙ্গলের এই রূপ—কিশলয়ের এই গন্ধকে ছাপিয়ে আর একটা গন্ধে হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল মানিক সর্দার। সে গন্ধ তার অচেনা নয়। এমনি বনের পথ দিয়ে যেতে যেতে কখনো কখনো এই রকম গন্ধের উৎকট উচ্ছ্বাস ভেসে এসেছে, আর—

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মানিক সর্দার। এক হাতে তুলে ধরলে বল্লম আর এক হাতে খপ করে চেপে ধরলে বলাইয়ের কাঁধটা।

'কী হল বাবা?'

'চুপ! বাঘ!'

বাঘ! একবার শিউরে উঠেই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বলাই।

শিরশিরে হাওয়াটাও যেন আতঙ্কে নিশ্চুপ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে পুরনো পেতলের মতো জ্যোৎস্নাটা ছায়ার কলঙ্ক মেখে কাঁপতে লাগল অল্প অল্প। মহুয়ার একটা ডাল এগিয়ে এসেছিল ওদের মাথার উপর—মনে হল মৃত্যুর কতকগুলো ধারালো নোখ যেন ছোঁ মারবার জন্যে উদ্যত হয়েছে!

কয়েক মুহূর্ত কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কোথাও। থেকে থেকে ঝিঁঝি ডাকছিল এতক্ষণ, সেটাও থমকে গেছে আপাতত। শরীরের শিরাগুলোকে টান টান করে মানিক সর্দার অপেক্ষা করতে লাগল।

'বাবা চলো, আমরা দৌড়ে পালিয়ে যাই—' শুকনো স্তিমিত গলা শোনা গেল বলাইয়ের।

'পালাতে গেলেই পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর। তখন আর কিছু করা যাবে না।'

আরো কিছুক্ষণ প্রতীক্ষায় কাটল। তারপর সতর্ক পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল ডানদিকের ঝোপের ভেতরে। বাঘও সুযোগের অপেক্ষা করছে। মানিকের হাতের বল্লমটা দেখেছে কিনা কে জানে—কিন্তু হঠাৎ আক্রমণ করার মতো সাহস পাচ্ছে না।

বলাইকে এক হাতে টেনে পিঠের দিকে সরিয়ে দিলে মানিক সর্দার। দুর্বল ক্লান্ত শরীরে কোথা থেকে একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র শক্তির জোয়ার এসেছে। বল্লম ধরা হাতের পেশী থরথর করে কাঁপছে—চোখ দুটো জ্বলে উঠছে দপদপ করে। আবার বাতাস বইল। কিন্তু কিশলয়ের গন্ধ পাওয়া গেল না—ভেসে এল বাঘের গন্ধের বীভৎস ঝলক।

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট প্রতীক্ষার পরে ডানদিকের ঝোপের উপর সতর্ক চোখ রেখে একটু একটু করে এগোতে লাগল মানিক—এক হাতে বলাইকে টানতে লাগল পেছন পেছন। বাঘ যদি লাফিয়ে পড়ে—তা হলে সোজা তাকে পড়তে হবে এই বল্লমের ওপরে। যদি দুটো-একটা থাবার আঁচড় লাগে, তাহলে সেটা তার ওপর দিয়েই যাবে, বলাইকে ছুঁতেও পারবে না।

একটু একটু করে দুজনে এগোতে লাগল—মানিকের চোখ আর বল্লম স্থির হয়ে রইল জঙ্গলের দিকে। বাঘই ভুল করেছে। গাছের ওপর থেকে যদি লাফ দিয়ে পড়ত তাহলে কিছু আর করবার ছিল না। কিন্তু ডানদিকে এখন শুধুই ঝোপ—একটা গাছও নেই। আর গাছ থাকলেও আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাবে মানিক সর্দার।

ওরা আস্তে আস্তে এগোতে লাগল—আর তার সঙ্গে ঝোপের মধ্যেও চলল সতর্ক পদচারণা। পাতার খস্ খস্ শব্দে বোঝা যাচ্ছিল বাঘও এগিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

অসীম হিংস্রতায় দাঁতে দাঁত চাপল মানিক সর্দার। একবার একটুখানি দেখতে পেলে হয়। বাঘকে কিছু করতে হবে না—তার বল্লম বিঁধিয়ে দেবে বাঘের পাঁজরায়। কিন্তু বাঘও চিনে নিয়েছে তার সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে। সুযোগ সেও দেবে না। আড়ালে আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে এমনিভাবেই চলতে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে; তারপর যে মুহূর্তে দেখবে শত্রু এতটুকু অসতর্ক হয়েছে—তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়বে তার ওপরে।

প্রায় দশ মিনিট ধরে এইভাবে চলল সুযোগের অপেক্ষা। অসহ্য মানসিক পীড়নে মাথার শিরাগুলো প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে মানিক সর্দারের। সামনে প্রায় আরো দুশো গজ জঙ্গল। এইটুকু পেরোতে পারলেই ফাঁকা মাঠ—একবার মাঠে গিয়ে পৌঁছোতে পারলে বাঘ আর তার সামনে আসতে পারবে না। শুধু একটি বাঘ কেন—তখন সারা দুনিয়ার সমস্ত বুনো জানোয়ারের সঙ্গেই লড়বার জন্যে তৈরী হয়ে আছে মানিক সর্দার।

বাতাসটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। বাঘের সাড়া পেয়েই ঝিঁঝিরাও ডাক থামিয়েছে হয়তো। শুধু বাঘের পায়ের খসখসানি ছাড়া আর এতটুকু শব্দ নেই কোথাও, যেন সমস্ত জঙ্গলটা নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে আছে—মানুষ আর জানোয়ারের এই যুদ্ধের ফলাফলটা তারা দেখতে চায়।

'বাবা—' বলাইয়ের মুমূর্ষু গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

চাপা গর্জনে মানিক সর্দার বললে, 'চুপ!'

পুরনো পেতলের মতো জ্যোৎস্নার ওপর গাছের পাতার কলঙ্ক কাঁপছে। শুধু ঝোপের ভেতরে একটা মাত্র বাঘই না, যেন সমস্ত জঙ্গলটার ওপরেই কে যেন একটা বিশাল চিতা বাঘের চামড়া বিছিয়ে রেখেছে। দুদিন পরে এখানে মহুয়া পাকবে—পলাশের রঙে লালে লাল হয়ে যাবে সব—দুপুরের ঝিমঝিমে রোদে এখান থেকে চলতে চলতে নেশা ধরে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই জঙ্গলে রূপ নেই, বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, কিছুই নেই। শুধু এক-একটা উৎকট গন্ধের ঝলকে মৃত্যু তার বীভৎস অস্তিত্বকে ঘোষণা করছে—শুধু ঝোপের ভেতরে ক্ষুধিত বাঘের চোখ নিষ্ঠুর আদিমতায় ধ্বক্ ধ্বক্ দপ্ দপ্ করে উঠছে।

এ প্রতীক্ষা অসহ্য। মানিক সর্দারের মাথার শিরা ছিঁড়ে যেতে লাগল। যা হোক কিছু হয়ে যাক—এই মুহূর্তেই হয়ে যাক। একবারের জন্যে একটুখানি বেরিয়ে আসুক বাঘ—যদি সাহস থাকে, মরদের মতো মুখোমুখি দাঁড়াক। তারপর প্রমাণ হয়ে যাক তার বল্লমের ধার বেশি, না বাঘের দাঁতের জোর!

'বাবা, আমার ভয় করছে—' বলাইয়ের ফোঁপানি শোনা গেল।

মানিক সর্দারের ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে গেল দপ করে। পনের বছর বয়স হল—কিন্তু এখনো মানুষ হল না ছেলেটা। আজ পঞ্চাশ বছর বয়েস—অসুস্থ জীর্ণ শরীর নিয়ে যখন সে বনের সব চাইতে হিংস্র শত্রুর সামনে রুখে দাঁড়িয়েছে—তখন তার পিঠের আশ্রয়ে

থেকেও একটা ছোট মেয়ের মতো ভ্যান্ ভ্যান্ করছে বলাই। মানিকের ইচ্ছে করতে লাগল, একটা প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দেয় বলাইয়ের গালের ওপর।

'চুপ কর্—চুপ কর্, মেয়েমানুষ কোথাকার।' তীব্র চাপা গর্জন করে উঠল মানিক।

আবার সেই বাঘকে মুখোমুখি রেখে এগিয়ে চলা। আবার সেই স্নায়ুছেঁড়া প্রতীক্ষার পালা। ঝোপের ভেতরে বাঘের সতর্ক পদসঞ্চার। দুশো গজ জঙ্গল পার হয়ে যেতে এখনো অনেক সময় লাগবে।

একটা কাণ্ড হল ঠিক এই সময়।

ঝোপের মধ্যেই কোথাও বাসা করে ডিম নিয়ে বসে ছিল বনমুরগী। খুব সম্ভব বাঘের পা পড়ল তার বাসায়। তৎক্ষণাৎ ক্যাঁ-ক্যাঁ করে একটা উৎকট চিৎকার তুলে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল বনমুরগী—ঝট্‌পট্ করে উড়ে গেল মানিক সর্দারের মাথায় পাখার ঝাপটা দিয়ে।

অদ্ভুত ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল বলাই, চমকে উঠল মানিক সর্দার—ধনুকের ছিলের মতো টান করা স্নায়ুর অতি সতর্ক পাহারা বিভ্রান্ত হয়ে গেল মাত্র কয়েক পলকের জন্যে। বাঘ সে সুযোগ ছাড়ল না—তীব্র হুঙ্কার করে—স্তব্ধ ভয়ার্ত জঙ্গলকে থরোথরো কাঁপিয়ে সোজা লাফিয়ে পড়ল মানিকের ওপর।

কিন্তু এই বিপর্যয়ের জন্য বাঘও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ঠিক গায়ে পড়ল না—পড়ল পাশে। বলাইয়ের আর্ত কান্নায় আর একবার আঁতকে উঠল জঙ্গল। আর মানিকের হাতের বল্লম বাঘের বুক ফসকে ডান কাঁধের ওপর গিয়ে বিঁধল।

আহত যন্ত্রণায় গোঙানি তুলে বাঘ লাফ মারল উল্‌টো দিকে। বুঝল তারও হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। সাধারণ শত্রুর সামনে সে পড়েনি—এখানে শিকার করার চাইতে শিকার হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি। তারপরে যন্ত্রণায় গর্জন করতে করতে ল্যাজ গুটিয়ে ছুটে পালালো—বহু দূর পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল তার গর্জন আর আওয়াজ। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মানিক সর্দার। তারপর বল্লমের ফলাটা ঘুরিয়ে আনল চোখের সামনে। বাঘের কিছু রোঁয়া আর রক্ত তখনো লেগে আছে তাতে। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ফোঁটা ফোঁটা ঘামগুলোকে মাটিতে ঝরিয়ে দিয়ে বললে, 'শা—লা!'

আহত হয়ে বাঘ পালিয়েছে। টের পেয়েছে বল্লমের স্বাদ। বুঝেছে পৃথিবীর সব জিনিসই তার খাওয়ার জন্যে তৈরী হয়নি। এর পরে মানুষের কাছে এগিয়ে আসবার আগে সে ভালো করে ভেবে নেবে।

'শালা!'

জঙ্গলে আবার তীব্র ঝিঁঝির ডাক উঠেছে। গাছের ডালে ঘুমন্ত পাখীরা জেগে উঠে ভয়ে কিচিরমিচির করছে। মানিক সর্দারের মনে হল শত কণ্ঠে অরণ্য যেন জয়ধ্বনি তুলছে তার।

এতক্ষণে বলাইয়ের কথা খেয়াল হল। বলাই বসে আছে মাটির ওপর।

পুরনো পিতলের মতো বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গলা দিয়ে ঘর্ ঘর্ করে আওয়াজ বেরুচ্ছে। যেন বোবায় ধরেছে।

ছেলের কাঁধ ধরে প্রাণপণে খানিক ঝাঁকানি দিলে মানিক।

'এই—'

'অ্যাঁ!'

'মানিক সর্দারের ছেলে না তুই?'

বলাই বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল—জবাব দিলে না।

'মায়ের দুধ খেয়েছিস, না ছাগলের দুধ?'

বলাই তেমনি বিহ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

'পিঠে মেরুদণ্ড নেই—এতটুকু সাহস নেই! হতচ্ছাড়া—মেয়েমানুষের অধম! কেমন করে বেঁচে থাকবি দুনিয়ায়—কী করে লড়বি চারদিকের এত সব বুনো জন্তুর সঙ্গে!'

বলাই চুপ।

এবার মানিক সর্দারের একটা প্রচণ্ড চড় বলাইয়ের গালে এসে পড়ল।

'ওঠ্ হারামজাদা—ওঠ্। এমন করে ব্যাঙের মতো বসে থাকলে চলবে না। পা চালিয়ে চল্। এখানে শুধু যে একটা বাঘই আছে সে কথা বলা যায় না। বারবার বুড়ো বাপ তোকে বাঁচাতে পারবে না।'

বাজারের সওদায় ভরা ছোট থলেটা ছিটকে পড়েছিল, কাঁপা হাতে সেটা কুড়িয়ে নিলে বলাই। তারপর কুকুরের ছানার মতো মাথা গুঁজে মানিক সর্দারের পাশে পাশে চলতে লাগল।

এতক্ষণে যেন মানিকের শরীরে সেই ক্লান্তি সেই অবসাদটা আবার এসে নতুন করে ভেঙে পড়েছে। পিঠের ওপরে সেই অসহ্য চাপ—তার মেরুদণ্ডটাকে মটকে দু'খানা করে দিতে চাইছে; পা দুটো খুলে পড়বার উপক্রম করছে হাঁটুর তলা থেকে। যে হাতে এতক্ষণ বল্লমটাকে উদ্যত করে রেখেছিল—সে হাতটা অদ্ভুত রকম ঢিলা হয়ে গেছে—যেন তালপাতার পুতুলের হাতের মতো সরু সুতোয় ঝুলছে কাঁধের সঙ্গে।

বাঘ পালিয়েছে। কিন্তু জীবন?

একটা বলদ বিক্রী হয়ে গেছে—আর একটাও যাবে। নতুন ধান এখনো অনেক

দূর—ততদূর পর্যন্ত ঝাপসা চোখের দৃষ্টি চলে না। কিছুদিন পরেই আসবে উপোস—বনের কচুকন্দ খেয়ে হয়তো আর এক মাস বেঁচে থাকা চলবে। কিন্তু তারপর?

উপায় নেই—কোনো উপায় নেই।

অথবা একটা উপায় আছে। যা করেছিল খাদেম আলি মোল্লা।

বলদ না থাক, বলদের মোটা দড়িগাছটা ছিল, আর ছিল শূন্য গোয়ালঘরের বাঁশের আড়া—যেখান থেকে ঝুলে পড়তে খুব বেশি সময় লাগে না।

কিন্তু শরীরে যদি একটু শক্তি থাকত—যদি গত বছরের সান্নিপাতিক জ্বরটা তাকে এমনভাবে ফোঁপড়া করে রেখে না যেত! তাহলে কি এত সহজে হার মানত সে? দিন-মজুরি করতে পারত—যেতে পারত রেলের ইস্টেশনে! পশ্চিমী কুলিরা মোট বয়ে বেঁচে থাকে—আর সে পারত না?

কিংবা তারও দরকার ছিল না। ছেলেটা। ছেলেটা যদি মানুষ হত! অপদার্থ মেয়েমানুষ! পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে শব্দ করে মাটিতে থুথু ফেলল মানিক সর্দার।

আর তক্ষুনি বাঘের গর্জনে আবার সমস্ত জঙ্গল কেঁপে উঠল। চোট পাওয়া চিতা যে অত সহজেই পালায় না—জেনেশুনেও সেকথা ভুলে গিয়েছিল মানিক সর্দার। খানিক দূরে গিয়েই বাঘ আবার নিঃশব্দে ফিরে এসেছে চোরের মতো, তারপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে নির্ঘাত লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানিকের ওপর।

হাত থেকে ছুটে গেল বল্লম। চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল মানিক। শুধু অসাড় আড়ষ্ট চোখ মেলে দেখতে লাগল একসার ধারালো দাঁত তার গলাটা ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে নেমে আসছে ধীরে ধীরে—বিষাক্ত দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসে সমস্ত মুখ জ্বলে যাচ্ছে তার—পায়ের ওপর সাপের মতো বাঘের ল্যাজ আছড়ে পড়ছে!

'বলাই!' অন্তিম প্রার্থনার মতো শুধু মনে হলো: বলাই বাঁচবে তো?

কিন্তু গলাটাকে ছিঁড়ে ফেলবার আগেই আর একবার বাঘ আর্তনাদ করল। লাফিয়ে উল্‌টে পড়ল মানিকের বুকের ওপর থেকে—তারপরে অসহ্য যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে।

এবার বলাই। এতক্ষণ মানিক তাকে সুযোগ দেয়নি—আড়াল করেই রেখেছিল। সেই আড়াল সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলাই জেগে উঠেছে। একটা পাথরের চাপ খুলে গিয়ে মুক্তি পেয়েছে তার পৌরুষ—তার পনেরো বছরের প্রথম পৌরুষ!

বল্লম এবার আর কাঁধে গিয়ে লাগেনি। পাঁজরার ভেতর দিয়ে সোজা বাঘের হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে। পঞ্চাশ বছরের মানিক সর্দারের হাত কেঁপেছিল—পনেরো বছরের বলাইয়ের হাত কাঁপেনি।

শেষ মুহূর্তের নিরুপায় যন্ত্রণায় বাঘ ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল—বল্লমের ফলায় উছলে উঠতে লাগল রক্ত—গর্জনের পর গর্জনে জঙ্গল বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

'বাবা! বাবা!' বলাইয়ের কান্না শোনা গেল। মাটিতে হাতের ভর রেখে উঠে বসল মানিক সর্দার—তারপর দাঁড়িয়ে গেল টলতে টলতে!

'তোমার গা দিয়ে যে রক্ত পড়ছে বাবা!' আরো শব্দ করে কেঁদে উঠল বলাই।

দু হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নিলে মানিক সর্দার। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, 'ভয় নেই—কোনো ভয় নেই। আমার জন্যেও নয়—তোর জন্যেও না।'

খুনী

ক্রমাগত মোটরের অধৈর্য হর্ন। রাত দেড়টার সময়, এই হাড়জমানো শীতে, কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটা বিশ্রী গাল উচ্চারণ করলে হাজারী।

প্রাইভেট গাড়ি কিংবা লরীর স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথ এ নয়। যুদ্ধের আমলে মিলিটারিরা খোয়া ছড়িয়েছিল, কিন্তু সে খোয়ার খবর নিতে গেলে এখন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করতে হয়। এখন পায়ের পাতা ডোবানো লাল ধুলো আর গোরুর গাড়ির দয়ায় এলোমেলো গর্ত। কয়েকটা আদিবাসীদের টুকরো টুকরো গ্রাম, কিছু শাল-পলাশের বন, ছোট ছোট দু-তিনটে পাহাড়, তারই ভেতর দিয়ে পথটা দামোদরের বালু-চরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ঘরের ভেতরে গন্‌গনে তাওয়া জ্বালিয়ে তাই নিশ্চিন্তে কম্বলের তলায় ডুব দিয়েছিল লেভেল-ক্রসিঙের প্রতিহারী হাজারী। আন্দাজ চারটের সময় মেল ট্রেন পাস করবে, গেট বন্ধ করে নির্ভাবনায় শুয়ে পড়েছিল সে।

এমন সময় মোটরের হর্ন তাকে ঘুম থেকে জাগাল।

ঘুঁটের ধোঁয়ায় জমাট হয়ে আসছে ছোট্ট ঘরটা। চোখ জ্বালা করে উঠল হাজারীর। কিন্তু হর্নের তাড়ায় চোখটা মুছে নেবার সময় পর্যন্ত পেলো না।

দরজা খুলতেই তীব্র হিম হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল গায়ে, কান দুটো কনকন করে উঠল। কম্বলটাকে ভালো করে মাথায় গলায় জড়িয়ে দু'পা এগোতেই একরাশ বীভৎস গালাগাল তাকে অভ্যর্থনা করল।

উল্লুক, রাস্কেল, ইডিয়ট! মরে ছিলি নাকি?

একটি ল্যাণ্ড্‌রোভার গাড়ি গেটের পেছনে দাঁড়িয়ে। তার প্রকাণ্ড আলোটা সার্চ-লাইটের মতো জ্বলছে। গায়ে ওভারকোট চড়ানো তিনটি মানুষ, একজনের হাতে চুরুট।

চুরুটওয়ালা আবার কটুগলায় ধমক দিয়ে উঠল, 'এম্‌নি করে ডিউটি করো তুমি? রিপোর্ট করব তোমার নামে। সন্ধ্যে হতেই গেট বন্ধ করে তুমি নাক ডাকাচ্ছ আর আধ ঘণ্টা ধরে আমরা সমানে হর্ন বাজাচ্ছি।'

নির্বিকার মুখে চাবি খুলছিল হাজারী, এবার ফিরে তাকালো এদের দিকে। হয়তো বলতে যাচ্ছিল, রাত দেড়টাকে সন্ধ্যে বলে না। উত্তরটা তার আর দেওয়া হল না—চুরুট হাতে মানুষটির ওপর চোখ পড়তেই ঠাণ্ডা হাত-পা আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার।

'সেলাম হুজুর।'

'সেলাম হুজুর?' চুরুটধারী মুখ বিকৃত করল: 'সেলামটা ছিল কোথায় এতক্ষণ? ট্রেনের সঙ্গে খোঁজ নেই—দিব্যি গেট বন্ধ করে রেখে সুখনিদ্রায় শুয়ে পড়েছ! পাব-লিকের সঙ্গে বুঝি এই রকম ব্যবহারই করো তোমরা?'

পাথুরে ঠাণ্ডায় এমনিতে হাত-পা কাঁপছিল, প্রায় ঠক্‌ঠকানি শুরু হল এবার। হাত জোড় করল হাজারী।

'কসুর মাপ করুন মালিক। এদিকের দেহাতী লোক এত রাতে কেউ তো গাড়ি নিয়ে বেরোয় না, তাই—'

'তাই যা খুশি করবে? ভেবেছো ইংরেজের আমল আছে এখনো? মনে রেখো, জমানা বদলে গেছে। এখন চাকরি রাখা নয়—দেশের সেবা করাই তোমাদের কাজ।'

আর একজন সিগারেট ধরালেন: 'করাপশন্, চ্যাটার্জি, করাপশন্। টপ্ টু বটম্।'

চ্যাটার্জি এবার কথা বললেন না, কদর্থ মুখ করে নাক দিয়ে ঘোড়ার মতো আওয়াজ তুললেন একটা। তা থেকে বোঝা গেল, তিনি শুধু এ ব্যাপারে যে একমত তাই নন, এর চাইতে উগ্র মতামত পোষণ করে থাকেন।

'কিচ্ছু হবে না দেশের। আমরা মিথ্যেই খেটে মরছি।' চুরুটের মুখ থেকে এক-রাশ মোটা ছাই ঝরিয়ে চ্যাটার্জি বললেন, 'নাও হে, এবার ওঠো গাড়িতে। যা শীত—প্রায় জমিয়ে দিলে!'

তৃতীয় লোকটি চুপচাপ ছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ চমকে নড়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ!'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছিলেন নাকি মিস্টার মাইতি? হাউ ফানি!' চ্যাটার্জি এবং তাঁর সঙ্গীটি শব্দ করে হেসে উঠলেন।

চ্যাটার্জির মোটা ভাঙা গলার সঙ্গে তীক্ষ্ণ সরু গলার আওয়াজ মিলল, কেমন আঁতকে উঠল হাজারী। আর আঁতকে উঠল একটু দূরের আকন্দ ঝোপের ভেতরে বসে থাকা একটা শেয়াল—খ্যাঁক্ করে একটা লাফ দিয়ে প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছুটে পালালো সেটা।

'ওঠো হে ঘোষ, উঠে পড়ো।' চ্যাটার্জি তাড়া দিলেন: 'ঠাণ্ডায় নাক কান ছিঁড়ে গেল যে।'

ঘোষের কিন্তু গাড়িতে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল না, কেমন উশ্‌খুশ করতে লাগলেন। আর তেমনি নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন মিস্টার মাইতি—খুব সম্ভব আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শীতল অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ শিখার মতো উল্কা ঝরল একটা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘোষ বললেন, 'এখনো পনেরো মাইল পেরুলে তবে ডাক-বাংলো। কী যে বোগাস্ এরিয়া—যেন পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। সত্যি বলছি, স্টিয়ারিঙ ধরতে আর ইচ্ছে করছে না—হাত অসাড় হয়ে গেছে। একটু যদি গরম হওয়া যেত—'

গেট্ খুলে দিয়ে হাজারী অপেক্ষা করে আছে। শীতের হাওয়ায় তারও মুখ চোখ কালিয়ে যাচ্ছে। আপদগুলো চলে গেলেই বাঁচে—কতক্ষণ আর এই ঠাণ্ডায় এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! কিন্তু সে কথা বলা তো দূরে থাক, হাজারী ভাবতেও সাহস পেল না। চ্যাটার্জির মহিমা সে জানে—জানে তিনি কে এবং কী! তাঁর কলমের একটি খোঁচাতেই তার চাকরি খতম হয়ে যেতে পারে।

চ্যাটার্জি বললেন, 'এখানে গরম হবে কোথায়? কাছাকাছি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আছে ভেবেছো নাকি?'

মিস্টার মাইতি আবার ঘুম থেকে জাগলেন। শেষ কথাটা বোধ হয় তাঁর কানে গিয়েছিল। 'চলুন না, পয়েন্টস্‌ম্যানের ওই ঘরটা তো রয়েছে। বসা যাক্ একটু ওখানেই।'

সভয়ে হাজারী একবার নড়ে উঠল। কথাটা ঠিক শুনেছে কিনা বুঝতে পারল না।

'ওই ঘরে? সে কি হে!' চ্যাটার্জি বিস্মিত হলেন।

ঘোষ যেন লুফে নিলেন কথাটা।

'তা আইডীয়াটা মন্দ কী! ম্যাস্ কণ্টাক্ট আমাদের কাজের একটা বড় অঙ্গ। আর এ-ও ম্যাসের একজন। না হয় একটু কণ্টাক্ট এর সঙ্গে করা যাক। সত্যি বলছি, এই শীতের মধ্যে পনেরো মাইল কেন, এক মাইল যাওয়ার কথা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।'

মিস্টার মাইতির মুখ দিয়ে ঘর্‌ঘর্ করে একটা চাপা আওয়াজ হচ্ছিল, আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খুব সম্ভব। কিন্তু ঠিক স্ট্রাটেজিক পয়েন্টে ওঁর ঘুম ভাঙে। জেগে উঠে বললেন, 'চলুন না—একটু বসাই যাক ওর ঘরে। ডাক-বাংলোতে গিয়েও জায়গা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। কয়েকজন ভি-আই-পি আসবার কথা আছে শুনেছি। তার চাইতে এখানে একটু বসে গেলে—'

'মেজরিটি মাস্ট বি গ্র্যান্টেড্—' চ্যাটার্জি দাক্ষিণ্যের হাসি হাসলেন। তারপর ডাকলেন: 'ওহে, কী নাম তোমার? এসো এদিকে।'

সম্ভাষণ হাজারীর উদ্দেশে।

শীতে আর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় মুমূর্ষ হাজারী সামনে এসে দাঁড়ালো। দুর্বল গলায় বললে, 'সেলাম হুজুর।'

'সেলাম ইতিপূর্বেই তুমি করেছ, ভক্তিতে আর প্রয়োজন নেই।' চ্যাটার্জি গণ-সংযোগের জন্যে বক্তৃতা করে থাকেন, তাই সাধুভাষা ব্যবহার করলেন। তারপর বললেন, 'কী নাম তোমার?'

'হুজুর, হাজারী সিং।'

'বাড়ি কোথায়?'

'জী, ছাপ্‌রা জিলা।'

'ছাপ্‌রা জিলা?, ঘোষ ফোড়ন কাটলেন: 'তবে আর তোমার ভাবনা কি হে? দিল্লী তো তোমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে—এক্ষুনি অ্যাম্‌ব্যাসাডার। তুমি কেন ভ্যারেণ্ডা ভাজছ এখানে বসে?'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কেমন বেয়াড়া ধরনে হেসে উঠলেন মিস্টার মাইতি—ব্যাঙের সাপ গেলার মতো ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ করে আওয়াজ হল।

চ্যাটার্জি মৃদু হেসে বললেন, 'ওয়েল সেড্।'

কিন্তু এমন উঁচু ধরনের রসিকতাটা মাঠেই মারা গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল হাজারী, এক বর্ণও বুঝতে পারল না।

'শুনেছ—' সদয়ভাবে এবার চ্যাটার্জি বললেন, 'তোমার ঘরে একটু বসব আমরা।'

হাজারী বার কয়েক খাবি খেল কেবল।

'জী, গরীবের ঘর, দড়ির খাটিয়া—'

এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে চ্যাটার্জি আরো উদার হয়ে উঠলেন।

'সারা ভারতবর্ষই গরীবের দেশ, বুঝেছ হাজারী?' চ্যাটার্জির হৃদয়ে গণসংযোগের প্রেরণা এসে গেল: 'সেই কোটি কোটি গরীবই হচ্ছে দেশের শক্তি, তার প্রাণ, তার আত্মা। সেই আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য—আমাদের মিশন—অর্থাৎ ব্রত। চলো আজ আমরা তোমারই অতিথি।'

মাইতির কেমন আশা হচ্ছিল, চ্যাটার্জি এবার জড়িয়ে ধরবেন হাজারীকে কিন্তু ধরলেন না দেখে একটু নিরাশই হলেন মনে মনে। ঘোষের ইচ্ছে হল হাততালি দিয়ে ওঠেন, নেহাৎ একলা হাততালি জমবে না বুঝেই থেমে গেলেন।

হাজারীর হাঁটু এবার শব্দ করেই কাঁপতে লাগল। 'কিন্তু হুজুর—'

'এসো এসো, তোমার কোনো ভয় নেই—' হাজারীর বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই তার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন চ্যাটার্জি।

মাটির একটা বড় মালায় গন্‌গন করছে আগুন। বাইরের তীক্ষ্ণ শীতল হাওয়ার মধ্যে থেকে এই ঘরে পা দিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সবাই।

ঘোষ বললেন, 'নট্ ব্যাড্! অবশ্য ধোঁয়াটা না থাকলে আরো ভালো হত।'

আর মাইতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালেন খাটিয়াটার দিকে। তেল-চিট্‌চিটে বালিশ, ময়লা ধুলো কম্বল। ছারপোকাও নিশ্চয় আছে কয়েক লাখ। তবু মাইতির বাসনা হল, সোজা বিছানাটাতেই লম্বা হয়ে পড়েন। চ্যাটার্জির পাল্লায় পড়ে সারাদিন এক ফোঁটা বিশ্রাম জোটেনি।

'হুজুর, এইটুকু তো ঘর। কোথায় যে আপনাদের বসতে দিই—'

কথাটার ভেতরে বিনয়ের আতিশয্য নেই এক বিন্দুও। ঘরটা হাত ছয়েক লম্বা, হাত চারেক চওড়া হবে বলে মনে হয়, সামান্য কিছু বেশি হতেও পারে। ভেতরে হাজারীর খাটিয়া, একটা চৌপাই, কোম্পানির গোটা দুই বাতি, ফ্ল্যাগ, উনুন, হাঁড়ি-কড়াই, দড়িতে ঝোলানো পোশাক, একটা মোটা লাঠি। টিনের বাক্সও আছে—তবে সেটা খাটিয়ার তলায়।

ঘুঁটের হাল্কা ধোঁয়ায় একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, তবু চ্যাটার্জি বললেন, 'আরে, এক কম্বলে অনেক ফকিরের জায়গা হয়। ভালোই হল, তোমার ঘর দেখে গেলাম। নাঃ, স্পেস্ সত্যিই খুব কম। ফ্যামিলি নিয়ে তো থাকাই যায় না দেখছি। ওয়েল, আমি দিল্লীতে লেখালেখি করব এ-নিয়ে।'

চ্যাটার্জি খাটিয়ায় বসে পড়লেন, তাঁর দৃষ্টান্তে ঘোষ এবং মাইতিও আসন নিলেন। খাটিয়াটা খট্‌খট্ করে উঠল—হাজারীর বরাত গুণেই ছিঁড়ে পড়ল না। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল হাজারী সিং—বিছানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল একটা।

'দাঁড়িয়ে কেন হাজারী, বোসো।'

'হুজুর আপনাদের সামনে—'

'আরে বোসো, বোসো—' চ্যাটার্জির মুখে অনুগ্রহের হাসি: 'বসে পড়ো। নাউ উই আর ফ্রেণ্ডস্। এ-যুগে সবাই সমান।'

অগত্যা বসতে হল হাজারীকে। আধখোলা দরজায় পিঠ দিয়ে। পেছন থেকে কন্‌কনে হাওয়া আসছে—কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েও তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না।

'কত মাইনে পাও তুমি?' ঘোষের জিজ্ঞাসা।

হাজারী জানালে।

'এত কম ?' ঘোষের চোখ বিস্ফারিত হল : 'চলে কি করে ?'

এর উত্তর নেই। বিনীত হাসিতে চুপ করে রইল হাজারী।

চুরুট নিভে গিয়েছিল, চ্যাটার্জি সেটাকে ধরালেন। তারপরে আস্তে আস্তে বললেন, 'রেলওয়েতে মাইনে সত্যিই বড্ড কম দিচ্ছে। আমি ভাবছি এ নিয়ে মুভ্ করব। বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওয়ার্কিং ক্লাসকে নেগলেক্ট করবার আর কোন মানেই হয় না।'

'এক্জাক্ট্লি !' ঘোষ কথাটা লুফে নিলেন : 'এইগুলোই তো সুইসাইডাল্ পলিসি। নইলে কি এ-সব যা-তা সেট্ ব্যাক হয় ইলেকশনে ?'

চ্যাটার্জি গম্ভীরভাবে চিন্তা করলেন খানিকক্ষণ।

'কিন্তু কি জানো ঘোষ, এদের লোভ যে-ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে যতই করো পেট ভরাতে পারবে না। অথচ, সত্যিই ছাখো—এদের নীড্ কতটা ? ফ্রী কোয়ার্টার পাচ্ছে—নেচারের ভেতরে কেমন হেল্‌দি হ্যাপি লাইফ—'

মাইতি এর মধ্যেই দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আচমকা জেগে উঠে জড়ানো গলায় বললেন, 'সেদিন কাগজে দেখছিলাম আসামে কোন এক লেভেল-ক্রসিং থেকে গেটম্যানকে বাঘে নিয়ে গেছে।'

চ্যাটার্জি শুনতে পেলেন না। কিংবা শুনলেও কর্ণপাত করলেন না।

'খায় শাক্‌সব্জী—ক্ষেতের টাটকা চাল—'

'চালের মণ পঁয়ত্রিশ টাকা, আর আটা—' বলতে বলতে আবার ঘুমিয়ে গেলেন মিঃ মাইতি। চ্যাটার্জি এবার তাঁর দিকে বিরক্ত দৃষ্টি ফেললেন একটা।

ঘোষ বললেন, 'ঘুমের ঘোরে কথা কইছেন।'

'হুঁ, তাই দেখছি।' কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে চ্যাটার্জি এবার হাজারীর দিকে ফিরলেন।

'দেশে কত পাঠাও হাজারী ?'

'জী—দশ-পন্দেরো—'

চ্যাটার্জির মুখে এবার জয়ের পরিতৃপ্তি দেখা দিল।

'দেন ইউ সি ঘোষ, এই টাকাতেও চালিয়েও দশ-পনেরো টাকা দেশে পাঠাতে পারছে—তার মানে, যা পায়, তাতে প্রয়োজন মিটিয়েও ওর বাড়তি থাকছে। তা থেকে বোঝা যায়, এর বেশি নীড্ ওর নেই। হোয়ারঅ্যাজ, একটা উঁচুদরের গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্টকেও মাসের শেষের দিকে টানাটানিতে পড়তে হয়—গাড়ির তেলে ঘাট্‌তি পড়ে।'

'সবই স্ট্যাটাস্ আর স্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং—'

শীতে আর ঘুমে হাজারীর সারা শরীর কুঁকড়ে আসছে। কতক্ষণে এরা নড়বে তার ঘর থেকে ? না হয় তার খাটিয়াতেই শুয়ে পড়ুক এরা—সেও মেজেতেই খানিকটা গড়িয়ে নিক। এই রাত দুটোর সময়, এমনি হিম ঠাণ্ডার ভেতরে কেন খামোখা বক্‌বক্ করছে বসে বসে ?

চ্যাটার্জি বলে চলেছেন, 'হ্যাঁ—স্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং। একটু খোঁজ করলে দেখবে ইভ্‌ন তোমার জেনারেল-ম্যানেজারের চাইতেও কত সুখী এরা—কী কন্‌টেন্টমেণ্ট ! আর সাধারণ মানুষের এই যে সন্তোষ—ভারতবর্ষের আইডিয়াল হচ্ছে ঠিক এইটেই। আজ যারা এদের ক্ষেপিয়ে তোলে তারা শুধু নিজেদের পোলিটিক্যাল অ্যাম্বিশনটাকেই ফুল্‌ফিল্ করতে চায়। যে অভাব এদের কোনোদিনই নেই, কৃত্রিমভাবে তাকেই সৃষ্টি করে তারা। আর—'

ঘোষ মুখ ফিরিয়ে হাই তুললেন, সেই সঙ্গে ঈর্ষাতুর চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেন মাইতির দিকে। মাইতি এবার সত্যি নিথর ঘুমে তলিয়ে গেছেন। মুখটা একটু ফাঁক হয়ে আছে, ঘর্‌ঘর্ করে চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। ঘোষের মনে হল, একটা চিমটি কেটে মাইতিকে জাগিয়ে দেন তিনি। দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন, অথচ চ্যাটার্জির যত বক্তৃতা সমানে শুনতে হচ্ছে তাকেই !

চ্যাটার্জি বললেন, 'দেশ গড়তে হবে—সকলকে নিতে হবে কর্তব্যের ভার। আজ যাঁরা লীডার, তাঁরা একদিন কত স্যাক্রিফাইস করেছেন। কিন্তু শুধু তাঁদের ত্যাগেই তো চলবে না। আজ দেশের সব মানুষকে ত্যাগ শিখতে হবে—শিখতে হবে কর্তব্য—'

ঘোষ হঠাৎ উঃ করে উঠলেন। ভুরু কোঁচকালেন চ্যাটার্জি।

'কী হল হে ? ছারপোকা নাকি ?'

'না হুজুর, খট্‌মল নেই—' নির্বাক হাজারী এতক্ষণে ত্রস্ত কৈফিয়ত দিলে একটা।

'খট্‌মল ছাড়া তোমাদের খাটিয়া আর কলের জল ছাড়া কলকাতার গয়লার দুধ—দুই-ই অ্যাবসার্ড !' ঘোষ গজগজ করে উঠলেন। ঘোষকে সত্যিই ছারপোকা কামড়ায়নি—কিন্তু সরব স্বগতোক্তির ত্রুটিটা এ-ভাবে ছাড়া ঢাকবার কোনো উপায় ছিল না।

চ্যাটার্জি থামবার পাত্র নন। আবার আরম্ভ করলেন, 'দুশো বছরের একটা পরাধীন জাতকে রাতারাতি ঘুম থেকে জাগানো যায় না। প্রত্যেকে যদি ত্যাগ করতে পারে—কর্তব্য যদি—'

এবারেও শেষ করতে পারলেন না। লেভেল-ক্রসিং-এর ঠিক পিছনেই সাতটা-আটটা শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠল। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে শাল-পলাশের বন কাঁপিয়ে হু-হু করে ছুটে এল উত্তরের হাওয়া। ভেজানো দরজাটা খুলে গেল এক ঝটকায়—ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় ঘুমন্ত মিস্টার মাইতি পর্যন্ত চোখ মেলে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

ঘোষ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'বাপ রে, নর্থ পোলে এসে পড়েছি নাকি? কী যেন নাম তোমার—ওহে হাজারী, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও না—'

'না—না, খোলা থাক খানিকটা।' চ্যাটার্জি কোটের কলারটা তুলে দিয়ে বললেন, 'ধোঁয়া দেখছ না ঘরে? গ্যাস পয়জনিং হয়ে মরবে নাকি শেষে?'

'হুঁ, তাও বটে!' একটু চুপ করে থেকে ঘোষ বললেন, 'আর তো পারা যায় না। নিয়ে আসবো ব্যাগটা?'

চ্যাটার্জি একবার আড় চোখে তাকালেন হাজারীর দিকে। ঘুমে আর ঠাণ্ডায় অদ্ভুত রকম কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে হাজারী। বললেন, 'আমিও সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। তবে কিনা আমরা পাব্লিক ম্যান—আমাদের কর্তব্য হল লোকের কাছে সব সময় নিজেদের ডিগনিটি বাঁচিয়ে চলা। এই লোকটার সামনে—'

ঘোষ মুখ বাঁকালেন। ইংরাজিতে বললেন, 'এর জন্য ভাবতে হবে না। এরা আমাদের চাইতে এ-সবের মর্ম অনেক ভালো বোঝে। একেও একটু গরম করে দেওয়া যাক—খুশিই হবে।'

ঘোষ উঠে দাঁড়াতে হাজারীও দাঁড়িয়ে পড়ল। হায়, মিথ্যে আশা! ঘোষ বেরিয়ে গেলেন, নির্বিকার ভেবে নেভা চুরুটে আবার আগুন ধরালেন চ্যাটার্জি। মাইতি ঘুমোতে লাগলেন এক মনে।

'দেশে-টেশে যাও না হাজারী?'

'যাই হুজুর। দো-চার বরিষমে এক দফে।'

'চাষ-বাস আছে?'

এক মুহূর্তে হাজারীর মন দূরে চলে গেল। চাষ-বাস ছিল বইকি একসময়। রহড়ের খেত ছিল, ছোট একটা ফলের বাগিচা ছিল, একটা তালাও ছিল। কিন্তু সে-সব যে কোথায় গেল তার খবর জানত তার বাপ—যে চোখে ভালো দেখতে না পেয়ে শাদা কাগজে টিপসহি দিয়েছিল, আর জানে জিমিন্দার ব্রিজনন্দন চৌধুরীজি যার বাড়িতে বহুৎ ভারী ভারী আদমি পাটনা থেকে এসে খানাপিনা করে।

'চাষ এক সময় ছিল হুজুর। এখন নেই।'

'হুঁ, চাকরির লোভে সে-সব বিসর্জন দিয়েছ?' চ্যাটার্জির মুখে ক্ষোভের চিহ্ন: 'এই স্লেভ মেণ্টালিটির জন্যেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল! মাটিই যে সব চাইতে খাঁটি জিনিস—তোমাদের কে বোঝাবে সে কথা? আমরা কেবল বকেই মরি!'

ঘোষ একটা ছোট ট্রাভেলিং ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলেন।

'জাগাব মাইতিকে?'

'কী হবে জাগিয়ে? ওর চলে না।'

ব্যাগ খুলে বোতল-গ্লাস বার করতে করতে মুখভঙ্গি করলেন ঘোষ।

'এদিকে রাইট অ্যাণ্ড লেফট ঘুষ খাচ্ছে, আর একটুখানি এ সব ঠোঁটে ছোঁয়ালেই ক্যারাক্টার নষ্ট হয়। হিপোক্রিট!'

সোডা খোলবার আওয়াজে একটুখানি নড়ে উঠলেন মাইতি, মুখটা কপ করে বন্ধ হয়ে গেল। পাছে ঘুমের ঘোরে তাঁর খোলা মুখে খানিকটা ঢেলে দেওয়া হয়—সেই ভয়েই যেন সতর্ক হয়ে গেলেন আগের থেকে।

দুটি গ্লাসের তরল সোনালীর ওপর শাদা ফেনা ঝক্‌ঝক্ করে উঠল হীরের মতো। আর চক্‌চক করে উঠল হাজারীর চোখ। এই শীত, এই জড়তা আর ওই গন্ধটা। তাকেও চকিত করে তুলল।

চ্যাটার্জি লক্ষ্য করেছিলেন। একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়।

'এ চীজ্ মালুম হ্যায় হাজারী—'

মালুম আছে বইকি হাজারীর। নইলে তার মতো গরীব-পরবর এক-আধটা দিন খুশি হবে কী করে। তবে মতোয়ালা নয় হাজারী। ন' মাসে ছ' মাসে এক-আধটা হাটের দিন সামান্য হাঁড়িয়া মেলে, আদিবাসীদের কাছে থেকে।

বিনীত হাসিতে হাজারী মাথা নিচু করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার জ্বলন্ত চোখ দুটো আবার উঠে এল সোনালীর উপর হীরের ফেনা জমে ওঠা গ্লাসের দিকে। বড্ড জাড়া পড়েছে আজ—বড় বেশি!

চ্যাটার্জি বললেন, 'খাবে হাজারী?'

বুকের ভেতরে ধক্ করে উঠল হাজারীর। প্রাণপণে সামলাতে চাইল নিজেকে।

'না হুজুর।'

'আপত্তি কেন হে? যা শীত—একটু তাজা হয়ে নাও না! ভয় নেই—আমরা তো রয়েছি!'

'ডিউটি আছে হুজুর। একটু পরেই মেল ট্রেন পাস্ করাতে হবে—'

'যে রকম কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়েছ, তাতে মেল ট্রেন পাস করাতে পারবে বলে তো ভরসা হয় না। আরে, গিলে ফেলো এক চুমুক—গা গরম হয়ে যাবে।' চ্যাটার্জির মুখে দেবদুর্লভ হাসি। স্নেহ অনুকম্পা বন্ধুত্ব—কী নেই সেই হাসিতে?

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষীণ গলায় হাজারী বললে, 'না হুজুর, সরকারী কাজ—'

ঘোষ ইংরাজিতে বললেন, 'ইন্‌সিস্ট করছ কেন? না খায় বয়েই গেল।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে চ্যাটার্জি জবাব দিলেন ইংরেজিতেই: 'উইট্‌নেস্ রাখতে চাই না

—পার্টি করে ফেলতে চাই—বুঝতে পারছ না? আমাদের পজিশনের কথাটাও ভেবে দেখো।'

'দ্যাট্‌স্‌ রাইট!'

চ্যাটার্জির মুখে রং বদলেছে এর মধ্যেই। মেজাজ খুশি হয়ে উঠেছে আরো। এখন তিনি ধীরে ধীরে জনগণের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন।

'ওই পেতলের গ্লাসটা বুঝি তোমার! ধরো—'

'হুজুর—'

'আমি বলছি তোমাকে।' হাজারী আর একটু কাছে থাকলে চ্যাটার্জি হাত বাড়িয়ে বোধ হয় তার গলা জড়িয়েই ধরতেন: 'আরে, আভি জমানা বদল হো গয়া। আমরা সব ভাই ভাই। তোলো গেলাস—'

এবার শেষ বাধাটাও উপড়ে গেল হাজারীর। আর মনে পড়ল, চ্যাটার্জি বলেছিলেন ডিউটি নেহি করতা—সামসে গেট বন্ধ করে নিদ্‌ লাগাও—তোমার নোকরি আমি—! না—হুকুম মানতেই হবে!

কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে বললে, 'হুজুর—বহৎ থোড়া—'

ঘোষ ইংরেজিতে বললেন, 'র? রিয়্যাল স্কচ—ওল্ড স্মাগলার—'

'দ্যাটস্‌ অল রাইট্‌! ওরা ওস্তাদ লোক—অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলের এক গ্যালনেও ওদের কিছু হয় না। ঢালো—'

কিন্তু সাঁওতালী হাঁড়িয়া আর রিয়্যাল স্কচের তফাত জানা ছিল না গরীব হাজারীর। এক চুমুকে সবটাই শেষ করতে গিয়ে বুক পর্যন্ত আগুন ধরে গেল। তারপর মনে হল, এইবারে উঠে দাঁড়িয়ে তার চিৎকার করে একখানা গান গাওয়া দরকার, শুনে হুজুরেরা খুশি হবেন। তারপর—

কখন ঘুমন্তপ্রায় মাইতিকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কখন খুশির ঝোঁকে হাওয়ার মতো ল্যাণ্ড্‌রোভার উড়িয়ে বেরিয়ে গেছে ঘোষ, তার কোন খবর হাজারী জানত না। হঠাৎ একটা বীভৎস বিকট আওয়াজে তার ঘোর কাটল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সে।

মেল ট্রেন ঠিকই বেরিয়ে গেছে। গার্ডের গাড়ির লাল আলো অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রক্তবিন্দুর মতো। শুধু লাইনের পাশে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে গোরুর গাড়িটা—আহত বলদ দুটো গোঙাচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। আর তার ঘুমের সুযোগে খোলা গেট পেয়ে যে-লোকটা গাড়ি নিয়ে লাইনে উঠে এসেছিল, সে-লোকটা টুকরো টুকরো হয়ে প্রায় দশ-বার গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে—শেষ রাতের ক্ষীণ চাঁদের আলোয়

লাইন-স্লিপার মুড়ি রক্তে স্নান করছে।

চাকরি যাবেই—সে ভাবনায় নয়। খুনী—বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাটা মনে পড়তেই হাজারী টলতে টলতে সেই রক্ত-মাংস ছড়ানো লাইনের উপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

তিলঙ্গমা

তিলঙ্গমা? আমি চমকে উঠে বললুম, 'এর মানে কী? এমন শব্দ কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।'

সাংবাদিক বন্ধু তাঁর প্রসন্ন প্রশান্ত হাসিটি মুখের উপর মেলে দিয়ে বললেন, 'শুধু আপনি কেন—কোন আভিধানিকও কখনও পেয়েছেন বলে জানি না। তিলে তিলে গমন করে যে নারী এমনি একটা ব্যুৎপত্তি করে নিতে পারেন।'

'আধুনিক কবিদের কী যে হয়েছে—' আমি গজগজ করে উঠলুম।

'আধুনিক কবিদের উপর আগে থেকেই অবিচার করবেন না—' বন্ধু আবার হাসলেন। বললেন, 'আমার এই রিভিউটা' প্রথমে পড়ে নিন, তারপরে যা বলবার বলবেন।'

অগত্যা পড়তে আরম্ভ করলুম। বেশ দীর্ঘ সমালোচনা। লাইনে লাইনে প্রশংসার উচ্ছ্বাস। তা থেকে যে তত্ত্ব মোটের উপর পাওয়া গেল, তা এই রকম:

'এ এক আশ্চর্য কবিতার বই। এর ভাষা নতুন, ছন্দ নতুন, বক্তব্য নতুন। এমন ভাষা-ছন্দ-ভাব বাংলা সাহিত্যে এর আগে কেউ ব্যবহার করেননি—রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপ্রতিভাও এই কল্পনা করতে পারেননি (আলোচনার এই জায়গাটায় এসে আমি বিষম খেয়েছিলুম), আজকের দিনের সাধারণ পাঠক বা সমালোচক তিলঙ্গমার মর্ম বুঝবেন না; কিন্তু যেমন বোদ্‌লেয়ার অনেক পরে তাঁর উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়েছেন, যেমন জেমস জয়েসের স্ট্রীম অফ কনসাসনেস্ অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে নিজের মহিমার আসন পেয়েছে তেমনি একদিন হয়ত এই কাব্য আজকের সমস্ত উপেক্ষা-উপহাসের মেঘাবরণ ছিঁড়ে সূর্যের মতো বেরিয়ে আসবে। এই বই থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃতি দেবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি মনে করি—সম্পূর্ণ বইখানিই উদ্ধৃতিযোগ্য।'

আমি হাঁ করে রইলুম কিছুক্ষণ।

'সত্যি কি এমনি নিদারুণ প্রতিভা জন্মেছে নাকি বাংলা দেশে?' অস্বস্তিভরে বললুম, 'কাগজ-টাগজগুলো আমিও তো পড়ি—কিন্তু এ-কবির কোনও কবিতা তো কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।'

'এঁর কবিতা কোন কাগজে ছাপা হয়নি। কবি কখনও পাঠাননি।'

'বোধ হয় ভাবেন, তাঁর কবিতা কেউ বুঝবে না?'

'না, তাও নয়। তিনি শুধু নিজের মনেই লিখে যান। বইখানি ছাপিয়েছেন তাঁর স্ত্রী।'

আমার ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বছর দুয়েক আগে নিজের খরচে আমি এক-খানা উপন্যাস ছেপেছিলুম। পঞ্চাশ কপিও বিক্রি হয়নি আজ পর্যন্ত। আর সেজন্য আমার স্ত্রী যা বলে থাকেন, তা প্রকাশ্যে শোনাবার মতো নয়।'

'ভাগ্যবান স্বামী!' আমি শীর্ণ স্বরে বললুম, 'আর এমন স্বামীর স্ত্রীও ভাগ্যবতী!'

'স্ত্রীও ভাগ্যবতী?' বন্ধু বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। 'খুব সম্ভব। কিন্তু আপনাকে আর ধোঁয়ার মধ্যে রেখে লাভ নেই। আগে কবিতার বইখানি আপনাকে একবার দেখানো দরকার।'

ব্যাগ থেকে বইটি বের করে এনে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে: 'পড়ুন।'

ছোট বই। রেক্সিনে বাঁধানো—সোনালী হরফে জলজল করছে নাম: তিলঙ্গমা—সোমেন দে চৌধুরী। দামী বিলিতি কাগজে চমৎকার ছাপা।

'টাকা আছে অনেক।'

'না, স্ত্রীকে গয়না বেচতে হয়েছে।'

আমার আর একবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমার স্ত্রী কুন্তলার কথাগুলো একবার শোনা উচিত ছিল। কিন্তু আপাতত সে বাড়িতে নেই—হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে কোন বান্ধবীর কাছে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে আমি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। কিন্তু চোখের দৃষ্টি থমকে থেমে গেল। একটি কবিতার নাম হল "চঞ্চলিতা হিঞ্চলিকা"। আর তার লাইনগুলো এই:

'পর্যুদস্ত পাণ্ডটে বিকেল
থ্যাচাং থ্যাচাং থ্যাচাং ট্রামের তেল;
টিং টিং—কাবলির হিং:
সবুজ চায়ের পেয়ালা—
বীবর্ণ প্রাণে লাল নীল শিং।
বাগিচায় বুলবুলি তুই—
ম্যাগোলীনা কচী কচী কাঁটা
নিয়ে আয় খাঁরা বলী দেব,
ওঁ কালিঘাটের ভোঁ ভোঁ
(পাঁটা—পাঁটা!)'

আমার হাত থেকে বইখানা খসে পড়বার উপক্রম হল।

'কী কাণ্ড মশাই।'

'ভালো লাগল না?'

'ভালো। পাউণ্ডের ক্যাণ্টোজ থার্টি সেভেন উলটেছি। হেনরি মিলারের রোজি ক্রুসিফিকেশন নিয়ে চেষ্টা করেছি—কিন্তু এ-কবিতা পড়লে যে ভৌ-ভৌ করে লোককে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে!'

'আমার সমালোচনার সঙ্গে মত মিলছে?' বন্ধুর ঠোঁটের কোণায় চাপা হাসি ফুলে উঠল একটুকরো।

'এক দিক থেকে মিলছে বইকি!' আমি তিক্তগলায় বললুম, 'ঠিকই বলেছেন, এই বস্তু—এই বানান রবীন্দ্রনাথ কল্পনাও করতে পারতেন না। যেমন হয়েছেন আপনারা সমালোচকেরা তেমনি আধুনিক কবির দল—'

'বলেছি তো, আধুনিক কবিদের উপর আগে থাকতেই অবিচার করবেন না। তাঁদের কোনও দোষ নেই!'

'কিন্তু এ যে পাগলের কাণ্ড!'

'ঠিক।' বন্ধু একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: 'আধুনিক কবিরাও এই কবিতা-গুলো পড়ে ওই কথাটাই বলবেন। ছুঁড়ে ফেলে দেবেন এ বই। কিন্তু এই প্রশংসাটুকু একজন বিশেষ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই এই সমালোচনা আমাকে লিখতে হয়েছে।'

'কে সেই বিশেষ মানুষটি?'

'লীলা দে চৌধুরী। আগে ছিল লীলা মিত্র।'

আমি হতাশ দৃষ্টিতে তাকালুম।

'সমস্ত জিনিসটাকে এমন জটিল করে তুলেছেন যে কিছু বুঝতে পারছি না।'

'জটিলতার জাল এখুনি খুলে দিচ্ছি। লীলা মিত্রের গল্পই বলি। 'তিলঙ্গমা'র সমস্যা তা হলে সহজেই সমাধান হয়ে যাবে।'

বন্ধু ধীরে সুস্থে চুরুট ধরালেন। সামনের দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের বাঘটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করলেন লীলা মিত্রের গল্প।

কলকাতার কোন মিশনারী কলেজে লীলা মিত্র ছিল আমাদের সহপাঠিনী। শুধু আমাদের ক্লাসেরই নয়—সারা কলেজের ছাত্রেরাই লীলা মিত্রকে একটা বিশেষ চোখ দিয়ে দেখত। এমন কি, কখনও কখনও অধ্যাপকেরা পর্যন্ত রোল-কল করতে করতে মাথা তুলে লক্ষ্য করতেন সেভেনটি ফাইভ যথাস্থানে হাজির আছে কি না! অনুপস্থিত মেয়েদের রোলে অযাচিত ভাবে রেসপণ্ড করে যে-সব ছেলেরা শিভালরির পুলক অনুভব করত, তারাও কোনদিন লীলা মিত্রের প্রক্সি দিতে সাহস পেত না।

এ থেকে মনে হতে পারে, লীলা মিত্র অসাধারণ সুন্দরী ছিল। না, তা নয়। রঙ কালোর দিকেই—চলনসই চেহারা। পড়াশুনোতেও সাধারণ ধরনের। সাহিত্যে বা সঙ্গীতে তার যে কোন বিশেষ দক্ষতা আছে, সে পরিচয়ও কেউ পায়নি। তবু সব মিলিয়ে কী যে তার মধ্যে ছিল—তার উপর চোখ না পড়েই পারত না।

এখন বুঝতে পারি, ওটা ব্যক্তিত্ব। খুব সাধারণ কথা—খুব সহজে বলে ফেললুম। কিন্তু জিনিসটা অত সহজ নয়। চেহারায় বৈশিষ্ট্য অনেকেরই থাকে—কিন্তু ব্যক্তিত্ব হল 'কোটিকে গুটিক'! চেহারা থেকে অনেকেরই স্বভাব ফুটে ওঠে, কিন্তু চরিত্রের দীপ্তি জ্বলে ওঠে না। লীলা মিত্রের মুখে ছিল চরিত্রের শিখা—তা থেকে ছড়িয়ে পড়ত ব্যক্তিত্বের আলো।

শুনেছি, অ-বাঙালীরা নাকি বাঙালী মেয়েদের পছন্দ করেন। আমার মনে হয়, বাঙালী মেয়ের চোখই হচ্ছে তার প্রধান কারণ। কারও চোখ গাছের পাতায় শিশিরের মতো কান্নাকে ছুঁয়েই আছে, একটু ছোঁয়া লাগলেই টুপটাপ করে ঝরে পড়বে। কেউ বা রবীন্দ্রনাথের 'আনমনা'—নিদ্রা-নীরব রাত্রে অন্ধকার শালের বনে ঝিঁঝির ডাকের মতো সুরবাঁধা সান্ত্বনাই হয়ত তার মগ্ন চোখকে জাগিয়ে তুলতে পারে ; কারও বা মনের বসন্ত ছায়া-আলোতে কালো তারার উপরে কেঁপে কেঁপে উঠছে ; কারও চোখ কঠিন-গম্ভীর—অনেক পরীক্ষা দিয়ে তবে তার মনের দরজায় পৌঁছনো যাবে।

কথাগুলো যদি রোমান্টিক শুনিয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন। এভাবে ছাড়া লীলা মিত্রকে আমি বোঝাতে পারতুম না। তার চোখের একটা আলো ছিল—উপমা দিয়ে বলতে পারি, হীরের আলো। তা হীরের বাইরে জ্বলছে না ; হীরের ভেতরেও নয়—ভেতরে বাইরে সবটাই জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। যে সহজ, উজ্জ্বল, তাকে বুঝতে, তাকে চিনতে এক মিনিটও দেরি হয় না।

একটা উদাহরণ দিই। খুব বৃষ্টি নেমেছে একদিন। ছুটির পরে আমরা অনেকেই আটকে পড়েছি, কারণ সামনের পার্কটার ভেতর দিয়ে শর্টকাট করলেও ট্রাম লাইন পর্যন্ত পৌঁছতেই ভিজিয়ে একেবারে ভূত করে দেবে।

ছাতা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল লীলা মিত্র। একটি ছেলে ফস করে বলে ফেলল, 'ইস্, ছাতার তলায় যদি এগিয়ে দিত ট্রাম পর্যন্ত।'

তখুনি ফিরে দাঁড়াল লীলা। বললে, 'আসুন।'

ছেলেটা অপ্রস্তুতের একশেষ। জিভ কেটে বললে, 'কিছু মনে করবেন না—ঠাট্টা করেছিলুম।'

'ঠাট্টা কেন হবে ? আসুন না—এগিয়ে দিই।'

'না না, ছোট ছাতা আপনার, দুজনেই ভিজব।'

'আধখানা করে ভিজব। একা যেতে গেলে আপনি সবটাই ভিজবেন। আসুন—'

লীলার চোখে সেই সহজ, উজ্জ্বল—সেই হীরের আলোটা জ্বলছিল। বাধ্য হয়ে এগোল ছেলেটা। কোন বলির পাঁটাকেও অমন অনিচ্ছার সঙ্গে হাড়িকাঠের দিকে এগোতে দেখিনি।

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে ওর দুর্গতি দেখছিলুম। বেচারার ট্র্যাজেডি ওখানেই শেষ নয়। ওইটুকু লেডীজ ছাতার তলায় সে যত স্পর্শ বাঁচাতে চেষ্টা করে—লীলা তত বেশী রক্ষা করতে চায় তাকে। শেষ পর্যন্ত আর পারল না—অর্ধেকটা যেতে-না-যেতেই টেনে দৌড় লাগাল, এক লাফে উঠে পড়ল একটা চলন্ত ট্রামে।

এই রকম কোন মেয়ে কি আমাদের মনে কোন রোমান্স সৃষ্টি করতে পারে? এত স্পষ্ট—এত সহজ? বোধ হয় না। এমনি একটি মেয়েকে আমরা পেতে চাই যে পাতায় ঢাকা ফুলের মতো—এক-একটি করে পাতা সরিয়ে যাকে দিনের পর দিন আবিষ্কার করতে হয়। সেই একটু-একটু করে জানার আকুলতাই প্রেম, সেই তিলে তিলে অবগুণ্ঠন সরানোই রোমান্স। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যাকে চেনা হয়ে গেল, সে অন্তরঙ্গা হতে পারে, অন্তরতমা হয় না।

আজ বুঝতে পারি, লীলা মিত্র সম্পর্কেও এইটিই আমরা অবচেতনভাবে অনুভব করে-ছিলুম। আমরা জানতুম, ও আশ্চর্য। ওর জন্যে আসবে আলাদা পুরুষ—একটি চরিত্র, একটি ব্যক্তিত্ব। আবরণ মোচন করবার ধৈর্য যার নেই—সে এসেই হাত বাড়িয়ে ওকে জয় করে নেবে। ভীরু চিত্তে অর্ঘ্য সাজাবে না—সঙ্গে সঙ্গে দাবি জানাবে।

লীলাকে একটু বিশেষভাবেই জানতুম আমি। জানবার কারণও ছিল।

একদিন আবিষ্কার করলুম, আমাদের স্টপ থেকেই ও ট্রামে উঠছে। আরও আবিষ্কার করলুম, পাড়ায়, যে বিরাট একটা চারতলা নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে, তারই একটা ফ্ল্যাটে ভাড়াটে হয়ে এসেছে ওরা।

এক সঙ্গেই প্রায় কলেজে আসি—একই ট্রামে প্রায়ই ফিরতে হয়। ট্রামেই আলাপ হল।

অফিস-ফেরত ভিড়, লেডীজ সীটে বসবার জায়গা পেয়েছে লীলা—আমি রড ধরে দাঁড়িয়ে আছি কাছাকাছিই। এমন সময় লীলার পাশের মেয়েটি নেমে গেল। স্পষ্ট, পরিষ্কার গলায় লীলা আমাকে বললে, 'আসুন, বসুন না এখানে।'

আমি বসে পড়লুম। ছাতার তলা থেকে পালানো সেই দুর্বলচিত্ত ছেলেটার মতো আমি নই। আমি জানতুম, লীলা এত সহজ—এত স্পষ্ট যে, ওর সম্পর্কে কোন দ্বিধার প্রশ্ন কোথাও নেই। ও যত সাধারণ, ততই অসাধারণ, যত কাছে, তত দুর্লভ। তাই ওর পাশে বসে স্বচ্ছন্দে গল্প করতে পারি—তাতে আমারও ভয় নেই, ওরও ভাবনা নেই।

লীলা বললে, 'আপনাদের পাড়ায় এসেছি—জানেন তো?'

'জানি। উনিশ নম্বরের একটি ফ্ল্যাটে আছেন।'

'তেতলায় উঠে ডানদিকের ফ্ল্যাটটা। আসুন না একদিন। আমারও স্বার্থ আছে।'

'কী স্বার্থ বলুন।'

'আপনি ইংরেজী অনার্সের ছাত্র। আমার বাবার ইংরেজীকে দারুণ ভয়। ডি-কুইন্সি একদম বুঝতে পারি না। দেবেন একটু পড়িয়ে?'

এইভাবে আলাপ। তারপরে ওদের বাড়িতেও আসা যাওয়া চলত। লীলার বাবা ছিলেন না। দাদা একটা ভালো গোছের চাকরি করতেন রাইটার্স বিল্ডিঙে—স্বল্পভাষী মানুষ, অবসর সময়ে বসে বিলিতী পত্রিকার ক্রশ-ওয়ার্ড নিয়ে মাথা ঘামাতেন। মা ছিলেন কোন্ এক জমিদারবাড়ির মেয়ে—বাপের বাড়িতে হাতি ছিল, তার গল্প করতেন, ওর বৌদি ক্লাসিক্যাল গান গাইতেন, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারতুম ও বস্তু তাঁর কোনদিন হবার নয়। ফার্স্ট-ইয়ারে পড়া লীলার ছোট ভাই ডন ব্র্যাডমান হওয়ার স্বপ্ন দেখত আর লীলার প্রকাণ্ড মোটা দিদি মধ্যে মধ্যে মুখভর্তি পান চিবোতে চিবোতে শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা বড় মোটরে চেপে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে আসতেন।

এইটে বুঝেছিলুম, পরিবারটা একটু দাম্ভিক, একটু স্বতন্ত্র। ওর মা এসে গল্প করতেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক কথার ভেতরে বাপের বাড়ির হাতিটা এসে উঁকি মারত। বাকি সবাই স্বল্পভাষী, সবাই আত্মকেন্দ্রিক! লীলার বড়দির সঙ্গে অবশ্য আমার কথাবার্তার সুযোগ হয়নি।

আপনি বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছেন। ভাবছেন, 'তিলত্তমা' দিয়ে আরম্ভ করে আমি এ কোন্ শিবের গীতে এসে পৌঁছেছি! কিন্তু এই পরিবারের যে একটা চাপা অহমিকা—একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ—লীলা সেইটেকেই নিজের মধ্যে আশ্চর্য সহজ অথচ অদ্ভুত সুদূরতায় রূপায়িত করেছিল। এদের মনে আভিজাত্যের যে অঙ্গার ধিকিধিকি করছে, সেইটেই জ্বলতে জ্বলতে লীলার ক্ষেত্রে হীরে হয়ে উঠেছিল।

ডি-কুইনসি পড়েছি, নিও রোম্যান্টিক কবিদের নিয়ে আলোচনা করেছি, ব্যাখ্যা করেছি ম্যাথিউ আর্নল্ড, শেক্সপীঅরের সূত্র ধরে ধরে জার্মান স্কলারদের কাছাকাছি পৌঁছেছি। ভালোই লাগত। নিজেরও পড়াশোনা হত। লেখাপড়ায় লীলা যতই সাধারণ হোক, সেই অসাধারণ মেয়ের কাছে আমি অন্তত সাধারণ হতে পারতুম না। আত্মমর্যাদায় বাধত।

বন্ধুরা আমাদের অন্তরঙ্গতার খবর জানত। কিন্তু এ নিয়ে কেউ একটা হাল্কা ঠাট্টাও কোনোদিন করেননি। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' বলতুম। তবুও এ-কথা কারও মনে

হয়নি—একান্ত সহজ পরিচয় ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

শেষ পর্যন্ত সেই অসাধারণ এল সোমেন দে চৌধুরী। এই 'তিলঙ্গমা'র কবি।

কী বললেন? এইরকম অদ্ভুত কবিতা লিখে সে লীলা মিত্রের মন জয় করেছিল? না—না। সোমেন দে চৌধুরী তখন কবিতা লিখত না। কবিতা সে পড়ত বলেও মনে হয় না। যুদ্ধের তখন প্রথম মুখ—সে এয়ারফোর্সে চাকরি নিয়েছিল।

লীলাদের বাড়িতেই আলাপ। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, ব্রাইট। দূরসম্পর্কের কী আত্মীয়-তার সূত্রে আসা যাওয়া করত ওদের ওখানে। আর. এ. এফ-এর গল্প করত সোমেন। বলত, ওদের অভিজ্ঞতার কথা।

মালয়ের যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি। কলকাতার আলো তখনও ব্ল্যাক আউটের ঠোঙা পরেনি। ওদের তখন ট্রেনিং আর মহলা। সোমেন এমনভাবে তারই গল্প জমিয়ে বলতে থাকত যে শুনে রোমাঞ্চ হত।

আর সেই গল্প শুনতে শুনতে লীলার দিকে দৃষ্টি পড়ত আমার। দেখতুম হীরের আলোর উপর আর-একটা কিসের আভা পড়েছে।

বলত, 'ভয় করে না সোমেনবাবু?'

'কিসের ভয়?'

'প্যারাসুট জাম্পে বিপদের সম্ভাবনা নেই?'

'থাকবে না কেন? কর্ড টানলুম, প্যারাসুট হয়ত খুললই না। তার মানে সোজা পাঁচ-সাত হাজার ফুট থেকে মাটিতে আছড়ে পড়া। কিংবা কখনও আগেই খুলে গেল প্যারাসুট—ফেঁসে গেল ডানায় লেগে ব্যস্, আর দেখতে হল না!'

'এ তো মরণকে সঙ্গে নিয়ে চলা!'

তবু তো এ ট্রেনিং। এর পরে আছে অ্যাকচুয়াল অপারেশন। এনিমি এরিয়ায় যেতে হবে বোমা ফেলতে। অভ্যর্থনা করবে অ্যাক্ অ্যাক্ ব্যাটারি। ফাইটার প্লেন তাড়া করবে মেসিনগান নিয়ে। তখন জ্বলন্ত প্লেন নিয়ে আকাশ থেকে হেডলং ডাইভ—এণ্ড্ অফ এ মিটিওর!

লীলা কথা বলতে পারত না। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত সোমেনের দিকে—হীরের উপর আর-একটা কিসের ছায়া কাঁপত। আমি বুঝেছিলুম। ও ছায়া ভালোবাসার।

ডি-কুইনসি ছেড়ে লীলা সিনেমায় যেতে আরম্ভ করল। সোমেন কলকাতায় এলে ওর কলেজে আসা বন্ধ হয়ে যেত। রোল-কল করতে করতে অধ্যাপক হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতেন সেভেন্‌টি ফাইভ যথাস্থানে আছে কিনা; অনুপস্থিত মেয়েদের রোলে সাড়া দিয়ে যে-সব ছেলে শিভালরির পুলক অনুভব করে, তারাও ওর প্রক্সি দিতে সাহস পেত না।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার মতলব কী? পরীক্ষা দেবে না?'

'না।' পরিষ্কার জবাব দিলে লীলা।

'কী করবে তবে?'

'বিয়ে করব।'

'সোমেন দে চৌধুরীকে?

'নিশ্চয়। নইলে তোমাকে নাকি?' লীলা হেসে উঠল: 'তা হলে বিয়ের রাত্রেও তুমি আমাকে ডি-কুইনসি পড়াতে চেষ্টা করবে।'

আমিও হেসে বললুম, 'এক পাতা ইংরেজী লিখতে যার পাঁচটা গ্রামার আর স্পেলিঙের ভুল হয়—তার মতো বাজে ছাত্রীকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।'

লীলা ভ্রূকুটি করে বললে, 'আচ্ছা দেখব, কোন্ লেডী নেস্‌ফিল্ড তোমার বরাতে এসে জোটে।'

'দেখো। কিন্তু বিয়েটা কবে হচ্ছে?'

'হবে-হবে—এত ব্যস্ত কেন? ভোজের জন্যে এখুনি ছটফটিয়ে উঠেছ বুঝি? কায়েতের ছেলে হয়ে তুমি যে বামুনের নোলাকেও ছাড়িয়ে উঠলে!'

বেশী দিন দেরি করতে হল না। আরও মাস কয়েক বাদে অসাধারণ লীলা মিত্রের সঙ্গে অসাধারণ সোমেন দে চৌধুরীর বিয়ে হয়ে গেল। তারপর বছর চারেক আর খবর জানি না। এম. এ. পড়তে পড়তে একটা নিউজ এজেন্সির চাকরি নিয়ে লাহোরে চলে যাই। সেখান থেকে যখন কলকাতায় এই কাগজটায় এসে যোগ দিলুম, তখন লীলা দে চৌধুরী মন থেকে কোথায় মিলিয়ে গেছে! বর্মা মণিপুরের বনে জঙ্গলে লড়াই চলছে পুরোদমে—বোমার ভয়ে অন্ধকার কলকাতা প্রায় জনশূন্য। মিত্রশক্তির অবিমিশ্র মিথ্যে প্রোপ্যাগাণ্ডা সত্ত্বেও বেশ বোঝা যাচ্ছে বাংলা দেশের অবস্থা খুব আশ্বাস পাওয়ার মতো নয়। ওদিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গর্জন উঠছে রেডিয়োতে। সারা ভারতবর্ষের স্নায়ু থরথর করে কাঁপছে—তখন কোথায় লীলা কোথায় কে?

একদিন ওর দাদার সঙ্গে ট্রামে দেখা হয়েছিল।

'ভালো আছেন?'

'ভালো আছি।'

লীলার কথাটা জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবতে ভাবতে দেখলুম, আমার টার্মিনাস এসে গেছে। নেমে পড়তে হল। আর তখুনি শুনলুম পাশের পানের দোকানের রেডিয়োতে উইনস্টন চার্চিলের বক্তৃতার 'রিলে' চলছে। 'দরকার হলে আমরা ইংলিশ চ্যানেলের জলে নেমে যুদ্ধ করব, তবু নাৎসীদের কোনও শর্ত গ্রহণ করব না।'

আর আমার মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বোমারু উড়ে গেল—খুব সম্ভব ফ্রন্টের

দিকে। লীলার কথা ভাববার মতো সময় কোথায় তখন?

আরও অনেক জল গড়িয়ে গেল তারপর। আরও আট বছর। যুদ্ধ শেষ; দাঙ্গা, স্বাধীনতা, পাকিস্তান, রিফিউজি সমস্যা। আবার একদিন লীলার দাদার সঙ্গে দেখা ড্যালহাউসি স্কোয়ারে।

'এই যে, চিনতে পারেন?' ভদ্রলোক নিজেই আমাকে সম্ভাষণ করলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক বদলে গেছেন লীলার দাদা। মাথার আধখানা জুড়ে টাক পড়েছে, রগের দুধারে চিকচিক করছে দু গোছা সাদা চুল। চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত আবার কোমল, সেই চাপা অহমিকার দীপ্তিটা নিভে গেছে। বোঝা যায় এর মধ্যে অনেক পোড় খেয়েছেন, জীবনের দায় অনেক বেশী চেপে বসেছে, আরও একজন সাধারণ চাকুরে বাঙালীর সঙ্গে তাঁর আর কোনও পার্থক্য অবশিষ্ট নেই।

বলা দরকার, আমি যখন লাহোরে, তখনই বাবা উত্তর ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় এসে বাসা নিয়েছিলেন।

বললুম, 'চিনতে পারব না কেন? ভালো আছেন।'

ভদ্রলোক একটা আধপোড়া চুরুট বের করে ধরালেন। বললেন, 'ভালো আর কি করে থাকা যাবে মশাই—যা দিনকাল।'

ওই সর্বজনীন ক্ষোভের জেরটা আমি আর টানলুম না। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলুম, 'এখনও এই শ্যামবাজার অঞ্চলেই আছেন?'

'হ্যা, সেই ফ্ল্যাটেই। ভাড়া অবশ্য অনেক বাড়িয়েছে। এই বাড়িওয়ালাগুলো যা হয়েছে, বুঝলেন—'

আবার সেই মধ্যবিত্ত অসন্তোষের গুঞ্জন।

আমি সংক্ষেপে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'তা বটে। ভালো কথা, লীলার খবর কি? কেমন আছে? কোথায় আছে সে?'

লীলার দাদার মুখে ছায়া পড়ল।

'আপনি জানেন না? খুব স্যাড ব্যাপার—বুঝলেন!'

আমার বুকের ভিতর দোল খেয়ে উঠল। লীলা কি মারা গেছে?

ভদ্রলোক বোধহয় আমার মনের চেহারাটা দেখতে পেলেন। বললেন, 'লীলা এখন কলকাতাতে আছে—আমাদেরই ওই বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটেই থাকে। কিন্তু জীবনটা ওর একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে? আমি আবার চমকে উঠলুম—আর-একটা সম্ভাবনা তৎক্ষণাৎ দেখা দিল সামনে। আর.এ.এফ.-এ যোগ দিয়েছিল সোমেন দে চৌধুরী। তা হলে কি একদিন কৌতুকের ছলে যে কথা বলেছিল, সেইটেই সত্য হয়েছে শেষ পর্যন্ত?

জলন্ত বিমান নিয়ে সে মিলিয়ে গেছে আরাকানের কোন দুর্গম জঙ্গলে কিংবা বে অব বেঙ্গলের হাঙরে-ভরা কালো জলে ? দি এণ্ড অফ এ মিটিওর ?

'সোমেন পাগল হয়ে গেছে।'

'পাগল !'

লীলার মৃত্যু নয়—সোমেনের মৃত্যু নয়—তারও চাইতে বড়, তারও চাইতে অনেক ভয়ঙ্কর আঘাত। লীলা মিত্রের এই ইতিহাস সেদিন কলেজের দু হাজার ছেলে-মেয়েদের একজনও কি কল্পনা করতে পারত ? ভাবতে পারতেন কোন অধ্যাপক—রোল-কল করতে করতে যার চোখ নিজের অজ্ঞাতেই একটি বিশেষ জায়গায় ঘুরে আসত একবার ?

'আর বলেন কেন—স্রেফ উন্মাদ। পারেন তো একবার যাবেন, আপনাদের দেখলে তবু মেয়েটা একটুখানি সান্ত্বনা পাবে। আপনাকে ও খুব শ্রদ্ধা করত !'

সামনের বাসটার দিকে দ্রুত এগোতে এগোতে বললেন, 'আচ্ছা নমস্কার।'

কিন্তু আমি আর নড়তে পারলুম না। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ওখানে।

ভেবেছিলুম যাব না, লীলার মতো মেয়ের এত বড় দুর্ভাগ্যের চেহারাটা কোনমতেই আমি সইতে পারব না। তবু যেতে হল। একটা কঠিন টান পড়েছিল বুকের নাড়ীতে।

আমাকে দেখে লীলা হাসতে চেষ্টা করল। বললে, 'এস কমল। এক যুগ পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে।'

লীলার চোখের দিকে তাকালুম। সেই হীরে দুটোর উপরে যেন ধুলোর স্তর জমেছে—যে আলো না বাইরে না ভেতরে সেই অপরূপ জ্যোতির্ময়তার উপরে নেমে এসেছে একটা অস্বচ্ছ আবরণ। আর ওরও সিঁথির একটা পাকা চুল রূপোর তারের মতো চিকচিক করে জ্বলছে।

জোর করে বললুম, 'ভালো আছ লীলা ?'

'খুব ভালো আছি।'

ঠাট্টা করছে ? নিজের তিক্ততাকে বোঝাতে চাইছে 'খুব ভালো'র উপর জোর দিয়ে ? কিন্তু তা তো নয়। স্পষ্ট, স্বাভাবিক ভাষায় বলছে—চমৎকার আছে সে।

'বোসো, চা আনি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে লীলা একবার থমকে দাঁড়ালো : 'ওর সঙ্গে তোমাকে দেখা করিয়ে দেবার উপায় নেই, উনি আজকাল নিজের সাধনা নিয়েই রাতদিন থাকেন, কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

লীলার দাদার কথা কানে বেজে উঠল। সোমেন পাগল হয়ে গেছে। অথচ লীলা

তো সে কথা বলল না! সোমেন সাধনা করছে—বরং এই কথাটা বলতে একটা চাপা গর্বের আলোয় মুখ ভরে উঠল তার।

আমি কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই লীলা চা আনতে গেল।

তারপর সব কথা শুনলুম চা খেতে খেতে।

যুদ্ধ থামবার পর স্বাধীন ভারতে সোমেন পোস্টেড্ হয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে। সেখানেই ক্রমশ তার ভাবান্তর ঘটতে থাকে। রাতদিন চুপচাপ বসে থাকে, কাজকর্ম করে না, আর কেবল বলে, 'ইস্—রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন! তা হলে ভারতবর্ষের রইল কী!'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে—না, ঠিক আমার মুখের দিকে নয়—আমাকে পার হয়ে লীলার চোখ সুদূরের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল: 'ওরা ওকে ছাড়িয়ে দিলে। বললে, মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট। বুঝল না—উনি একটা নতুন জগতে চলে এসেছেন। ওঁর অসামান্য শক্তি একটা নতুন মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।'

লীলা বলে চলল, 'আমরা কলকাতায় এলুম। আর যেদিনই এলুম—সেইদিনই উনি চলে গেলেন নিমতলার শ্মশানঘাটে। যেখানে রবীন্দ্রনাথকে দাহ করা হয়েছিল, এক মুঠো মাটি তুলে আনলেন সেখান থেকে। তারপর থেকে রোজ ভোরে সেই মাটির একটা ফোঁটা কপালে পরে উনি কবিতা লিখতে বসেন। সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কবিতা লিখে চলেন। অদ্ভুত—অসাধারণ সে কবিতা। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো কবি সে-রকম কবিতা কখনও লিখতে পারেননি। দেখবে দু-একটা?'

লীলা উঠে গেল, ফিরে এল চমৎকার নীল কাগজে মুক্তোর মতো হরফে লেখা কতগুলো কবিতা নিয়ে। সে কবিতাগুলো কী রকম, আশা করি, তা আপনাকে আর বলবার দরকার নেই। 'তিলজমা'র পাতা খুলেই বোধ হয় আপনি তার কিছু পরিচয় পেয়েছেন।

আমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। আমি স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলুম কাগজগুলোর দিকে।

লীলা বললে, 'জানো—বড় প্রতিভাকে কেউ বুঝতে পারে না, তাকে তুচ্ছ করে তাকে অপমান করে। সেইটেই হল মূর্খের সান্ত্বনা—তার আত্মতৃপ্তি। দাদা বলে, ওর মাথা খারাপ; বউদি বলে, রাঁচীতে পাঠানোর কথা; মা কাঁদেন, বলেন, লীলার সর্বনাশ হয়ে গেল! কিন্তু আমি কেমন করে ওদের বোঝাব ওর এই আশ্চর্য সৃষ্টি একদিন পৃথিবীতে হয়ত যুগান্তর আনবে—হয়ত নোবেল-প্রাইজের মতো সম্মান ওঁরও জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

আমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। আমি শুধু ভাবছিলুম, অসাধারণ লীলা মিত্র

কিছুতেই হার মানবে না : যে অসামান্য পুরুষকে সে জীবনে বেছে নিয়েছিল, একবিন্দু ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না তার মহিমা।

লীলা বললে, 'দাদা বলে, পাগলই যদি না হবে—তবে কেন অমন ছাইপাঁশ লেখে—যার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না ? আমি বলি, এ তোমার ক্রসওয়ার্ড পাজল নয় যে 'মুড' আর 'হুডে'র সমাধান করতে পারলেই হল। বউদি আরও ব্লাণ্টলি বলে, মাথা খারাপ না হলে তোমার গায়ে কেন হাত তোলে ? আমি জবাব দিই, লেখার ধ্যানে ও যখন ডুবে থাকে তখন আমি গিয়ে খাওয়াদাওয়া নিয়ে ওকে বিরক্ত করি—ওর চিন্তার সুতো কেটে যায়—মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। যারা সত্যিকারের শিল্পী, তারা এমন করে সংসারের হিসেব মেনে চলে না।'

এইবার আমার চোখে পড়ল। লীলার গলার কাছে একটা বন্যজন্তুর আঁচড়ের মতো কতগুলো নখের দাগ শুকিয়ে আছে। ওটা যে কিসের তা আর জিজ্ঞেস করবার দরকার ছিল না।

'তুমিই বল কমল! সাহিত্যের ভাল ছাত্র তুমি, শুনেছি লেখক হিসেবেও তোমার খুব নাম হয়েছে এখন। এগুলো কি সত্যিই পাগলের প্রলাপ ? এগুলো কি সেই রকমের কবিতা নয়—যা সব ভাষা, ছন্দ, সংস্কারকে ছাপিয়ে নিজের ইতিহাস তৈরী করতে চলেছে ?'

আমি দেখলুম, দুটো হীরের উপর সেই অস্বচ্ছ আবরণটা কাঁপছে। যে আলো না-বাইরে না-ভিতরে, স্থির জ্যোতির্ময়তার মহিমায় যা এতদিন সমুজ্জ্বল হয়ে থাকত—এখন মনে হল, সেটা একটা প্রদীপের ম্লান শিখায় পরিণত হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমিই ওটাকে নিবিয়ে দিতে পারি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'তুমি ঠিকই বুঝেছ লীলা। তোমার পরের কথাটাই সত্যি।'

দেখলুম, অনেক বছর আগেকার হীরক-দীপ্তি আবার ঝকমক করে উঠল। লীলার গলায় নখের হিংস্র আঁচড়গুলোকে একটা দুর্মূল্য গজমোতির হারের মতো মনে হল এখন।

লীলা বললে, 'আমি ওর একটা পাণ্ডুলিপি ছাপব কমল। তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

একবারের জন্যে আমি দ্বিধা করলুম। তারপর লীলার চোখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে বললুম, 'সে তো খুব ভালো কথা। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।'

সাংবাদিক-বন্ধু চুরুটটাকে অ্যাশ-ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এই সেই কাব্য—"তিলত্তমা"। আপনি ভাববেন না—এ সমালোচনা ছাপা হবে না কোথাও। শুধু এর একটি কপি থাকবে লীলা দে চৌধুরীর কাছে। সোমেনের পরেই পৃথিবীতে আমাকে সে

সব চাইতে বিশ্বাস করে—তুনিয়ার সবাই চিৎকার করে সোমেনকে পাগল বললেও আসাধারণ লীলা জানবে, সোমেনের এই অসমাপ্ত কবিতা একদিন বিশ্বসাহিত্যে বিপ্লব আনবে।'

একটু হেসে বন্ধু আবার জুড়ে দিলেন : 'আর কে বলতে পারে ভবিষ্যতের সমালোচক এই কবিতার মধ্যেই আরও বড় বোদলেয়ার, আরও বড় জেমস জয়েসের সন্ধান পাবেন কিনা!'

কথাটা ঠাট্টা, কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমি আর এবার হাসতে পারলুম না।

মহলা

অভিমন্যু চৌধুরী বড আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মেক-আপ করছিল। আজকের অভিনয়ের সে-ই নায়ক, পরিচালক—এক কথায় তার হাতেই সব। প্রিয়দর্শন দীর্ঘ চেহারার অভিমন্যু চৌধুরীকে ঠিক রূপকথার রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল।

নিজের হাতেই মেক-আপ নিচ্ছিল। বরাবরই নেয়।

মাথার ঠিক উপরেই একশো পাওয়ারের আলোটা ঝুলছে। সেই আলোয় গোঁফের রেখাটা ঠিক করে নিতে নিতে অভিমন্যু ভুরু কুঁচকে পেছন ফিরল। বুড়ো চাকরের মোটা পরচুলা আর ঝাঁকড়া গোঁফ-পরা হরিশ এসে দাঁড়িয়েছে।

'কেমন হয়েছে অভিমন্যুদা?'

চোখ কুঁচকে একবার হরিশকে ভাল করে দেখে নিলে অভিমন্যু। তারপর বললে, 'বাঁদিকের গালে একটা আঁচিল বসিয়ে নাও গে। এই-মাঝারি সাইজের।'

হরিশ চলে যাচ্ছিল, অভিমন্যু পিছু ডাকল।

'অর্কেস্টা রেডি?'

'হ্যাঁ, তৈরী হয়ে গেছে।'

'লাইটিঙের চার্ট?'

'ওটা কমলদার কাছে। সে-ই থাকবে লাইট বোর্ডের কাছে।'

'ঠিক আছে।' একটু ভেবে অভিমন্যু বললে, 'ওপনিং সিনের মিক্‌স্‌ড্ লাইটিং ইয়েলো আর ব্লুর এফেক্‌ট্ বেশ ভালো করে বলে দিয়ো কমলকে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, মেয়েদের কতদূর?'

'শুধু রেবা সরখেলের ভৈরবী বাকি। ও তো সেকেণ্ড অ্যাক্টের শেষের দিকে।' হরিশ এক মুহূর্তের জন্য চুপ করল, তারপর বললে, 'একটা কথা বলব অভিমন্যুদা?'

'আবার কী হল?'

'সবাই বলছে, জয়ন্তীই আজকের নাটক ডোবাবে। কেন যে শেষে ওকেই অভিমন্যুদা হিরোয়িন করলেন!'

অভিমন্যুর দু'চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠল।

'কেন হিরোয়িন করলাম? তোমরা জানো না সে-কথা? ঠিক ওই রকম পার্টের জন্য মেয়ে কোথায় পাচ্ছিলে শুনি? নাটকের নায়িকার বর্ণনার সঙ্গে জয়ন্তীই তো হুবহু মিলে যায়।'

'তা মিলে যায় বটে।' হরিশ মাথা চুলকালো: 'কিন্তু অ্যাক্টিং—'

'স্টেজে নামলেই খুলে যাবে, কিছু ভেবো না।'

'না, ভাববার আর কী আছে।' হরিশ একবার দ্বিধা করল: 'তবে কিনা কৃষ্ণা বোসকে পার্টটা দিলে—'

'হুঁ, অ্যাক্টিং ভালো হত, কিন্তু নায়িকার দিদিমার মতো দেখাত। আর আমার তাতে অভিনয় করা সম্ভব হত না।' অভিমন্যু আবার আয়নার দিকে মুখ ফেরালো: 'যাও, কিছু ভাবতে হবে না। দায়িত্ব যখন আমার, তখন আমিই সব দেখব। জয়ন্তীর অভিনয় যদি খারাপ হয়, তারপরে যা বলবার বোলো, এখন নয়।'

হরিশ বেরিয়ে গেল। খুশী হয়ে গেল না।

অভিমন্যু কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তেল আর আঠার গন্ধ। পারা-ওঠা আয়নার ভেতর থেকে যেন কতগুলো ক্ষতচিহ্ন উঁকি মারছে। ফ্রেমের গায়ে পেন্টের দাগ, কাচের ওপর পাউডারের গুঁড়ো জমে আছে। খানিকটা ক্রেপ তুলে নিয়ে আঙুলে জড়াতে জড়াতে ভাবতে লাগল অভিমন্যু।

সত্যিই কি কাজটা ভালো হল না? সত্যিই কি ক্লাবের সকলের মতের বিরুদ্ধে জয়ন্তীকে পার্ট দেওয়া তার অন্যায় হয়েছে? অথচ, তখন যেন কেমন রোখ চেপে গিয়েছিল।

সবাই বলেছিল, কৃষ্ণা বোসকেই নেওয়া হোক। ঠিক কথা, কৃষ্ণা অভিনয় ভালো করে, অ্যামেচার মহলে তার দুর্দান্ত নামডাক। কিন্তু ত্রিশ-পেরুনো কৃষ্ণাকে অভিমন্যু কিছুতেই পাড়াগাঁয়ের সপ্তদশী কিশোরী বলে ভাবতে পারেনি। কৃষ্ণার কালি-পড়া অভিজ্ঞ চোখের দিকে তাকিয়ে সে কিছুতেই এই ডায়ালগ বলতে পারে না: সত্যি বল তো, রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলির চোখ দুটি তুমি কোথায় পেলে?

অতএব একদিন আনকোরা জয়ন্তী এসে ঢুকল। বিধবা মায়ের মেয়ে, ভাইয়ের সামান্য রোজগারে দিন চলে না। ক্লাবের নামডাক আছে, এখানকার আবহাওয়া ভালো—তাই মা কয়েকটা টাকার আশায় স্বল্প-শিক্ষিতা মেয়েকে পাঠিয়েছে অভিনয় করতে। শুনেছে, যদি নাম করতে পারে তাহলে অনেক অ্যামেচার পার্টি থেকে ডাক আসবে, মাসে দেড়শো-

দুশো টাকা রোজগার করাও অসম্ভব কিছু নয়।

একেবারে কাঁচা, একেবারেই ছেলেমানুষ।

সত্যিকারের সরল সপ্তদশী কিশোরী কি আর কিশোরীর অভিনয় করতে পারে? তার জন্যে একবারে আলাদা ধরনের লোক চাই। অথচ সেই অসাধ্যই সাধন করতে চেয়েছিল অভিমন্যু। সবাই যত বেশি করে বলেছে কৃষ্ণার কথা, অভিমন্যুর ততই জয়ন্তীর ওপর জেদ পড়েছে।

খেটেছে প্রাণপণে। তবুও কাল বোর্ড-রিহার্সালের সময় দুবার হেসে ফেলেছে জয়ন্তী, ভুল একজিট-এন্ট্রান্স নিয়েছে, সব চাইতে দারুণ ড্রামাটিক জায়গাগুলোতে ইমোশান নষ্ট করে ফেলেছে। ক্লাবের সবাই কোনো কথা বলেনি, কেবল মুখ টিপে টিপে হেসেছে দু-একজন। বেশ হবে, জব্দ হোক অভিমন্যু। অভিনয়ের সময় নিজের জেদের দাম তাকে দিতে হবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল অভিমন্যু; তারপর আঁকা গোঁফটায় সামান্য কিছু কারুকাজ করে মেক-আপ রুম থেকে বেরিয়ে এল।

ক্লাবের থিয়েটার—বোর্ডে গিজগিজ করছে লোক। যত কাজের, অকাজের তত বেশি। চা-সিগারেট হাসি কোলাহল। অভিমন্যু একটা ধমক দিলে।

'ভলান্টিয়ারেরা সব এখানে কেন? মিথ্যে ভিড় বাড়াচ্ছে কেবল। যাও যাও—গেটে যাও—'

মেয়েদের চা খাওয়াবার জন্যে যে দু-তিনজন অত্যুৎসাহে আনাগোনা করছিল তারা অভিমন্যুর চোখের দিকে তাকিয়েই স্টেজ-ডোরের দিকে ছুটল।

চারটি মেয়ে মেক-আপ নিয়ে এক কোনায় বেঞ্চিতে এসে বসেছে। তিনজন অভিজ্ঞ অ্যামেচার অভিনেত্রী। দুজনের বইটা আগে করা, তারা নিশ্চিন্তে হাসাহাসি করছিল। তাদের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল জয়ন্তী, তার দু চোখ ভয়ে ভরা, কপালে ঘামের বিন্দু।

একবার তাকিয়ে দেখল অভিমন্যু।

'ভয় হচ্ছে না তো জয়ন্তী?'

প্রাণপণে ভয়টাকে চাপতে চাপতে জয়ন্তী বললে, 'না।'

'তোমার মা দাদা এসেছেন। তাঁদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

অস্পষ্ট গলায় জয়ন্তী বললে, 'আচ্ছা। কিন্তু—' বেঞ্চি ছেড়ে উঠে জয়ন্তী অভিমন্যুর পাশে এসে দাঁড়ালো: 'সত্যি যদি পার্ট ভুলে যাই? যদি খুব খারাপ করি? তা হলে?'

কয়েক মুহূর্ত অভিমন্যু আবার জয়ন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্লাবের সকলের বিরুদ্ধে সে চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। কোনোমতেই হার মানতে পারবে না।

'এদিকে একটু এসো জয়ন্তী, কথা আছে।'

স্টেজের একেবারে পেছনে। একরাশ কাটপিস, ধুলো মাথা সিংহাসন, একটা আধ-ভাঙা টেবিলের উপর গোটা তিনেক লাল ভেলভেটের তাকিয়া। সামনে উঁচু প্রাচীর, পেছনে স্টেজের আড়াল। নির্জনতা আর আবছা আলো।

অভিমন্যু বললে, 'শোনো।'

এই নির্জন, অস্পষ্ট আলো, রূপবান অভিমন্যুর মেক-আপ করা রাজপুত্রের মতো চেহারা, আর তার অপূর্ব কোমল গলার স্বর—জয়ন্তীর রক্ত-চলাচল যেন বেড়ে গেল বুকের মধ্যে। ক্ষীণ স্বরে জয়ন্তী বললে, 'বলুন।'

চারদিকে একবার দেখে নিয়ে হঠাৎ মুঠোর ভিতর জয়ন্তীর একখানা হাত টেনে আনল অভিমন্যু। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল জয়ন্তী।

অভিমন্যু বললে, 'সকলের মতের বিরুদ্ধে তোমাকে নায়িকার পার্ট কেন দিয়েছিলাম—জানো?'

জয়ন্তী কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল কেবল।

'শুধু আজকের থিয়েটারেই নয়, আমার জীবনেও তোমাকে নায়িকা করতে চাই। জয়ন্তী, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

টলে প্রায় পড়ে যেতে চাইল জয়ন্তী। মেক-আপ করা মুখের ভেতর থেকে ফুটে বেরুল রক্তের উচ্ছ্বাস। অভিমন্যু শক্ত করে তার হাত ধরে রাখল।

'সেই ভালবাসার আজ পরীক্ষা, জয়ন্তী। আমার মান তোমাকে রাখতে হবে। পারবে না?'

প্রায় দু মিনিট পরে জয়ন্তী চোখ খুলল। সম্মোহনকারীর মতো তীব্র দৃষ্টিতে অভিমন্যু তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার ছোঁয়াতেই যেন জয়ন্তীর চোখ দুটোও আলো হয়ে উঠল।

রক্তাক্ত মুখে, দীপ্ত দৃষ্টিতে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে জয়ন্তী বললে, 'পারব।'

তেমনি সম্মোহন করার ভঙ্গিতে অভিমন্যু বললে, 'তবে চলো বোর্ডে। বেল পড়বে এক্ষুণি।'

রেসের ঘোড়াকে নাকি মদ খাইয়ে মাঠে নামাতে হয়। তার চাইতেও তীব্র, তারও চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর নেশা।

সেই নেশার ঘোরে অভিনয় করে চলল জয়ন্তী। আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য।

হাততালির পরে হাততালি।

হরিশ ছুটে এল: 'এ কি হচ্ছে অভিমন্যুদা? মির‍্যাকল নাকি? জয়ন্তী যে ফাটিয়ে দিলে!'

তীব্র গলায় অভিমন্যু বললে, 'থাক—থামো।'

হরিশ বুঝতে পারল না। হতভম্ব হয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

চরম হল একেবারে শেষের দৃশ্যে এসে।

পায়ের কাছে এসে বসে পড়বে নায়িকা। জলভরা দু চোখ তুলে বলবে: সবাই আমাকে ছেড়ে গেল। সংসারে কেউ কোথাও আমার রইল না। তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে? বলো—বলো—

পাগলের মতো ছুটে এল জয়ন্তী। পায়ের কাছে বসে পড়ল না, একেবারে আছড়ে পড়ল এসে। দু হাতে অভিমন্যুর পা জড়িয়ে ধরে, রুক্ষ চুল আর চোখের জলে একাকার হয়ে পাগলের মতো বলতে লাগল: বলো—বলো—তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না? বলো?

পুরো দু মিনিট প্রচণ্ডতম হাততালি। অডিটোরিয়ামে মেয়েদের চোখে শাড়ির আঁচল উঠে এল, পুরুষদের চোখে রুমাল। কে যেন অডিটোরিয়াম থেকে চিৎকার করে বললে, 'অদ্ভুত—অদ্ভুত! ইউনিক!'

ড্রপ পড়ল।

ক্লাবের মেম্বার আর বন্ধুবান্ধবদের ভিড়ে স্টেজ ভেঙে পড়বার উপক্রম।

'দারুণ হে অভিমন্যু—দারুণ! আর কী দুর্দান্ত অভিনয় করেছে জয়ন্তী।'

'রিয়্যালি, কৃষ্ণা এর কাছেও এগোতে পারত না।'

'অথচ, রিহার্সালে এর ওয়ান-ফোর্থও করতে পারেনি। আমরা তো ভেবেছিলুম, স্রেফ বসিয়েই দেবে। ডুববে ওর জন্যেই।'

'আরে আমি তো জানতুমই—' সব চাইতে যিনি বিরূপ ছিলেন জয়ন্তীর সম্পর্কে, সেই উকিল প্রসন্নবাবু এসে অভিমন্যুর পিঠে থাবড়া দিয়ে বললেন, 'আমি জানতুম, জহুরী জহর চেনে। অভিমন্যুর কখনো ভুল হয় না।'

ভিড় একটু কমলে, মাথা-মুখ ধুয়ে অভিমন্যু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। আয়নার ওপরে একশো পাওয়ারের আলো। সেই আলোয়, পেন্ট-লাগা ফ্রেম আর পাউডারের গুঁড়ো-মাখানো পারা-উঠে-যাওয়া আয়নার কাচে জয়ন্তীর ছায়া পড়ল।

'অভিমন্যুদা?'

অভিমন্যু মুখ ফেরালো।

'এখনো দাঁড়িয়ে কেন? খেয়ে নাও গে। তোমাদের সব ফিমেল আর্টিস্টকে নিয়ে এখুনি গাড়ি যাবে। টাকা পাওনি?'

জয়ন্তীর মুখ কালো হয়ে উঠল। বললে, 'টাকার জন্যে আসিনি।'

'তবে ? তবে আর কী চাই ?'

'আমি আজ তোমার সঙ্গে যাব। তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে।'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব!' হঠাৎ বিশ্রী ভাবে খেঁকিয়ে উঠল অভিমন্যু : 'খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই আমার! জিনিসপত্র গোছানো, হিসেব, সকলকে পাঠাবার বন্দোবস্ত—আমার ফিরতে রাত দুটো। এখন ইয়ার্কি দিলে আমার চলবে না। যাও, খেয়ে গাড়িতে ওঠো গে—আমাকে বিরক্ত কোরো না!'

রক্তহীন মুখে একমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়ন্তী। তারপর ছুটে পালালো।

আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অভিমন্যু। একটু নিষ্ঠুরতাই হল হয়তো। কিন্তু উপায় ছিল না। নেশা ধরিয়ে না দিলে রেসের ঘোড়া ছুটতে পারত না।

জয়ন্তীর ক্ষতি হল ? না—কিছুমাত্র না। এই তার সত্যিকারের মহলা। এর পর থেকে সম্পূর্ণ স্টেজ-ফ্রী হয়ে গেল সে, কোনো অভিনয়েই কোনোদিন তার আর আটকাবে না।

একটি চিঠি

তখন আমার বয়স সাত, তোমার এগারো। তখন আমি সুর করে পড়ি : 'তিনটে শালিক ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে' আর তুমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ো 'পঞ্চনদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে'। আমি যাই স্কুলের গাড়িতে চেপে বিনুনি দুলিয়ে, তুমি ছ্যাকড়া গাড়ির পেছনে উঠে পড়ো। স্কুলের রাস্তায় গাড়োয়ান চাবুক হাঁকালে টুপ করে নেমে যাও।

আমাদের পাশের বাড়িতে তুমি থাকতে। প্রায়ই খেলতে আসতে আমার সঙ্গে।

কী আর খেলা—পুতুল খেলা। আমার সইয়েরা বলত : পুরুষমানুষ মেয়েদের সঙ্গে খেলতে আসে, লজ্জা করে না ? অভিমানে ছলছল করে উঠত তোমার চোখ। সুন্দর টুকটুকে মুখখানা রাঙা হয়ে যেত।

তোমার হয়ে ওদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করতুম, বলতুম, খেলবে—বেশ করবে, তোদের কী তাতে! তোরা কেন বলিস ওকে ? শেষে সইয়েরা রাগ করে চলে গেল। আড়ি-আড়ি-আড়ি। আমিও হাত উলটে বললুম, সেই ভালো, আমিও আড়ি দিলাম। আর আসতে হবে না তোদের।

ওরা আর এল না।

না এলেও কোনো ক্ষতি হল না। আমার তো তুমি ছিলে। কী যে ভালো লাগতো

তোমার সঙ্গে খেলতে। তুমি আমার চাইতে কত বড়—কত বেশি পড়ো, কত ইংরেজি, কত অঙ্ক, কত ভূগোল। তবু তুমি পুঁতির মালা গাঁথতে পারতে না, পুতুলকে কাপড় পরাতে জানতে না। তোমার বোকামি দেখে আমার কী যে হাসি পেত। একদিন আনাড়িপনা করে মস্তবড় বৌ পুতুলটাকে তুমি ভেঙে ফেললে। আর কেউ ও কাজ করলে কেঁদে পাড়া মাথায়-করতুম, দুঃখে গড়াগড়ি খেতুম মাটিতে—যে ভেঙেছে তাকে আঁচড়ে কামড়ে একাকার করতুম। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। অস্বীকার করব না, চোখে আমার জল এসেছিল। তবু ফ্রকের কোণায় চোখ মুছে জোর করে হেসে বলেছিলুম, ভেঙেছে তাতে আর কী হয়েছে, বাবা আবার একটা কিনে দেবে আমায়।

তোমার কথা আলাদা। তোমার ওপর কিছুতেই আমি রাগ করতে পারি না।

সেদিন আমি বললুম, পুতুলের বিয়ে দেব।

শুনে তুমি ভারি খুসি হয়ে বললে, সে বেশ হবে, চমৎকার হবে।

তারপর সারা দুপুর তোমাতে আমাতে সে কি আয়োজন—কী ব্যস্ততা। একেবারে বিয়েবাড়ির আসল কর্তা-গিন্নীর মতো। বড়দি এসে হেসে বললে, খুকু, তোর খেলার সইটি কিন্তু জুটেছে ভালো।

তোমাকে ঠাট্টা করলে। তোমার ফর্সা গাল দুটো গোলাপী হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আমি রাগ করে বললুম, তুমি আমাদের খেলায় গোলমাল কোরো না বড়দি, আমি কিন্তু মাকে বলে দেব।

পুতুলের বিয়ের সব আয়োজন তো হল। কিন্তু ফুল কোথায়?

তাই তো ফুল কই?

তারপরে আমি সেই দুঃসাহসের কাজটা করলুম। বাবার টবে সেই অনেক যত্নে বাঁচানো গোলাপ গাছটায় দুটি ফুল ফুটেছে প্রথম। যখের ধনের মতো বাবা সে দুটোকে আগলে রাখেন।

সেই ফুল তুলে এনে পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমরা বর-কনের বাসর সাজালুম। চৌধুরীদের বাড়িতে যেমনভাবে ফুলশয্যা সাজাতে দেখেছিলুম, ঠিক তেমনি করে।

বিয়ে ভালোই হল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঘটল আর একটু পরে।

অফিস থেকে ফিরে বাবা দেখলেন, টবে ফুল নেই। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন। মিথ্যে কথা বলতে শিখিনি—স্বীকার করলুম। ঠাস্ ঠাস্ করে চড় পড়ল আমার গালে। আমার এই সাত বছর বয়েসে বাবার কাছে কখনো আমি এমনভাবে মার খাইনি—দুঃখে অভিমানে আমার কান্না পর্যন্ত এল না।

তুমি এলে পরদিন দুপুরে। আমার বেশ মনে আছে—রবিবার ছিল সে দিনটা।

খুব লেগেছিল না রে?

বাবার মার খেয়ে কাঁদিনি, তোমার স্নেহ সইতে পারলুম না। দু চোখ দিয়ে ঝরঝর জল নামল।

তুমি আমার চোখ মুছিয়ে দিলে আমারই শাড়ির ছোট্ট আঁচল দিয়ে। সেই আমার প্রথম শাড়ি—বাসন্তীরঙের ছোট্ট কাপড়টুকু আমার জন্মদিনে দিদিমা কিনে দিয়েছিলেন।

তুমি বললে, চল্ খুকু. আমরা ফুলের গাছ লাগাই। সেই গাছে ফুল হবে—পুতুলের বিয়েতে আর কারো ফুল নিতে হবে না।

কোত্থেকে একটা ছোট্ট টগর ফুলের চারা নিয়ে এলে, তুমিই জানো। আমাদের রান্নাঘরের পাশে, ছাইগাদার ধারে যে দু হাত জায়গাটুকু আছে, সেইখানে আমরা গাছ লাগালুম।

তারপর কত যত্ন, কত পরিচর্যা, কত জল ঢালা।

সবাই হাসত। বলত: আদরের চোটেই মরবে গাছটা।

কিন্তু মরল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিকড় ধরল মাটিতে। একটু একটু করে বড় হতে লাগল। ছেয়ে গেল নতুন কোমল পাতায় পাতায়।

তুমি আর আমি রোজ এসে দেখতুম। কবে এর ফুল ফুটবে—কত দেরি আছে আর!

ফুল আর ফুটতে পেলো কই। তার কত আগেই তোমার বাবা বদলি হয়ে গেলেন। ততদিনে আমাদের টগর গাছ মাটি থেকে এক হাত উঁচু হয়ে উঠেছে।

তোমাদের গাড়ি স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। দূর থেকে তুমি আমায় ডাক দিয়ে বললে, ফুলগাছটাকে দেখিস খুকু,—ফুল ফুটলেই আমায় খবর দিস।

তোমার মনে আছে, ফুল ফোটার খবর তোমায় দিয়েছিলুম। তোমারও জবাব এসেছিল। যাব—সুযোগ পেলেই যাব। দেখে আসব ফুল।

কিন্তু সুযোগ আর হবে কী করে। তুমি বড় শহরে গিয়ে বড় হলে একটু একটু করে—স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢুকলে। তোমার চিঠি বন্ধ হয়ে গেল। এই ছোট মফঃস্বল শহরের আরো ছোট একটি মেয়েকে কে আর মনে রাখে।

আমি কিন্তু মনে রেখেছিলুম। বছরের পরে বছর কাটতে লাগল, বারে বারে আমার টগর গাছটি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। আমি আর পুতুলের বিয়ে দিইনি—গাছের একটি ফুল তুলিনি, একটিও তুলতে দিইনি কাউকে।

বছরের পর বছর কাটল। আমি যে-বারে আই. এ. পড়ছি, বাবা মারা গেলেন। দাদা তাঁর স্ত্রী নিয়ে অমৃতসরে—আমাদের খোঁজ-খবর নিতে পারেন না—টাকা পয়সাও পাঠাতে পারেন না। আমার আর মার খাওয়া চলে না এমনি অবস্থা। বাধ্য হয়ে পড়া

ছাড়লুম। এখানকার গার্লস্ স্কুলে নিলুম চল্লিশ টাকার চাকরি।

জানো, এত দুঃখেও আমাদের গাছটাকে ভুলিনি। কত বড় হয়েছে—কী অজস্র ফুল ধরে। কিন্তু একটা ফুলও আমি কাউকেও নিতে দিই না। কত ভোরের আবছা আলোয়, কত ঝিমঝিম দুপুরে টগর ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে যায়—আমি চুপ করে বসে থাকি, দেখি পুতুলের বিয়ের স্বপ্ন। আর ভাবি, তুমি আসবে, নিশ্চয়ই আসবে একদিন। এখন আমার বয়েস কুড়ি, তোমার চব্বিশ। কী ছেলেমানুষি—স্তাখো সাত বছর বয়েসের স্বপ্নটাকে এখনো বুকের মধ্যে আঁকড়ে বসে আছি।

তারপর পরশু সেই কাণ্ডটা হল।

রবিবারের দুপুরবেলা স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখছি, হঠাৎ দেখি দুটি ছোট ছোট মেয়ে আমার টগর গাছ থেকে ফুল তুলছে। সামনের বাড়ির ভাড়াটেদের মেয়ে—নতুন এসেছে পাড়ায়।

রাগে অন্ধ হয়ে ছুটে গেলুম।

—কেন ফুল তুলছিস? কার হুকুমে?

ওরা কেঁদে ফেলল।

—পুতুল খেলার জন্যে—

—পুতুল খেলার জন্যে! হাত তুলেছিলুম, নেমে এল। শুধু বললুম, যা, বেরো এখান থেকে।

সেই পুরনো ইতিহাস। আবার তোমাকে মনে পড়ল। গাছটার দিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম। এমন সময় বাইরে জীপ গাড়ির শব্দ। দরজার কড়া নড়ল।

দরজা খুলে চমকে উঠলুম। মাথার হ্যাট নামিয়ে তুমি বললে, চিনতে পারো?

চিনেছি বইকি। জন্মান্তরের ওপারে হলেও চিনতে পারতুম। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার—কী স্বাস্থ্য, রূপ যেন ফেটে পড়ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলুম আমি।

মা ছুটে এলেন।

তুমি বললে, আমি এখানে সার্কল অফিসার হয়ে এসেছি। কাল জয়েন করেছি। ভাবলুম দেখা করে আসি আপনাদের সঙ্গে।

মা হেসে কেঁদে একাকার হলেন। কোথায় বসাবেন—কী খেতে দেবেন, কী ভাবে যে আপ্যায়ন করবেন। তারপর শুরু করলেন দুঃখের পাঁচালী।

তুমি গম্ভীর হলে, মাথা নাড়লে, দীর্ঘশ্বাস ফেললে, যা যা বলা উচিত সব বললে। এর মধ্যে মা একবার টগর গাছটার কথাও মনে করিয়ে দিলেন।

তুমি হেসে উঠলে, বললে, কী যে সব ছেলেমানুষি। তা গাছটা এখনো বেঁচে আছে? হাউ ফানি!

ফানি! কথাটা আমার বুকে গিয়ে বিঁধল। আরো বেশি করে বিঁধল যখন গাছটা একবার তুমি দেখতেও চাইলে না।

মা বললেন, চা আনি, খাও।

তুমি বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়ালে। বললে, না না, আজ থাক। একটু ব্যস্ত আছি, একবার ডি. সি.র ওখানে যেতে হবে। আমি তো এখন আছিই এখানে। আর একদিন এসে চা খাব।

মা বললেন বিয়ে করোনি বাবা?

তোমার সুন্দর গাল দুটো সেই ছেলেবেলার মতো রাঙা হয়ে উঠল। না, তুমি এত-দিনেও বদলাওনি। বললে, না।

মা বললেন, তা হলে করো এবারে।

তুমি তেমনি রাঙা মুখে বললে, হ্যাঁ—না করে আর উপায় নেই। মা ভারি বিরক্ত করছেন।

—মেয়ে ঠিক হয়েছে? মার গলায় কেমন একটা আশার সুর যেন বেজে উঠল, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তুমি মাথা নিচু করলে! বললে, তা একরকম ঠিকই আছে। মানে কলেজে, একজন আমাদের সঙ্গে—মানে আমার ক্লাসমেট ছিল—সে আবার এখান-কার ডি সি.র ভাগনী—

হঠাৎ যেন কেমন নিভে গেলেন মা। শুধু বললেন, ভালো, খুব ভালো!

আমি হেসে বললুম, আমাদের নিমন্ত্রণ করবেন না?

তোমাকে 'আপনি' বললুম, অথচ কিছু মনে করলে না তুমি। হেসে বললে, নিশ্চয়-নিশ্চয়, তোমরা না গেলে কি চলে? আচ্ছা কাকিমা—আজ তবে চলি।

আমাদের মফঃস্বল শহরের পথে ধুলোর ঝড় তুলে তোমার জীপ চলে গেল। মা চেয়ে রইলেন সেদিকে।

আজ যখন তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি, তখন সেই দুটি ছোট মেয়েকে ডেকে এনেছি নিজেই। ওদের বলেছি, ওরা ফুল নিয়ে যাক—ওদের পুতুলের বিয়ের জন্যে গাছ উজাড় করে নিয়ে যাক।

তোমাকে আমি এই চিঠি লিখছি কেবল একটা কথা বলবার জন্যে।

পুতুল খেলার জন্যে যে ফুলের গাছ লাগিয়েছিলুম—পুতুল খেলা ছাড়া তার ফুল আর কোনো কাজেই লাগে না। জীবনের নিয়মই তাই।

রেকর্ড

বৌবাজার স্ট্রীট আর শেয়ালদার মোড়ের কয়েকটি ছোট ছোট গলি দিয়ে, কিংবা স্কট্ লেনের পাশ কাটিয়ে একটি বিচিত্র বাজারে ঢোকা যায়। ইংরাজিতে তার ভদ্র নাম 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট'—চলতি বাংলায় 'চোরা বাজার'। একসময় বোধ হয় চোরাই জিনিসের বিক্রি-পাটা চলত এখানে—আজ সে পাট না থাকলেও অখ্যাতিটা আঁকড়ে বসেই আছে।

বৈঠকখানা মার্কেটের গাছপালার দোকানগুলি পার হলেই এই বাজারের সীমান্ত: এ অংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। নতুন পুরনো প্রচুর সস্তার জুতো, শোলা হ্যাট, ইলেক্‌ট্রিক হীটার, তাপ্পি-মারা স্টোভ আর লাল হয়ে যাওয়া দশ-বারো আনা সেরের চিংড়ি মাছ। এই অংশে দাঁড়ালেই নাকে আসবে স্পিরিট আর বার্নিশের গন্ধ—তারপর আপনি একেবারে ফার্নিচারের জগতে গিয়ে পৌঁছবেন।

নতুন পুরনো ফার্নিচারে দোকানগুলো ঠাসা। ল্যাজারাস কোম্পানির আদি বার্মা টীক রং ফিরিয়ে অপেক্ষা করে আছে। আবার চকচকে নতুন জিনিস এক নম্বর সি-পি ভেবে কিনে এনে ছ মাস পরে আবিষ্কার করবেন, কাঠটা বিশুদ্ধ জারুল। সস্তায় হয়তো খাঁটি মেহগনীর জিনিস পাবেন আবার প্রচুর পয়সা দিয়ে আলমারিটা এনে দেখলেন, ফাটা কাঠের ওপর বেমালুম বার্নিশ লাগিয়ে আপনার মাথায় কাঁটাল ভেঙেছে।

অর্থাৎ, রাস্তার লটারি। এক আনা দিয়ে কাঁটা ঘোরালেন—পেলেন তিনটি ছোট ছোট বিস্কুট; কিংবা কপালের জোর থাকল তো চন্দন সাবানই জুটে গেল একখানা।

তবু আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের এখানে লটারির টিকিটই কিনতে হয়। বৌবাজার কিংবা রিপন স্ট্রীটের দিকে পা বাড়াতে আমাদের সাহসে কুলোয় না।

আমি গিয়েছিলুম ছোট একটা বুককেসের সন্ধানে। মনের মতো কিছু পেলুম না। ফিরে আসছি, এমন সময় একটা দোকানের দিকে নজর পড়ল।

ফার্নিচারের দোকান নয়। 'বাবু কলকাতার' শেষ অভিজ্ঞান কতকগুলি গৃহসজ্জা। চীনেমাটির বড় বড় 'পট', গিল্ট-করা ফ্রেমে বিলিতি ছবি, দু-একটা শ্বেতপাথর কিংবা ইমিটেশন স্টোনের ছোট-বড় মূর্তি, ব্রোঞ্জের নর্তকী, পুরনো ফ্যাশানের আরো নানা টুকিটাকি। একটা চোঙাওলা গ্রামোফোনে হিন্দী গানের রেকর্ড বাজছিল, সেইটে কানে যেতে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।

হিন্দী গানের আকর্ষণে নয়। দেখলুম, স্তূপাকার পুরনো রেকর্ড। 'যেখানে দেখিবে ছাই'—এই মহাজন বাক্যে এখানে আমি লাভবান হয়েছি আগে। অর্থাৎ পুরনো রেকর্ডের ভেতর থেকে পেয়েছি অপ্রাপ্য রবীন্দ্র-কণ্ঠ, পেয়েছি রাধিকা গোস্বামীর

গান, দিলীপকুমারের 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা'। তাদের কোনো-কোনোটা কোনমতে শ্রাব্য, আবার দু-একটা প্রায় নতুনের মতো। দাম আশাতীত সস্তা, বলাই বাহুল্য। বললুম রেকর্ডটা দেখাও তো।

একজন বের করে দিল—অধিকাংশই সস্তা সিনেমার গান—কিংবা বাজার-চলতি 'পপুলার ডিস্ক'—পুজোর অ্যাম্প্লিফায়ারে বাজাতে বাজাতে যারা অকাল-জরা লাভ করেছে। তবু এদের মধ্যে একখানা রেকর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অচেনা লেবেল, অচেনা ভাষা। ওপরের লেখাগুলোও রোমান হরফ বলে মনে হল না। দেখলুম বেশি পুরনোও নয়।

হিন্দী রেকর্ডটা থেমে গিয়েছিল। বললুম, 'এটা বাজাও তো।'

চোঙাওলা গ্রামোফোন থেকে প্রথমে একরাশ অদ্ভুত বাজনা ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাজনা এর আগে কখনও শুনিনি। এক ড্রাম বাজছে—গীটারও আছে বোধ হয়, কিন্তু আরো কী কী যে আছে আমার বোধগম্য হল না। নানা ঢঙের বিদেশী ছবি দেখেছি—রেকর্ড শুনেছি অনেক, কিন্তু এ জিনিস কখনো কানে আসেনি এর আগে।

তারপর গান। নারীপুরুষের চার-পাঁচটি কণ্ঠ আছে মনে হল। যেমন অদ্ভুত বাজনা—তেমনি অদ্ভুত সুর। কেন জানি না—কোথায় রক্তের মধ্যে দোলা লেগে গেল। জানি এ সুর একেবারে অচেনা, তবু মনে হতে লাগল এ যেন আমি কবে কোথায় শুনেছিলুম। উল্টো পিঠেও একই জিনিস—একটা গানকেই গাওয়া হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় পেলে এ রেকর্ড?'

জবাব এল, 'চৌরঙ্গী অঞ্চলে ওদের যে এজেন্ট আছে সে এনে দিয়েছে।'

'এ কোন্ ভাষা?'

বিহারী মুসলমান দোকানদার হেসে বললে, 'ক্যা মালুম?'

বারোআনা পয়সা দিয়ে রেকর্ডখানা আমি সংগ্রহ করে নিয়ে নিলুম। দর করলে হয়তো আরো সস্তায় হত, কিন্তু কেমন যেন মনে হল দরাদরি করে খেলো করবার মতো গান এ নয়।

বাড়ি ফিরে মেশিনে দিয়েছি, আমার স্ত্রী করুণা উঠে এলো পড়ার টেবিল থেকে। নতুন অধ্যাপনায় ঢুকেছে—কলেজের ছাত্রীদের চাইতে পড়ার তাগিদ তার নিজেরই বেশি। ভুরু কুঁচকে বললে, 'এ আবার কী?'

বললুম, 'দেখতেই পাচ্ছ, রেকর্ড বাজাচ্ছি।'

'কী বিটকেল বাজনা রে বাপু! এ কাদের গান?'

'জানি না।'

'জানো না তো আনলে কেন ?'

'চুপ করো একটু, শুনতে দাও।'

মিনিট খানেক ধৈর্য ধরে রইল করুণা। তারপর মুখের ওপর টেনে আনল রাজ্যের বিরক্তি।

'পাগল করে দিলে যে। কোত্থেকে রাজ্যের ছাইপাঁশ জোটাও তুমিই জানো। পড়তে দেবার মতলব না থাকে তো বলো, সোজা ছাতে গিয়ে উঠি।'

'লক্ষ্মীটি—আর একটুখানি। তিন মিনিটে তোমার জ্ঞানার্জনে কাঁটা পড়বে না।'

গান থামলে করুণার দিকে তাকালুম। দেখি হাতে একটা লাল-নীল পেনসিল নিয়ে এসেছিল, তার গোড়াটা চিবোচ্ছে আনমনার মতো।

'খুব খারাপ লাগল করুণা ?'

করুণা একটু চুপ করে রইল। বলল, 'না—খারাপ লাগল না। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল। পড়াটা নষ্ট করে দিলে আমার।'

'কেন ?'

'ভারী আশ্চর্য লাগল সুরটা। মনে হল কবে যেন কোথায় শুনেছি।'

বললুম, 'ঠিক তাই। আমারও অমনি মনে হয়েছিল।'

করুণা আস্তে আস্তে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। মেশিনটা তুলে রেখে দেখি ও পড়ছে না, একটা ব্লটিং প্যাডের ওপর নীল পেনসিলের আঁচড় টানছে।

আমিও কতগুলো খাতা টেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের সংখ্যা বাড়াতে বসে গেলুম। কিন্তু একটা খাতাতেও মন দিতে পারছি না। দু কান ভরে ওই বিচিত্র বাজনা আর গানের সুর বেজে চলেছে। কোথায় শুনেছি—কবে শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

করুণা যেন আমারই ভাবনার সূত্র টেনে বললে, 'এ কী কাণ্ড করলে বলো তো ?'

'কী হল আবার ?'

'ওই রেকর্ডটা। ভারী অস্বস্তি লাগছে। যেন খুব চেনা—যেন—' করুণা গুনগুন্ করে দু-তিনটে সুর ভাঁজল, তারপর বিরক্ত হয়ে বললে, 'নাঃ—কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আচ্ছা পাগলামি ধরিয়ে দিলে যা হোক। দিলে পড়াটা শেষ করে।'

মোট কথা, ওই রেকর্ডখানা আমাদের দুজনের সন্ধ্যাকেই আচ্ছন্ন করে রাখল। এ একটা বিরক্তিকর মানসিক অবস্থা। খুব চেনা মানুষের নাম মনে করতে না পারলে, চাবির গোছা এই মাত্র কোথাও রেখে তারপরে আর খুঁজে না পেলে যেমন একটা ছট-ফটানি জেগে ওঠে, ঠিক সেই রকম।

রাত্রে খেতে বসে করুণা বললে, 'মনে পড়েছে।'

আমি চোখ তুলে তাকালুম।

'ছেলেবেলায় যখন আসামে ছিলুম, তখন খাসিয়াদের নাচের সঙ্গে যেন ওই রকম গান—'

'খাসিয়াদের গান ?'

করুণা একটু বিভ্রান্ত হল যেন। তারপর মাথা নেড়ে বললে, 'না না, ঠিক খাসিয়াদের নাচ নয়। ঠিক কী যেন—কী যেন—' একটু চুপ করে থেকে বললে, 'বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের ডাক শুনেছ কখনো ? পাহাড় ভেঙে নেমে আসে, বড় বড় গাছগুলিকে স্রোতের টানে কুটোর মতো ভাসিয়ে নেয়, দূরের পাহাড়ে বুনো হাতি গর্জে ওঠে, তখন নাগাদের ঢাকের আওয়াজ—'

বলতে বলতে হতাশ ভাবে চুপ করে গেল করুণা: 'কী জানি।'

কিন্তু ওই ঢাকের কথায় আর একটা স্মৃতি জেগে উঠল আমার মনে। মানভূম। দু ধারে কুসুম গাছের সারি আর ঘন বাঁশের বন—তারই ভেতর দিয়ে নির্জন পথ বেয়ে চলেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে—ঝালদার পাহাড় দূরে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশের একটা প্রকাণ্ড দীঘিতে পানডুবকীর কলধ্বনি, ঝিঁঝির ডাক।

হঠাৎ পানডুবকী আর ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে গুরু গুরু করে উঠল নাকারার আওয়াজ। এদিক থেকে ওদিক, এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্ত। কী একটা পরব আছে ওদের—গ্রামে গ্রামে শুরু হল ছৌ-নাচের পালা।

সেই অস্পষ্ট অন্ধকার—কালো হয়ে আসা কুসুম গাছ আর বাঁশবন, ঝালদার পাহাড়ের ভুতুড়ে ছবি আর ওই নাকারার আওয়াজে হৃৎপিণ্ড আমার চমকে চমকে উঠেছিল। মনে পড়েছিল, পুলিসের বুলেটের সঙ্গে লড়বার আগের দিন রাত্রে বিয়াল্লিশের আগস্টে, বালুরঘাটের অন্ধকার সাঁওতালি গ্রামগুলো থেকে অমনি ভাবেই নাকারা-টিকারার রোল আমি শুনেছিলুম।

বর্ষার ব্রহ্মপুত্র, নাগাদের ঢাক, নাকারা-টিকারার আওয়াজ, ছৌ-নাচের বাজনা,—এদের সঙ্গে কোথায় এই রেকর্ডটার মিল আছে ? মিলছে না—অথচ কোথায় যেন মিলছে। কিছুতেই মনে আনতে পারছি না—অথচ ঠিক মনে আছে। কী যে খারাপ লাগতে লাগল।

একটা অচেনা অজানা পুরনো রেকর্ড কিনে আচ্ছা জ্বালা হল তো।

এর মধ্যে একদিন করুণার এক সহপাঠিনী এসে হাজির।

শহরের ওপরতলার বাসিন্দা—নিতান্তই একদা করুণার সঙ্গে গভীর সখীত্ব ছিল বলে আমাদের এই হরিজনপাড়ায় পা দিয়েছেন। মহিলাটি বিদুষী এবং গুণবতী। ওয়েস্টার্ন মিউজিক শেখবার জন্যে ইউরোপে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গানের ওপর ডক্টরেট নিয়ে ফিরে এসেছেন। বরমাল্য দিয়েছেন এক মারাঠী একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারকে।

করুণা দারুণ খুশি হয়ে বললে, 'আইভি এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমাদের এই পাজল্‌টার একটা সলিউশন খুঁজে দে।'

রেকর্ডখানা দেখে কপাল কোঁচকালেন আইভি।

'কোনো স্লাভ ভাষা মনে হচ্ছে। বাজা তো।'

বাজানো হল। আইভিও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। শপ্যাঁ-ভাগনার-বাখ-বীঠোফোনের সঙ্গে পরিচয় আছে—তার ওপরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা অকারণেই শোনালেন আমাদের। কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

শেষে ব্যাগ খুলে একটা টফি খেলেন। তার সেলোফোনের মোড়কটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, 'কোনো কমিউনিটি সং বলে মনে হচ্ছে।'

করুণা বললে, 'সে তো বোঝাই যায়। অনেকে মিলেই গাইছে যখন।'

টফির মোড়কটাকে একটা আংটির মতো জড়ালেন আইভি। বললেন, 'নাউ আই রিমেম্বার। সুইৎসারল্যাণ্ডের একটা ম্যারেজ ফেস্টিভ্যালে এমনি গান আমি যেন শুনেছিলুম।'

ম্যারেজ ফেস্টিভ্যাল! করুণা আমার দিকে তাকালো একবার। চোখে চোখ মিলল। উত্তরটা কারোই মনঃপূত হয়নি।

করুণা বলতে যাচ্ছিল: ঠিক বিয়ের সুরের মতো মনে হচ্ছে কী? তা ছাড়া সুইস্‌রা তো স্লাভ্‌ বলে—

আইভি আর সময় দিলেন না, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ চলি ভাই। নিউ এম্পায়ারে একটা শো আছে, তার রিহার্সাল করতে হবে। তা ছাড়া অনেকক্ষণ এসেছি—ন্যান্সি ইজ্‌ ফিলিং ভেরি লোন্‌লি! এ পুয়োর লিট্‌ল থিং শী ইজ!'

ন্যান্সি ওঁর দুহিতা নয়—কুকুর।

ওঁর মোটরটা চলে যেতে করুণা বললে, 'চালিয়াৎ।'

আমি হাসলুম—জবাব দিলুম না। করুণা গজগজ করতে লাগল: 'ইউরোপে গাছের তলায় তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রি হয় শুনেছি। পাঁচ শিলিং কি সাত ফ্রাঙ্ক দিলে—'

করুণা ডক্টরেট নয়, অতএব এ স্বাভাবিক ঈর্ষা। আসল কথা শ্রীযুক্তা আইভিও আমাদের নিরাশ করলেন। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।

সেদিন মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙল।

জল খেতে উঠেছি—কানে এল বাঘের ডাক। রাত দেড়টায় ঘুমন্ত কলকাতার ওপর দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে একটা গম্ভীর ধ্বনি বয়ে যেতে লাগল। আর্ত অথচ ভয়ঙ্কর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ। মুখের কাছে জলের গ্লাসটা তুলে আমি নামিয়ে ফেললুম।

বাঘ ডাকছে।

আমাদের বাড়ি থেকে একটা সরল রেখা টানলে দুটো বড় রাস্তার ওপারে সোজা মার্কাস স্কোয়ার। একটা সার্কাসের দল দিন কয়েক হল তাঁবু ফেলেছে সেখানে। সেখান থেকেই আসছে বাঘের ডাক।

কলকাতার এই অনিদ্রা আলো-জ্বালা রাত্রে বাঘটা হয়তো সুন্দরবনের স্বপ্ন দেখছে। তাই চমকে জেগে উঠছে—অসহায় ক্ষোভ আর নিরুপায় কাতরতায় ডেকে উঠছে ও-ভাবে।

কিন্তু কেন জানি না—আমার ওই বিদেশী রেকর্ডটাকে মনে পড়ল। মিল আছে—ওর সঙ্গেও মিল আছে। অথচ কিছুতেই ধরতে পারছি না—কিছুতেই না।

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালুম। সামনের কয়েকটা পাম গাছ—তাদের মাথার ওপরে রাত্রির তারা—কয়েক টুকরো মেঘ, সব যেন বাঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বারবার।

শেষ পর্যন্ত সমাধান করলেন এক ভূ-পর্যটক।

রেকর্ডটা শুনে চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেসা করলেন, 'কোথায় পেলেন?'

'চোরা বাজারে।'

'আশ্চর্য।'

'কেন?'

'এ কলকাতায় এল কী করে তাই ভাবছি। এ রেকর্ড গোপনে তৈরি হয়েছিল—গোপনে বিক্রি আর বিলি হয়েছিল সামান্য সংখ্যায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকটি শিল্পীই নাৎসীদের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।'

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো আমার। জলজল করে উঠল করুণার চোখ। 'খুলে বলুন।'

ইয়োরোপের একটা ছোট দেশের নাম করলেন পর্যটক। 'নাৎসী অধিকারের সময় এই রেকর্ডটি ছিল সেখানকার মুক্তি-যোদ্ধাদের গান। হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল এর প্রতিটি কপি, আর অরিজিনাল—এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইডেট করেছে। অথচ সেই রেকর্ড পাওয়া গেল কলকাতার বাজারে।' পর্যটক থামলেন।

রাস্তা দিয়ে গর্জিত একটা ছাত্র শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। আমরা তিনজনেই কান পেতে শুনলুম কিছুক্ষণ। কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল ঘরে।

পর্যটক আবার বললেন, 'একটা অত্যন্ত দামী জিনিস পেয়েছেন আপনি। জানি না, যুদ্ধের পর ওরা এই রেকর্ডটাকে আবার চালু করতে পেরেছে কিনা। যদি না পেরে থাকে—'

ছাত্র শোভাযাত্রার দূর-ধ্বনিটা হঠাৎ বন্যার মতো প্রবল বেগে ভেঙে পড়ল। দুম দুম করে আওয়াজ উঠল কয়েকটা তারপর পথ দিয়ে চিৎকার করতে করতে কে বলে গেল : লাঠি চলছে—টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে—

আবার স্তব্ধতা নামল ঘরে।

দূরে শুনছি প্রাণের বন্যা—ক্রোধের ঝোড়ো গর্জন। না—এখন আর সুরটাকে চিনতে বাকী নেই। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষা-মাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ছৌ-নাচের নাকারা—বালুরঘাটের রাত্রি-কাঁপানো টিকারার আওয়াজ—মার্কাস স্কোয়ার থেকে বাঘের ডাক, আর—আর আজকের এই ঘা-খাওয়া মিছিল, সব একসঙ্গে মিলে ওই সুরটাকে সৃষ্টি করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে এ সুর এক। জানতুম, আমরাও এ সুরকে জানতুম। ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন চিনতে পারিনি।

করুণা আমার দিকে তাকালো। দু চোখে অসহ্য ঘৃণা জ্বলছে ওর। আস্তে আস্তে বললে, 'এ রেকর্ডকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।'

তিতির

'জুলফিকার!'

'সুখলাল!'

একসঙ্গেই ডেকে উঠল দুজন। তারপর কয়েক সেকেণ্ড এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কেবল। বাতাসে ছড়িয়ে যেতে লাগল লেবু-ঘাসের গন্ধ—মাথার ওপর উড়তে লাগল একটা শঙ্খচিল।

দুই দেশের সীমান্তরেখা। দুই রাষ্ট্রের প্রতিহারী।

মাঝখানে ঘন লেবুঘাস, টুকরো টুকরো ঘাস-জমি আর কিছু আগাছার জঙ্গল ছড়ানো পঞ্চাশ গজের মতো নো-ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড। অবশ্য স্বাভাবিক সময়ে। খবরের কাগজে কিছু উত্তেজনার তাপ লাগলে, নেতারা কখনো কখনো গরম বক্তৃতা দিলে দূরত্বটা তিন-চারশো গজ দাঁড়িয়ে যায়। তখন মুখের রেখা কুটিল হয়ে ওঠে—বন্য আলোয় জ্বলতে থাকে চোখ, হাতের রাইফেল উদ্যত হয়ে ওঠে। সার্জেন্ট মেজরের আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। আর আবহাওয়া শান্ত থাকলে অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে আসা, আড়চোখে লক্ষ্য করা পরস্পরকে—একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে এক-আধটু আলাপ করবার ইচ্ছে।

'আরে ভাইয়া!'

'আরে ভাইয়া!'

আরো কয়েক সেকেণ্ড। এ ওর দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকা। লেবু-ঘাসের মিঠে গন্ধভরা হাওয়ায়, বিকেলের লালচে আলোতে অপ্রতিভভাবে ভাবতে চেষ্টা করা কী বলা যায় এর পর। সুখলালের চোখে পড়ল জুলফিকারের গোঁফে যেন পাক ধরেছে। আর জুলফিকারের মনে হল এর মধ্যে যেন অনেকটাই বুড়িয়ে গেছে সুখলাল।

বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল এতক্ষণ বাঁধা নিয়মে কাজ করছিল জুলফিকারের। যে-কোনো একটা কথা আরম্ভ করবার জন্যেই জুলফিকার জিজ্ঞেস করলে, 'খইনি খাইবো?'

'কাহে নেহি?' সুখলাল স্বচ্ছন্দ হয়ে হাসল।

নো-ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ডের আগাছা মাড়িয়ে, দলিত লেবুঘাস থেকে আরো খানিক উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে দুজনে দুদিক থেকে এগিয়ে এল। তারপর একেবারে সামনাসামনি। আধ হাতের ভেতর।

সুখলাল হাত বাড়াল, খানিকটা খইনি ঢেলে দিলে জুলফিকার। একসঙ্গেই মুখে পুরল। আবার খানিকটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। লেবুঘাসের ওপর দিয়ে শিরশির করতে লাগল বাতাস, একটু দূরে একজোড়া তিতির এ-ওকে ডাকতে লাগল।

জুলফিকার বললে, 'বসবে একটুখানি?'

'কুছ্ হরজা নেই—' আবার হাসল সুখলাল।

একটুখানি পরিষ্কার ঘাসের জমির ওপর বসে পড়ল দুজন। বাঁদিকে আন্দাজ আধ মাইল দূরে একটা সাদা একতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। দুজোড়া চোখ অন্যমনস্কভাবে সেই বাড়িটার ওপর পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

'শেঠজীকা গদ্দী।' সুখলাল আস্তে আস্তে বললে।

'হ্যাঁ।' জুলফিকার দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ করে থুতু ফেলল ঘাসের ওপর।

খুব আরামসে এক হাতে গোঁফের একটা প্রান্ত নিয়ে পাকাতে লাগল: 'হ্যাঁ, ওরা আরামেই থাকে।'

'বে-আইনি কারবার চালায় হরবখৎ।'

'ওদের বদন ছোঁবে কে?' তিক্তভাবে জুলফিকার হাসল: 'হিন্দোস্তান হো—পাকিস্তান হো—ওদেরই তো মওকা। যত হয়রানি সব গরীবের বেলায়।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সমর্থন করল সুখলাল।

'গরীবের ওয়াস্তে দুসরা কানুন। আধা সের সুপারি ইয়া সেরভর কড়ুয়া তেল নিয়ে বর্ডার পার হতে গেলে গোলী খেয়ে মরবে।

'আর গোলী মারব আমরাই।' চাপা বিস্বাদ গলা জুলফিকারের।

'নোকরি।'

'হ্যাঁ, নোকরি।'

স্নিগ্ধ, শান্ত বিকেল। শরতের লাল রোদের ঝিলিমিলি। লেবুঘাসের গন্ধ। তিতিরেরা এ ওকে ডাকছে : 'শেখ ফরিদ কুদরৎ—শেখ ফরিদ কুদরৎ—'

ছেলেবেলার অভ্যাসে প্রতিধ্বনি করল সুখলাল।

'শেখ ফরিদ কুদরৎ
তেল-নিমক-আদরৎ—'

দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে। জুলফিকার বললে, 'আমাদের গাঁওয়ে নদীর ধারে অনেক তিতির থাকত।'

'হ্যাঁ, বহুৎ।'

'আর জিমিন্দার কামতাপরসাদজী বন্দুক নিয়ে তিতির মেরে আনত।'

'এখন আর তিতির মারে না। অ্যাসেমব্লিতে ঢুকেছে।'

'এখন আদমি মারে—' জুলফিকার মন্তব্য করল মৃদু হাসিতে।

'পাক্কা!' সুখলালের মাথা নড়ল।

কিন্তু কামতাপরসাদকে ছাড়িয়ে দুজনের মন অনেক পেছনে চলে গেছে। ওদের গ্রাম! রেলের 'টিশন' ছাড়িয়ে পুরো চার ক্রোশ। গাঁয়ে ঢোকবার মুখে সেই কতকাল আগেকার নবাবী তালাও। তার একপাশে বিরাট মহল চকনাচুর হয়ে ভেঙে পড়ে আছে—রাত করে লোকে সেদিক দিয়ে হাঁটতে সাহস পেত না—জিনের ভয়। মজে-আসা নবাবী তালাওয়ের ভাঙা ঘাটে নাকি কত লোকে দেখেছে জ্যোৎস্না রাতে সাদা কাপড় পরা দুটো 'চুড়ৈল' সেখানে গলা জড়াজড়ি করে বসে আছে।

ওদের ছেলেবেলায় এই জুলফিকার—এই সুখলাল—আরো কতজন ডানপিটে রাত করে জিন-চুড়ৈল দেখতে এসেছে। কিন্তু কোনোদিন দেখা পায়নি তাদের। একবার কেবল লকড়ের ডাক শুনে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সবাই।

গাঁয়ে ঢুকতে মহাবীরজীর ধ্বজা। আরো এগিয়ে মসজিদ। কামতাপরসাদজীর মস্ত বাড়ি। মানুষের ঘরদুয়োর। বাজার। আরো একটু এগোলে পুরনো পীরের দরগা। একটুখানি মাঠ। তারপর গাঁয়ের নদী। শিবমন্দির। নদীর নাম ঝুমঝুমিয়া।

ঘাসের বনে তিতির ডাকে। বালি ডাঙায় চিকচিক করে ভাঙা ঝিনুকের টুকরো। বালির ওপর পায়ের দাগ এঁকে এঁকে চাহার দল ঘুরে বেড়ায়, তিরতিরে নীল জলের ধারে এক ঠ্যাং তুলে দাঁড়িয়ে থাকে বগুলা।

এমনিতে হাঁটুভোর জল। মানুষ-গোরু-ভৈঁসা হেঁটে পার হয়। তারপর একসময়—আকাশের কালো মেঘেরা দল বেঁধে দেখা দেবার আগেই হড়পা বান নামল দূরের পাহাড়ে শাল-পলাশের বনে। আরেঃ বাপ—ক্যা বাতাউ? কয়েক ঘড়ির মধ্যেই নদীর বদন

বিলকুল পালটে গেল। লাল জল নেমে এল হুড় হুড় করে—কী তার তোড়, মানুষ দূরে থাক—তার ভেতরে হাথি ভি পড়লে কুটো হয়ে উড়ে যায়। ফেনা ছুটে যাচ্ছে তীরের মতো, পাক খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে গাছের ডাল, জলের তলায় গড়ানো পাথর গুঁড়ো হচ্ছে মড়মড়িয়ে। আর একবার কান পেতে শোনো জলের ডাক। কে বলবে এ সেই কুলকুল করে বয়ে চলা ছোট ঝুমঝুমিয়া? মনে হবে, লাখো ভৈঁসা যেন পাগল হয়ে গর্জাতে গর্জাতে ছুটে চলেছে!

এই নদীর সঙ্গে যেন ওদের জীবনের যোগ ছিল, ওই ঝুমঝুমিয়া নদীর সঙ্গে। ঝিনুক কুড়িয়েছে, বালি নিয়ে গেছে, শীতের দিনে নদী পার হয়ে কোঁচড় ভরে নিয়ে এসেছে 'বয়ের'। তিতিরের ডাক শুনে সাড়া দিয়ে বলেছে: তেল-নিমক-আদরৎ, তেল-নিমক-আদরৎ। কামতাপরসাদের ক্ষেত থেকে চুরি করে এনেছে কাঁচা ছোলা আর কচি বেগুন—নদীর ধারে বসে পুড়িয়ে খেয়েছে। জুলফিকার, সুখলাল—আরো অনেকে।

আবার নদীর মতোই গাঁয়ের জীবনেও বান নেমেছে। হোলি—মহরম—ইদ মুবারক—দেওয়ালী। দুঃখের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে 'হায়জা'—শীতের মাঠে যখন সর্ষে ক্ষেতে দেওয়ালী জ্বলেছে, তখন কোথা থেকে এসেছে প্লেগ। গাঁও ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে মানুষ আর বড়্‌কা বড়্‌কা সুই নিয়ে তেড়ে এসেছে ডাক্তারেরা।

তবু বানের জল যেমন চলে যায়—তেমনি করে সব মিলিয়ে গেছে একদিন। আবার নদীর ধারে ঘাসবনের ভেতরে তিতিরের ডাক। সকালে সন্ধ্যায় শুনিয়েছে শেখ ফরিদের মহিমা। বালি নিয়ে যাওয়া, ঝিনুক কুড়োনো। ঝাঁক বেঁধে চাহার নাচানাচি। আসমানের চাঁদ-তারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেওয়ালী জ্বালানো, হাউই ছোঁড়া। কাওয়ালী গানের সুরে, আতরের গন্ধে আর পোলাও-কোর্মার খোশবুতে ইদের সন্ধ্যা আনচান।

তারপর আর এক বান এল। ঝুমঝুমিয়া থেকে নয়। এল কলকাতা থেকে, এল লাহোর থেকে। দেখতে দেখতে মানুষ 'জানবর' হল। গোরুর মাথা পড়ল শিবমন্দিরে, ভাঙল মসজিদ, আগুন জ্বলল বাজারে, ঝুমঝুমিয়ার তিরতিরে নদীর জল দিয়ে ভেসে চলল লাশের পর লাশ। বগুলারা উড়ে পালাল, ঘাসবনের মধ্যে আর তিতির ডাকল না—শেখ ফরিদের দোয়া চাইবার মতো জোর পেল না গলায়। তখন কোথায় জুলফিকার—কোথায় সুখলাল!

স্মৃতির ভেতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল দুজনেই। চিন্তার এইখানটাতে এসে দুজনেরই চোখ জ্বলে উঠল একসঙ্গে। বিকেলের আলোয় জুলফিকার দেখল সুখলালের মুখের ওপর মেঘ নেমেছে; সুখলাল দেখল গোঁফের একটা দিক হিংস্রভাবে চিবোচ্ছে জুলফিকার।

কিন্তু সে আজ কতকালের কথা। অনেক পানি, বহুৎ ধুপ, অনেক জাড়া পার হয়ে

গেছে তার ওপর দিয়ে। ভুলো ভাই—উ বাত ছোড় দো। উ বীত গয়া। সময় এমনি ভাবেই চলে। 'আঁজুলিকা পানি'।

সুখলাল হাসল—জুলফিকার হাসল। আজ আর কারো ওপর কারো রাগ হচ্ছে না। কী করতে পারি তুমি আমি। নসীব।

বাতাসে লেবুঘাসের গন্ধ। নিঃশ্বাস টানতে টানতে স্নেহশীতলতায় জুড়িয়ে যায় কলিজা। বিকেলের লাল আলোকে দেওয়ালীর আলোর মতো মনে হয়। এখন আর কোনো বিরোধ নেই কোথাও।

'দেশে যাও না?' জুলফিকার জানতে চাইল।

'নাঃ।' সুখলালের ছোট্ট জবাব।

'তোমার ক্ষেত ছিল, হাল ছিল—কোথায় সে-সব?'

ক্ষত শুকিয়ে গেলেও এখনো রক্ত ফুটে উঠতে চায়। সুখলালের চোখে কুয়াশার মতো আবরণ নামল একটা।

'ভাইটা তো খুন হল দাঙ্গার সময়। আমি চলে এলাম কলকাতায়। গোলমাল থামলে দেশে এসে জানলাম, আমার জমি আর নেই। আমি আর ভাই নাকি টিপসহি দিয়ে টাকা নিয়েছিলাম কামতাপরসাদের কাছ থেকে। জমি কামতাপরসাদের খাস হয়ে গেছে।'

জুলফিকার নড়ে উঠল।

'নিয়েছিলে টাকা?'

'না—কভি নেহি।'

'হারামী।' দাঁতে দাঁত চাপল জুলফিকার।

'এখন অ্যাসেম্বলীর মেম্বার।'

'হাঁ, ওদেরই মওকা।' জুলফিকার গোঁফের একটা প্রান্ত চিবোতে লাগল: 'রজ্জব আলীভি করাচীতে গিয়ে খাসা আছে। বড়া মোকাম, বড়া নোকরি।'

সুখলাল বললে, 'দুসরা হারামী। তোমার বোনকে—'

আর বলতে পারল না। জিভ জড়িয়ে এল সংকোচে।

জুলফিকার চোখ তুলল আকাশে। সূর্য আরো পশ্চিমমুখো। রোদের রঙ আরো ঘন হয়ে এসেছে। যেন এক আঁজলা রক্ত ঝরে পড়ল জুলফিকারের মুখে।

'গলায় ফাঁস দিয়ে মরল বোনটা। থানার দারোগা সব গড়বড় করে দিলে। কিচ্ছু হল না রজ্জব আলীর।'

'ওদের কিছু হয় না।'

'না।'

'সব এক দলের !'

'বিলকুল।'

আবার চুপচাপ। বাতাসে ঘাসের গন্ধ। সন্ধ্যার আভাস পেয়ে দু-চারটে পোকা ডাকতে আরম্ভ করেছে। তিতিরের সাড়া নেই। কান পেতে ওদের কথাই শুনছে কি না কে জানে !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুখলাল।

'আর কামতাপরসাদজীই আমাদের ক্ষেপিয়ে দিলে।'

'রজ্জব আলী আমাদের বলল শহীদ হতে।'

'আমার ভাই মরল, মামা মরল।'

'আমার ঘর-দরজা ভি নিকাশ হয়ে গেল।'

'ওরা আরামসে আছে।'

'ওরাই থাকবে।'

'আমার ঘর নিল !'

'আমার ইজ্জত নিল !'

'ওদের জন্যে দুসরা কানুন।'

'হাঁ, ওদের কানুন আলাদা।'

এ ওর মুখের দিকে তাকাল। ক্লান্তি, তিক্ততা, নিরাশা। জুলফিকারের গোঁফে পাক ধরেছে, মুখের রেখাগুলো কেমন ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আছে। ঝুমঝুমিয়া নদীর এতটুকু চিহ্ন কোথাও নেই। আছে লাহোরের পোড়া ছাইয়ের গুঁড়ো, কলকাতার শুকনো রক্তের দাগ।

বিকেলের আকাশে কলধ্বনি তুলে উড়ে গেল হাঁসের দল। মাথা তুলে দেখল দুজনেই। চিনল। 'লাল সর' দিগন্তের ঘন গভীর রৌদ্রে কালচে লাল পাখিগুলো যেন চাপবাঁধা রক্ত মেখেছে গায়ে।

সুখলাল বললে, 'এমনি করে হাঁস উড়ে যেত আমাদের গাঁয়ের ওপর দিয়ে। ঝুম-ঝুমিয়া পার হয়ে যেত বড় বিলায়।'

'রাজহাঁস এসে নামত ধানের ক্ষেতে। চাঁদনী রাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত নতুন ধানের শীষ।'

'আর কখনো কখনো ক্যাটকেঁটিয়া এসে পড়ত নবাবী তালাওয়ে।'

'ভোরের আগে রজ্জব আলী যেত শিকার করতে, কামতাপরসাদও যেত।'

আবার কামতাপরসাদ—আবার রজ্জব আলী। স্মৃতির ভেতরে ফিরে গিয়ে, সোনালী দিনগুলোর মধ্যে ডুব দেবারও উপায় নেই। দু-দিক থেকে ছুটো 'মগরে'র মতো ছুটে

আসে ওরা। সামনে এসে দাঁড়ায় নবাবী তালাওয়ের শ্যাওলাভরা কালো জলের থেকে উঠে আসা সেই দুটো 'চুড়ৈল'এর মতো।

'উ বাত ছোড় দো।' একটা ঘাসের শীষ ছিঁড়ে নিলে সুখলাল।

'ছোড় দো।'

'যেতে দাও ও-সব। কী হবে আর ও-কথা ভেবে? তোমার ভিটেমাটি মুছে গেছে চিরদিনের মতো, আমার জমি-জিরাত খাস হয়ে গেছে কামতাপরসাদের। তুমি এখন পরদেশী—আমার দেশ থেকেও নেই।'

'এখন ডেরা-ডাণ্ডা বেঁধেছ এই বঙ্গালেই?' সুখলাল জানতে চাইল।

'ক্যা করে? থাকতে তো হবে কোথাও।'

'কেমন লাগে?'

জুলফিকার বিস্বাদ হাসি হাসল।

'ভিজে মাটি। প্যাচপেচে জল। বোখার হয়।'

'হঁা?'

'ভালো আটা মেলে না। পেটের গোলমাল হয়।'

'হঁা?'

সুখলালের চোখে পড়ল এতক্ষণে। শুধু গোঁফই পাকেনি জুলফিকারের, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে; কালির প্রলেপ পড়েছে চোখের কোনায়।

'তবু তো এই তোমার আপনা ঘর এখন।'

'হঁা, আপনা ঘর।' দাঁতের ফাঁক দিয়ে আবার পিচ করে থুতু ফেলল জুলফিকার। তারপর চিবোতে লাগল গোঁফের ডগা।

বিকেলের লাল কালো হচ্ছে ধীরে ধীরে। ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে লেবুঘাসের বনে। পোকার ডাক চড়া পর্দায় উঠছে ক্রমশ। আবার তিত্তিরের ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। শেখ ফরিদ কুদরৎ—শেখ ফরিদ কুদরৎ—

'আভি যা না।' জুলফিকার উঠে দাঁড়াল।

'ম্যয় ভি চলে।' উঠে দাঁড়াতে হল সুখলালকেও।

'নোকরি।'

'নোকরি।'

দুই প্রহরী। দুই সীমান্তের রক্ষী। মাঝখানের নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে। দুজনের ভেতর দু হাতের ব্যবধান।

নিজেদের জায়গায় ফিরে যাওয়ার আগে আর একবার এ ওর দিকে তাকাল। দু-জোড়া দৃষ্টিই কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। আঁসু? না—আঁসু অনেক আগেই

শুকিয়ে গেছে।

'আমরা বেকুব।' ফিসফিস করে বললে জুলফিকার।

'বুদ্ধু।' তেমনি গলায় জবাব দিলে সুখলাল।

আর ঠিক তক্ষুনি হাঁ-হাঁ করে উঠল জুলফিকার। চেঁচিয়ে বললে, হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—'

ঘাসের মধ্য থেকে যে গোখরোটা ফণা তুলেছিল, তার ছোবলটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ল মাটিতে। তার আগেই লাফিয়ে দু হাত সরে গেছে সুখলাল। আর ছোবল বসিয়ে মাথাটা তুলে নেবার আগেই জুলফিকারের রাইফেলের কুঁদো এসে পড়েছে সাপটার ফণায়। থেঁতলে একাকার হয়ে গেছে সেটা।

দুই সীমান্তের মাঝখানে নো-ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড। গোখরো সাপেরা বাসা বেঁধেছে সেখানে।

অন্তিম যন্ত্রণায় মোচড় খেতে লাগল সাপটা। পিছল চিত্রকরা শরীরটা এঁকেবেঁকে চলল নানা ভঙ্গিতে।

'ইবলিশ!'

'হারামী!'

'অনেক সাপ আছে এখানে।'

'বহুৎ।'

'তাই দুই সীমানার ফারাক।'

সুখলাল তাকাল জুলফিকারের দিকে। জুলফিকার তাকাল সুখলালের দিকে। একটা প্রশ্ন। একটাই। ঝুমঝুমিয়ায় আবার কি বান ডাকবে কখনো? কোনো নতুন বান?

'চলে।'

'চলে।'

প্রতিহারীরা ফিরে চলল। জুলফিকারের পা চলল জোরে। একটা জীপ গাড়ির আওয়াজ আসছে যেন দূর থেকে। সার্জেণ্ট মেজর রাউণ্ডে বেরেয়িছে হয়তো।

নো-ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ডে গোখরোর ফোকরে ভরা মাটির ওপর অন্ধকার নামল। মাথা থ্যাঁতলানো সাপটা স্থির হয়ে এল আস্তে আস্তে। বাতাসে ছড়াতে লাগল লেবুঘাসের বিষণ্ণ করুণ গন্ধ। পোকাদের ঐকতান উঠতে লাগল একটা প্রকাণ্ড করাত চলবার কর্কশ আওয়াজের মতো।

আর—আর তিতির ডাকতে লাগল।

আমার এই চিঠিটা পেয়ে তুমি চমকে উঠবে সে-কথা আমি জানি। ঠিক কালকের মতোই। কোর্ট থেকে মুচলেকা দিয়ে যখন তুমি বেরিয়ে এলে তখন তোমার ছাইয়ের মতো মুখ আমাকে দেখে আরো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। আমিও তক্ষুনি ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে গিয়েছিলুম। তুমি ভেবেছিলে, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। কিন্তু তুমি জানতে না, খবরের কাগজে নামটা দেখেই আমার কেমন অদ্ভুত সন্দেহ হয়েছিল। আমি জানতুম এ অসম্ভব—এমন হতেই পারে না। তবু একটা অলস কৌতুহলের টানে যখন আদালতের ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম—তখন দেখলুম অসম্ভবও সম্ভব হয়। তুমিই তো!

চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না—চশমা খুলে ফেললুম। ফলে সব কুয়াশার মতো ঝাপসা হয়ে গেল। আমি আর থাকতে পারলুম না। সোজা বেরিয়ে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলুম।

বৈশাখী রোদে বাইরে আগুনের ঢেউ খেলছিল। আদালতের বুড়ো অশথ গাছটার ঝরে-যাওয়া লাল পাতাগুলো ঘূর্ণি হাওয়ায় নেচে বেড়াচ্ছিল পথের উপর। ভাঙা গলায় একটা কাক ডাকছিল থেকে থেকে। এক পেয়ালা অসম্ভব গরম চা সামনে নিয়ে চুপ করে আমি বসে রইলুম। মনে পড়ল তোমাকে যেদিন আমি প্রথম দেখেছিলুম।

বন্ধুর বিয়েতে গেছি তোমাদের গ্রামে। তুমি পাশের বাড়ির মেয়ে। সেদিনের গায়েহলুদের রঙ তুমিও মেখেছিলে তোমার গালে মুখে; কালোপাড় শাড়িতে। আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলুম, কাঁচা সোনার উপর কি আর হলুদের রঙ খোলে? সোনাই যে মলিন হয়ে যায়।

বন্ধুর সঙ্গে তোমার কী যেন ঠাট্টার সম্পর্ক ছিল। তা ছাড়া যে-ভাবে ওর মুখে তুমি হলুদ ঘষে দিয়েছিলে, তাতে খানিকটা রাগও করে থাকবে হয়তো। আমার চোখ লক্ষ্য করে আর তোমার দিকে একবার তাকিয়ে ফস করেই বলে ফেলল: বাঃ, তোরই তো গায়ে-হলুদ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এই তো নিশীথ রয়েছে, ভারী সুপাত্র, লাগিয়ে দেওয়া যাক—কী বলিস?

বন্ধুর পিঠে আমি এমন একটা চড় কষালুম যে উঃ করে উঠল। আর লজ্জায় একবার কেঁপে উঠেই তুমি তক্ষুনি ছুটে পালালে।

বন্ধুকে বললুম, ইডিয়ট্! রসিকতার একটা মাত্রা রাখতে নেই!

বন্ধু হাসল: কিন্তু অন্যায় বলিনি। মেয়েটা সত্যিই ভালো রে! বিয়ে করলে

ঠকবি না।

কথাটা ভুলতে পারলুম না। আর ভুলতে পারলুম না সোনার উপর হলুদের ছাপ, লজ্জায় রাঙা হয়ে যাওয়া তোমার মুখ।

সেই একটুখানি দেখাই আমার মাথার ভেতর নেশার মতো জমাট বেঁধে রইল। সেই নেশাটাকে ঘন করে তোলবার আয়োজনই তো ছিল চারদিকে। বিয়ের বাসরে শানাই বাজছিল, শাঁখের শব্দ উঠছিল ঘন ঘন, চেলি-চন্দনে অপরূপ দেখাচ্ছিল কনেকে, নিতান্তই সাধারণ চেহারার কালো লম্বা বন্ধুটিকে দেখাচ্ছিল ঠিক রাজপুত্র। মালা-বদলের সময় হঠাৎ মনে হল, সেই হলুদমাখা লজ্জা-রাঙানো তোমার মুখখানাই কনের মুখে গিয়ে পড়েছে, কাঁপা হাতে আমার গলাতেই তুমি মালা পরিয়ে দিচ্ছ যেন।

একমাস পরে আবার বন্ধুর বাড়িতে ঘুরে এলুম। তারপর—

তোমরা বেশি পয়সাকড়ি দিতে পারবে না জেনে বাবার আপত্তি হয়েছিল একটু। কিন্তু আমি একমাত্র সন্তান। তার উপর তোমাদের বংশ ভালো, তোমার আশ্চর্য রূপ। কথা পাকা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

যেদিন তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে নৌকোয় উঠলুম—সেদিন আকাশ আলো করে দ্বাদশীর চাঁদ। খাল বেয়ে নৌকো চলেছে, দু পাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চাঁদও এগিয়ে চলেছে সঙ্গে। জলটা কখনো দুধের মতো ধবধব করছে, কখনো বা হিজলপাতার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোটা চিংড়ি-ধরা জালের মতো জলের উপর দোল খাচ্ছে। দু পাশের বেতবনের মধ্যে লগির ঘায়ে চমকে লাফিয়ে উঠছে ঘুমভাঙা মাছ—নলখুরি ফুলেরা পাপড়ি গুটিয়ে এলিয়ে পড়েছিল—তারাও শিউরে শিউরে উঠছে থেকে থেকে।

পর পর দুখানা নৌকোয় এগিয়ে চলেছি আমরা। সামনের নৌকোয় বাবা রয়েছেন, পুরুতঠাকুর আছেন, পুবের ভিটের জ্যাঠামশাই রয়েছেন। নৌকোর উপরে বসেছে তোমাদেরই দুজন লোক—আমাদের মাঝিরা অত দূরের খাল চেনে না, ওরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমারই নৌকোয় বরযাত্রী বন্ধুবান্ধবের ভিড়, হাসছে, গল্প করছে, সিগারেট খাচ্ছে, হার্মোনিয়াম বাজিয়ে সুরে-বেসুরে গান গাইছে।

কিন্তু আমার মন কিছুতেই ছিল না। বালিশে কনুই রেখে আমি বাইরের দিকে চোখ মেলে দিয়েছিলুম। কখনো গাছের আড়ালে ডুব দিচ্ছে চাঁদ, কখনো ঠিক আমার মুখের উপরেই উঁকি মারছে এসে। মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবীটাই আজকে গায়ে হলুদ মেখে বসে আছে—চাঁদ থেকেও চুঁইয়ে চুঁইয়ে হলুদ ঝড়ো পড়েছে চারদিকে। নৌকোর ছল-ছল উলুধ্বনি দিচ্ছে, পাতায় পাতায় খস্ খস্ করে বেজে উঠছে নতুন চেলির শব্দ,

খালের ধারে নরম কাদা একরাশ শ্বেত-চন্দন হয়ে গেছে, বাঁশের বনে রাত্রির হাওয়ায় শানাইয়ের সুর বাজছে।

কত রাত পর্যন্ত সবাই হল্লা করেছিল জানি না, একসময় খেয়াল হতে দেখলুম, যে যেখানে পারে ঘুমিয়ে পড়েছে এলোমেলো ভাবে। সামনের নৌকোতেও কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু মাঝিরা ক্লান্তভাবে লগি ঠেলে চলেছে।

তখন আমি ভাবছিলুম তোমাদের বাড়ির কথা। সেখানে কি কারো চোখে ঘুম আছে আজকে? বড় বড় পেট্রোমাক্সের আলো জ্বলছে, সামিয়ানা খাটানো হচ্ছে, রাত জেগে কাজ করছে মেয়েরা, আলপনা দেওয়া চলছে। তোমাকে হয়তো তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কাল সারাদিন উপোস দিতে হবে—অনেক ধকল যাবে শরীরের উপর দিয়ে। তোমার পিসিমা হয়তো এসে বলেছেন: 'আহা, আজ আর মেয়েটাকে তোরা জ্বালাসনি—একটুখানি জিরোতে দে।'

কিন্তু তুমি কি ঘুমুতে পারছ? তোমার শোওয়ার ঘর আমি দেখেছি—তোমার মাথার কাছের জানলাটাও আমার মনে আছে। ঠিক জানলার বাইরেই তো একটা বাতাবী লেবুর গাছ। এখন তো বাতাবী লেবুর ফুল ফোটবার সময়, নিশ্চয় তার মিষ্টি গন্ধে তোমার ঘরখানা ভরে গেছে। আমার মতো চাঁদের আলো তোমারও মুখের উপর ঝরে পড়েছে, তুমিও ঘুমুতে পারছ না কিছুতেই। আধবোজা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছ প্রতিটি মুহূর্তে আমার নৌকো এগিয়ে আসছে তোমাদের ঘাটের দিকে। লজ্জায় ভয়ে তোমার বুক কাঁপছে। হয়তো এরই মধ্যে মৃদু নিঃশ্বাস পড়ছে কয়েকবার। কালকে থেকে তুমি আর এ-বাড়ির কেউ নও। তোমার এই ছোট্ট শোবার ঘরটি, দেওয়ালে এই যে বসুধারার দাগ, তোমার টেবিলটির উপর বই খাতা চুলের ফিতে, আল্‌নায় এই যে ডুরে শাড়ি—এদের সকলের সঙ্গে কাল থেকে তোমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। ওই বাতাবী লেবুর গাছটা, জানলার ফাঁকে ওই চেনা আকাশটুকু—সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কোন্ অজানার মধ্যে যে তুমি ঝাঁপ দেবে!

কিন্তু ভয় পেতে গিয়েও তুমি ভয় পাচ্ছ না। আমার মুখ তোমার মনে পড়ছে। আমাকে দেখেছ, আমাকে বিশ্বাসও করেছ তুমি। সেই অজানার মধ্যেও আমি আছি তোমার পাশটিতে। তোমাকে রক্ষা করব, আশ্রয় দেব, যদি কখনো দুঃখ পাও, চোখের জল মুছিয়ে দেব। আমাকে তুমি বিশ্বাস করেছ।

তোমার ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। মিষ্টি গন্ধের ঝলকের মতো টুকরো টুকরো স্বপ্ন ভেসে যেতে লাগল চোখে।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙল বেসুরো চেঁচামেচিতে। বাবাই চিৎকার করছেন, কী হবে এখন? কেমন করে লগ্নের মধ্যে গিয়ে আমরা পৌঁছুব? ছিঃ ছিঃ, আমার মান গেল,

ভদ্রলোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে, এখন কী উপায় করি আমি?

বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ির ঘা পড়ল।

সেদিন যা ঘটেছিল, পরে হয়তো সবই তুমি জেনেছ। পথ দেখাবার দায় নিয়ে তোমাদের ওখান থেকে যারা এসেছিল, সন্ধ্যার পরে বেশ করে সিদ্ধি খেয়েছিল তারা। সেই সিদ্ধির নেশায় সারারাত ভুল পথ দেখিয়েছে। ভোরে যখন চটকা ভেঙেছে, তখন তারা দেখেছে নৌকো এসে পৌঁছেছে ঝা-পুরের স্টীমার ঘাটে। তোমাদের গ্রাম এখান থেকে কম করেও এখন পুরো দেড় দিনের পথ। যত চেষ্টাই করা যাক—রাত বারোটার আগে সেখানে পৌঁছনো সম্ভব নয়। অথচ সন্ধ্যার পরে আর দ্বিতীয় লগ্ন নেই।

আমার সামনেই ঝা-পুরের নদী। যতদূর চোখ চলে ঢেউয়ের পর ঢেউ। কাল সমস্ত রাত চাঁদের সঙ্গে, খালের জলের সঙ্গে, স্বপ্নের সঙ্গে তুমি আমার কাছে ছিলে। আজ এই সকালে সামনের রাক্ষসী নদীটার একেবারে ওপারে চলে গেছ তুমি, দূর-দূরান্তে কয়েকটা ঝাপসা গাছপালা ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না।...বাবা বলছিলেন, যত টাকা বকশিশ চাস দেব, যেমন করে হোক সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া চাই।

মাঝিরা বললে, বাবু আমরা মানুষ—কলের জাহাজ নই। তবু চেষ্টা করে দেখব। এখন কেবল আল্লার মেহেরবানি।

নাওয়া খাওয়া বিশ্রাম পড়ে রইল—নৌকো ছুটল পাগলের মতো। জোয়ারের মুখে দাঁড় টেনে, বৈঠা ফেলে, লগি ঠেলে বাইচের দৌড়ের মতো চলল নৌকো। বরযাত্রীদের মুখে কথা নেই। বাবা কেবল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, আর বলছেন, আরো—আরো তাড়াতাড়ি—

গা দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে মাঝিদের। মুখ দিয়ে ফেনা। আর আমি? আমার কথা কি বলবার দরকার আছে কিছু?

পথ-দেখানোর লোক দুটো গণ্ডগোল বুঝে ঝা-পুর ঘাটে নেমেই গা ঢাকা দিয়েছিল। রাস্তা জিজ্ঞেস করতে করতে আর অসুরের মতো বাইতে বাইতে মাঝিরা প্রায় অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলল। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হল না।

তোমাদের ঘাটে যখন নৌকো পৌঁছল, তখনও আধঘণ্টার মতো লগ্ন আছে। বাবা বললেন, ভগবান আমাদের মুখ রেখেছেন।

কিন্তু তোমরা অপেক্ষা করোনি। বেলা নটায় যাদের আসবার কথা, তারা এসে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় পৌঁছলেও পৌঁছতে পারে—এ আশা তোমরা কী করে রাখবে? পাড়াগাঁয়ের সমাজ। লগ্নভ্রষ্ট হলে জাত যাবে—অন্যপূর্বাকে কেউ ঘরে নিতে চাইবে না—তোমার অত রূপের জন্যেও না।

আমাদের আর তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে হল না। তার আগেই খবর এল,

নিরুপায় হয়ে তোমার বাবা গ্রামের একটি অকর্মা ছেলেকে একটু আগেই এনে পিঁড়িতে বসিয়েছে। বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে।

বাবার সমস্ত মুখ কালো হয়ে গেল। বললেন, গাঁয়ে কারো অরক্ষণীয়া মেয়ে নেই? শুধু শাঁখা-সিঁদুর হলেই চলবে। দশ মিনিটের মধ্যে যোগাড় করো। ছেলের বিয়ে না দিয়ে, বৌ না নিয়ে আমি ফিরব না।

এইবার আমি বাধা দিলুম, সে হয় না, বাবা। তার দরকার নেই।

বাবা বললেন, দরকার আছে, এ অপমান নিয়ে গ্রামে ফিরতে পারব না।

বললুম, আমার পক্ষে এ অবস্থায় বিয়ে করা সম্ভব নয়, বাবা। আমাকে ক্ষমা করো। তাছাড়া কেবল আজই নয়। আমি আর বিয়েই করব না।

বাবা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বেশ, তবে তাই হোক। নৌকা মধুগঞ্জের বাজারে নিয়ে চলো। আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম করে ভোরে আমরা ফিরে যাব।

বরের টোপরটা এক ফাঁকে আমি খালের জলে ভাসিয়ে দিলুম—কেউ টের পেল না। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম আজ আর চাঁদ নেই—খানিকটা মেঘ উঠে এসে তাকে আড়াল করে রেখেছে। খালের জল কালির মতো কালো। দু ধারের বেতবনে বাতাসের শব্দ কর্কশ হাসির মতো শোনা যাচ্ছে।

নৌকো যখন তোমাদের ঘাট থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসছে, তখন ভাগ্যের একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজ আর উলুধ্বনি ভেসে এল। হয়তো সম্প্রদান আরম্ভ হয়েছে। বাবা একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন সবেমাত্র, সেটাকে তখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জলের মধ্যে—আমি তার মধ্যে আমার আকাঙ্ক্ষার পরিণামটা দেখতে পেলুম। একটুকরো লাল আগুন হাওয়ার মধ্যে চার-পাঁচ সেকেণ্ড ছুটে গিয়ে সেই কালির মতো কালো জলের ভিতর চিরকালের মতো হারিয়ে গেল। ও আর কোনোদিন জ্বলবে না।

শুধু আমার বুকের ভিতর একটা পোড়ার যন্ত্রণা সমানে জ্বলে যেতে লাগল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম আমি। চন্দ্রহীন আকাশে চলন্ত মেঘগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার শুভক্ষণটিও ভেসে চলে গেল।

গ্রামের স্কুলের মাস্টারি করছিলুম—দুদিন পরেই সে চাকরি ছেড়ে দিলুম। কলকাতায় চলে এলুম ছোটমামার মেসে। যুদ্ধের তখন শেষমুখ। সিভিল সাপ্লাইয়ে একটা চাকরিও জুটে গেল।

কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারলুম না। টিউশন করে মেসে ফিরে আসি রাত করে। ঢাকা-দেওয়া ঠাণ্ডা ভাতটা খেয়ে নিই। তারপর ঘরের বাকি দুজন ঘুমিয়ে পড়লে

জ্বালিয়ে নিই মোমবাতি, একখানা 'সঞ্চয়িতা' কিনেছি, পড়ি রবীন্দ্রনাথের কবিতা: 'ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য যাওয়া আসা, পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।'...আর ভাবি, তুমি কেমন আছো। সুখী হয়েছ নিশ্চয়ই। ঘর-সংসার, স্বামী, শিশু—

দিনের পর দিন কেটে গেল। যুদ্ধ থামল, এল পার্টিশন। সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি ছেড়ে আমি ভবানীপুরের একটা স্কুলে চাকরি নিয়েছি। বাবা মারা গেছেন —মাকে এনেছি নিজের কাছে। কেটুয়াখুটি রোডে আদি গঙ্গার ধারে ছোট ছোট দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছি সস্তায়। আমার দিন-রাত্রি বাঁধা পড়ে গেছে। সকাল সন্ধ্যে টিউশন—দুপুরে স্কুল। বাড়ি ফিরলে আমার দিনযাত্রার মতো সামনে আদিগঙ্গার স্রোত —আমার ভবিষ্যতের মুখে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে গঙ্গার ওপারে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের লাল প্রাচীর।

মা কতবার বলেছেন, বিয়ে কর।

আমি রাজী হইনি।

না মা, ও-কথা আমায় আর বোলো না।

তারপর গতবছর মাও ছেড়ে গেলেন। মরবার আগের দিন হাসপাতালে আমার হাত ধরে বললেন—বাবা, চল্লিশ তো পেরিয়ে গেলি। এমন ভাবে বিবাগী হয়েই তুই কাটাবি? আমি চলে গেলে কে তোকে দেখবে, কে দুটি তোকে খেতে দেবে? আমাকে কথা দে, যত শীগ্‌গির হয় তুই বিয়ে করবি—নইলে মরেও আমি শান্তি পাব না।

মার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। এই শেষ সময়ে মাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করছিল না। চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, তাই হবে মা, বিয়ে আমি করব।...কিন্তু সেই শুভক্ষণটি যে আমার এত কাছে এসে পড়েছে সে কি জানতুম?

খবরের কাগজের ওই জায়গাটাতে চোখ হঠাৎই পড়ল বলতে হবে। ও-সব খবর আমি পড়ি না। তবু কী করে ওখানেই আটকে গেল দৃষ্টিটা। পূর্ব-কলকাতার কোন এক হোটেলে পাপ ব্যবসা চালাবার অভিযোগে পুলিস হোটেলের মালিক এবং সেই সঙ্গে তিনটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করেছে। সেইখানেই দেখলুম একটি নাম। আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত ধরনের পদবী—তোমার স্বামীর পদবী আমার মনে ছিল।

কাজ আছে বলে মামলার দিন ছুটি নিলুম স্কুল থেকে। এলুম কোর্টে। ভেবেছিলুম এ অসম্ভব—এমন হতেই পারে না। এ শুধু অলস কৌতূহল ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু দেখলুম, তুমিই তো। তুমি ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। তোমার চেহারায় এখন

অনেক বছর তার ছাপ ফেলে গেছে, তোমার কাঁচা সোনার মতো রঙ মলিন হয়ে গেছে। পারুলফুলের মতো মুখখানি থেকে পাপড়ি ঝরে গেছে অনেকগুলো। চোখের কোণে কোণে কালি। সেই এলিয়ে দেওয়া মাজা ছাপানো চুলের রাশ আর নেই—এখন তা ফাঁপানো, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। তোমার নখে রঙের চিহ্ন, তোমার ঠোঁটে রঙের আভাস। তবু তুমি—তুমিই।

চোখে ভুল দেখছি মনে করে চশমা খুলে ফেললুম। সব যেন ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। বাইরে ছুটে এলুম। ঢুকে পড়লুম একটা চায়ের দোকানে—এক পেয়ালা অসম্ভব গরম চা নিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলুম তোমার কথা। বাইরে অশ্বত্থের পাতা নিয়ে দুপুরের বাতাস ঘূর্ণির তালে নাচতে লাগল, একটা কাক ভাঙা গলায় ডেকে উঠতে লাগল থেকে থেকে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে চায়ের দোকানের বেয়ারা এসে বললে, কই বাবু, চা খেলেন না তো! ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে!

পয়সা দিয়ে আমি পথে নেমে এলুম। দুপুরের রোদ তখন আমার মাথার মধ্যেই জ্বলছে। আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে ঘূর্ণি হাওয়া। জানি, পাকিস্তান হওয়ার পর সব অন্যরকম হয়েছে। চোখের সামনে এখন অনেক কিছুই তো দিনের পর দিন দেখছি যা কোনোদিন কল্পনাও করা যেত না।

কিন্তু তুমি—তুমিই। কেমন করে ভুলব সেই গায়ে হলুদের রঙ, সেই নারকেল-বনের ছায়া, সেই বাতাবী লেবুর গন্ধ?

আবার এলুম কোর্টে। তোমাদের মামলার দিন।

দলে দলে লোক হাজির হয়েছে আদালতে। বোধ হয় এসব মামলায় এমনি করেই আসে ওরা। সহানুভূতির চাইতেও নগ্ন কৌতূহল আর নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের ভিড়। তাদেরই মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

দু চোখের জল ছেড়ে দিয়ে তুমি জবানবন্দী দিলে।

পার্টিশনের পর স্বামী নিয়ে এসেছিল কলকাতায়। তারপর স্রোতের শ্যাওলা। এ ঘাট থেকে ও ঘাটে। দুটো বাচ্চা ক্যাম্পে কলেরায় মরে গেল। শেষকালে যদি কলোনির খড়ের ছাউনিতে মাথা গোঁজবার ঠাঁই হল তো পেটের খাওয়া জোটে না।

তোমার স্বামী সামান্যই লেখাপড়া জানত। দেশে অল্প-স্বল্প যা ছিল তাই নাড়াচাড়া করে খেত, বাকি সময় কাটাত বখামো করে। কলকাতায় এসেও কিছু কাজ জোটাতে পারল না—কিন্তু শয়তানের দলে জুটে গেল ঠিক।

তারপর একদিন কালীঘাটে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তোমাকে একখানা বড় নীল রঙের মোটরে তুলে দিলে। সেইদিন তুমি দেখলে তোমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে

গেছে—মাথার উপর থেকে মুছে গেছে আকাশ।

পাতালের সিঁড়ির নিয়ম আছে। এক ধাপ পা দিয়েই আর পরিত্রাণ নেই। একটু একটু করে একেবারেই তলায় নামিয়ে নেবে। আলো আর মাটির জীবন থেকে বিদায় নিলে তুমি। দু বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও পারোনি—ভাগ্যকেই মেনে নিলে শেষ পর্যন্ত।...আর স্বামী? যাদবপুরের ওদিকে কোথায় একটা ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে তিন বছর জেল খাটছে।

সব খুলে বলেছিলে, একটি কথাও গোপন করোনি। আদালত থমথম করতে লাগল। যে চোখগুলিতে নগ্ন নিষ্ঠুর কৌতুক আর কৌতুহল ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছিল, কখন নিভে গেল সেসব; আমার আশেপাশেই কয়েকটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম।

হাকিমও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কী আর বলবার ছিল?

আইনের মুখ চেয়ে শাস্তি দিলেন, টিল দি রাইজিং অব দি কোর্ট। ভদ্রভাবে ভবিষ্যতে থাকবার মুচ্‌লেকা।

ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে তুমি বেরিয়ে এলে। পথের ভিড়ের মধ্যে চকিতে দেখতে পেলে আমাকে। ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলে একবার, তারপর মনে করলে আমি নিতান্তই একজন পথ-চল্‌তি লোক—তোমাকে দেখেও চিনতে পারিনি। আর আমিও তৎক্ষণাৎ তোমার সামনে থেকে সরে এলুম। কিন্তু তখুনি বুঝতে পারলুম কী আমাকে করতে হবে।

তারপর কাল সারা রাত আমি ভেবেছি। সমস্ত রাত নিজের সঙ্গে আমার লড়াই চলেছে। তাকিয়ে দেখেছি, বুকের ভিতরে যে জায়গাটা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছিল, সেটা এখন একটুকরো হীরের মতো জ্বলছে। যা আগুন ছিল, তা আলো হয়ে উঠেছে। সে আলোয় জ্বালা নেই—জ্যোতি হয়ে আমার বুকখানাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। ...আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম।

দুপুরে আবার গেলুম কোর্টে। অনেক চেষ্টায় তোমাদের মামলার উকিলকে খুঁজে পেলুম। আরো অনেক চেষ্টায় পেলুম তোমার ঠিকানা। আমি স্কুলমাস্টার বলেই ঠিকানাটা দিলেন—নইলে কিছুতেই দিতেন না।

আমি ঠিক করেই নিয়েছি। জীবনে একবার শুভক্ষণকে আমি হারিয়েছিলুম, সেদিন আমার কোনো হাত ছিল না। আজ সেই শুভলগ্ন আবার এসে পড়েছে, এবার আর ভাগ্যের উপর বরাত দেব না—এই শুভ মুহূর্তটিকে নিজের জোরেই আমি জয় করে নেব। মার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করব আমি।

তোমার স্বামী? আমি জানি, সে কেউ নয়। তোমার আমার মাঝখানে সে হঠাৎ এসে পড়েছিল—আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তার। আর এতদিন ধরে সে কী

দিয়েছে তোমাকে ? দিয়েছে দুঃখ, দিয়েছে অকথ্য অপমান। দুটি বীরের বাহু বাড়িয়ে তোমাকে রক্ষা করা দূরে থাক—নিজের হাতে অন্ধকারের পথে তোমাকে ঠেলে দিয়েছে।

তোমাকে আমি উদ্ধার করব। আইন আমাকে সাহায্য করবে।

আর সময় নেই। আর আমার দেরি করা চলবে না। একজন হোটেলের মালিক জেল খাটছে, কিন্তু ওর মতো আরো অনেকের তো অভাব নেই। এক্ষুনি আমাকে তৈরি হতে হবে, ওদের কেউ তোমার জীবনে এসে পড়বার আগেই।

আমি জানি, কেটুয়াখুটি রোডের এই টিনের ঘরেই তোমার আসল জায়গা। আমার মনে পড়ছে সেই গায়ে হলুদের রঙ—সেই লেবুফুলের গন্ধ। চিঠি লিখতে লিখতে চোখ তুলে দেখছি আদিগঙ্গার জলে দুধবরণ জ্যোৎস্না ঢেউ খেলছে, জেলখানার প্রাচীরটা চাঁদের আলোয় আবছা হয়ে গেছে। এখন আর কোনো বাধাই নেই।

কাল সন্ধ্যায় আমি তোমাকে আনতে যাব। তুমি আসবে আমি জানি। এমন শুভক্ষণকে তুমিও মিথ্যে হতে দেবে না।

লণ্ঠনের তেল ফুরিয়েছে—একটু পরেই নিভে যাবে। তা যাক। বাইরে চাঁদ উঠেছে। আর সেই হীরেটা ধকধক করে জ্বলছে আমার বুকের ভিতর।